বাংলা

প্রথমপত্র

কোর্স কোড - HSC 1801

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচ এস সি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা

প্রথমপত্র

কোর্স কোড - HSC 1801

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচ এস সি প্রোগ্রাম)

কোর্স সমন্বয়কারী
মোঃ চেঙ্গীশ খান
মেহেরীন মুনজারীন রত্না

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা

প্রথমপত্র

কোর্স কোড - HSC 1801

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : ১৯৯৮

পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১১

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

ছবি

মাসুদ মাহমুদ মল্লিক

শেখ মনির উদ্দিন

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ মামুন মিঞা

Ó বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3068-9

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর - ১৭০৫

মুদ্রণ

মেসার্স পি. এ প্রিন্টার্স

২৯/১ রূপচান লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

গদ্য

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা : বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা		১
বিড়াল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫
কারবালার পর	মীর মোশাররফ হোসেন	১৮
আদর্শ মহাপুরুষ	শেখ আব্দুর রহিম	৩৯
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬
বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৬
যৌবনের গান	কাজী নজরুল ইসলাম	৯৭
জীবন ও বৃক্ষ	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	১১১
বইকেনা	সৈয়দ মুজতবা আলী	১১৯
পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৯
সূর্যগ্রহণ	জহির রায়হান	১৬১

কবিতা

ভূমিকা : বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা		১৮৩
সমুদ্রের প্রতি রাবণ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬
মানব বন্দনা	অক্ষয় কুমার বড়াল	২০৪
ওরা কাজ করে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৬
ছন্দ হিন্দোল	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২৩৮
খেয়া পারের তরণী	কাজী নজরুল ইসলাম	২৪৪
কবর	জসীমউদ্‌দীন	২৫৩
পাঞ্জেরী	ফররুখ আহমদ	২৬৭
রানার	সুকান্ত ভট্টাচার্য	২৭৩
তোমাতে অমর আমি	আহসান হাবীব	২৮২
অনন্য স্বদেশ	হাসান হাফিজুর রহমান	২৯৫

সহপাঠ : উপন্যাস

লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১-১৫৫
ভাষারীতি ও প্রবাদ-প্রবচন		১৫৯-১৬৮

শিক্ষার্থীদের প্রতি

এইচ এস সি প্রোগ্রামের বাংলা প্রথম পত্র বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। এতে গদ্য, কবিতা, উপন্যাস ও বিরচন স্থান পেয়েছে। গদ্য ও কবিতা যেখানে শুরু হয়েছে তার আগে যথাক্রমে গদ্য ও কবিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের ধারণা এ পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের এ রেখাচিত্রটি জানা জরুরি।

আপনারা লক্ষ করে থাকবেন- বইটি দূরশিক্ষণের উপযোগী মড্যুল পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামের বাংলা বই রচনায় আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলাম। এখানে তারই কিছুটা বিকশিত রূপ লক্ষ করবেন। তবে মৌলিক ব্যাপারগুলি প্রায় অভিন্ন। এখানে ইউনিটের পরিকল্পনাটি লক্ষ করবেন। প্রত্যেকটি গদ্য ও কবিতাকে এখানে এক একটি ইউনিট হিসাবে ধরা হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন দিকগুলো আপনি জানবেন তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলে দেয়া হয়েছে। ছোট-ছোট পাঠের যে ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে সেগুলোও ভাল করে দেখবেন। যেখানে যে নির্দেশ ও নির্দেশের জন্য প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের যে উত্তরগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো পড়ে বুঝবার চেষ্টা করবেন কিভাবে সঠিক উত্তর লেখা যায়। যেগুলোর উত্তর লেখা নেই সেগুলো বইটির সাহায্য নিয়ে নিজেই তৈরি করবেন। নিজে লেখা এবং নিজের মতো করে সঠিক উত্তর তৈরি করা মোটেও কঠিন কাজ নয়।

প্রত্যেকটি রচনার ভাষারীতি ও শব্দ ব্যবহারের কৌশল লক্ষ করবেন।

সৃজনশীল কাজ ঠিক পরীক্ষার জন্য নয়। তবে এ কাজগুলো শিক্ষার্থীকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ও নানা বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। অবসর সময়ে বিষয়গুলো নিয়ে ভাববেন ও কিছু কিছু সৃজনশীল কাজ করবেন।

মানুষের পাঠের সীমানা নির্দিষ্ট নয়। তবুও নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা ও প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে হয়। এ সীমাবদ্ধতার মাঝে একটি ক্ষুদ্র জানালা আমরা খুলে দিয়েছি- 'আরও যা পড়তে পারেন' অংশে। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু রচনা ও বইপত্রের নাম বলা হয়েছে- যেগুলো হাতের কাছে পেলে এবং সময় থাকলে পড়ে দেখতে পারেন। এটি Further reading বা আরও কিছু পড়া ও জানার জন্য।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। আনুমানিক সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের মাতৃভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এগুলো কবিতার আঙ্গিকে রচিত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত কাব্যচর্চার ইতিহাস। উল্লিখিত সহস্রাধিক বছর বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেছে মৌখিক বাংলায়। বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছে বলেই আঠারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না।

সাহিত্যের বাহন না হলেও প্রাত্যহিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে লিখিত গদ্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রে এবং দলিল-দস্তাবেজে এ গদ্যের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বিশৃঙ্খল এই গদ্য ভাষার জন্ম মধ্যযুগের সময় পরিসরে হলেও, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক যুগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে।

উনিশ শতকে বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিস্ট ছিলেন বিদেশীরা। আঠারো শতকের শেষে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারী এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। উইলিয়াম কেরী এবং টমাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁরাই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মিশন থেকে বাংলা গদ্যে বাইবেল-এর অনুবাদ এবং ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। এ-সময়ই ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। উইলিয়াম কেরী এক্ষেত্রেও পালন করেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যে-সব সিভিলিয়ান কর্মচারী এদেশে আসতেন তারা দেশীয় ভাষা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করার স্বার্থেই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি। তাঁরই উদ্যোগে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অন্যান্য দেশীয়-ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভব করেই কলেজটিতে শুরুর পরের বছরই (১৮০১) বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উইলিয়াম কেরী হন বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। তিনি নিজে বাংলা গদ্যে দুটি বই রচনা করলেন এবং দেশীয় শিক্ষক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়েও কিছু পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করালেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল :

	গ্রন্থ	রচয়িতা
১.	কথোপকথন (১৮০১) ইতিহাসমালা (১৮১২)	উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)
২.	হিতোপদেশ (১৮০২)	গোলোকনাথ শর্মা
৩.	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (ইশপস্ ফেবল্‌সের অনুবাদ (১৮০৩)	তারিণীচরণ মিত্র (আনু ১৭৭২-১৮৩৭)
৪.	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
৫.	তোতা ইতিহাস (১৮০৫)	চণ্ডীচরণ মুন্সী (১৭৬০-১৮০৮)
৬.	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) লিপিমালা (১৮০২)	রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)
৭.	বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) হিতোপদেশ (১৮০৮) রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭৬২-১৮১৯)

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি থেকে মুক্ত করার কৃতিত্ব যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়-এর (১৭৭৪-১৮৩৩)। উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগ ও চর্চায় বাংলা গদ্য ঐ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রাণবন্ত তর্ক বিতর্কের লিখিত গদ্যরূপ বিভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এ

ভাবেই বাংলা গদ্য বিকাশধারার পথ খুঁজে পায়। রামমোহন রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক' 'প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৯), রামমোহনের সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)।

আলোচনা 'বিতর্ক ও মীমাংসা' এবং ধর্মতত্ত্বের বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের অমিত সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন রায়। আর এ গদ্যকে সাহিত্যের বাহনের মর্যাদায় উন্নীত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-৯১)। ভাব ও বিষয় অনুসারে বাক্যবিন্যাস এবং ইংরেজি ভাষার আদলে বিভিন্ন বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেছেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী অভিধায়। তবে বিদ্যাসাগর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি প্রধানত অনুবাদক, পাঠ্যগ্রন্থ প্রণেতা এবং শিক্ষা-সমাজ সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধকার। তাঁর অনূদিত, রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত(১৮৪৯), সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১) ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং লেখক হিসেবে পূর্বে আবির্ভূত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গদ্য রচয়িতা। 'বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির' চর্চাকারী হিসেবে বাংলা গদ্যে অক্ষয় কুমারের অবদান সুচিহ্নিত। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও যে বাংলা গদ্যের বাহন হতে পারে, সে সম্ভাবনা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁর। অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : ভূগোল (১৮৪১), চারুপাঠ (তিনখণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ; ১৮৫১, ১৮৫৩), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা(১৮৫২), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা ঘটে বাংলা সাহিত্যে। এ সময় থেকেই বাংলা গদ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাতও হয় এ সময়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে সৃষ্টিশীল গদ্য রচয়িতা হিসেবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), মাইকেল মধুসূদন দত্ত(১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩৯-৭৩) । ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেশ কটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কথিকাধর্মী রচনা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৭৭৯ শকাব্দ) বিশেষ তাৎপর্য চিহ্নিত। এ গ্রন্থের দুই কাহিনী 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-কে কোনো কোনো সমালোচক প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্ম নামে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) গ্রন্থে। তবে 'আলালের ঘরে দুলালের' গুরুত্ব শুধু উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত প্রথম রচনা হিসেবে নয় বরং বাংলা গদ্যের পালাবদলের মাইল ফলক হিসেবেই এর সমধিক গুরুত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ব্যবহার করলেন কলকাতার চলতি বুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা। এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যবুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালী ভাষা' তাই এক স্মরণীয় মাইল ফলক। 'আলালী ভাষা' আলোচনায় 'হুতোমী ভাষা'র প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) রচিত 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'ও (১৮৬২-৬৪) কলকাতার চলতি বুলিতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবধান সুচিহ্নিত ছিল না। তাঁর অনূদিত 'মহাভারতে' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়' ক্লাসিক সাধুভাষা ও অপভাষা মিশ্রিত চলিত বুলির ব্যবধানটি মোটা দাগে চিহ্নিত ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দশক বাংলা গদ্যে মৌলিক নাট্যসাহিত্য রচনার কারণেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার পরিচয়ে। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। মধুসূদনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। মধুসূদনের নাট্যচর্চায় সম্প্রসারিত হল বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা। বাংলা গদ্য যে সার্থক নাটকের, বিশেষত গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ প্রহসনের বাহন হতে পারে, মধুসূদনের নাটক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে আর এক উল্লেখযোগ্য নাম দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) এর রচয়িতা হিসেবে সমধিক পরিচিত দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি 'সধবার একাদশী, (১৮৬৬) নাটক। বিষয়গৌরবের দিক থেকে 'নীলদর্পণ'-এর অসামান্যতা সত্ত্বেও গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতার কারণে 'সধবার একাদশী'র রয়েছে এক স্বতন্ত্র মূল্য। দীনবন্ধু এ নাটকে লঘুভঙ্গির ভাষার আশ্রয়ে জীবনের বেদনাবহ এক প্রান্তকে শিল্পরূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'সধবার একাদশী' নাটক-এর মাধ্যমে দীনবন্ধু বাংলা গদ্যের বহুমুখী সম্ভাবনার একটি দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন সর্বসমক্ষে।

পাঠ্যপুস্তক ও তর্ক-বিতর্কের বাহন হিসেবে প্রচলিত যে গদ্য বিদ্যাসাগরের চর্চায় শিল্প মাধ্যমের স্তরে উন্নীত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৮-৯৪) সাধনায় সে গদ্য শিল্পিত উপন্যাসের ধারক হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গদ্যে, যুগপৎভাবে উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য সুপ্রমাণিত হল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিম গদ্যচর্চার নতুন যে পথসন্ধান দিলেন, তাকে অনুসরণ করেই সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্য উত্তরকালে বিকশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ ((১৮৮৪), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২)।

মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) এ যুগের একজন বলিষ্ঠ গদ্যলেখক। 'বিষাদসিন্ধু' তাঁর (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১) সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। লেখকের অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের নাম 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য সাধনার বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশ শতকে। আর বিশ শতকের প্রথমার্ধকে অভিহিত করা হয় 'রবীন্দ্রযুগ' নামে। স্মরণীয়, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষত 'গল্পগুচ্ছে' শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর বেশ কটি রচিত হয় এ-সময়ে। তবে গদ্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের শিখরস্পর্শী সাফল্য ঘটেছে বিশ শতকেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পালাবদল ঘটে। এ সময় থেকে তিনি সাধুভাষা রীতির গদ্য পরিত্যাগ করে চলিত ভাষারীতির গদ্য গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু গদ্যচর্চায় ঐ রীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চায় বিকাশমান বাংলা গদ্যভাষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মানুষের বহুমুখী আবেগ অনুভূতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তাঁর সৃজনশীল চর্চায় বাংলা গদ্যের বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের যে সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তা বিচিত্রমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নিজের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলাগদ্যের 'মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য'। রবীন্দ্রনাথের বিপুল গদ্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : ***নাটক***- অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), রক্তকরবী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), ***উপন্যাস***- চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯০৮), চতুরঙ্গ(১৯১৫), ঘরে বাইরে (১৯১৫), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)। ***ছোটগল্প*** - গল্পগুচ্ছ (তিনখণ্ড), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১)। প্রবন্ধ- সভ্যতার সংকট (১৯৪১)। ***সাহিত্য সমালোচনা***- প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭)। ***রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ***- স্বদেশ (১৯০৮) শিক্ষা (১৯০৮), কালান্তর (১৯৩৭), ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ- ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯১৩)। ***ব্যক্তিগত প্রবন্ধ***- পঞ্চভূত (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), ছিন্নপত্র (১৯১২), জীবনস্মৃতি (১৯১২) রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও যিনি রবীন্দ্রগদ্য দ্বারা প্রভাবিত হন নি এবং রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তাঁর লেখক ছদ্মনাম 'বীরবল'; নতুন গদ্যরীতির প্রবক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গদ্য 'বীরবলী গদ্য' নামে পরিচিত। তাঁর আর এক অসামান্য কীর্তি 'সবুজপত্র' নামের সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা। তিনিই প্রথম কলকাতার প্রমিত চলিত ভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষারীতির গদ্য লেখা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-বীরবলের হালখাতা, নানা কথা (১৯১৯), রায়তের কথা, গল্পসংগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা গদ্য উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেও কোটি কোটি বাঙালির জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা আজও বিকাশমান। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা গদ্যচর্চায় যাঁরা অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, সে সব সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিক ও মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও কৃতির পরিচয় নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল :

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)	প্রকৃতি(১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)	বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪৯), ঘরোয়া (১৩৪৮)।
৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)	পল্লীসমাজ (১৯১৪), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০)।
৪. রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)	গড্ডালিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭)।
৫. মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)	আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম-বরণ।
৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় (১৮৯৪-১৯৫০)	পথের পাঁচালী (১৯২৯), আরণ্যক (১৩৪৫), ইছামতী (১৩৫৬)।
৭. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)	শাশ্বত বঙ্গ (১৩৫৮), কবিগুরু গ্যেটে (২ খণ্ড), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬)।
৮. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)	আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানীপর্দা, গালিভরের সফরনামা, জীবন ক্ষুধা, আবেহায়াত, সত্যমিথ্যা, আমার দেখা রাজীনীতির পঞ্চাশ এবং আত্মকথা।
৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)	গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), কবি (১৯৪২), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)
১০. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), ব্যথার দান (১৯২২), যুগবাণী (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী
১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৫৭)	স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ।
১২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)	সংস্কৃতি (১৩৬৫)।
১৩. সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪)	দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, শবনম।
১৪. আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮১)	রাঙা প্রভাত (১৯২৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা।
১৫. হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)	বাংলার কাব্য (১৯৪২)।
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)	পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), চিহ্ন (১৯৪৭)।
১৭. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)	কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, মহাভারতের কথা, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমার যৌবন, আমার ছেলেবেলা।
১৮. বিনয় ঘোষ (১৯১৭-৮০)	বাংলার নবজাগৃতি, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।
১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১)	নয়নচারা, লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
২০. মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১)	কবর, মীরমানস, বাংলা গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা।

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

পশ্চিম বাংলার নৈহাটির কাছাকাছি কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। হুগলী মোহসিন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। কর্মজীবনে তিনি প্রথম ভারতীয় ও বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। 'তথা মানস' একটি কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় Rajmohan`s wife। সাহিত্য রচনায় ঝোঁক তাঁর বরাবরই ছিল। বাঙলা সাহিত্য সাধনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন। কাব্য এবং ইংরেজি রচনা ছেড়ে তিনি গদ্য রচনায় মন দিলেন। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল 'দুর্গেশনন্দিনী'। বাঙলা সাহিত্যে এটিই প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। গদ্য সাহিত্যের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলো এ উপন্যাস। বাঙলা গদ্যেও যে উত্তম সাহিত্য রচনা সম্ভব 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথাই প্রমাণ করলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু রীতির বাঙলায় যেটুকু জড়তা ছিলো, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা দূর হলো– বাঙলা হয়ে উঠলো সাহিত্যের উপযোগী ভাষা। গুণে-মানে ভাব ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুরীতির গদ্য রচনা সমাজে খুবই সমাদর পেয়েছিল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাঙলা গদ্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি অবদান রেখেছেন। তবে তাঁর বিখ্যাত রচনার মধ্যে উপন্যাসই প্রধান।

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম

উপন্যাস : কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), বিষবৃক্ষ(১৮৭৩), রাজসিংহ ইত্যাদি।

রম্য রচনা : কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)।

প্রবন্ধ : বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৭-৯২), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬)।

ভূমিকা

'বিড়াল' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি রম্যরচনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যতগুলো রম্য রচনা আছে, 'বিড়াল' তার মধ্যে অন্যতম। এটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি ছোট কিন্তু চির নতুন। কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক গভীর দর্শনের কথা বলেছেন। বিড়াল চরিত্রকে লেখক দরিদ্র বঞ্চিত ও শোষিত সমাজের প্রতিনিধি বা প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর ধনী সমাজের প্রতীক হলেন কমলাকান্ত। দুইজনের আলোচনায় আমাদের সমাজের আসল ছবি ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে সত্যিকার মানুষ হতে হলে তাকে কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে সে কথাও বলা হয়েছে। সমাজে শৃঙ্খলা আনতে হলে মানুষকেই যে বিচারবুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করতে চাইলে মানুষের ভূমিকাই যে প্রধান হতে হবে, স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে সেদিকে। রম্য রচনা হিসেবে 'বিড়াল' এক অসাধারণ প্রবন্ধ। আজো শত সহস্র পাঠক এ রচনাটি পড়ে আনন্দ ও চিন্তার খোরাক পেয়ে থাকেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যরচনার গুণ মান ও রসবোধের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

২. লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।

৩. সাধুরীতির গদ্যও যে কতো সহজ এবং আকর্ষণীয় হতে পারে তা বুঝতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কিছু ঐতিহাসিক নাম ও স্থান সম্বন্ধে জানতে এবং লিখতে পারবেন।
- বিড়াল কোন সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কি কি বলছে তা বুঝতে এবং লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
শয়নগৃহ – শোয়ার ঘর। **চারপায়ী** – টুল বা চৌকি। **প্রেতবৎ** – প্রেতের মতো। **নিমীলিত লোচনে** – বন্ধ চোখে। **নেপোলিয়ন** – পূর্ণনাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রিঃ) মহাবীর ফরাসী সম্রাট। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন। ১৮১৫ খ্রিঃ ওয়াটার্লু যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। **ওয়াটার্লু** – যুদ্ধক্ষেত্রের নাম। এখানে নেপোলিয়ন ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন। **ওয়েলিংটন** – ডিউক অব ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫৪ খ্রিঃ) নামে সমধিক পরিচিত। ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইনি মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। **বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া** – বিড়াল হয়ে। **আফিঙ্গ** – আফিম (পপি ফুলের	আমি শয়ন গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুকা হাতে ,নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটু ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও!" চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!" তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যুহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?" বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া,

রস থেকে তৈরি)।

পাষাণবৎ – পাথরের মতো।

ডিউক মহাশয় – ক্ষুদ্র রাজা, অভিজাত ব্যক্তি।

যথোচিত – যেমন উচিত।

এক্ষণে – এখন।

অপরিমিত – পরিমাণ করা হয়নি যার।

মার্জার – বিড়াল।

নিঃশেষ – একেবারে শেষ।

উদরসাৎ – খেয়ে ফেলা।

ব্যূহ রচনা – যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো।

প্রকটিত – প্রকাশ।

অভিপ্রায় – ইচ্ছা।

চিরাগত – প্রথা (বহুদিন ধরে যা হয়ে আসছে)।

অবমাননা – অপমান।

বাঞ্ছনীয় – যা চাওয়া যায় এমন।

কাপুরুষ – ভীতু পুরুষ।

সকাতর চিত্তে – কাতর মনে।

ষষ্ঠি – লাঠি।

ধাবমান হইলাম – ধেয়ে গেলাম।

সগর্বে – অহঙ্কারের সঙ্গে।

পুনরপি – আবার।

শয্যায় – বিছানায়।

দিব্যকর্ণ – অলৌকিক ক্ষমতায় শোনার কান।

মনুষ্য – মানুষ।

প্রভেদ – পার্থক্য।

ক্ষুৎপিপাসা – ক্ষুধা ও পিপাসা।

শাস্ত্রানুসারে – নিয়ম অনুসারে।

ঠেঙ্গালাঠি – লম্বা লাঠি।

আইস – আসো।

অনুসন্ধানে – খুঁজে।

বিজ্ঞ – জ্ঞানী।

সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন ষষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে ষষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও"! প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া ষষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে–আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল– অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী–আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

চতুষ্পদ – চার পেয়ে প্রাণী। **ব্যতীত** – ছাড়া। **আহরিত** – সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। **মূলীভূত** – আসল, গোড়ার। **প্রহার** – মারা। **সহায়** – সহকারী।	

সার-সংক্ষেপ

লেখক নিজেই কমলাকান্ত। হালকা কথায় নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। বিড়ালের সঙ্গে কমলাকান্তের যে কথা বার্তা সেটা তাঁর নিজস্ব চিন্তা। বিড়াল নিরীহ প্রাণী। সুযোগ পেলেই দুধ চুরি করে খায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে ব্যবধান তা যে মানুষেরই সৃষ্টি এ কথাই লেখক কমলাকান্ত সেজে বলেছেন। তাঁর মতে দরিদ্র অসহায় যারা, তারা অনেক সময় বাধ্য হয়ে অন্যায় করে। তখন ধনীরা তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। কেনো তারা অন্যায় করলো তার কারণ কখনো খোঁজা হয় না। বিড়ালকে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কমলাকান্তের সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে রূপকের আশ্রয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বিড়ালকে দুধ খেতে দেখে কমলাকান্তের কী মনে হলো সংক্ষেপে লিখুন।
২. কমলাকান্ত দিব্যকর্ণে বিড়ালকে কী বলতে শুনলেন তার বিবরণ লিখুন।
৩. বিড়াল যখন ঘরে ঢুকে 'মেও' বললো তখন কমলাকান্ত কী করছিলেন?
৪. 'ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম' - কথাটা কে কাকে কখন এবং কেন বলেছে?

নমুনা প্রশ্নোত্তর

'ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম' - কথাটা কে কাকে কখন বলেছে?

লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের রম্য রচনা 'বিড়াল'-এর মধ্যে বিড়ালই এই কথা বলেছে কমলাকান্তকে। দিব্যকর্ণ খুলে যাওয়ার পর কমলাকান্ত বিড়ালের মনের কথা শুনতে পেলেন। দুধ চুরি করে খাওয়ার জন্য কমলাকান্ত লাঠি নিয়ে বিড়ালকে মারতে এল। সে ভয় না পেয়ে 'মেও' অর্থাৎ কেন মারবে' প্রশ্ন করে। তারপর সে অনেক যুক্তি তোলে তার আচরণকে উচিত প্রমাণ করার জন্য। বিড়ালের মতে মানুষ নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর। তারা অন্যের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবে না। সে শিক্ষাও তারা পায় না। অথচ পরোপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ কথা মানুষের জানা এবং সে রকম আচরণ করা উচিত।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বিড়ালের মতো অসহায় প্রাণীরা তাদের অপরাধের জন্য কী কী যুক্তি দেখায় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিড়াল কী কী বলেছে তার সার কথাগুলো নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
শিহরিয়া – শিউরে ওঠা। **প্রয়োজনাতীত** – প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। **কৃপণ** – যে শুধু সঞ্চয় করে খরচ করে না। **তদপেক্ষা** – তার চেয়ে। **শিরোমণি** – সমাজের প্রধান ব্যক্তি। **ন্যায়ালঙ্কার** – ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। **মান্য** – সম্মান পাওয়ার যোগ্য। **ভোজ** – খাওয়া-দাওয়া। **আহ্বান** – ডাকা। **দণ্ড** – শাস্তি। **প্রাঙ্গণ** – মাঠ। **প্রাসাদ** – বিশাল বাড়ি। **যুবতী** – যৌবনবতী মেয়ে। **ভার্যা** – স্ত্রী, বৌ। **সহোদর** – একই উদরে জন্ম অর্থাৎ আপন ভাই। **সতরঞ্চ খেলা** – দাবা খেলা। **উদর** – পেট। **কৃশ** – রোগা। **অস্থি** – হাড়। **পরিদৃশ্যমান** – দেখা যায় এমন। **লাঙ্গুল** – লেজ। **বিনত** – নম্র। **অবিরত** – অনবরত। **কৃষ্ণচর্ম** – কালো চামড়া। **শুষ্ক মুখ** – শুকনো মুখ। **ক্ষীণ** – দুর্বল। **সকরুণ** – অতি দুঃখপূর্ণ। **নির্দয়** – নিষ্ঠুর, দয়াহীন। **কার্পণ্য** – কৃপণতা। **দূরদর্শী** – যার ভবিষ্যত দেখার ক্ষমতা আছে।	"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে–চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? "দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে, তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা, ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না–সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে? "দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাতে করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়–তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ–দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর–আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর–ছি!ছি! "দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি, দিক্ দৃষ্টি করিতেছি–কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল–গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মুর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারে স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল–তবেই তাহার পুষ্টি তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে। "আর আমাদিগের দশা দেখ–আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে–জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে–অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও"! মেও! খাইতে পাই না! – আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড নাই কেন? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি

বঞ্চিত – প্রতারিত, যে ঠকেছে এমন। **আহার্য** – খাবার।	কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

সার-সংক্ষেপ

বিড়াল তার চুরি করে দুধ খাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অনিয়মের কথা বলেছে। তার ব্যাখ্যায় ধনী কৃপণদের জন্যই গরিবরা চোর হয়। তাই চোরের শাস্তি হলে যারা চোর তৈরি করে, তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত বলে বিড়াল মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। বিড়াল তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছে যে, মানুষ ‘তেলা মাথায় তেল ঢালে’- এটা তাদের সবচেয়ে বড় দোষ। যাদের খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য মানুষ ভোজের আয়োজন করে। আর শুধু বেঁচে থাকার জন্য যাদের একটু খাবার প্রয়োজন, তাদেরকে কেউ খেতে দেয় না। ভোজের আসরে খেতেও ডাকে না। বরং খাবার বেঁচে গেলে তা ফেলে দেয়া হয়, তবু ক্ষুধার্তদের জন্য তা রাখা হয় না। ধনীদের এমন নির্দয় আচরণের জন্যই দরিদ্র অসহায়রা চুরি করে। তাই চুরির জন্য দরিদ্রকে শাস্তি দেয়ার কোনো অধিকার নেই ধনীর।

ধনীরা দরিদ্রের কষ্ট বোঝে না। না খেয়ে থাকলেও দরিদ্রের সেবায় কেউ এগিয়ে যায় না। তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য দরিদ্ররা চুরি করে। বিড়াল বলতে চায় যে, কৃপণ ধনীরাই সৃষ্টি করে চোর। তারা একাই পাঁচশো জনের সম্পদ ভোগ করে। এটাও সামাজিক অন্যায়। চোরের শাস্তি হলে ধনী কৃপণদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ তারাই ক্ষুধার্তকে চুরি করতে বাধ্য করে। পৃথিবীতে সবাই বাঁচতে চায় বলেই চুরি করে খেয়ে বাঁচতে হয় চোরকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. ‘চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর’ - এ কথা কে বলেছে এবং কেন বলেছে, সংক্ষেপে লিখুন।

২. বিড়াল কমলাকান্তকে ‘দূরদর্শী’ কেন বলেছে, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. বিড়ালের মতে ‘মনুষ্যজাতির’ কী কী দোষ, সংক্ষেপে লিখুন।

৪. দরিদ্রের চুরি করাকে বিড়াল ঠিক কাজ মনে করেছে কেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৫. বিড়ালের যুক্তিগুলো কী আপনি সমর্থন করেন? নিজের বক্তব্য গুছিয়ে লিখুন।

১. ‘চোরে চুরি করে ..... সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর॥ বিড়াল কমলাকান্তের দুধ চুরি করে খেয়েছে। সেজন্য কমলাকান্ত তাকে লাঠি দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন। বিড়াল তাতে ভয় না পেয়ে ‘মেও’ বলে ডাকে। যেন প্রশ্ন, কেন মারবেন কমলাকান্ত? তারপর বিড়াল দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তি দেখায়, কেন সে চোর হয়েছে। চোর দরিদ্র। তার ঘরে খাবার থাকে না। কিন্তু পেটে থাকে খিদে। ধনীর ঘরে প্রচুর খাবার। ফেলে ছড়িয়ে ধনীরা খায়। কখনো দরিদ্রদের জন্য কিছু বিলিয়ে দেয় না। এই সব ধনী কৃপণদের জন্য অসহায় দরিদ্ররা কিছু খেতে পায় না। বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য তারা চুরি করে খায়। অর্থাৎ ধনীরা দরিদ্রদের বাধ্য করে চোর হতে। তাই চোরের শাস্তি না হয়ে যারা চোর সৃষ্টি করে তাদেরই সাজা হওয়া উচিত। কারণ তাঁদের দোষ শতগুণ বেশি।

৩. বিড়ালের মতে মনুষ্যজাতির ..... লিখুন।

উত্তর ॥ বিড়াল দরিদ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কমলাকান্তের কাছে ধনী সমাজের 'মনুষ্যজাতির' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনা তুলে ধরেছে। যেমন :

ক ধনীরা দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হয় না। দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট তারা কোনোদিন বোঝে না। তাদের জন্য কাতর হয় না।

খ. ধনী ব্যক্তিরা ধনীদের খাওয়াতে ভালবাসেন। যাদের ঘরে প্রচুর খাবার তাদেরই ভোজসভায় ডাকেন।

গ. ধনীরা ক্ষুধার্ত দরিদ্রদেরকে ভোজসভায় কোনোদিন ডাকেন না। অবশিষ্ট খাবার ফেলে দেন তবু গরিবদের খেতে দেন না।

ঘ. ধনী ব্যক্তিরা ভোগী। একাই পাঁচশো জনের সম্পদ সঞ্চয় করে। ফলে অনেককে বঞ্চিত করতে হয়। সে জন্য তাঁদের কোনো অপরাধ বোধ হয় না।

ঙ. ধনী ব্যক্তির অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের বাঁচার পথ বন্ধ করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তারা চুরি করে। অর্থাৎ কৃপণ ধনী ছোটো বড়োর ব্যবধান সৃষ্টি করে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করে। তারাই সৃষ্টি করে চোর।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ধনীর প্রতিনিধি হিসেবে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝিয়ে লিখতে পারবেন।
- দরিদ্রের দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতি বলতে বিড়াল কী বোঝাতে চেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
সোশিয়ালিষ্টিক – সমাজতান্ত্রিক; এটি ইংরেজি শব্দ। সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক একটি মতবাদ। **নির্বিঘ্নে** – নিরাপদে। **নৈয়ায়িক** – যিনি ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **কস্মিনকালে** – কোন কালে। **সুতার্কিক** – তর্কে পটু। **দণ্ডবিধান** – শাস্তির ব্যবস্থা। **মার্জারী মহাশয়া** – স্ত্রী বিড়ালকে সম্বোধনের জন্য মহাশয় এর সঙ্গে আ-প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। **উপবাস** – না খেয়ে থাকা। **নসীরাম বাবু** – কোন একজনের নাম। **বিজ্ঞ** – জ্ঞানী। **পরাস্ত** – পরাজিত। **প্রথানুসারে** – নিয়ম অনুসারে।	আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।" মার্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?" আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?" বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য। মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

ধর্মাচরণে – ধর্মের আচার আচরণে। **পাঠার্থে** – পড়ার জন্য। **নিউমান** – বিখ্যাত লেখক। **অসীম** – যার সীমা নেই। **মহিমা** – গুণ। **এক্ষণে** – এখন। **স্বস্থানে** – নিজের জায়গায়। **জলযোগ** – হালকা খাবার বা নাশতা। **অধীর** – অধৈর্য। **পুনর্বার**– আবার। **সরিষা ভোর** – সর্ষে দানার সমান। **ক্ষুধানুসারে** – কেমন খিদে লাগে তা বিবেচনা করে। **পতিত আত্মা** – দুর্দশায় পড়েছে এমন আত্মা। এখানে কথাটা বিড়ালকে বলা হয়েছে।	বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।" মার্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।" মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

সার-সংক্ষেপ

বিড়ালের মতো এক নগণ্য প্রাণীর কথা শুনতে শুনতে কমলাকান্ত অধৈর্য হলেন। কারণ বিড়াল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের কথা বলছে। যে মতবাদে ধনী এবং নির্ধন সমান। কমলাকান্তের যুক্তি হলো ধনী যদি ধন সঞ্চয় না করে তাহলে সমাজের উন্নতি হবে না। আর বিড়াল মনে করে নির্ধন যদি খেতেই না পায় তাহলে সমাজের উন্নতিতে তার লাভ কী? বিড়াল বলেছে যে, চোরকে শাস্তি দেয়ার আগে একটা নিয়ম করা প্রয়োজন। সেটা হলো, বিচারককে তিন দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না করে, তবেই তিনি শাস্তি দিতে পারবেন চোরকে। কমলাকান্ত বিড়ালের সঙ্গে তর্কে না পেরে উপদেশ দিতে চাইলেন। বিড়ালকে ধর্মকর্মে মন দিতে বললেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কিছু বইও দিতে চাইলেন পড়ার জন্য। অবশেষে খাবারের ভাগ দিবেন বলে তার্কিক বিড়ালকে চলে যেতে বললেন। খুব খিদে পেলে সর্ষে পরিমাণ আফিম দিতেও চাইলেন। আপোসের কথা শুনে একটু খুশি হয়ে বিদায় নিলো বিড়াল। কমলাকান্ত বিড়ালকে জ্ঞান দিতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন : কমলাকান্ত 'সোশিয়ালিষ্টিক' ..... লিখুন।

উত্তর॥ 'বিড়াল' প্রবন্ধে কমলাকান্ত ধনী সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর মতে ধনীরা ধন সঞ্চয় করবেন এবং নিরাপদে তা ভোগ করবেন। যদি তা না হয় তাহলে হয়তো কেউ ধন সঞ্চয় করবেন না। অথচ ধন ছাড়া সমাজের উন্নতি কোনেদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু 'সোশিয়ালিষ্টিক' বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ধন সঞ্চয়ের কোনো নিয়ম নেই। এ

মতবাদে দেশের ধনী নির্ধন সকলেই সমান। তাতেই বরং সমাজের বিশৃঙ্খলা বাড়বে। গরিবেরা তখন অনায়াসে ধনীর অর্থ ভোগের জন্য দাবি করতে পারবে। কমলাকান্তের বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের এ নীতি ধনী সম্প্রদায়ের জন্য শুভ হবে না। আর ঠিক এ কারণেই অর্থাৎ দরিদ্রের জন্য ধন সঞ্চয়ের চেষ্টাই বাদ দিবেন ধনীরা।

'চোরকে ফাঁসি দাও ..... লিখুন।

উত্তর॥ বিড়াল' প্রবন্ধে দুধ চুরি করে খাওয়ার জন্য কমলাকান্ত বিড়ালকে শাস্তি দিতে চাইলে সে কথাগুলো বলে। বিড়াল কেন চুরি করে খেয়েছে তার বহু কারণ দেখিয়েছে। অবশেষে সে একটা নিয়মের প্রস্তাব দেয় কমলাকান্তকে। তার মতে চোরকে শাস্তি দিতে চাইলে বিচারকের উচিত হবে চোরের সত্যিকার অবস্থা বোঝার জন্য তিনদিন না খেয়ে থাকা। তাহলে খিদের জ্বালায় যে কী কষ্ট হয় তা বিচারক বুঝতে পারবেন। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না হয় তাহলে বিড়াল মাথা পেতে শাস্তি নিবে। বিড়ালের তর্ক এবং নিয়মের কথাটা ভাবিয়ে তুললো কমলাকান্তকে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'বিড়াল' প্রবন্ধে হালকা কথাবার্তায় গল্পের ছলে লেখক কী বলতে চেয়েছেন, নিজের ভাষায় লিখুন।

২. ''এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন''? একথা কে বলেছে এবং কাকে বলেছে, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন :

ক) তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ'

খ) 'ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়'

গ) 'সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও'

ঘ) 'সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলেও না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।

৪. টীকা লিখুন।

নেপোলিয়ন, ওয়াটার্লু, সোশিয়ালিষ্টিক, শিরোমনি, মার্জারী মহাশয়া।

বিড়াল প্রবন্ধে হালকা ..... ভাষায় লিখুন

উত্তর : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রম্য রচনা গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে 'বিড়াল' প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথাবার্তায় কিছু তামাসার খোরাক আছে। বিশেষ করে দুধচোর বিড়াল যখন পণ্ডিতের মতো কথা বলে, তর্ক করে এবং মানব চরিত্রের দোষগুণের কথা বলতে থাকে তখন পাঠকের হাসি পেতে পারে। বিড়ালের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তামাসা মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। তামাসার ছলে লেখক গভীর দর্শনের কথাগুলোই খোলামেলাভাবে বলেছেন। এটাই রম্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'বিড়াল' প্রবন্ধে মাত্র দুটি চরিত্র। কমলাকান্ত ও বিড়াল। কমলাকান্ত ধনী সমাজের প্রতিনিধি। আর দরিদ্র অসহায় সমাজের প্রতিনিধি হলো বিড়াল। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, দুজনের কথাবার্তায় সমাজের সেই বাস্তব চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সমাজে ধনীদের অনেক আছে। তারা পাঁচশো জনের সম্পদ একাই সংগ্রহ করেন এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোগ করেন তা। আর তাঁদেরই আশে পাশে যে দরিদ্র জনসাধারণ থাকে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা ধনীরা ভাবেন না। দেখা যায় ভোজসভায় যে খাবার বেঁচে যায়, তা ফেলে দেয়া হয়। তবু দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে

দেয়া হয় না। এছাড়াও যাদের ঘরে খাবারের অভাব নেই, ধনীরা তাদেরই ডাকেন ভোজসভায়। দরিদ্র রুগ্ন অনাহারে দুর্বল ব্যক্তিদের খেতে ডাকেন না কোনো ধনী। ফলে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর ঘরে চুরি পর্যন্ত করে। তখন তাকে সবাই বলে চোর। কিন্তু কেন যে সে চুরি করলো, কেন চোর হলো, সে কারণ কেউ খুঁজতে যান না। চোরকে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করেন। বিড়ালের সুখ দিয়ে লেখক সমাজ জীবনের এ সত্য কথাগুলো বলিয়েছেন।

বিড়াল কমলাকান্তকে আরো বলে যে, ধনীরাই সমাজে চোর সৃষ্টি করেছেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো দেশের ধন সম্পদে ধনী ও গরিবের যদি সমান অধিকার থাকতো, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হত না। কিন্তু কমলাকান্তের মতে, ধনীরা সম্পদ সংগ্রহ করে বলেই সমাজের উন্নতি হয়। বিড়াল এ কথা মানতে চায় না। তার মতে, গরিবরা যদি খেতে পরতে না পায়, তাহলে সমাজের উন্নতি হলেই কী আর না হলেই কী। পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র জন সাধারণের পক্ষ থেকে বিড়াল যখন এ কথাগুলো বলে তখন পাঠকদেরও ভাবিয়ে তোলে তা। বিড়াল আরও বলে যে ক্ষীর সর দুধ দই মাছ মাংস শুধু কি ধনীরাই খাবেন? গরিবরা খেতে পাবে না কেন? তখন মনে হয়, কোনো গরিব ক্ষুধার্ত অসহায় লোক সাহসের সঙ্গে প্রশ্নগুলো করছে ধনী সম্প্রদায়ের কাছে।

বিড়াল যখন প্রতিবাদ করে বলে, দুধ চুরি করে খেয়েছি বলে দণ্ড দিবে কেন? বিচারককে তিনদিন না খেয়ে খিদের জ্বালা অনুভব করতে বলে সে। তার মতে গরিবের দুঃখ না বুঝে বিচার করলে তা ন্যায্য বিচার হয় না। সমাজের গরিব সম্প্রদায় এমন করেই বলে থাকে। প্রকৃত পক্ষে গরিবের প্রতিবাদ ও যুক্তির কাছে ধনীরা যখন হেরে যান তখন তাঁরা নানা রকম নীতিকথা এবং ধর্মকথার উপদেশ দেন। কমলাকান্তও তাই করেছেন। তর্কে হেরে গিয়ে বিড়ালকে তিনি ধর্মকর্মে মন দিতে বলেন। নীতি নিয়ম মেনে চলতে বলেন।

তবে কমলাকান্ত জ্ঞানী। সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির কারণ তিনি বোঝেন। তাই অবশেষে বিড়ালের সঙ্গে আপোসের কথা বলেন। ছানা ভাগ করে খাওয়ার আশ্বাস দেন বিড়ালকে। আফিমের মতো দামী নেশার জিনিসও একটু দিতে চান। সত্য মিথ্যে যাই হোক, আশ্বাস পেয়ে বিড়াল চলে যায়। এতে কমলাকান্ত খুশি হন। কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে গরিবরা বিদায় হলে ধনীরা যেমন খুশি হয়- ঠিক তেমনি।

বিড়াল প্রবন্ধে আমরা একদিকে লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাই, অন্যদিকে পাই লেখকের অসাধারণ রসবোধের পরিচয়। অতি সাধারণ ঘটনার রূপকে তিনি সমাজের কঠিন সত্যগুলো উচ্চারণ করেছেন।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

'তেলা মাথায় ---------- রোগ'।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধ থেকে বাক্যটি নেয়া হয়েছে। দুধ চুরি করে খাওয়া নিয়ে কমলাকান্ত ও বিড়ালের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তারই এক পর্যায়ে বিড়াল উক্তিটি উচ্চারণ করে।

এ রম্য রচনায় বিড়াল দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হয়ে ধনী সমাজের প্রতিনিধি কমলাকান্তকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা শুনিয়েছে। বিড়ালের যুক্তি হলো, তার খিদে পেয়েছিল, কেউ তাকে ডেকে খেতে দেয় না এবং দিবেও না। তাই সে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চুরি করেছে। তার বিচারে এটা দোষ নয়। বরং ধনীরা যে প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করে রাখে, কখনো যথেষ্ট অপচয়ও করে, যার ফলে গরিবরা খেতে পায় না, সেটাই ধনীদের অপরাধ। ধনীরা কোনদিন দরিদ্র এবং ক্ষুধার্তদের দুঃখ কষ্ট বোঝে না। তাদের সম্মান করা তো দূরের কথা। অথচ ধনীর ঘরে কোনো জ্ঞানী-গুণী কিংবা ধনী লোক খেতে আসলে তাঁদের আদরের অন্ত থাকে না। কমলাকান্তের দুধটুকু যদি ওঁদের কেউ খেতেন তাহলে তিনি খুশিই হতেন। আরও একটু দিতে চাইতেন। অথচ ক্ষুধার্ত অসহায় বিড়াল দুধটুকু খেয়েছে বলে তাকে লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েছেন কমলাকান্ত। মানুষের এমন আচরণ দেখেই বিড়ালের মনে হয়েছে, তেলা মাথায় তেল দেয়াই মানুষের স্বভাব। কথাটা কঠিন হলেও সত্য।

'সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের ..... দণ্ডবিধান কর্তব্য।'

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বিড়াল' প্রবন্ধ থেকে লাইনগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কমলাকান্তের উক্তি।

কমলাকান্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, ধনীরা ধন সঞ্চয় করে বলেই সমাজের উন্নতি হয়। স্কুল কলেজ, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিড়ালের মত হল, সমাজের উন্নতি মানেই ধনীর ধনবৃদ্ধি। এমন সামাজিক উন্নতিতে গরিবের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিড়ালের দৃঢ় বিশ্বাস, গরিবরা যদি খেতে না পায়, যদি তাদের দুঃখ কষ্ট না কমে, তাহলে সমাজের উন্নতি হওয়া না হওয়ায় গরিবের কিছু যায় আসে না। ক্ষিদে পেলে বাঁচার জন্য চুরি করেই খেতে হবে তাদের। বিকল্প নেই। কমলাকান্ত বিড়ালের এমন যুক্তি কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। তাঁর বিচার মতে গরিবের কী হলো না হলো সে কথা ভাবার চেয়ে সমাজের উন্নতির কথা ভাবাই বেশি প্রয়োজন। আর সে কারণেই সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুব জরুরী। শাস্তিরও বিধান থাকতে হবে চোরের জন্য। কী কারণে চোর চুরি করে সে কথা না ভাবলে চলতে পারে কিন্তু চোরের দণ্ডের কথা সমাজকে ভাবতেই হবে। কমলাকন্তের কথায় এখানে ধনী এবং দরিদ্রের মন মানসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

৪. টীকা লিখুন

উত্তর : পাঠ ১, ২ ও ৩ এর শব্দার্থ ও টীকা অংশে দেখুন।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. দশটি যৌগিক শব্দ বিশ্লেষণ করুন।
২. দশটি সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়াকে চলিত ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ায় রূপান্তর করুন।
৩. পাঠ থেকে সাধুরীতির দশটি সর্বনাম পদ (একবচন ও বহুবচনের) বের করে লিখুন।
৪. শর্তবাচক অব্যয় ব্যবহার করে পাঠ থেকে পাঁচটি যৌগিক বাক্য বেছে নিয়ে লিখুন (প্রয়োজনে বাক্য সংক্ষেপ করতে পারেন)।
৫. এ পাঠে কী কী বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, নাম উল্লেখ করে তার পাঁচটি নমুনা দিন।
৬. বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এক পদের ব্যবহার করুন : যেমন- মন, হস্ত, ভগ্ন, দণ্ড, ইত্যাদি।
৭. দশটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করুন : যেমন- মন, জ্ঞান, কারণ, প্রহার, ধর্ম, প্রশংসা, শিক্ষা, সুখ, আহার, সমাজ।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

১. দশটি যৌগিক শব্দের বিশ্লেষণ :

আহারাভাবে	:	আহার+অভাব+এ
নির্দয়তায়	:	নির+দয়া+তা+য়
সমাজবিশৃঙ্খলার	:	সমাজ+বি+শৃঙ্খলা+র
নির্বিঘ্নে	:	নির+বিঘ্ন+এ
মনুষ্যজাতির	:	মনুষ্য+জাতি+র

[*বাকি পাঁচটি শব্দ বেছে নিয়ে বিশ্লেষণ করুন*]

২. দশটি সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়ার চলিত রূপান্তর :

ঝুলিয়া পড়িয়াছে	ঝুলে পড়েছে
ঠেঙ্গাইয়া মারিও	ঠেঙ্গিয়ে মেরো

খাইয়া ফেলে	খেয়ে ফেলে
হইতে পারিল	হতে পারলো
করিয়া বলিলাম	করে বললাম

৩. শর্তবাচক অব্যয় ব্যবহার করে পাঁচটি যৌগিক বাক্য :

ক. যদি কেহ সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল তবেই তাহার পুষ্টি।

খ. তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে গ্রন্থ দিতে পারি।

গ. যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন উপদেশ প্রদান করিবে।

ঘ. চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণও শতগুণে দোষী।

ঙ. যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে পারে।

৪. বাক্যে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন :

ক. কমা – অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল, বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে।

খ. প্রশ্নবোধক চিহ্ন – কৃপণের দণ্ড হয় না কেন?

গ. উদ্ধৃতি চিহ্ন – 'মেও' বিড়াল ডাকিল।

ঘ. অবাক/আবেগ চিহ্ন – ছোট লোকের দুঃখে কাতর! ছি!

ঙ. ড্যাশ – আমাদিগের দশা দেখো – আহারাভাবে উদর কৃশ।

চ. সেমিকোলন – চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

পাঠ থেকে একটি অনুচ্ছেদ বেছে নিয়ে পড়ুন এবং তার বিরাম চিহ্নগুলো দেখুন। তারপর বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য রচনা করুন।

৭. বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এক পদের ব্যবহার :

ক. মন : বন্ধু কাল বিদেশ যাবে তাই আমার মন খারাপ (মন)
আমার সুখে তার মন খারাপ হয় (হিংসা)
পড়ায় তার মন নেই (মনোযোগ)

খ. দণ্ড : তোমার হাতে বাঁশের দণ্ড কেন (লাঠি)
দুধ চুরির জন্য বিড়ালকে দণ্ড দিতে চাই (শাস্তি)
আর এক দণ্ড দেরি করতে পারবনা (সময়)

[*বাকি দুটি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করুন*]

৮. বিশেষ্য পদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করুন।

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মন	মানসিক	প্রশংসা	প্রশংসিত
জ্ঞান	জ্ঞানী	শিক্ষা	শিক্ষিত
কারণ	কারণিক	সুখ	সুখী
প্রহার	প্রহৃত	আহার	আহার্য
ধর্ম	ধার্মিক	সমাজ	সামাজিক

সৃজনশীল কাজ

১. তেলা মাথায় তেল দেয়া; কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করতে শিখুন। আপনার জানা পাঁচটি প্রবাদ লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি পড়ুন। সম্ভব হলে লেখকের কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাসও পড়ুন।

কারবালার পর

মীর মোশাররফ হোসেন

লেখক পরিচিতি

কুষ্টিয়া জেলার (তৎকালীন নদীয়া) গৌরী নদীর তীরে লাহিনীপাড়া গ্রামে এক সৈয়দ পরিবারে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তাঁর আগে বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য কোনো মুসলমান সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায় না। মীর মশাররফ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। জমিদার কাচারীর ম্যানেজার হিসেবে তিনি কলিকাতা, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার, ফরিদপুরের পদমদী এবং তাঁর জন্মভূমি কুষ্টিয়াতেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। লেখকের প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রসরচনা, নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে প্রায় ৩৫টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সাহিত্য রচনার প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল আকর্ষণ। বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রতি মুসলিম সমাজকে পথ দেখিয়েছেন তিনি। এ জন্যও তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে।

মীর মশাররফ হোসেন মূলত সাধুরীতির গদ্যে লিখতেন। তাঁর ভাষা গড়ে নিতেন। ফলে তাঁর রচনায় যেমন প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে তেমনি আছে আঞ্চলিক শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ। লেখকের প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী', প্রকাশ কাল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু'। তিন পর্বে ১৮৮৫, ১৮৮৭ এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থের নাম :

উপন্যাস : উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯১)।

নাটক : বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)

কাব্য : সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭)

আত্মচরিত : আমার জীবনী (১৯০৮)।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভূমিকা

'কারবালার পর' গদ্যাংশটুকু 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এ অংশে আছে, কারবালার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এজিদের নির্দেশে সীমার ইমাম হোসেনের মাথা কেটে বর্শায় বিদ্ধ করে দামেস্কে নিয়ে যাচ্ছেন তার করুণ বিবরণ। এক লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে সীমার যে পাশবিক কাজ করেছে, সে জন্য বিশ্ববাসীর ঘৃণার পাত্র হয়েছে সে। এ গদ্যাংশের মধ্যেই আছে গৃহস্থ আজরের মতো মহান ব্যক্তির বর্ণনা। হোসেনের পবিত্র মাথার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে একে একে তিন পুত্রের মাথা কেটে সীমারের হাতে দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। অবশেষে সীমারের বর্শার আঘাতে আজর নিহত হয়েছেন। এদিকে আজরের তুলনাহীন আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনায় লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের অমর এবং জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে আজও বিখ্যাত।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. আধুনিক যুগের প্রথম সার্থক মুসলিম গদ্যলেখকের রচনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।
২. মীর মশাররফ হোসেনের অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে আংশিক ধারণা লাভ করবেন।
৩. লেখকের ভাষারীতি, শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সীমারের পাষাণ-হৃদয় চরিত্রের বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- অর্থলোভ মানুষকে কতো অমানুষ করে তুলতে পারে, তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
ত্রস্তে – বেগে। **মোহিত** – মুগ্ধ। **দৌড়িতেছ** – দৌড়াচ্ছো। **স্বার্থ** – নিজের লাভ। **পাতকী** – পাপী। **বিনাশ** – ধ্বংস। **কলহ** – ঝগড়া। **বৈরীভাব** – শত্রুভাব। **বিসর্জন** – ত্যাগ। **অকাতরে** – কাতর নয় এমন। **অগাধ** – অথৈ, অতি গভীর। **কুহক** – মায়া, **সমাগত** – প্রায় আগত। **অবিশ্রান্ত** – অক্লান্ত, অনবরত। **দিনমনি** – সূর্য। **আশু** – তাড়াতাড়ি। **নিশা** – রাত। **বিদ্ধ** – গাঁথা। **রোষ** – রাগ। **মোচন** – মুক্তিদান। **শিহরিয়া** – কেঁপে ওঠা, শিউরে ওঠা।	রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌঁড়িতেছে? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি ? সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? তুমি ত আর জয়নাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না? জয়নাব এমাম হাসানের স্ত্রী। হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে এত বেগে দৌঁড়িতেছ কেন? যাইতেছই বা কোথা? একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি? অর্থ ? হায় রে অর্থ! হায় রে পাতকী অর্থ। তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নিতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন বিনাশ- এ সকলই তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি! কি মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত- মহাব্যস্ত প্রাণ ওষ্ঠাগত! তোমারই জন্য কেবলমাত্র তোমারই কারণে- কতজনে তীর, তরবারি, বন্দুক, বর্শা, গোলাগুলি অকাতরে বক্ষ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে। তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবিতেছে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, পর্বত শিখরে আরোহণ করিতেছে। রক্ত, মাংসপেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর। তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক! কি মায়া!! কি মোহিনী শক্তি!!! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোঁকা খাইতেছে? কে না মজিতেছে? তুমি দূর হও! কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও! কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও। তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমারই জন্য প্রভু হোসেন সীমার হস্তে খণ্ডিত! –রাক্ষসি। তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ। সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল গমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্তরে নানা ভাব; তন্মধ্যে অর্থ-চিন্তাই প্রবল, চির অভাবগুলি আশু মোচন করাই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর

	ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত- যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশা যাপন করি। এ ত সকলই মহারাজ এজিদ নামদারের রাজ্যভুক্ত, অধীন ও অন্তর্গত। সৈনিক বেশ, হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কি বলিবে? কার সাধ্য কে কি করিবে?

সার-সংক্ষেপ

লেখক এখানে বলেছেন যে হোসেনের শিরে সীমারের প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন লক্ষ টাকা। সেই লোভে এতো বড়ো পাপের কাজ সে করেছে। টাকার লোভ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি তো দিতেই পারে না, দেয় শুধু অশান্তি। পৃথিবীর সমস্ত অনর্থ কাজের মুলে আছে অর্থলোভ। এ লোভকে লেখক তাই ঘৃণার চোখে দেখেছেন। অর্থলোভকে তুলনা করেছেন বিষের সঙ্গে। এ বিষের আকর্ষণে মানুষ হয়ে যায় পাষণ্ড, নিষ্ঠুর ও অমানুষ।

লেখক কল্পনায় অর্থলোভী সীমারের সঙ্গে কথা বলছেন। অর্থের লোভে মানুষ কেমন অমানুষ হয় সে কথা বলছেন। অর্থের জন্য মানুষ বিবেক বুদ্ধি মায়া মমতা বন্ধুত্ব প্রেম ভক্তি সবই বিসর্জন দিতে পারে। তাই অর্থকে লেখক বলেছেন সব অনর্থের মূল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এ পাঠে লেখা নতুন শব্দগুলো নিজের খাতায় লিখুন।

২. অর্থের লোভ মানুষের কি কি ক্ষতি করে, কমপক্ষে পাঁচটি ক্ষতির কথা নিজের খাতায় লিখুন।

৩. ইমাম হোসেনের কাটা মাথা সীমারের বর্শায় গাঁথা– এ দৃশ্য কল্পনা করে ৬/৭টি বাক্যটি লিখুন।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : অর্থ মানুষের কী কী ক্ষতি করে, কম পক্ষে ছয়টি ক্ষতির কথা লিখুন।

উত্তর ॥ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে প্রয়োজনে অর্থ মানুষকে খারাপ কাজ এবং অমঙ্গলের নেশার দিকে টানে। তাই প্রবাদ আছে যে অর্থই অনর্থের মূল। সে অনর্থগুলো পরিবারে ও সমাজে নানা ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন :

ক. অর্থের লোভ মানুষকে লোভী করে তোলে।

খ. অর্থের লোভ মানুষকে হিংসাপরায়ণ করে তোলে।

গ. অর্থের জন্য মানুষের বিচার বুদ্ধি লোপ পেতে পারে।

ঘ. অর্থের জন্য মানুষের সুস্থ বিবেক মরে যেতে পারে।

ঙ. অর্থের লোভে মানুষের বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মদিনার রাজা হোসেনের পরিচয় জানতে এবং লিখতে পারবেন।
- গৃহস্বামী আজরের অতিথি সেবার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
নিশাযাপন – রাত কাটানো। **সাদরে** – আদরের সঙ্গে। **পথশ্রান্তি** – পথের ক্লান্তি বা অবসাদ। **আহার্য** – খাবার জিনিস। **শির** – মাথা। **পরাস্ত** – পরাজিত। **পৌত্তলিক** – যে পুতুল পূজা করে। **একেশ্বরবাদী** – এক ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে। **উপাস্য** – উপাসনার যোগ্য। **অজ্ঞাতে** – অজান্তে। **তত্ত্বাবধানে** – দেখা শোনাতে। **দ্বিরুক্তি** – দ্বিতীয় বার কথা বলা। **শ্রবণ মাত্রই** –শোনা মাত্রই। **সম্মত** – রাজী হওয়া। **আশ্রম** – বাসস্থান। **শয়ন** – শোয়া। **বিলম্ব** – দেরি। **অচেতন** – চেতনা শূন্য। **বাস্তবিক** – সত্য। **আরাধনা** – উপাসনা। **রত** – নিযুক্ত। **প্রত্যূষ** – সকাল। **ভক্তি সহকারে** – ভক্তির সঙ্গে। **বিনীত ভাবে** – বিনয়ের সঙ্গে। **অভ্যর্থনা** – আপ্যায়ন।	সীমার এক গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশাযাপন করিবেন জানাইলেন। বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত- বুঝি, রাজসংক্রান্ত কেহ বা হয় মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা, বলিলেন না। সাদরে সীমারকে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি ও আহার্য দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তি সহকারে অতিথিসেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।" সীমার বলিল– "কি কথা?" "কথা কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এ বর্শাবিদ্ধ শির কোন্ মহাপুরুষের?" ইহার অনেক কথা তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাঁহার পিতা আলী এবং মুহাম্মদের কন্যা ফতেমা যাঁহার জননী, এ তাঁহারই শির। কারবালা প্রান্তরে মহারাজ এজিদ-প্রেরিত সৈন্য সহিত পরাস্ত হইয়া এ অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি; পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মুহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।" "হ্যাঁ, এতক্ষণে জানিলাম আপনি কে? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ, যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ সময়ে কৌশলে কি বলপ্রয়োগে এ মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এ মহামূল্য শির – আপাতত যাহার মূল্য লক্ষ টাকা– যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে। আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যূষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।" সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়ন বিলম্ব, যেমনই শয়ন, অমনই অচেতন। গৃহস্বামী বাস্তবিক হয়রত মুহাম্মদ মোস্তফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র ও এক স্ত্রী। নাম 'আজর'।

সার-সংক্ষেপ

ক্লান্ত সীমার রাত কাটানোর জন্য এক গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হলো। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পোশাক দেখে গৃহস্বামী তাকে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। পরে অতিথিকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে বর্শার আগায় গাঁথা ঐ কাটা মাথাটি হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এর পুত্র এবং হযরত মুহাম্মদের অতি প্রিয় নাতি ইমাম হোসেনের। এই কাটা মাথা দেখাতে পারলে এজিদ তাকে এক লক্ষ টাকা পুরষ্কার দিবে। সীমার বললো যে আজর পৌত্তলিক বলেই তার বাড়িতে সে অতিথি হয়েছে। আজর সত্যিই দেবদেবীর পূজা করতেন। এক ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। হযরত মুহাম্মদের শিষ্যও ছিলেন না তিনি। আজর অতিথিকে নিশ্চিত মনে বিশ্রাম নিতে বললেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে আজরের চরিত্র বর্ণনা করুন (আজরের ধর্ম, তাঁর অতিথি সেবা, তাঁর মধুর ব্যবহার এবং পরিবারের কথা গুছিয়ে নিবেন প্রথমে)।

২. শব্দার্থগুলো কয়েকবার পড়ে ৫টি শব্দ বেছে নিয়ে নিজের ভাষায় বাক্য লিখুন।

৩. আজরের কী কী কথা শুনে সীমার নিশ্চিন্ত মনে ইমাম হোসেনের মাথা তার কাছে রাখতে রাজি হলো, তা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. পাঠ থেকে ৫টি বাক্য বেছে নিয়ে তা চলিত ভাষায় লিখুন। যেমন :
ইহার অনেক কথা তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। (সাধু ভাষা)
এর অনেক কথা তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। (চলিত ভাষা)

নমুনা উত্তর

৩. আজরের কী কী কথা শুনে সীমার নিশ্চিন্ত মনে ইমাম হোসেনের মাথা তার কাছে রাখতে রাজি হলো?

উত্তর॥ সীমারের কাছ থেকে আজর শুনেছেন যে ইমাম হোসেনের ছিন্ন শিরের দাম লক্ষ টাকা। এতো বড়ো সম্পদ নিয়ে রাত জাগাও বিপদ, ঘুমালেও বিপদ। সে কথা সীমার যেমন জানে আজরও তেমনি বুঝেছিলেন। তাই অতিথিকে তাঁর কাছে মাথাটা গচ্ছিত রাখতে বলেছিলেন। তাহলে :

ক) ক্লান্ত সীমার ঘুমিয়ে পড়লেও কেউ লক্ষ টাকা মূল্যের এ ছিন্ন শির নিয়ে যেতে পারবেনা।
খ) রাত্রে কৌশলে কিংবা বলপ্রয়োগে মহামূল্য শির কেড়ে নিতে পারবে না।
গ) কোনো শত্রু যদি সীমারকে অনুসরণ করেও থাকে, সে এ ছিন্ন শির খুঁজেই পাবে না।
ঘ) আজর নিজের তত্ত্বাবধানে ছিন্ন শির রাখার আশ্বাস দিলেন।
ঙ) সকালে সীমারের হাতে ছিন্ন শির তুলে দিবেন বলে আজরকে আশ্বস্ত করলেন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হোসেনের ছিন্নশির দেখে পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও আজর ও তার পরিবারের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ননা লিখতে পারবেন।
- কী কী বাক্য উচ্চারণ করে আজর বিলাপ করেছিলো তার কয়েকটি বাক্য নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- হোসেনের ছিন্ন মাথা নিয়ে আজর কী করতে চেয়েছিলো তা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ

আদ্যন্ত – আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।
সমুদয় – সমস্ত।
নিদারুণ – অতি কঠোর, একান্ত অসহ্য।
লীলা – খেলা।
দ্বেষ – হিংসা।
মূঢ়তা – মূর্খতা।
তন্ত্রী – তার
বিভেদ – পার্থক্য।
চক্ষু – চোখ।
অবমাননা – অপমান।
রোষাগ্নি – ক্রোধের আগুন।
নির্বাপিত – নিভে গেছে এমন।
অনন্তধাম – চিরস্থায়ী গৃহ অর্থাৎ মৃত্যুর জগৎ।
ঋষি – সাধু।
অনন্ত – চিরস্থায়ী।
বশবর্তী – অধীন।
অমানুষিক – মানুষের অসাধ্য।
কীর্তি – বিশেষ ভালো কাজ।
হত – হত্যা করা হয়েছে এমন।
ইয়ত্তা – হিসাব।
প্রস্তর – পাথর।
বিপরীত – উল্টা।
সদগতি – মৃতের শেষ কাজ।

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া, আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন- শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মানুষমাত্রই এক উপকরণে গঠিত এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সেও সর্বশক্তিমানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হউক আর না হউক, জাতি ও জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু, পরম ধার্মিক, বিশেষ ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষ মুহাম্মদের হৃদয়ের অংশ – ইহাদের এই দশা? হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলেও কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায় – বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? যে ধর্মই হউক না কেন, উহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে, তৎকার্যে যোগ দিতে কে বারণ করিবে? মহাপুরুষ মুহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছেন বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য ? জগৎ কয় দিনের? এজিদ। তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস? জীবনশূন্য দেহের সদ্‌গতির সংবাদ শুনিয়া কি তোর চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্বাপিত হইত না? তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনিয়া মিটিত না? হোসেন-পরিবারের মহাক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া, অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক বিকাশ করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে! – তোর মন কি এতই কঠিন যে, জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস না। তোকে কোন ঈশ্বর গড়িয়াছিল জানি না; কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভে বশবর্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি! তোর এই অমানুষিক কীর্তিতে জগৎ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে। এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখ হইতে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন কতকাল ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণ হরণ করিয়াছিস, কিন্তু তোর পিতা এমাম বংশের ভিন্ন নহেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না। তাঁহার ঔরসে জন্মিয়া তোর একি ভাব? রক্ত-মাংস-বীর্য-গুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানব শরীরের স্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। তাহা যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা – জীবন থাকিতে হোসেন - শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না; যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি সহকারে সে মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া যাইয়া শিরশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদগতির উপায় করিবে, প্রাণ থাকিতে আজর এ শির ছাড়িবে না!"

সার-সংক্ষেপ

সীমার ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রী পুত্রের কাছে আজর সমস্ত ঘটনা বললেন। হোসেনের ছিন্ন শির দেখে শোকে অধীর হয়ে সবাই কাঁদতে লাগলেন যে সব মানুষই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। তবু তাদের মধ্যে এতো হিংসা এতো ঘৃণা কেন? যে যার ধর্ম পালন করবে তাতে বাধা দেয়ার তো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া হোসেন হলেন-সাধু, পরম ধার্মিক মহাপুরুষ মুহাম্মদের বংশধর। পবিত্র বংশের পবিত্র সন্তান। সেই পবিত্র মাথা কেটে বর্শায় বিদ্ধ করেছে সীমার। এজিদের জন্যই সীমার অকালে হোসেনকে হত্যা করেছে। আজর প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবন থাকতে এই ছিন্ন শির সীমারকে দিবেন না। কারবালায় গিয়ে হোসেনের দেহ খুঁজে নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সৎকার করবেন।

পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও মহাপুরষ মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি আজরের ভক্তি ছিল। হোসেনের ছিন্ন শির দেখে আজরের পরিবার শোকে দুঃখে কাতর হলো। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই ছিন্ন শির কিছুতেই সীমারকে দিবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে আজরের শোকের কারণ কী, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২. ধর্মের বিভেদ থাকলেই মানুষের প্রতি মানুষ পশুর মতো আচরণ করবে বলে আপনি মনে করেন কি? কমপক্ষে ৭/৮টি বাক্যে আপনার মত যুক্তি দিয়ে লিখুন।

নমুনা উত্তর

১. ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে আজরের শোকের কারণ কী?

উত্তর ॥ ইমাম হোসেন হলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) প্রাণপ্রিয় নাতি, জগৎ-জননী মা ফাতিমার আদরের সন্তান এই মহাপুরুষ জীবিত থাকলে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে পারতেন। ঈশ্বরের মহত্ত্বের কথা প্রচার করতে পারতেন। তাঁর এমন করুণ মৃত্যুতে তাই–

ক) পশু পাখির চোখে অশ্রু ঝরছে,

খ) প্রকৃতির অন্তর ফেটে যাচ্ছে,

গ) ছিন্ন মস্তক দেখে মানুষ ব্যথিত হয়েছে,

ঘ) এমাম হোসেনের মৃত্যু সংবাদ যে শুনেছে সেই শোক প্রকাশ করেছে।

এতো বড়ো মহৎ প্রাণের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে তাই পৌত্তলিক আজরও কান্না রোধ করতে পারেন নি। মায়া মমতা দিয়ে গড়া কোনো মানুষই ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে না কেঁদে পারে না। আজর একজন সৎ ও বিবেকবান মানুষ। মানুষের জন্য মানুষই কাঁদে। আজরের কান্নায় তার মানবতা ও মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

২. এজিদকে উদ্দেশ্য করে আজর কী বলেছিলেন?

উত্তর ॥ এমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে শোকে দুঃখে আজর বলেছিলেন- লোভেই সীমার এমন জঘন্য নিষ্ঠুর কাজটা করেছে। এজিদের নাম ধরে উচ্চারণ করলেন যে, এ কি জগতে অমর? এমাম হোসেন নিহত হয়েছেন এ খবর শুনেই তোর চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নিভে যেতে পারত না কি? এমাম হোসেনের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার পরিজনের যে আহাজারি, যে বুক ফাটানো কান্না, যে সীমাহীন শোকের ধ্বনি উঠেছে তাতে ঈশ্বরের আসন পর্যন্ত টলে উঠছে। কিন্তু এজিদের হৃদয় এতই পাষাণ যে মৃতদেহের প্রতিও সে শত্রুতা পোষণ করেছে। ঈশ্বর তাকে কোন বস্তু দিয়ে গড়েছেন যে তার মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই? সামান্য লোভের জন্য এজিদ এমন অমানবিক কাজ করলো যে চিরকাল জগতবাসী তাকে ঘৃণা করবে। আর কাঁদবে এমাম হোসেনের জন্য। অসময়ে এজিদ এমাম হোসেনকে হত্যা করেছে। এ কথা মনে হলে পাষাণও গলে যাবে - এমনই বেদনাদায়ক এ নির্মম হত্যা। এজিদ মানুষ নয়। মানুষের কোনো গুণই তার মধ্যে নেই। সে পাষণ্ড, নরপশু।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সত্যিকার মানুষ হলে তার মধ্যে যে দয়া মায়া সহানুভূতি থাকে এবং পরের দুঃখে তখন সে কেমন কাতর হয় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- আজর সীমারকে পশু ও সভ্য মানুষের আচরণগত পার্থক্য বোঝাতে চেয়েছিল, নিজের ভাষায় তা গুছিয়ে লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
অঞ্চল – আঁচল। **নিধি** – গচ্ছিত ধন। **পণ** – প্রতিজ্ঞা। **প্রত্যার্পণ** – ফেরত দেয়া। **প্রাতে** – সকালে। **উৎসর্গ** – স্বত্বত্যাগ, দান। **পরোপকার** – পরের উপকার। **ব্রত** – তপস্যা, সংযম। **অতিবাহিত** – পার করে, কাটিয়ে যেতে। **রজনী** – রাত। **লোমহর্ষক** – গায়ে কাঁটা দেয় এমন ভয়ের কথা। **জগৎলোচন** – পৃথিবীর চোখ। **রবিদেব** – সূর্য। **অন্তর্ধান** – অদৃশ্য হওয়া। **কল্য** – কাল। **নিঃস্বার্থ** – স্বার্থছাড়া। **প্রণয়ী** – প্রেমিক। **দৃষ্টান্ত** – উদাহরণ। **জায়া** – স্ত্রী। **পরিজন** – পরিবারের লোক। **অবিনশ্বর** – যা অমর। **লোহিত** – লাল। **পরিশোভিত** – সুন্দর সাজে সজ্জিত। **বিলম্ব** – দেরি। **রক্ষিত** – রাখা আছে। **বহির্ভাগে** – বাইরে। **গতজীবন** – জীবনহীন। **দণ্ডায়মান** – দাঁড়ানো। **শীঘ্র** – তাড়াতাড়ি। **ভ্রাত:** – ভাই। **উচ্চৈ:স্বরে** – উঁচু স্বরে।	পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবন পণ; তথাপি কিছুতেই সৈনিক হস্তে এ শির প্রত্যার্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।" পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন, "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর-ভক্তের মন এক, আত্মা এক। ধর্ম কি কখনও দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে - রক্তে রক্তে লেশমাত্র যোগাযোগ নাই, তবে তাঁহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে কেন? ধার্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর প্রেমিক কাহার না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া, সাহস দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। পরোপকার ব্রতে জীবনপণ কথাটি শুনিয়াও কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না।" পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগৎ দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগতকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে, জগৎলোচন রবিদেবকে পূর্ব গগন-প্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগৎ কল্য দেখিয়াছে। আজ আবার দেখুক নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক - পবিত্র জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক - সাধু জীবনের ভক্তি দেখুক। ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-জায়া, পরিজন বিয়োগ হইলে লোকে কাঁদিয়া থাকে, জীবনকে অতি তুচ্ছ জানে, জীবন থাকিতেই জীবনলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কাঁদিতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না, তাহারও জ্বলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে? মানুষের পরিচয় কি? মহাশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ে ক্ষমতা কি? নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি? আজ ভাল করিয়া দেখুক। জগৎ জাগিল। পূর্ব গগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল! সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া বর্শাহস্তে দণ্ডায়মান- এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব!" আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিল, "ভ্রাতঃ, তোমার নামটি কি শুনিতে চাই। আর তুমি কোন ঈশ্বরের সৃষ্টজীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিও না; ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গতজীবন শত্রু শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ, তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন ভাই?"

সার-সংক্ষেপ

হোসেনের মাথা দামেস্কে নিতে দিবে না বলে আজরের পরিবার একমত হল। সেজন্য যে কোনো ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলো তারা। প্রয়োজনে জীবন দান করবে তবু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। সারা রাত কেটে গেলো এসব কথা আলোচনা করতে করতে। আজরের পরিবারের লোকজন সত্যিকার অর্থে ধার্মিক। সে ধর্ম মানুষের ধর্ম। মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা হৃদয়ের শক্তিকে, মায়া মমতা বিবেক ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখে। আত্মত্যাগে তাঁদের ভয় থাকে না। মানুষ হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পারলেই জীবন সার্থক হয় এ তাঁদের বিশ্বাস।

মানুষ আর পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এ যে পশু ভালো-মন্দ বোঝে না, ধর্ম-অধর্ম বোঝে না, পরের জন্য আত্মত্যাগ বোঝে না এবং অবিনশ্বর জীবনের অর্থও তার অজানা। কিন্তু মানুষ ভালো মন্দ বোঝে। পরের জন্য, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে। হৃদয়ের এ শক্তিই মানুষকে অমর করে। প্রকৃত মানুষের মর্যাদা পাওয়া যায় চরম ত্যাগেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আজরের স্ত্রী ও পুত্রেরা কী আলোচনা করেছিলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।
২. মানুষ অমর হয় কিসে - ভোগে না ত্যাগে? আপনার বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে লিখুন।
৩. মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কী, আজরের বক্তব্য পড়ে তা নিজের ভাষায় লিখুন।
৪. আজরের স্ত্রী এবং পুত্রদের চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো গুণ কী? ত্যাগ সাহস না ভক্তি? অথবা তিনটাই? আপনার মতামত খাতায় লিখুন।

নমুনা উত্তর

১. আজরের স্ত্রী ও পুত্রেরা কি আলোচনা করেছিলেন তা লিখুন।

উত্তর॥ এমাম হোসেনের ছিন্ন শির এবং কারবালায় লোমহর্ষক যুদ্ধের কথা জানার পর আজরের পরিবারের সকলেই শোকে অধীর হলেন। তাঁরা যদিও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না তবু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁরা জানতেন যে এমাম হোসেন ছিলেন বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতি আদরের নাতি। শত্রুরা ইমাম হোসেনকে বধ করে ধর্ম বিধান মতে মৃতের সৎকার তো করেইনি বরং পবিত্র দেহ থেকে মাথাটা ছিন্ন করেছে। এ পবিত্র ছিন্ন শির তাঁরা কারবালায় নিয়ে যাবেন। ভোর হওয়ার আগেই সকলে চলে যাবেন। ভাগ্যে যা থাকে থাক। এতে যদি জীবন যায় তাতেও আপত্তি নেই। আজরের তিন ছেলেও এ কথায় রাজি। তাঁরাও প্রতিজ্ঞা করলেন- কিছুতেই এ ছিন্নশির সীমারকে ফেরত দিবেন না। এ জন্য তাঁরা জীবন দিতেও প্রস্তুত। ছেলেদের সাহসের কথা শুনে আজর আশ্বস্ত হলেন।

৪. মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ..... লিখুন।

উত্তর॥ আজর সাধারণ গৃহস্থ। তিনি একেশ্বরবাদী নন। মুহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) শিষ্যও নন। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক বিবেকের ধর্মে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রাণীর মধ্যে যে বিবেক নেই, সেই বিবেকের জন্যই যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী এ কথা তিনি সীমারকে বলতে চেয়েছেন। আজরের মতে ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি বিধি ব্যবস্থা, ইত্যাদির কোথাও এমন কথা পাওয়া যায় না যে শত্রুর মৃত শরীরে নির্যাতন করতে হয়। তিনি আরও বলেন যে বন্য পশু এবং অসভ্য জাত, যারা পশুর তুল্য, তারাই কেবল মৃতের শরীরে লাঞ্ছনা দিয়ে আনন্দ পায়। মানুষের ধর্ম হল মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ করা। সভ্য মানুষের প্রধান গুণ হলো, পরোপকারের কাজে এগিয়ে যাওয়া। পশুরা এসব চিন্তা করতে কিংবা এমন আচরণ করতে পারে না। তাই পশুরা সহজেই হীন নির্বোধ এবং নিষ্ঠুর হতে পারে। মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য এখানেই। সীমার যেহেতু মানুষ, তাই তার কাছে আজরের প্রশ্ন মানুষ হয়েও কেনো সে পশুর আচরণ করছে?

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- পশুহৃদয় সীমার টাকাকে কতো মূল্য দিয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- আজরের পুত্র সায়াদের পিতৃভক্তি এবং ত্যাগী চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
প্রদত্ত – দেয়া। **উদর** – পেট। **হিতোপদেশ** – ভাল উপদেশ। **কপট** – প্রতারক। **ধর্মাবতার** – ধর্মের অবতার, বিচারকের প্রতি সম্বোধন। **বাসনা** – ইচ্ছা। **জীবনান্তে** – জীবনের পরে। **রাজদ্রোহী** – রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে। **বিষণ্নভাবে** – দুঃখিতভাবে। **সংকল্প** – প্রতিজ্ঞা। **যাঞ্চা করিয়া** – চেয়ে নিয়ে। **সমর্পণ** – স্বত্বত্যাগ করে দেয়া। **নরহত্যা পাপ পঙ্কিলে** – মানুষ হত্যার মতো খারাপ পাপে। **স্কন্ধোপরি** – কাঁধের উপর। **খড়্গ** – খাঁড়া, তরবারি। **তিলার্ধকাল** – এক মুহূর্ত। **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া** – মৃতের সৎকার। **নরাকার পশু** – মানুষের আকারে পশু। **ছেদন** – কেটে ফেলা। **ন্যস্ত** – দেয়া, অর্পণ করা। **দীক্ষিত** – উচ্চ আদর্শের শিক্ষা পাওয়া। **পরিপোষণ** – বিশেষভাবে পালন। **মনুষ্যত্ব** – মানুষের প্রকৃত	"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! এ সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব, বিড়ালতপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী জগতে অনেক আছে- অনেক দেখিয়াছি। আজও দেখিলাম। তোমার ধর্ম-কাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা সমস্ত তুলিয়া রাখ। কারণ, ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকি নাই; কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাকে না বুঝিবে যে, হোসেন- মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকটে বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকার পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।" "ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চহৃদয়ে টাকার ঘাতপ্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা, এ সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই?" "ওহে ধার্মিকপ্রবর! আমি ও সকল কথা অনেক জানি। টাকা কি জিনিস তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমন ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট কথাটির প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে বল ত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই, কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনের টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিও নেহাৎ মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি? –ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?" "রাজদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই, তোমার সহিত বাদ-বিসম্বাদ ও কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীন প্রজা। সাধ্য কি রাজকর্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি,মস্তক পাইলে ত তুমি ক্ষান্ত হও?" "হ্যাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি- মহারাজের নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব। হয়ত ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার। শীঘ্র শির আনিয়া দাও।" আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্নভাবে বলিলেন, 'হোসেনের মস্তক রাখিতে

গুণ।
উত্তোলন – উঠানো।
জ্যেষ্ঠপুত্র –বড় ছেলে।
গ্রীবা – ঘাড়।
লেখনী – কলম।
মুদিত – বন্ধ করা।
যথার্থ – খাঁটি।

সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না, আমি তোমাদের সাহায্যে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এ স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাঞ্চা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি। আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আবার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় উহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ-পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজ-কর্মচারী রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এ যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইলে সে তিলার্ধকালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এ আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিল, 'পিতা! আমার ভ্রাতৃত্রয় জীবিত থাকিতে আপনার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইবে; এ কি কথা! আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনই নরাকার পশু যে স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? ধিক আমাদের জীবন! ধিক আমাদের মনুষ্যত্বে। যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষ পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছি, সে পিতার শির যে কারণে দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে, সে কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারিব না? পিতঃ! আর বিলম্ব করিবেন না, খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক-পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন, সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার-ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত! তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ সে উদরও সার্থক। প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশু-পক্ষীদের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য– বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য– আজর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, জ্যেষ্ঠপুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদিত করিলেন। কবির কল্পনা আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

সার-সংক্ষেপে

আজরের উপদেশ ও যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সীমার ক্ষুব্ধ হলো। সে মনে করলো, টাকার লোভে আজর হোসেনের ছিন্নশির রেখে দিতে চান। আজর শপথ করে বললেন যে হোসেনের মাথা দামেস্কে নিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু সীমারের ভুল ধারণা ভাঙলো না। হোসেনের মাথা না দিলে আজরকে সে হত্যা করবে বলে জানালো। আজর ইচ্ছা করলেই তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সীমারকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তাতে সত্য ভঙ্গ হয়। তিনি বিশ্বাস ঘাতক হয়ে যান। তাছাড়া অযথা নর হত্যার পাপও হবে। তাই স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে আজর নিজের মাথা দেয়ার সিদ্ধান্ত

নিলেন। ছেলেকে বললেন, তার মাথা কেটে সীমারের হাতে দিতে। তারপর যত্ন করে হোসেনের মাথা কারবালায় নিয়ে যেনো মৃতের সৎকার করা হয়। একথা শুনে আজরের বড়ো ছেলে সায়াদ নিজের মাথা উৎসর্গ করতে চাইলো। যোগ্যপুত্র থাকতে পিতার মাথা কেউ কাটবে একথা সে মানতে পারল না। ছেলের আত্মত্যাগে আজর মুগ্ধ হলো। তাকে এবং তার জননীকে বহুবার ধন্যবাদ জানাল। পরের জন্য এমন আত্মত্যাগেই যে মানব জন্ম সার্থক এবং এমন পুত্রের পিতা হওয়াও যে কতো বড়ো ভাগ্যের কথা, কতো পুণ্যের কথা, তা ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করলেন আজর। তারপর প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং হোসেনের মাথা রক্ষার জন্য তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। বুকে পাথর বেঁধে নিজের হাতে খড়্গের আঘাতে কেটে ফেললেন হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ ছেলের মাথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সীমারের কাছে মনুষ্যত্ব বড়ো না টাকা বড়ো — সীমারের যুক্তিগুলো সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।
২. হোসেনের মাথা রেখে দেয়ার জন্য আজর কী সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কী করলেন, সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ লিখুন।
৩. মনুষ্যত্বের জন্য এবং আদর্শের জন্য এতো বড়ো আত্মত্যাগের কাহিনী আগে কখন শুনেছেন কী? এ কাহিনী জেনে আপনার কি মনে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।
৪. সায়াদ পিতা আজরকে কী কী বলেছিলেন, নিজের ভাষায় লিখুন।

প্রশ্ন : সীমারের কাছে মনুষ্যত্ব বড়ো না টাকা বড়ো?

উত্তর॥ এমাম হোসেনের ঘাতক সীমার আকারেই শুধু মানুষ। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম যেমন দয়া মায়া স্নেহ মমতা পরোপকার ইত্যাদি কোনো গুণই নেই। তাই মানুষ হয়েও সে পশু। টাকার লোভে নিষ্ঠুরতম কাজ করতেও তার কোনো কষ্ট হয় না। তার মতে, টাকাই মানুষের প্রধান সম্পদ। টাকা না থাকলে সমাজ, স্বজাতি, ভাই বোন এমন কি স্ত্রীর কাছেও মূল্য থাকে না। কেউ সম্মানও করে না। টাকা না থাকলে রাজাও রাজাকে চেনে না। সাধারণ লোক মান্য করে না। বিপদের সময় জ্ঞান থাকে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল পর্যায়েই টাকা প্রয়োজন। এ জগতে টাকার খেলাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই সীমারের কাছে মানুষ ধর্ম কিংবা মনুষ্যত্বের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি।

প্রশ্ন : সায়াদ পিতা আজরকে কী কী বলেছিলেন, ... লিখুন।

উত্তর॥ সায়াদ আজরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত। এমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে তিনিও শোকে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। নরপিশাচ সীমারের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং রাগ হয় তাঁর মনে, পিতার সঙ্গে তিনিও প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রাণ দিবেন তবু হোসেনের পবিত্র শির সীমারের হাতে ফেরত দিবেন না। সীমারের দাবিতে আজরকে ছিন্ন শির ফেরত দিতেই হবে। এমন পরিস্থিতিতে আজর নিজের মাথা কেটে সীমারের হাতে দিতে বললেন ছেলেদের। তখন সায়াদ বলেছিলেন যে তাঁরা তিন ভাই জীবিত থাকতে পিতার মাথা দিতে হবে কেন? তাছাড়া তাঁরা কি এমনই নরাকার পশু যে নিজের হাতে পিতার মাথা কাটবেন? তাঁদের অন্তরে কি পিতৃভক্তি নেই? যে পিতার জন্য তাঁরা জগতের মুখ দেখেছেন, মানুষ পরিচয়ে বড় হয়েছেন, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে না পারলে জীবনে সহস্র ধিক। সায়াদ পিতাকে বলেছিলেন, খণ্ডিত মস্তক পেলেই যদি সীমার চলে যায়, তাহলে অবিলম্বে আমার মাথা কেটে তাকে দিন। গোলমাল মিটে যাক।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আজরের অসাধারণ সাহস এবং ত্যাগের বর্ণনা লিখতে পারবেন।

◆ আজরের স্ত্রীর শেষ পরিণাম কি হলো তার বর্ণনা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
কম্পিত হইল – কেঁপে উঠল। **রঞ্জিত হইল** – রঙিন হলো। **পুত্রশোণিত** – পুত্রের রক্তে। **আর্তনাদ** – কাতর চিৎকার। **লুণ্ঠিত হইবে** – গড়াগড়ি যাবে। **মহাহর্ষে** – মহা আনন্দে। **কর্তিত** – কাটা। **শোণিত রঞ্জিত** – রক্তে রাঙা। **বধ** – হত্যা। **নরপিশাচ** – মানুষ রূপী পিশাচ। **নরাধম** – অতি হীন মানুষ। **প্রবঞ্চক** – যে প্রতারণা করে বা ঠকায়। **দস্যু** – ডাকাত। **মহাগোলযোগ** – খুব গোলমাল। **অনর্থক** – বিনা কারণে। **বিনাশ** – নষ্ট। **ধূর্ত** – চালাক। **নিস্তার নাই** – ছাড়াছাড়ি নাই। **সর্বকনিষ্ঠ** – সবচেয়ে ছোটো। **সংবরণ** – দমন। **ভূতলশায়ী করিল** – মাটিতে শুইয়ে ফেলল। **সজোরে** – জোরের সঙ্গে। **বীরদর্পে** – বীরের মতো অহঙ্কারে। **সুবর্ণপাত্র** – সোনার পাত্র। **গৃহভ্যন্তরে** – ঘরের ভেতরে।	উঃ! কি সাহস! কি সহ্যগুণ! দেখরে পাষণ্ড এজিদ দেখ, পরোপকার-ব্রতে পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ। দেখরে সীমার। তুইও দেখ। মনুষ্য জীবনের ব্যবহার দেখ। খড়্গ কম্পিত হইল, রঞ্জিত হইল, পরোপকার, আর মৃত শিরের সৎকার হেতু প্রাণাধিক পুত্রশোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল। লৌহনির্মিত খড়্গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝন ঝন রবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু আজরের রক্তমাংসের শরীর হেলিল না, শিহরিল না– মুখমণ্ডল মলিন হইল না। ধন্য রে পরোপকার! ধন্য রে হৃদয়! এদিকে সীমার বর্শা হস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।" আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সীমার মহাহর্ষে শির বর্শার বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সদ্য কর্তিত শোণিতরঞ্জিত রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কি? তুমি উম্মাদ হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক লইয়া গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখনও দেখি নাই। আহা! এ বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এ বুঝি তোমার পরোপকার-ব্রত! আরে নরাধম! এ বুঝি তোর সাধুতা! কি প্রবঞ্চক! পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ, আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস?" "ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি ত বলিয়াছ যে খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন একি কথা-এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?" "আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু। টাকার লোভে কাহার কি সর্বনাশ করিবে কে জানে?" "তুমি কি পুণ্যবলে হোসেন-মস্তক কাটিয়াছিলে ভাই? মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম; এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।" "কথা কাটিলে চলিবে না। যে মস্তকের জন্য কারবালা প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তকের জন্য মহারাজ এজিদ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তকের জন্য চতুর্দিকে 'হায় হোসেন' হায় হোসেন' রব উঠিতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্তে এ কি? - ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।" "ভাই! তুমি, তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম নহে।" সীমার মহাগোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ শির এখানে রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবার হোসেন শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি।" আজরের মুখভার দেখিয়া মধ্যম পুত্র বলিলেন, "পিতঃ চিন্তা কি? আমরা সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিক-প্রবর চলিয়া যাইবে। অধম সন্তান এ দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।" আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের

পূর্ববৎ – আগের মতো।

অনুগ্রহ – উপকার।

পাপীয়সী – পাপী (মহিলাকে সম্বোধনের শব্দ)।

রোষভরে – খুব রাগের সঙ্গে।

পামর – পাপিষ্ঠ, নীচ।

বর্শাচ্যুত – বর্শা থেকে পড়ে যাওয়া।

মৃত্তিকায় – মাটিতে।

আত্মবিসর্জন – নিজের প্রাণ দেয়া, আত্মহত্যা করা।

দক্ষিণ হস্ত – ডান হাত।

ক্রোড়ে – কোলে।

নিকটস্থ – কাছের।

নিকট আসিলে সীমার আরও আশ্চর্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, "এ উম্মাদ কি করিতেছে?" প্রকাশ্যে বলিল, "ওহে, পাগল! তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"এ কি ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই, ধিক তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এ মস্তকের পরিবর্তে দুইটি প্রাণ ত অনর্থক বিনাশ করিলে, বলত ইহারা তোমার কে?"

"এ দুইটি আমার সন্তান।"

"তবে ত তুমি বড় ধূর্ত ডাকাত! টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ। ছি ছি! তোমার ন্যায় অর্থ-পিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর, নতুবা নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি, লইয়া যাও।"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটিই চাহিতেছি, সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। এবারে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনই পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাই না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই। তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না।"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সংবরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিযাছিস? তোর সকলই কপটতা! শীঘ্রই হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।!

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না– তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি, এ যা-একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা।" সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল এবং বীরদর্পে আজরের শয়ন গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, সুবর্ণ পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়্গ হস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল। এ পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না-হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?"

"কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

"কি, তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস না? ওরে পাপীয়সী! তুই স্বচক্ষেই ত দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তুই স্ত্রীলোক হইয়া অনুগ্রহ চাহিস না।"

এ বলিয়া সীমার বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই আজরের স্ত্রীর খড়্গহস্তে

	রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এ খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি, পরপর আঘাতের স্পষ্টত তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর নিকটেই আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি" সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিলেন, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব? আমার বাঁচিয়া থাকা না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এ খড়্গে তিনটি পুত্র গিয়াছে। আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবনসর্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস।" এ কথা বলিতে বলিতে আজরের স্ত্রী সীমারের হস্ত লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শা বিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজরের স্ত্রী মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বেগে পালাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ দ্বারা আত্মবিসর্জন করিলেন– সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন- শির পূর্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

সার-সংক্ষেপ

আদর্শের জন্য আজর নিজের হাতে খড়্গের আঘাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র সায়াদের মাথা কেটে সীমারের সামনে আনলেন। সীমারের ধারণা হলো যে আজর লক্ষ টাকার লোভে হোসেনের মাথা গোপন করে অন্য কারো মাথা কেটে এনেছেন। সায়াদের কাটা মাথা তার সামনে রেখে খণ্ডিত মস্তকটা আনতে বললো সে। আজর দ্বিতীয় পুত্রের মাথা কেটে আনলেন। এবারও সীমার তার কথা রাখলো না। আজরকে প্রশ্ন করে সীমার জানতে পারলো যে ঐ দুটো আজরের পুত্রের মাথা। এতে তার মনের সন্দেহ আরো বেশি হলো। নিশ্চয় আজর টাকার লোভেই এমন করছেন। আবারও সে খণ্ডিত মস্তকটা চাইলো। আজর এবার তৃতীয় পুত্রের মাথা কেটে আনলেন। এবার সীমার ক্ষিপ্ত হয়ে হোসেনের মাথা চাইলে আজর সেটা দিতে অস্বীকার করলেন। সীমার বর্শার আঘাতে আজরকে হত্যা করে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলো যে এটা সোনার পাত্রে হোসেনের মাথা রাখা আছে। আর আজরের স্ত্রী খড়্গ হাতে সেই মাথা পাহারা দিচ্ছেন। সীমার লাফ দিয়ে হোসেনের মাথা আবার বর্শায় গেঁথে ফেললো। আজরের স্ত্রীকে অভয় দিয়ে বললো যে তাকে সে হত্যা করবে না। আজরের স্ত্রী ঘৃণার সঙ্গে তার দয়া প্রত্যাখ্যান করলেন। শোকে দুঃখে ক্রোধে তিনি খড়্গ নিয়ে সীমারকে হত্যার জন্য তেড়ে গেলেন। সীমারের ডান হাতে আঘাতও করলেন। বর্শায় গাঁথা মাথাটা মাটিতে পড়ে গেলো। আজরের স্ত্রী সেটা তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইলেন। সীমার তাঁর আঁচল টেনে ধরে হোসেনের কাটা মাথাটা কেড়ে নিলো। হতাশ হয়ে আজরের স্ত্রী খড়্গের আঘাতে আত্মহত্যা করলেন। প্রাণ দিলেন তবু সীমারের হাতে মান দিলেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আজরের হাতে সদ্য কাটা মাথা দেখে সীমার কী বললো, তা সংক্ষেপে লিখুন।
২. আজরের মুখভাব দেখে মধ্যম পুত্র পিতাকে কী বলেছিলেন, তা লিখুন।
৩. আজরের স্ত্রী সীমারকে কী বলেছিলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) "আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

খ) 'এখন বিলম্ব কেনো? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখো।

নমুনা উত্তর

'আমার কি জীবন আছে? ..... কখনই চাহিনা।'

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসের 'কারবালার পর' গদ্যাংশে এ উক্তিটি করেছিলেন আজরের স্ত্রী। আদর্শ মানুষ আজরের যোগ্য স্ত্রী তিনি। এমাম হোসেনের পবিত্র ছিন্ন শির কারবালায় নিয়ে সৎকার করার ইচ্ছে ছিলো আজরের পরিবারের সকলের। তাই আজর একে একে তিন পুত্রের মাথা কেটে সীমারকে দিলেন। কিন্তু সীমার তাতে রাজি নয়। তার চাই হোসেনের মাথাটাই। সেটা দিতে অস্বীকার করলে সীমার আজরকে হত্যা করে। তারপরও আজরের স্ত্রী হোসেনের মাথা দিতে অস্বীকার করলে পাষাণ নরপিশাচ সীমার আজরের স্ত্রীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তখন আজরের স্ত্রী কথাগুলো উচ্চারণ করেন।

আজরের স্ত্রী-র 'মরিয়াই আছি' শব্দ দুটির মধ্যে ফুটে উঠেছে নিদারুণ মর্মযাতনা এবং হাহাকার। যে সুখের সংসারে স্বামী পুত্র নিয়ে তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ, সেই জীবনের সব স্বপ্ন এবং সুখ তাঁর চোখের সামনেই শেষ হয়ে গেছে। প্রাণাধিক পুত্ররা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছেন, প্রেমময় আদর্শ চরিত্রের স্বামীকে সীমার হত্যা করেছে। এরপর তাঁর জীবনের অস্তিত্বই হয়ে পড়েছে অর্থহীন। বেঁচে থাকার অবলম্বন, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুভয়- কোনোটাই তাঁর নেই। এমন করুণ অবস্থায় মানুষের একমাত্র কাম্য হতে পারে মৃত্যু। আজরের স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাই তিনি সীমারের অনুগ্রহের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, বেঁচে থাকার অনুভবই যার নেই, তাঁর জন্য অভয়বাণীরও কোনো মূল্য নেই। আজরের স্ত্রীর উক্তিতে পাঠকের প্রাণ হু হু করে ওঠে বেদনায়। চোখে নামে অশ্রুর ধারা, আদর্শের জন্য, মানব ধর্মের জন্য এতো বড়ো ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা চিরকাল জগৎবাসী মনে রাখবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. লেখক সীমারকে উদ্দেশ্য করে কী কী বলেছেন, তার ভাবার্থ সংক্ষেপে লিখুন।

২. সংক্ষেপে আজরের চরিত্র বর্ণনা করুন।

৩. আজরের স্ত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

প্রশ্ন : আজরের স্ত্রী চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর ॥ "কারবালার পর" গদ্যাংশে আজরের স্ত্রী ভূমিকা খুবই কম। কিন্তু ঐ অল্প পরিসরেই আজরের স্ত্রী অসাধারণ চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বামী এবং তিন পুত্র নিয়ে তার ছোটো সংসার, কাহিনীতে যতোটুকু বোঝা যায়, আজরের সংসারের সুখ ও শান্তির অভাব ছিলো না। স্বামীর আদর্শকে তিনি সম্মান করতেন। স্বামীর সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দের সত্যিকার অংশিদার ছিলেন তিনি। স্বামীর সিদ্ধান্তে তাঁর ছিলো অগাধ আস্থা। তাই আমরা দেখি, আজরের স্ত্রী স্বামী ও পুত্রদের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির তাঁরা কারবালায় নিয়ে যাবেন। সীমারকে কিছুতেই দিবেন না। এর জন্য পরিবারে যতো বিপদই আসুক না কেনো তাঁরা মাথা পেতে নিবেন। আজরের স্ত্রী ছিলেন অসাধারণ ধৈর্যশীল এবং ত্যাগী মহিলা। ইমাম হোসেনের পবিত্র শির রেখে দেয়ার জন্য তাঁরই চোখের সামনে

একে একে তিনটি ছেলের মাথা কেটেছেন আজর। তিনি বিলাপ করেন নি কিংবা স্বামীর উপর ক্ষুব্ধ হন নি। অসীম ধৈর্যে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছেন। প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের ধন প্রাণের নিধিরা সবাই নিহত হলে, বাধা দিলেন না তিনি একবারও। এমন ধৈর্যের চিত্র কল্পনা করাও কঠিন।

ত্যাগের মহান আদর্শে আজরের স্ত্রী ছিলেন স্বামী পুত্রের অনুসারী। ইচ্ছে করলে তিনি স্বামী পুত্রকে উসকে দিয়ে সীমারকে হত্যা করার পরামর্শ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে যান নি। বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাননি অতিথির সঙ্গে। বরং বেছে নিয়েছেন চরম আত্মত্যাগের পথ। এমন কঠিন ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। পরের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃতের সৎকার করা বিবেকবান মানুষের ধর্ম। আর সে মানবধর্ম পালন করতে গিয়ে তিনি সবই হারালেন। শোক প্রকাশ করে ত্যাগকে ছোটো করলেন না। আজরের স্ত্রীর ত্যাগের পরিমাপ করতেও আমাদের হৃদয় কাঁপে।

প্রখর আত্মসম্মানবোধ ছিলো আজরের স্ত্রীর। নরাধম সীমার যখন তাঁকে হত্যা করবে না জানালো, তখন তিনি তার দয়া প্রত্যাখ্যান করলেন ঘৃণার সঙ্গে। যে পাষণ্ডের জন্য তাঁর স্বামী পুত্র সবাই প্রাণ দিয়েছেন, সে পাষণ্ডের দয়া বা অনুগ্রহ নেয়ার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন তিনি।

আজরের স্ত্রী ছিলেন সাহসী। স্বামী-পুত্ররা নিহত হওয়ার পরও তিনি খঞ্জর হাতে হোসেনের পবিত্র ছিন্ন শির পাহারা দিচ্ছিলেন। হিংস্র পশু সীমারের হাত থেকে ঐ পবিত্র মাথা তিনি রক্ষা করতে পারবেন না জেনেও আত্মসমর্পণ করেন নি। সীমার ঘরে ঢুকে হোসেনের ছিন্ন শির যখন বর্শায় গেথে নিলো, তখন আজরের স্ত্রী মুখে একবার মাত্র দুঃখের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনি। তিনি বলেন- এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম, আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইলো না, হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পরিলাম না, ইহাই দুঃখ।' আজরের স্ত্রীর এ উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অতুলনীয় আদর্শের কথা। সব হারিয়েও তাঁর দুঃখ হয়েছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারার জন্য। কিন্তু তিনি শেষ চেষ্টা করতে ছাড়েন নি। সীমারকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করেছেন। হত্যা করতে চেয়েছেন নরপশুকে। ইচ্ছে ছিলো, সীমার নিহত হলে তিনি ইমাম হোসেনের মাথা কারবালায় নিয়ে যাবেন।

পাষাণ হৃদয় সীমারকে তিনি হত্যা করতে পারলেন না। খঞ্জরের আঘাতে হোসেনের মাঘাটা বর্শা থেকে খুলে পড়ে গেলো। আজরের স্ত্রী সেই মাথা কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইলেন। কিন্তু সীমার তাঁকে ধরে ফেললো এবং কেড়ে নিলো ছিন্ন শির। তখন হতাশ হয়ে আজরের স্ত্রী পড়ে থাকা খড়গ দিয়ে আঘাত করে নিজের প্রাণ দিলেন। পরের জন্য এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগের কারণে আজরের স্ত্রীর চরিত্র আমাদের মনের গভীরে দাগ কাটে। এমন মহৎ ও মানবতাবাদী চরিত্রের প্রতি আমরা সম্মান না জানিয়ে পারি না।

প্রশ্ন : লেখক সীমারকে উদ্দেশ্য করে কী কী বলেছেন, তার ভাবার্থ সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর ॥ বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের 'কারবালার পর' অংশে সীমার চরিত্রের নিষ্ঠুরতম দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। কারবালার যুদ্ধ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় নাতি ইমাম হোসেনের পরিবার পরিজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা আজো ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মনে রেখেছেন। বিশেষ করে ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে কারবালা প্রান্তরের আকাশ বাতাস সেদিন শোকে আকুল হয়ে কেঁদেছিলো। চারদিক থেকে কেবল 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' শব্দের বিলাপ শোনা যাচ্ছিলো। আর আহত ইমাম হোসেনের মৃত্যু হয়েছিলো পাষণ্ড সীমারের খঞ্জরের আঘাতে। এ ভয়ানক নিষ্ঠুরতার কথা মানুষ ভোলেনি। কোনোদিন ভুলতেও পারবেনা। মোহররম মাসের শোক দিবসে সীমারের প্রতি নতুন করে মানুষের মনে ঘৃণার ভাব জাগে।

কারবালার সেই মহাশোকের ঘটনার শত শত বছর পরেও তাই লেখক মীর মশাররফের ভাষায় সীমারের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে ঘৃণা এবং ধিক্কার। সীমারকে তিনি পাষণ হৃদয়ের লোক বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ মৃত্যুর পর পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে মানুষের লেনদেন শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু মানুষকে কিংবা মৃত মানুষের কোনো অঙ্গে নির্যাতন করা তখন চরম অন্যায়। কেউ তা করেও না। কিন্তু সীমার এমনই পশু যে হোসেনের ছিন্ন মস্তক সে বর্শার আগায় গেঁথে নিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়াচ্ছে। লেখক কল্পনায় পশু সীমারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি জানতে চান, কেনো ইমাম হোসেনের পবিত্র দেহ থেকে সে মাথা কেটেছে? কেনোই বা সে পবিত্র মাথা বর্শায় গেঁথে নিয়ে সে দৌড়াচ্ছে? তার স্বার্থ কী?

এজিদের নির্দেশে সীমার পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম কাজ করেছে। ইমাম হোসেনের কাটা মাথা এজিদকে দেখতে পারলে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। শুধুমাত্র অর্থের লোভে সীমার এ ঘৃণ্য কাজটা করেছে। লেখক বলছেন যে ইমাম হোসেন তো

সীমারের কোনো ক্ষতি করেন নি। ইমাম হাসানের স্ত্রী জয়নাবের রূপেও সে মোহিত হয় নি। তাহলে কেনো সে এমন নির্মম আচরণ করলো ইমাম হোসেনের সঙ্গে।

লেখকের মতে শুধু টাকার লোভে সীমার পশু হয়ে গেছে। তাই অর্থের প্রতি লেখকের প্রচণ্ড ঘৃণার কথা যেনো সীমারের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়েছে। অর্থের জন্য পৃথিবীতে যতো অনর্থ ঘটে ইমাম হোসেনের করুণ পরিণতি তারই একটি। অর্থের জন্যই জীব ও জীবনের ধ্বংস হয়, সম্পত্তি নষ্ট নয়, পিতা পুত্রে শত্রুতা হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়, ভাই বোনে ঝগড়া হয়, রাজার সঙ্গে প্রজার গোলমাল হয়, বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু তবুও অর্থের কি মোহিনী শক্তি! এতো অশান্তি, এতো দুঃখ এবং এতো অনাসৃষ্টি সত্ত্বেও রাজা প্রজা ধনী নির্ধন যুবক বৃদ্ধ প্রেমিক– সবাই অর্থ লাভের জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকে। এ অর্থের জন্য তীর, তরবারি, বন্দুক ও বর্শার আঘাতও সহ্য করে। অর্থের লোভে মানুষ অগাধ জলে ডুব দিতে পারে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করতে পারে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারে, রক্ত দিতে পারে, মাংস কেটে ফেলতে পারে, এমন কি নিজের জীবনটাও বিকিয়ে দিতে পারে। অতীত বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের চিন্তাও লোপ পায় এ অর্থেরই জন্য। যেমন ঘটেছে সীমারের ক্ষেত্রে।

লেখক অর্থকে বলেছেন – কুহক। এ কুহক বা মায়ায় পড়ে সবাই। অর্থের মায়ায় ও মোহে মানুষের মায়া দয়া স্নেহ মমতা বিবেক বুদ্ধি ভালোবাসা যুক্তি জ্ঞান চিন্তা দর্শন সবই লোপ পায়। মানুষ ঠকে তবু লজ্জা বা অনুশোচনা হয়। সবার কাছে নিন্দার পাত্র হয় তবু দমে যায় না। ধিকৃত ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে জেনেও অর্থ লোভ বিসর্জন দিতে পারে না মানুষ। সীমার তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ অর্থলোভেই ইমাম হোসেনকে সীমার হত্যা করেছে। লেখকের বিচারে অর্থও পাতকী। সীমারও পাতকী। কবির কল্পনাতেও এদের পাপ নামের ঠাঁই হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : সংক্ষেপে আজরের চরিত্র বর্ণনা করুন।

উত্তর ॥ 'কারবালার পর' গদ্যাংশে আমরা আজরকে পেয়েছি অতি সাধারণ এক গৃহী হিসেবে। ঘরে তাঁর তিন পুত্র সন্তান এবং এক স্ত্রী। আজর একেশ্বরবাদী নন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার শিষ্যও নন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নন আজর। তাঁর গৃহে নানা দেব দেবীর মূর্তি। তিনি দেব দেবীর উপাসনা করেন। খুব সাদামাটাভাবে জীবন যাপন করতো তিনি। তাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সীমারকে দেখে তিনি উচ্চপদস্থ কোনো রাজ কর্মকর্তা ভেবেছিলেন প্রথমে।

আজর খুব অতিথি পরায়ণ। যদিও সীমারের বর্শার আগায় গাঁথা ছিলো ছিন্ন শির, তবু পথিক যে ক্লান্ত সেটা তিনি বুঝেছিলেন। পথিক যখন তাঁর গৃহে রাত কাটাতে চাইলো তখন আজর সমাদর করে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আশ্রয় দিলেন। তার ক্লান্তি দূর করার জন্য সেবা যত্ন করলেন। নানা রকম খাবার দাবার এনে রাখলেন অতিথির সামনে। ভক্তির সঙ্গে তাকে খাওয়ালেন এবং গৃহে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সাধারণ মানুষ হলেও আজর ছিলেন সৎ এবং কৌতূহলী। তাঁর মনে কোনো পাপবোধ ছিলো না বলেই অতিথিকে অতি সহজে প্রশ্ন করতে পেরেছিলেন যে – অতিথি কোথা থেকে এসেছেন এবং বর্শায় বিদ্ধ মাথাটা কার? এ তথ্য জানার কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিলো না। নিতান্ত কৌতূহলের বশেই তিনি বর্শায় বিদ্ধ শিরের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন।

মধুর ব্যবহার এবং বিনয় ছিলো আজরের চরিত্রের অন্য দুই বৈশিষ্ট্য। সীমারকে কোনো প্রশ্ন করার সময় তিনি অনুমতি নিয়েছেন এবং 'মহাশয়' সম্বোধন করে ভদ্রতা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বেশি কথা বললে অথবা অনর্থক কৌতূহল প্রকাশ করলে অতিথি যেনো অসন্তুষ্ট না হয় সে ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির সাবধানে রাখার পরামর্শ দেয়ার সময় তাই আজর বলেন –আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। অতিথির সঙ্গে আজরের এমন বিনয়ী ব্যবহারের আদর্শকে আজো আমরা সকলেই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি।

আজর ছিলেন সাবধানী এবং দায়িত্ববান। অতিথির লক্ষ টাকার ছিন্ন শির কেউ যদি কৌশলে কিংবা বলপ্রয়োগে কেড়ে নিয়ে যায়, তাই নিজের ঘরে তা যত্ন করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া অতিথি ক্লান্তির কারণে গভীর ঘুমে অচেতন হলেও কেউ তা চুরি করতে পারে। সুতরাং সাবধানী আজর ছিন্নশির নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে অতিথিকে স্বস্তি দিতে চেয়েছিলেন। অতিথির সেবা করলেই শুধু চলবে না, অতিথির সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিতে হবে এ ছিলো আজরের চিন্তা। সামাজিক জীবনে অতিথি সেবার কদর চিরকাল ছিলো, এখনও আছে। কিন্তু অতিথি সেবায় তার জান মালের নিরাপত্তার জন্য আজরের যে সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় আমরা এখানে পাই তা যথার্থ অসাধারণ। অতিথি সেবার এমন নৈতিক আদর্শ আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আমরা নিজেদের জীবনে এ

গুণগুলো অর্জন করতে পারি। তাতে উপকৃত হবো আমরা। উপকৃত হবে সভ্য সমাজ। সাধারণ গৃহী হয়েও আজর তাই অসাধারণ এক নীতিবান মানুষ হিসেবে আমাদের মনে স্থান করে নেয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. 'আমার কি জীবন আছে? আমি তো মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।'

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. কয়েকটি বাক্যের গঠন লক্ষ্য করুন :

ক. কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ (দৌড়াইতেছো/দৌড়াচ্ছো)?
খ. তুমি ত আর জয়ানাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না (হওনি)?
গ. তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া (শিউরে) ওঠে।
ঘ. ভ্রাতঃ, তোমার নামটি কি শুনিতে (শুনতে) চাই।
ঙ. সকলে একত্র হইয়া (হয়ে) শোকে কাঁদিতে (কাঁদতে) লাগিলেন (লাগলেন)।

* বন্ধনীতে দেয়া ক্রিয়াপদগুলো ব্যবহার করে বাক্যগুলো চলিত ভাষায় রচনা করুন।

২. এজিদের চরিত্রে পাঁচটি বিশেষণ প্রয়োগ করে পাঁচটি বাক্য চলিত ভাষায় রচনা করুন (পাঠ থেকে বিশেষণ বেছে নিন)।

৩. উপযুক্ত বিশেষণ ব্যবহার করে আজর সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশংসার বাক্য রচনা করুন।

৪. সাধুরীতির দশটি ক্রিয়াপদ লিখুন এবং পাশাপাশি তাদের চলিত রূপও লিখুন (পাঠ থেকে বেছে নিন)।

সাধুরীতির দশটি সর্বনাম পদ লিখুন এবং পাশাপাশি তাদের চলিত রূপও লিখুন।

৬. সাধু ও চলিত রীতির ভাষায় বৈশিষ্ট্য কী কী?

৭. দশটি শব্দের সমার্থক শব্দ শিখুন। যেমন

দিনমনি : সূর্য, রবি, ভানু, তপন, সবিতা, মিহির
কুহক : মায়া, ইন্দ্রজাল, প্রতারণা, ছলনা, ভেলকি
নিশা : রজনী, রাত্রি, নিশি, রাত
অগাধ : অতলস্পর্শ, অতি গভীর, অথৈ, তল পাওয়া যায় না এমন গভীর
শির : মাথা, মস্তক, অগ্রদেশ, উপরিভাগ, মুণ্ড
প্রত্যুষ : সকাল, ঊষা, প্রভাত, ভোর
আরাধনা : উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা, আবেদন
চক্ষু : চোখ, নেত্র, লোচন, আঁখি
দ্বেষ : হিংসা, ঈর্ষা, শত্রুতা, বিরাগ
মূঢ় : মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞান, অবিবেচক।

৮. বিড়াল তপস্বী, ভণ্ড, গুরু, কপট ঋষি, স্বার্থপর পীর- এগুলো কি সমার্থক শব্দ?

৯. পাঁচ ধরনের বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

১০. দশটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করা হলো, পড়ুন এবং নিজে নিজে আরও দশটি শব্দ (পাঠ থেকে বেছে নিয়ে) বিশ্লেষণ করুন।

পিতার :	পিতা+র	কথাটির : কথা+টির
উদরে :	উদর+এ	বাহাদুরী : বাহাদুর+ঈ
মানুষের :	মানুষ+এর	জীবনকে : জীবন+কে
আত্মীয়তা :	আত্মীয়+তা	অর্থলোভী : অর্থলোভ+ঈ
কারবালায় :	কারবালা+য়	পাইলে : পা+ইলে

১১. দশটি যৌগিক শব্দ শিখুন; নিজে নিজে বিশ্লেষণ করুন :

পুত্রশোনিত, হিতোপদেশ, স্কন্ধোপরি, রাজাশ্রিত, পরোপকার, জন্মগ্রহণ, পিতৃভক্তি, বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ, জীবনান্তে।

নমুনা উত্তর

৪. সাধুরীতির দশটি ক্রিয়াপদ :

ঘটিয়াছে – ঘটেছে,	দেখিলাম – দেখলাম
বলিল – বললো	আসিয়া – এসে
আনিয়া – এনে	করিবে – করবে
হইল – হলো	ঠকাইতে – ঠকাতে
জুড়াইল – জুড়ালো	যাউক – যাক

৫. সাধুরীতির দশটি সর্বনাম পদ লিখুন।

তাহা – তা,	ইহা – এ
কাহার – কার	এখানে – এখানে
তাঁহার – তাঁর	ইহার – এর
যাহা – যা	ইহারা – এরা
উহার – ওর	কাহাকে – কাকে

৬. সাধু ও চলিত রীতির ভাষার বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর : সমস্ত উন্নত ভাষারই দুটি রূপ, লিখিত এবং মৌখিক। লিখিত ভাষার আবার দুটি রীতি, সাধু রীতি এবং চলিত রীতি। মৌখিক ভাষারও দুটি রীতি, শিষ্ট বা মানযুক্ত রীতি এবং আঞ্চলিক রীতি। রেখার সাহায্যে দেখানো হলো

	মৌখিক		সাধু রীতি	শিষ্টরীতি
ভাষা		লিখিত ভাষা		মৌখিক ভাষা
	লিখিত		চলিত রীতি	আঞ্চলিক রীতি

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো

ক. বাক্যে সর্বনামের বড়ো রূপ ব্যবহৃত হয়, যেমন; ইহার, ইহাদের, তাহার, তাহাদিগের, ইত্যাদি।

খ. বাক্যে ক্রিয়ার বড়ো রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন; করিয়াছিলো, খাইয়াছে, পড়িতেছিলো, পারিবে, ইত্যাদি।

গ. বাক্যে তৎসম বা গুরুগম্ভীর শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন, মস্তক, স্কন্ধ, হস্ত, বক্ষ, ইত্যাদি।

ঘ. বাক্যে সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন; নিকটস্থ, রোষাগ্নি, সপ্ততল, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি।

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো

ক. বাক্যে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, যেমন; এর, এদের, তাদের, তার, ইত্যাদি।
খ. বাক্যে ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, করেছিলো, খেয়েছে, পড়ছিলো, পারবে, ইত্যাদি।
গ. বাক্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার কম। যেমন; মাথা, কাঁধ, হাত, বুক ইত্যাদি।
ঘ. বাক্যে সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার কম। যেমন; কাছে, সাত তলা, জিনিস, রোষের আগুন, ইত্যাদি।

আরও যা পড়তে পারেন

'বিষাদসিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজি মিঞার বস্তানী'- এগুলো পাবেন বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর বিভিন্ন খণ্ডে।

আদর্শ মহাপুরুষ

শেখ আবদুর রহিম

লেখক পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমায় ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন শেখ আব্দুর রহিম। প্রতিকূল অবস্থার সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেও প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তবে নিজের চেষ্টায় তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেন তাঁর পরিমাণ খুব কম ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম বাংলার যুগে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম 'সুধাকর' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। সেকালে তাঁকে কেন্দ্র করেই মুসলিম লেখকদের সুধাকর দল গড়ে উঠেছিল, তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার মুসলমান বিশ্ব মুসলিমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতি হিসেবে মুসলমানের এক বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামি ভাবের সুষ্ঠু প্রয়োগের ভেতর দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা তিনি করেছেন।

১৯৩১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

রচনাবলী : হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি, 'ইসলাম ইতিবৃত্ত', 'ইসলামনীতি' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'কোরান ও হাদিসের উপদেশাবলী', 'নামাজতত্ত্ব বা নামাজ বিষয়ক যুক্তিমালা', 'হজবিধি', 'রোজাতত্ত্ব', 'খোৎবা', 'ইসলাম তত্ত্ব' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়।

ভূমিকা

"আদর্শ মহাপুরুষ" প্রবন্ধটি শেখ আব্দুর রহিমের 'হযরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এ প্রবন্ধে লেখক যুক্তিতর্ক, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মিতা ও আবেগহীন সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবন ও চরিত্রকে তুলে ধরেছেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. লেখক-সাংবাদিক আব্দুর রহিমের রচনা, ভাষারীতি, শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (স.) এর প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অবহিত হবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মানব জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মদ (স.) কেন আদর্শ মহাপুরুষ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
আসঙ্গলিপ্সু – সাহচর্যকামী। **অবিনশ্বর** – অমর, চিরস্থায়ী, অক্ষয়। **চতুর্ভুজ** – চার হাত। **উন্মুক্ত** – খোলা। **অপরিণামদর্শী** – যে পরিণাম চিন্তা করে না। **সংসারোদ্যান** – সংসাররূপ বাগান। **নশ্বর** – যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অস্থায়ী। **ভবপারাবারে** – সংসার সমুদ্রে, এখানে পৃথিবী বা বাস্তব সংসারকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **জীবন তরী** – মানব জীবনরূপ তরী বা নৌকা। **সংসর্গ** – সংস্পর্শ, মিলন। **পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানী** – যিনি পারলৌকিক তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক জানেন। **সিদ্ধপুরুষ** – জীবন ও জগতের রহস্য সম্পর্কে যাঁরা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা। **দিব্যচক্ষে** – অলৌকিক বা দৈব দৃষ্টি দিয়ে।	গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আরস্তুতল বলিয়াছেন যে, মানব স্বভাবত আসঙ্গলিপ্সু। মানব-সৃষ্টির উপাদানগুলির মধ্যে প্রেম একটি উপাদান ছিল, ইহা সুনিশ্চিত। খোদাতাআলা মানবকে তার আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার দেহের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইয়া দিয়া মানবকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এ কারণবশত মানব যখন অবিনশ্বর জগৎ হইতে নশ্বর জগতে পদার্পণ করে, তখন সেই খোদাতাআলার প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হয়। এ পৃথিবী খোদাতাআলার আশ্চর্যজনক সৃষ্টি-কৌশলে পরিপূর্ণ। যদিও মানবাত্মা চতুর্ভুজরূপে প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তথাপি তাহার গমনাগমনের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহার উন্নতিমার্গে আরোহনার্থ একদিকে সোপানশ্রেণী সংলগ্ন রহিয়াছে; যদি সে উদ্যম সহকারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে খোদাতাআলার অনুগ্রহে উক্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক উন্নতিমার্গে আরোহন করিতে সক্ষম হয়। আবার অন্য দিকে তাহার জন্য অবনতির দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, যদি তাহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয় তাহা হইলে অজ্ঞানতারূপ লৌহনির্মিত হস্ত উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তখন সেই অপরিণামদর্শী মানবাত্মা অবনতির গভীরতম গর্ভে নিপতিত হয়। একদিকে বিবেক ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আত্মাকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে কুপ্রবৃত্তি অসৎ পথে চালিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিতেছে। এরূপ ভয়ানক অবস্থার বিষয় মনোমধ্যে উদিত হইলে আমরা কেবল বলিতে থাকি, হায়, কি বিষম ব্যাপার! কি ভয়ানক প্রবল কাল সমুপস্থিত!! হে খোদাতাআলা, তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন!!! গন্তব্যপথ মহাবিপদসঙ্কুল! এ প্রবাসস্থান মহাবিভীষিকাপূর্ণ!! এমন কি, এখানে মহাবীরগণও নিরুদ্দেশ!!! জ্ঞানীগণের জ্ঞান লুপ্ত! বুদ্ধিমানগণ হতবুদ্ধি!! বিদ্বানগণ বিকম্পিত!!! এরূপ বিষয় সমস্যাপূর্ণ অবস্থায় এ সংসারোদ্যানে (যাহাতে পুষ্প অপেক্ষা কণ্টক অধিক) বিপদসঙ্কুল জীবনাতিবাহিত করা সহজ ব্যাপার নহে। এ ভবপারাবারে যখন সকলেই একই জীবনতরীতে আরোহণপূর্বক গন্তব্যস্থানে গমন করিতেছি, একই প্রবৃত্তিরূপ পাইলের উপর সকলেরই ভরসা রহিয়াছে এবং শেষে একই প্রবল ধ্বংস-ঝটিকায় উক্ত তরী মহাকালসাগরে নিমজ্জিত হইবে, তখন পরস্পরের টানাটানিতে বিভিন্ন প্রকারের সংসর্গে অবস্থিতি করিয়া, বিপদ-আপদকীর্ণ অবস্থায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকিয়া এবং আমোদ-প্রমোদে এ বিপদ সঙ্কুল জীবনাতিবাহিত করা উদারহৃদয় মহাত্মাদিগের কার্য। বাস্তবিকই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া

টীকা

গ্রীস – ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র,

গ্রীস প্রাচীন সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। গ্রীস ছিল পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ও শিল্পীদের লালনভূমি।

পণ্ডিত আরস্তুতুল – "আরস্তুতল' প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল-এর আরবি উচ্চারণ। মহামনীষী দার্শনিক এরিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। এরিস্টটল আঠার বছর বয়সকালে এথেন্স যান এবং প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। প্লেটোর একাডেমিতে তিনি আট বছর অধ্যয়ন করেন এবং ৩৩৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩২৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দকাল পর্যন্ত তিনি এথেন্সে অবস্থান করেন। এরিস্টটলের মতো পণ্ডিত পৃথিবীতে খুব কমই জন্মলাভ করেছেন। দর্শন, কাব্য, ইতিহাস, নাটক, কাব্যতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা তাঁর হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এরিস্টটলের রচিত গ্রন্থ সংখ্যা সম্পর্কে নানা মত রয়েছে।

নির্মলভাবে জীবনাতিবাহিত করা খোদাতাআলার প্রদত্ত ক্ষমতা। ইহাই কার্য-কুশলতার জীবনস্বরূপ। চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার প্রতিপালন, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সুনিয়মে প্রজাপালনকার্যে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়া মহাজ্ঞানীর কার্য। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন তপস্বী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান বীরপুরুষ ও সিন্ধুপুরুষগণও সমস্তই এ বিষয়ে পাঠশালার শিশুদিগের ন্যায় অজ্ঞ! এরূপ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ঐ ব্যক্তি হইতে পারেন, যাঁহাতে সর্বজ্ঞানী খোদাতাআলার অসীম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং যাঁহাতে যাবতীয় সৃষ্টি পদার্থের তত্ত্ব, প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃত অবস্থা দিব্যচক্ষে প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং যাঁহার নিকট পৃথিবীস্থ দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও শিশুবৎ অনিভজ্ঞ, যিনি আরবের এমন অশিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি খোদাতা'আলার প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সার-সংক্ষেপ

দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব। স্রষ্টা মানুষের মধ্যে অর্পণ করেছেন প্রেম ও ভালোবাসার অনুভূতি। আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে দিয়েছেন জ্ঞান ও অজ্ঞতা, দিয়েছেন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। মানুষ ইচ্ছামত ভালমন্দ দুই-ই করতে পারে। এ পৃথিবীতে অনেক বীরের পদস্খলন হয়। বিধাতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সঠিক পথ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। বিধাতার সেই অসীম অনুগ্রহের আলোকে স্নাত হয়েই দুনিয়ার বুকে পদার্পণ করেছিলেন মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। আরবের অশিক্ষিত বর্বর জন সমষ্টিকে তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করেছিলেন। তাই তিনি আল্লাহর প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নিচে বামপাশের প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান পাশের খালি জায়গায় সংক্ষেপে উত্তর লিখুন

প্রশ্ন	উত্তর
১. আদর্শ মহাপুরুষ কে ? কেন তাকে আদর্শ মহাপুরুষ বলা হয়েছে?	১.
২. এখানে মহাবীরগণও নিরুদ্দেশ!!! জ্ঞানিগণের জ্ঞান লুপ্ত। বুদ্ধিমানগণ হতবুদ্ধি!! বিদ্বানগণ বিকম্পিত!!! কেন?	২.

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

মানব স্বভাবত আসঙ্গলিপ্সু।

"মানব স্বভাবত আসঙ্গলিপ্সু" আলোচ্য বাক্যটি শেখ আব্দুর রহিম বিরচিত "আদর্শ মহাপুরুষ" প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এ উক্তিতে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি ও স্বভাব ধর্মের কথা বলেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই এ পৃথিবীতে মানুষ সমাজ, গৃহ ইত্যাদি গঠন ও প্রতিষ্ঠা করে পরস্পর প্রীতি, ভালবাসা ও সহমর্মিতার সঙ্গে বসবাস করে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের সঙ্গ কামনা করা। মানুষের মধ্যে স্রষ্টা যে সব উপাদান আরোপ করেছেন তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রেম। মানুষের মধ্যে আরও নানাবিধ গুণাবলীর সমন্বয় সাধন করে আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার প্রতিনিধিরূপে। সুতরাং মানুষে-মানুষে সান্নিধ্য ও পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সামাজিক বাঁধনই মানুষের চিরদিনের স্বভাবধর্ম।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- মহানবীর সঙ্গে বিবি খোদেজার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- তৎকালীন মক্কা নগরীর অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
ঐকান্তিক – অত্যধিক, একনিষ্ঠ। **সর্বোতভাবে** – সম্পূর্ণরূপে। **উৎসর্গ** – নিবেদন।	পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনাসত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন-দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু খাদিজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া গেল। খাদিজা বিবি যেমন আপনাকে তাঁহার চরণতলে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গণ্যমান্য কুরায়েশদিগের সাক্ষাতে স্বীয় অতুল ধন-

দূর্দান্ত – দূর্দমনীয়।

হৃতসর্বস্ব – যার সবকিছু অপহৃত হয়েছে।

তৎসমুদয় – সেসব।

টীকা

খোদেজা বিবি – হযরত মুহম্মদ (স.) এর ধনশালী স্ত্রী। বিবি খোদেজাই প্রথম ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার ক্ষমতাও তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। অতএব দরিদ্র হযরত মুহাম্মদ (স.) খাদিজা বিবির বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তৎসমুদয় সৎকার্যে, সদনুষ্ঠানে ও সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন উচ্চমনা ছিলেন, পরম দয়ালু খোদাতাআলা তাঁহাকে সেইরূপ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পিতামহ মোত্তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসন সংরক্ষণের ক্ষমতা কুরয়শদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে মক্কা নগরের মধ্যে অশান্তি ও অত্যাচারের প্রবল স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। কি স্বদেশী কি বিদেশী প্রায় অনেকেরই ধন-সম্পত্তি ও অনেক সময়ে স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত দুর্দান্ত দস্যুকুল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইত এবং তদুপলক্ষে অনেক নিরীহ পথিকের তপ্ত শোণিতে নগরের রাজপথসমূহ রঞ্জিত হইয়া পড়িত। একদা হেনজেলা নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ মক্কাবাসী আবদুল্লাহ বিন-জুদায়ানের নিকট যাইতেছিলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিলে রাজপথের উপর প্রকাশ্যভাবে তাঁহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। জোবেদা নামক একজন ব্যবসায়ী বিরল পণ্যদ্রব্যসহ মক্কা নগরে উপস্থিত হইলে কুর্য়শ-সরদার আসেম-বিন-ওয়েল নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করেন; কিন্তু ক্রীত দ্রব্যজাতের মূল্য কিছু মাত্র না দিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক তাড়াইয়া দেন। তখন জোবেদা অনন্যোপায় হইয়া তৎকালীন নামমাত্র শাসনকর্তাগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি হৃতসর্বস্ব হইয়া মনের ক্ষোভে ও আক্ষেপে মক্কার শাসনক্ষমতা প্রভৃতির নিন্দাবাদ করিতে থাকেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রথম জীবনে ছিলেন অভাবগ্রস্ত। দরিদ্র মানুষের প্রতি প্রবল ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি তখন ইচ্ছামত দান করতে পারেননি। বিবি খোদেজাকে বিয়ে করার পর তাঁর অভাব ও দারিদ্র্য দূর হল। বিবি খোদেজা তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য হযরতের চরণতলে উৎসর্গ করলেন। হযরত মুহম্মাদ (স.) বিপুল ধনসম্পদ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মত জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতামহ আব্দুল মোতালেবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসনকার্যের ভার কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। ফলে মক্কার জনজীবনে নেমে আসে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। প্রকাশ্য ডাকাতি ও রাহাজানির ফলে মানুসের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করাও কঠিন হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. বিবি খোদেজা তাঁর ধন সম্পত্তি কী করেছিলেন?	১.
২. মক্কার শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল?	২.

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হলফ-উল,ফযুল সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- তৎকালীন মক্কাবাসীদের ধর্মবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
উপর্যুপরি – পরপর। **কস্মিনকালে** – কখনো। **সুরাপায়ী** – মদ্যপায়ী। **আখড়া** – আড্ডা। **মদিরালয়** – মদের ঘর। **বীভৎস কাণ্ড** – ভয়ানক ব্যাপার। **হিতকর** – মঙ্গলকর। **টীকা** **হলফ-উল্-ফযুল** – মক্কায় শান্তি স্থাপনের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে হাশিম ও কুরায়েশ বংশের প্রত্যেক গোত্রের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির নাম 'হলফ-উল্-ফযুল।' **কাবাগৃহ** – মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগৃহ।	উপর্যুপরি ঐরূপ দুইটি ঘটনার সংবাদ পাইয়া হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা নগরে শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে হাশিম বংশধর ও কুর্‌য়শ বংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির সভ্যগণ সকলেই মক্কার সর্বপ্রকার অত্যাচার অশান্তি নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মুসলমান ইতিহাসে এ প্রতিজ্ঞাই 'ফযুল প্রতিজ্ঞা' (হলফ্-উল্-ফযুল) নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্বকালে জরহম বংশের তিনজন সদাশয় পুরুষ নগরের অত্যাচার দমনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, ঘটনাক্রমে সেই তিনজনেরই নাম ফযল ছিল। 'ফযল আরবি ব্যাকরণের বহুবচনে 'ফযুল' শব্দে পরিবর্তিত হয়। ঐ পূর্বতন নাম অনুসারে এ প্রতিজ্ঞারও নাম 'হল্ফ-উল্-ফযুল' বলিয়া অভিহিত। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঐ সমিতির গঠন দ্বারা পথিক, পরিব্রাজক, বণিক ও ধনী-দরিদ্র সকলেরই আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং মক্কা নগরের মধ্যে সর্বতোভাবে শান্তি সংস্থাপিত হয়। উপরি-উক্ত সদনুষ্ঠানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) কুর্‌য়শদিগের প্রতিজ্ঞানুরূপ তাহাদের সহকারিতা ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কস্মিনকালে তাহাদের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই এবং কখনও কোন প্রতিমূর্তির পূজা করেন নাই, কিংবা কুর্‌য়শদিগের ন্যায় প্রতিমূর্তিগুলিকে খোদাতাআলা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এ সময়ে মক্কা শহরটির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। পবিত্র কাবাগৃহ সুরাপায়ী মাতালগণের এক প্রধান আখড়ায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সময় কাবাগৃহটি দর্শন করিলে মদিরালয় বলিয়া অনুমিত হইত। নগরবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সুরাপানে মত্ত থাকিত। কেবল একটি পবিত্র-হৃদয় যুবক দূর হইতে ঐ সকল বীভৎস কাণ্ড দর্শন করিয়া নরপিশাচদিগের জন্য সর্বদা আক্ষেপ করিতেন এবং সর্বদা তাহাদের জন্য বিষণ্ন অবস্থায় কালযাপন করিতেন। এদিকে আবার সাধারণ হিতকর কার্যে সকলের সঙ্গে সহাস্যবদনে মিলিত হইতেন। কেহ বিপদে পতিত হইলে তিনিই সর্বাগ্রে তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। মানব সমাজের মধ্যে অবস্থান করিয়া এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক কার্যে যোগদানপূর্বক খোদাতাআলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা অপেক্ষা, রাহেব বা যোগীদের ন্যায় জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়া জঙ্গলে বা গিরিগুহায় গমনপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খোদাতাআলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা তত কঠিন কার্য নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কার সমাজ জীবন থেকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন "হলফ-উল্-ফযুল' সমিতি। হাসেম ও কুরায়েশ বংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

পবিত্র কাবাগৃহ কুরায়েশদের নানা প্রকার দূরাচারী ক্রিয়াকর্মের ফলে মদিরালয়ে পরিণত হয়েছিল। তখন মক্কায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল। মক্কার এরূপ সামাজিক অধঃপতন হযরত মুহাম্মদ (স.) কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. কী উদ্দেশ্যে 'হলফ-উল-ফযুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?	১.
২. মক্কার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?	২.

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- গজালল কাবা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- কাবাগৃহ সংস্কার সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
গজালল কাবা – কাবা ঘরের দুটি স্বর্ণনির্মিত হরিণ। **করাল** – ভীষণ। **প্রপীড়িত** – নির্যাতিত। **হজরে আসোয়াদ** – কৃষ্ণ পাথর।	কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, কাবার মধ্যে দুইটি স্বর্ণনির্মিত হরিণ (গজালল কাবা) ছিল। সেই হরিণদ্বয়ের উদর মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্য নিহিত ছিল। কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার জন্য গুপ্তভাবে কাবার ভিত্তি খনন করিয়া তাহা হস্তগত করে। তজ্জন্য ভিত্তির পার্শ্বে একটি গভীর গর্ত হয়, সেই গর্তে বৃষ্টির জল প্রবেশ করায় প্রাচীর ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠে। কেহ বলেন যে, কাবার দ্বারগুলি পার্শ্বস্থ ভুমির সহিত সমতল অবস্থায় ছিল বলিয়া বৃষ্টি হইলেই কাবার মধ্যে জল প্রবেশ করিত। আবার কেহ কেহ বলেন, কাবার দেয়াল মানুষের মাথার সমান উচ্চ ছিল, ছাদ ছিল না। নিম্ন ভূমিতে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত থাকায় পার্শ্বস্থ পর্বত হইতে বৃষ্টি বা বন্যার জল গড়াইয়া আসিয়া কাবা মসজিদের দেয়ালের গোড়ায় জমিত, তাহাতে কাবার দেয়াল ভূপাতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এ সকল কারণে উহা পুনঃসংস্কারের

	আবশ্যক হয়; কিন্তু প্রথমত কেহই কাবার প্রাচীর ভগ্ন করিতে সাহস করেন নাই। কারণ সকলেই বলেন, 'খোদা গৃহ ভগ্ন করা মহাপাপ।' আবার কেহ কেহ বলেন, 'উহা ভাঙিয়া যখন পুনঃনির্মাণ করিব, তখন আবার পাপ হইবে কেন? কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও কেহই প্রাচীর ভাঙিতে সাহস করেন নাই। এরূপ গোলযোগে পঁচিশ বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে সকলে প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ বিভাগ করিয়া লইয়া ভাঙিয়া পুনঃনির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন, 'ইহাতে যদি কোনরূপ পাপ হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে ঐ পাপের অংশী হইব, আর যদি পুণ্য হয়, তবে তাহাও সমভাবে প্রাপ্ত হইব।' এ বিষয় স্থিরীকৃত হইলে সকলে কাবা ভাঙিয়া ফেলিয়া ভিত্তি উচ্চ করিয়া নির্মাণ করিতে মনস্থ করেন, কারণ তাহা হইলে বৃষ্টি জল আর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এ সিদ্ধান্তানুসারে কাবার চারিটি প্রাচীরের নির্মাণভার চারি সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হইল। রোকনে (প্রাচীর) হজ্‌রে আসোয়াদ হইতে রোকনে এরাকী পর্যন্ত প্রাচীরের নির্মাণভার বনূ আবদে-মনাফ ও বনূ জহরার হস্তে; রোকনে এরাকী হইতে রোকনে শামী পর্যন্ত বনূ-আসাদ-ইবন-আবদেল-ওজজ ও বনূ আদুদ্দারের হস্তে; রোকনে শামী হইতে রোকনে হজ্‌রে আসোয়াদ পর্যন্ত বনূ সাহামা ও বনূ আদির হস্তে অর্পিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

কয়েকজন দুর্বৃত্ত কাবাগৃহ খনন করে সোনার হরিণ দুটি চুরি করে। কাবা গৃহের পুনঃ সংস্কারের সময় মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কলহ দেখা দেয়। এভাবে পঁচিশ বছর কেটে যায়। চারটি গোত্র পরে সবাই মিলে পুনঃ সংস্কারের কাজে হাত দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. গজালল কাবা কী?	১.
২. কাবাগৃহ পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল কেন?	১.

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কাবাগৃহের নির্মাণ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মাদ (স.) কিভাবে হজরে আসোয়াদ স্থাপনের কলহের মীমাংসা করলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
তদ্দর্শন – তা দেখে। **সম্মতি** – মত দেয়া। **অর্ণবপোত** – জলযান, জাহাজ। **আক্‌দোদম** – (আরবি শব্দ) শোনিতের প্রতিজ্ঞা, রক্ত শপথ।	সকলে প্রাচীর খননকার্যে নিযুক্ত হইলেন। একদিন একখানি প্রস্তর খনন করিয়া বাহির করিলে, তাহা হঠাৎ গড়াইয়া গিয়া পূর্বস্থানে পতিত হইল। তদ্দর্শনে সকলে ভাবিলেন যে, বোধ হয় এ কার্য বিধাতার অভিপ্রেত নহে। একজন বলেন, 'সদুপায়ে অর্থোপার্জন দ্বারা কাবার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করা উচিত।' তজ্জন্য সকলে সদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু কেহ প্রাচীর খননে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। পরে ওলীদ-বিন-মগিরা শাবলহস্তে অগ্রসর হইয়া প্রাচীর খনন করিতে লাগিলেন; তৎপরে অপর সকলে তাহার অনুসরণ করিল। এ সময়ে রোম-নগরের একখানি অর্ণবপোত জেদ্দার 'নিকটস্থ সমুদ্রে ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহার কাঠ ওলীদ-বিন মগিরা ক্রয় করিয়া আনেন। সেই পোতে বকুম নামক একজন বহুদর্শী রোমীয় শিল্পী ছিল, সে অতি কষ্টে তীরে উপনীত হইয়াছিল। ওলীদ তাহাকে আনিয়া কাবা নির্মাণকার্যে নিযুক্ত করিলেন। এরূপে ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে কাবার নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গেল। অবশেষে হজ্‌রে আসোয়াদকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টস্থানে স্থাপন করিবে, ইহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজ্‌রে আসোয়াদকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেহ কাহার কথায় মনঃসংযোগ করিল না। আবদুদ্দারের বংশীয় লোকগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, 'আমাদের দলস্থ একজন জীবিত থাকিতে অন্য দলস্থ লোকদিগকে এ পবিত্র কার্য কোনক্রমেই সম্পন্ন করিতে দিব না।' এ প্রতিজ্ঞাকে 'আক্‌দোদ্দম' অর্থাৎ শোণিতের প্রতিজ্ঞা বলে। অবশেষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এরূপে কিছু সময় অতীত হইয়া গেল। ওলীদ-বিন-মগিরা বলিলেন, ' এরূপে বিবাদে অনর্থক আমাদের ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।' সকলে এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। ওলীদ বলিলেন, 'যে ব্যক্তি অতি প্রত্যুষ বনূ-সায়রা দ্বার দিয়া বাহির হইবে, সেই ব্যক্তি আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিলে আমরা তাহার উপদেশানুসারে কার্য করিব।' এ কথায় সকলে সূর্যোদয়ের পূর্বে উক্ত দ্বারে গিয়া বসিয়া রহিলেন। যথাকালে দেখিতে পাইলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) ঐ দ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর ছিল। সকলে বলিলেন, 'মুহাম্মদ সুবিবেচক, ইহার কথা কেহ অগ্রাহ্য করিও না।' তৎপরে তাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর বিবাদ মীমাংসার ভার দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) সকলের বিভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া স্বীয় গাত্র হইতে একখানি বস্ত্র লইয়া ভূমিতলে বিস্তৃত করিলেন এবং স্বহস্তে হজ্‌রে আসোয়াদকে উত্তোলনপূর্বক উক্ত বস্ত্রের মধ্যস্থলে রাখিয়া বলিলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি এ বস্ত্রের কোণ ধরিয়া উত্তোলন করুন; ইহাতে সকল সম্প্রদায়েরই পুণ্যের সঞ্চার হইবে।' চারি দলের প্রধান পুরুষ আতবা-ইবন-রাবিয়া, আবু জম্‌য়া, হোজাইফা-বিন-মগিরা এবং আদি-ইবন-য়্‌স কর্তৃক প্রস্তরখানি সমভাবে উত্তোলিত হইলে, কে উক্ত বস্ত্র হইতে তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবে ইহা লইয়া আবার মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং ঐ প্রস্তরখানি বস্ত্র হইতে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিলেন। তখন সমুদয় গোলযোগ মিটিয়া গেল। এ ঘটনায় এ ইঙ্গিত ছিল যে, একশ্বেরবাদ-ধর্মের মন্দিরের পূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হস্তে সমাধা হইল। হাদিসে উল্লেখ আছে, 'নবুয়তরূপ সৌধের শেষ ইষ্টক স্বরূপ আমি।'

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীর খননের সময় বিরোধ উপস্থিত হয় 'হজরে আসোয়াদ' নামক কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন নিয়ে। অধিক পূণ্য সঞ্চয়ের আশায় এ বিশেষ প্রস্তরটি কাবাগৃহে স্থাপনের জন্য প্রত্যেক গোত্রই সমানভাবে আগ্রহী। অবশেষে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বিরোধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ এবং আবদুদ্দারের বংশীয় লোকেরা কঠিন রক্ত শপথ নিয়ে বলল তাদের বংশের একজন লোকও জীবিত থাকা পর্যন্ত অন্য দলের কোন লোক পবিত্র প্রস্তর স্থাপন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ওলিদি বিন মুগীরার কথানুযায়ী স্থির হলো যে, পরদিন প্রত্যূষে বনু সায়রা দ্বার দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম বের হবেন তার মীমাংসা ও উপদেশানুসারে এ প্রস্তর স্থাপিত হবে।

ঘটনাক্রমে পরদিন হযরত মুহম্মাদ (স.) সে দ্বার দিয়ে বের হবার সময় চার গোত্রের অপেক্ষমান লোকেরা তাঁকে বিরোধটি মীমাংসা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা অনায়াসে সে রক্তক্ষয়ী জটিল সমস্যার সমাধান করে দিলেন। হযরত মুহম্মাদ (স.) তাঁর গায়ের বস্ত্র খণ্ডটি মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর প্রস্তরটি রাখলেন এবং চারগোত্রের চারজন প্রধান ব্যক্তিকে বস্ত্রটির চার কোনায় ধরার জন্য অনুরোধ জানালেন। বস্ত্রখণ্ডে রক্ষিত প্রস্তরটি ভূমি থেকে তোলা হলে তিনি প্রস্তরটি নিজ হাতে তুলে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন। এ ভাবে পবিত্র গৃহের পূর্ণতা হযরত মুহম্মাদ (স.) এর হাতেই সাধিত হল।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হযরত মুহম্মদ (স.) দুর্ভিক্ষের সময় কী করেছিলেন সে সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- দুর্ভিক্ষের সময় চাচা আবু তালিবের প্রতি মুহম্মদ কী আচরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
খুল্লতাত – চাচা। **তদবধি** – তখন থেকে। **প্রপীড়িত** – নির্যাতিত।	এ সময়ে আরব দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন কুর্‌য়শ নেতাগণ সকলেই নিজ নিজ পরিবারবর্গ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, কেহ কাহারও তত্ত্বাবধান করা ত দূরের কথা বরং জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিত না। তদবস্থায় বহু লোক অন্নাভাবে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়ানক সময়ে সেই দয়ার সাগর, যিনি মহাবিচারের দিনে 'উম্মতি' 'উম্মতি' বলিয়া ডাকিবেন, তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি স্বীয় সহধর্মিনী খাদিজা বিবির সঞ্চিত ধনরাশি অকাতরে দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ দারিদ্র্য-দুঃখ-প্রপীড়িত দম্পতি তখন দরিদ্রগণের পিতামাতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদেরই স্নেহ-দৃষ্টিতে দরিদ্রদিগের অন্নাভাব দূরীভূত হইয়া গেল, অন্নাভাব বলিয়া তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। আবু তালিব তখন নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় নিপতিত এবং পরিবার-পোষণে নিতান্ত অসমর্থ। হযরত মুহাম্মদ (স.) নবম বৎসর বয়সে ঐ পিতৃব্যের আশ্রয়ে গিয়া পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তিনি এক্ষণে পিতৃব্যের ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আবু তালিবের শিশুপুত্র হযরত আলীকে প্রতিপালনার্থে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ও অনুকরণে আবু তালিবের অপর এক পুত্র হযরত জাফরের প্রতিপালন ভার তাঁহার খুল্লতাত হযরত আব্বাস গ্রহণ করিলেন। কেবল আকেল নামক পুত্রটিই আবু তালিবের নিকট রহিলেন। এরূপে সেই মহাদুর্ভিক্ষ সময়ে আবু তালিবের সাংসারিক ব্যয়ের অনেক লাঘব হইল। হযরত আলী

	তদবধি অনেক দিন পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিপালনাধীনে ছিলেন। হযরত (স.) পরম যত্নে তাঁহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

সার-সংক্ষেপ

এক সময় মক্কা নগরীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কারো মুখের পানে তাকায়নি। হযরত মুহম্মাদ (স.) তাঁর সহধর্মিনী বিবি খোদেজার সমস্ত ধনসম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। এতে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের লাঘব হলো। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃব্য আবু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত হযরত মুহম্মাদ (স.) পিতৃব্যপুত্র আলীকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন।

পাঠ ৭

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হযরত মুহম্মদ (স.) দাসদাসীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করতেন তা লিখতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মদ (স.) কে কেন সবাই "আল-আমীন" বলে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
কর্ণগোচর – শোনা। **আল-আমীন** – বিশ্বাসী, সত্যবাদী। **গুণগ্রাহীতা** – অন্যের গুণ গ্রহণ করার মর্যাদায়। **উম্মতি** – আমার উম্মত। **মহাবিচারের দিন** – কেয়ামতের দিন। **উক্তবিধ** – উল্লেখিত বিধি বা মতানুসারে।	আরবদেশে দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক সংগতিপন্ন ব্যক্তিরই দাসদাসী থাকিত। কিন্তু আরবেরা তাহাদের প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত। দেশের নিয়মানুসারে নিরীহ দাসদাসীগণকে অকাতরে নানা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। আরবগণ কেহ কখনও দাসদাসীগণের দুর্দশা ঘুচাইবার জন্য কোনরূপ যত্ন বা চেষ্টা করেন নাই। হযরত মুহাম্মদ (স.) দাসদাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহদৃষ্টিপাত করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ইতিহাসে ঐ ঘটনা এরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জায়েদ নামক এক আরব বালক শত্রুদল কর্তৃক ধৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হয়। খাদিজা বিবির ভ্রাতৃষ্পুত্র হাকেম বিন-খারাম ওকাজ মেলা হইতে ইহাকে চারিশত দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিয়া খাদিজা বিবিকে উপহার দেন। পতিপরায়ণা খাদিজা বিবি ঐ দাসকে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে তাঁহার পরিচর্যার জন্য প্রদান করেন। হযরত ঐ বালকের প্রতি একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া তাহার লালন-পালন করিতে থাকেন এবং তাহাকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাহার প্রতি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর স্নেহ ও সাদর-সম্ভাষণাদি শ্রবণ করিয়া আরববাসী অনেকেই মনে করিত যে, জায়েদ দাস নহে- মুহম্মদের পুত্র। জায়েদের পিতা হারিস পুত্রের সন্ধানে মক্কায় আসিয়া দেখিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাহাকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। হারেস ইহা দেখিয়া জায়েদকে বাড়িতে লইবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু জায়েদ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্নেহপাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, সে কোনরূপে পিত্রালয়ে যাইতে সম্মত হইল না। এ জায়েদ যাবজ্জীবন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট ছিল। খাদিজা বিবির সহিত বিবাহের পর পনর বৎসর কাল হযরত মুহাম্মদ (স.) নানা সৎকর্মে ও সদনুষ্ঠানাদিতে অতিবাহিত করেন। তিনি অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাগণের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়স্থল স্বরূপ হইয়াছিলেন। যাহার যে কোন অভাব বা অভিযোগ হউক না কেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কর্ণগোচর করিলে তিনি অবিলম্বে সে অভিযোগের প্রতিকার করিতেন। এজন্য সকলে

	তাঁহাকে 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) এ গৌরবান্বিত উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তিনি যেদিকে চলিয়া যাইতেন, সেই দিকেরই ঐ শ্রেণীর লোক 'আল-আমীন', 'আল আমীন' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইত। তিনি যাহাদের নিকট বাল্যকালে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, সেই কুর্‌য়শ বংশীয়গণও তাঁহার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্তবিধ সম্মানিত উপাধিতে আহ্বান করিতেন। পরম করুণাময় খোদাতাআলা তাঁহাকে স্বর্গীয় আদেশে ভূষিত করিবার পূর্বে তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা তাঁহাকে এরূপ উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন, যাহা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না।

সার-সংক্ষেপ

আরবদেশে দাসপ্রথা ছিল সুদীর্ঘ কালের প্রচলিত নিয়ম। দাসদের প্রতি তাদের অর্থশালী প্রভূরা পশুর মত নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করত। হযরতের সেবা করার জন্য জায়েদ নামে একজন ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল। তিনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু জায়েদ হযরত মুহম্মাদ (স.) এর এতই স্নেহভাজন ছিলেন যে পিতা হারেসের অনুরোধে তিনি পিতার কাছে পর্যন্ত যাননি। তিনি সারাজীবন হযরত মুহম্মাদ (স.) এর কাছেই ছিলেন। বিবি খোদেজাকে বিয়ের পর পনের বছর কাল হযরত মুহাম্মদ (স.) নানা সদানুষ্ঠানে ও সৎকর্মে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তিনি ছিলেন আল-আমীন বা সত্যবাদী। তাঁর বিরুদ্ধবাদী কুরায়েশরাও তাঁকে সম্মানিত এ উপাধিতে আহ্বান করত।

আরবে হযরত মুহম্মদ (স.) প্রথম দাসদাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. "হলফ-উল-ফযুল বলতে কী বুঝায়?
খ. কী কারণে কাবাগৃহ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়?
গ. "হজরে আসোয়াদ" কী? এটা স্থাপনের ঘটনা বিবৃত করুন।
ঘ. হযরত মুহম্মাদ (স.) কে আল আমীন বলা হতো কেন?
ঙ. "এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কেটে গেল?"। কিরূপ অবস্থায় কার দশ বছর কেটে গেল?
চ. আকদ্দোম কী? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
ছ. কাবার পুনঃনির্মাণ কাজ কত খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়? কার তৎপরতায় এ কাজ শেষ হয়? নির্মাতা শিল্পী কে ছিলেন?
ঝ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতামহের মৃত্যুর পর মক্কার অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছিল?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : 'হলফ-উল-ফযুল- বলতে কী বুঝায়?

উত্তর ॥ হলফ-উল-ফযুল একটি প্রতিজ্ঞার নাম। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা নগরীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হাশিম ও কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির সভ্যগণ সকলেই মক্কার সর্বপ্রকার অত্যাচার, অশান্তি নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ প্রতিজ্ঞাই ইতিহাসে হলফ-উল-ফযুল নামে অভিহিত। প্রসিদ্ধি আছে যে, অনেক আগে হুরহম বংশের তিনজন মহান পুরুষ নগরের অত্যাচার দমনের জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন। ঘটনাচক্রে সেই তিনজনের নাম ছিল ফযল। আরবী ব্যাকরণে 'ফযল এর বহুবচন হলো 'ফযুল' ' তাদের প্রতিজ্ঞার নামানুসারেই হযরত (স.) তার প্রতিজ্ঞার নাম রাখেন 'হলফ-উল-ফযুল'।

প্রশ্ন : কী কারণে কাবাগৃহ পুন: সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়?

উত্তর : কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, কাবার মধ্যে দুটি স্বর্ণনির্মিত হরিণ (গজালল কাবা) ছিল। সে হরিণ দুটির পেটে ছিল রত্নরাজি। দুর্বৃত্তরা তা আত্মসাৎ করার জন্য গোপনে কাবার ভিত্তি খনন করে। সেজন্য ভিত্তির পাশে একটি গর্ত হয়। সেই গর্তে পানি প্রবেশ করায় কাবার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কাবার দ্বারগুলি পার্শ্বস্থ ভূমির সমতল অবস্থায় ছিল বলে বৃষ্টি হলেই কাবাঘরে পানি ঢুকত। আবার অনেকে বলেন কাবাঘরের দেয়াল মানুষের মাথার সমান উঁচু ছিল, ছাদ ছিলনা, ফলে পার্শ্বস্থ পর্বত থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে এসে কাবার দেয়ালের গোড়ায় জমতো। ফলে কাবার দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সকল কারণে কাবাঘর পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশ্ন : হজরে আসোয়াদ কী? এটা স্থাপনের ঘটনা বিবৃত করুন।

উত্তর : হজরে আসোয়াদ হলো কালো পাথর। কাবাগৃহ পুনঃসংস্কারের জন্য খননের সময় একখানি প্রস্তর ছিটকে বেরিয়ে আসে। এ প্রস্তরটিই হজরে আসোয়াদ।

এ প্রস্তরটি কারা সঠিক স্থানে স্থাপন করবে, তা নিয়ে মক্কার কোরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন সাব্যস্ত হলো যে, যে ব্যক্তি অতি প্রত্যূষে বনু সায়বা দ্বার দিয়ে বের হবেন, তিনি তাদের মীমাংসা করে দেবেন। পরদিন দেখা গেল উক্ত দ্বার দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) বের হচ্ছেন। তখন তারা মুহাম্মদ (স.) এর উপরই বিবাদ মীমাংসা করার ভার দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের সব কথা শুনে নিজের গায়ের চাদর মাটিতে বিছিয়ে তার মধ্যে প্রস্তরটি রাখলেন। অতঃপর চার গোত্রের চার গোত্র প্রধানকে চারকোণা ধরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে পাথরটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন। এ হলো 'হজরে আসোয়াদ' স্থাপনের ঘটনা।

প্রশ্ন : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল-আমীন' বলা হতো কেন?

উত্তর : আল-আমীন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। হযরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল থেকেই ছিলেন সচ্চরিত্রের অধিকারী। নানা সৎকর্ম ও সদানুষ্ঠানে যোগদান করা ছাড়াও তিনি ছিলেন অসহায় দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রত্যেকের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হয়ে তার বংশের লোকেরাই তাকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন : "এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল" কিরূপ অবস্থার কার দশ বছর কেটে গেল।

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার নবুয়ত লাভের পূর্বেও বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সবার সঙ্গে হাসিমুখে অংশগ্রহণ করতেন। কেউ বিপদে পড়লে তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন। মানব সমাজের মধ্যে অবস্থান করে এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক কাজে যোগদান করে খোদার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দশ বছর কেটে গেল।

প্রশ্ন : আকদোদ্দম কী? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : হজরে আসোয়াদ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনকে কেন্দ্র করে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রত্যেক দলের লোক এটাকে স্থাপন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আব্দুদ্দারের বংশীয় লোকেরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাদের মধ্যে একজন জীবিত থাকতে এ কাজ অন্য কাউকে করতে দেবেনা। এ প্রতিজ্ঞা 'আকদোদ্দম' বা শোনিতের প্রতিজ্ঞা নামে পরিচিত।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "আদর্শ মহাপুরুষ প্রবন্ধ অনুসরণে হযরত মুহম্মাদ (স.) এর চরিত্র মাধুর্যের পরিচয় দিন।
২. শেখ আব্দুর রহিম রচিত "আদর্শ মহাপুরুষ" প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. "আদর্শ মহাপুরুষ" অবলম্বনে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন : 'আদর্শ মহাপুরুষ' প্রবন্ধ অনুসরণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র মাধুর্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন মানব শ্রেষ্ঠ। মানুষের সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ও সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রের মধ্যে। তাই তিনি ছিলেন আদর্শ মহাপুরুষ।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অসৎ প্রবৃত্তিকে দএ করতে পেরেছিলেন। ফলে এ বিপদ সঙ্কুল সংসার পারাবারে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তিনি জীবনতরী বেয়ে গিয়েছেন। নানা প্রকার বিঘ্ন ও সমস্যায় তিনি সহাস্য ও ধৈর্যশীল থেকেছেন; মানুষের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় করেছেন। বস্তুতপক্ষে সংসার জীবনে পরস্পরের সঙ্গে মিলে নির্মলভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে এরূপ সাংসারিক কর্মকুশলতার সুন্দর পরিচয় পাই আমরা।

ধনশালিনী রমনী বিবি খোদেজাকে বিবাহ করার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। বিবাহের পর বিবি খোদেজা তার বিপুল সম্পত্তি হযরতের চরণতলে উৎসর্গ করেন। দরিদ্র মানুষের জন্য হযরতের অন্তরে ছিল অসীম স্নেহ ও করুনাধারা। তিনি বিবি খোদেজার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তা অকাতরে গরীবের জন্য বিলিযে দিয়েছেন।

মক্কা নগরীর সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য হাশিম ও কুরায়েশ বংশের প্রত্যেক শাখার যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'হলফ-উল-ফযুল' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতি গঠনের ফলে মক্কাবাসীদের জীবনে নেমে আসে শান্তি, নিশ্চয়তা ও শৃঙ্খলা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সমিতি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে লক্ষ করা যায় তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব।

মক্কায় বিবদমান চার গোত্রের মধ্যে 'হজরে আসোয়াদ' স্থাপন নিয়ে যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) তাঁর সহজ ও সুন্দর সমাধান করে দেন। এ ঘটনায় হযরতের চরিত্রে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ন্যায় বিচারবোধ দেখা যায় তা সত্যিই বিস্ময়কর।

আরবদেশে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন কুরায়েশ ও আরবের অন্যান্য ধনী ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারবর্গ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই চরম দুর্দিনে উম্মতের দুঃখে বিগলিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বিশাল সম্পত্তি জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য বিলিয়ে দেন। তিনি ছিলেন গরীব জনসাধারণের পরম আশ্রয়স্থল। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি পিতৃব্যপুত্র হযরত আলীকে লালন পালন করেন। প্রভুদের অমানুষিক উৎপীড়ন থেকে তিনি দাসদাসীদের রক্ষা করেন। ক্রীতদাস জায়েদকে তিনি পুত্রের মতো লালন-পালন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও মক্কার জনসাধারণ তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক নির্মলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে "আল-আমিন" আখ্যা দিয়েছিল। দুর্লভ এ গৌরব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র মাহাত্মেরই পরিচয় দান করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন পদ্ধতি, কর্ম ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন যথার্থ আদর্শ মহাপুরুষ।

প্রশ্ন : 'আদর্শ মহাপুরুষ' অবলম্বনে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের প্রসঙ্গটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

উত্তর : কাবাগৃহের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত দুটি হরিণ এর প্রতিমূর্তি ছিল। মূর্তি দুটির পেটের মধ্যে ছিল অনেক মণিমাণিক্য। দুর্বৃত্তরা দেয়ালের নিচে গভীর গর্ত খনন করে হরিণ দুটি চুরি করে। সেই গর্তে বৃষ্টির পানি জমলে কাবাগৃহ পতনোন্মুখ হয়। বৃষ্টির সময় সেই পানি প্রবেশ করতো কাবাঘরের মধ্যে, কেউ কেউ বলেন কাবাঘরের দেয়াল ছিল মাথার সমান উচুঁ, ঘরের ছাদ ছিল না। নিম্নভূমিতে অবস্থিত কাবা গৃহের দেয়ালের গোড়ার উচ্চভূমির পানি এসে জমলে দেয়াল ভূপতিত হবার উপক্রম হয়। এ সব কারণে কাবাগৃহ সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউই খোদার ঘরের দেয়াল

ভাঙ্গতে সাহসী হয় না। বলে কাবা ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা মহাপাপ, আবার কেউ কেউ বলে ভেঙ্গে নতুন করলে পাপ হতে পারে না। পরিশেষে স্থির হয় এক এক দল বা ব্যক্তি কাবার এক এক অংশ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করবে।

এতে যদি পাপ হয় সবাই তার ফল ভোগ করবে পুণ্য হলে সবাই তার অংশ পাবে। স্থির হলো কাবাগৃহ ভেঙ্গে উচ্চ ভিত্তির ওপর তা পুনরায় নির্মাণ করা হবে। চারটি দেয়ালের নির্মাণের দায়িত্ব চার দলের ওপর ন্যস্ত হয়। চারটি দল বা সম্প্রদায়ই ছিল কোরেশ বংশের।

খনন কার্য শুরু হলে একদিন একখানি পাথর গড়ায়ে গিয়ে আবার পূর্বস্থানে পতিত হয়। তা দেখে তাদের মনে হয় কাবা গৃহ ভাঙ্গা বোধ হয় আল্লাহর ইচ্ছে নয়। একজন বলেন সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা কাবাগৃহ ভেঙ্গে গড়তে হবে। তখন সবাই সদুপায়ে অর্জিত অর্থ নিয়ে আসেন, কিন্তু প্রাচীর খনন করতে কেউই সাহসী হয় না। পরিশেষে ওলীদ-বিন-মগিরা মাবল খনন কার্যে অগ্রসর হলে সবাই তার অনুসরণ করেন। রোমের একজন দক্ষ শিল্পীকে দিয়ে কাবার পুণঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) "গন্তব্যপথ মহা বিপদ সংকুল। এ প্রবাস মহা বিভীষিকাপূর্ণ।"
খ) "একদিকে বিবেক ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আত্মাকে জ্যোর্তিময় করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে কুপ্রবৃত্তি অসৎ পথে চালিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিতেছে।"
গ) "একেশ্বরবাদ ধর্মের মন্দিরের পূর্ণতা হযরত মুহম্মাদ (স.) এর হস্তে সমাধা হইল।"
ঘ) "নিশ্চয়ই তিনি খোদাতাআলার প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

ক) গন্তব্যপথ ..... মহাবিভীষিকাপূর্ণ।"

আলোচ্য অংশটুকু শেখ আব্দুর রহমান রচিত 'আদর্শ মহাপুরুষ' নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে লেখক পার্থিব জীবনের লোভে মোহ জয় করে স্রষ্টার আরাধনায় মগ্ন থাকা যে কত কঠিন, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্রষ্টার সৃষ্টি অনন্ত রহস্যে আবৃত। এখানে পদে পদে আছে বিপদ। লেখক তাই এ পৃথিবীকে মনে করেছেন প্রবাস স্থান। মানুষ এখানে ক্ষণকালের যাত্রী মাত্র। তারপর তাকে যেতে হবে চিরস্থায়ী আবাস পরকালের পথে। পৃথিবীর জীবন নানা বিপদে আকীর্ণ। এ বিপদ থেকে পবিত্রাণের একমাত্র উপায় স্রষ্টার অনুগ্রহ। পৃথিবীর বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশে যেখানে জ্ঞানীর জ্ঞান লুপ্ত, বিদ্বান বিমূঢ় হয়ে পড়ে, সেখানে একমাত্র সহায়ক হতে পারে স্রষ্টার অশেষ অনুগ্রহ ও করুণা। তাই তিনি পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান কালকে বিপদ সংকুল ও বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশ বলেছেন।

পার্থিব জগতের বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশ থেকে স্রষ্টার অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় নেই।

খ. একদিকে বিবেক ..... ধ্বংস সাধন করিতেছে।

আলোচ্য অংশটুকু শেখ আব্দুর রহিম রচিত "আদর্শ মহাপুরুষ" নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে লেখক আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

স্রষ্টা মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে তৈরী করেছেন। তার মধ্যে আত্মা দিয়েছেন, দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ পৃথিবীর নানা জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে কল্যাণকামিতা থেকে দূরে সরে যায়। ঐশ্বরিক জ্ঞান তার আত্মাকে আলোকিত করে তোলে বটে, কিন্তু অন্যদিকে সে চলার পথে প্ররোচিত হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নানা কুপ্রবৃত্তির দ্বারা। এ অবস্থায় আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ ব্যতীত মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়।

মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র উপায় হলো নিজেকে স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন রাখা।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

ক. বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করুন

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হযরত মুহম্মাদ (স.) নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন সুতরাং তাঁর ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন-দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না কিন্তু খোদেজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব দূরীভূত হইয়া গেল

খ. প্রতিশব্দ লিখুন

ইচ্ছা, গৃহ, আকাশ, স্ত্রী, পৃথিবী।

গ. একই পদের ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখান

হাত, মুখ, খাওয়া, চোখ, মাথা।

ঘ. চলিত রীতিতে রূপান্তরিত করুন

অবশেষে হজরে আসোয়াদকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টস্থানেস্থাপন করিবে, ইহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজরে আসোয়াদকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেহ কাহারো কথায় মনঃসংযোগ করিল না।

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার :

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মাদ (স.) নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন-দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু খোদেজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া গেল।

প্রতিশব্দ

ইচ্ছা – অভিপ্রায়, বাসনা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, ইপ্সা, কামনা, বাঞ্ছা, সাধ।

গৃহ – আগার, আবাস, আলয়, ভবন, গেহ, নিকেতন, নিলয়, বাটি, বাড়ি, মন্দির, সদন।

আকাশ – গগন, নভঃ, অভ্র, অম্বর, অন্তরীক্ষ, আসমান, নভোমণ্ডল।

স্ত্রী – অবলা, নারী, দারা, কান্তা, পত্নী, গৃহিনী, বণিতা, বধূ, অঙ্গনা, জায়া, বামা, রমনী, মহিলা।

পৃথিবী – অবণী, ক্ষিতি, বসুধা, ধরিত্রী, পৃথ্বি, জগৎ, ধরণী, ধরা, বসুন্ধরা, ভুবন, বিশ্ব।

একই পদের ভিন্নার্থক প্রয়োগ

হাত

হাত – আমার হাতে ব্যথা পেয়েছি।

ক্ষমতা – এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

কাজ করা – একটু হাত লাগাও, কাজটা এখনই শেষ হয়ে যাবে।

অধিকার কমানো – না জেনে এখানে হাত দিও না।

মুখ

গম্ভীর ভাব – সারাদিন মুখ ভার করে থেকো না।

সংযত হওয়া – মুখ সামলিয়ে কথা বলবে।

আশা করা – খুব বড় মুখ করে এসেছি, এ কাজটা করে দিতেই হবে।

ভরসা করা – শুধু তোমার মুখ চেয়ে, সেদিন রহিমকে কিছু বলিনি।

চোখ

জ্ঞান – এ ব্যাপারে এখনো তার চোখ ফুটেনি।

দৃষ্টিরাখা – মেয়ে বড় হয়েছে, এখন একটু চোখ রাখতে হবে।

শত্রু – সৎমার কাছে আমি তো চোখের বালি।

হিংসা – একজনের উন্নতিতে আরেক জনের চোখ টাটালে কোন লাভ নেই।

মাথা

মেধা – শাহীনের অংকে মাথা আছে।

প্রধান – শফিক সাহেব আমাদের গ্রামের মাথা।

প্রতিজ্ঞা – মাথা খাও, ভুলো না যেন, খেয়ো মনে করে।

ছোট হওয়া – শুধু তোমার জন্যে সেদিন বিচারে আমাদের মাথা হেঁট করে আসতে হলো।

সাধু রীতিতে রূপান্তর

অবশেষে হজরে আসোয়াদকে কোন্ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করবে, এ নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হলো। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজ্‌রে আসোয়াদকে স্থাপন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কেউ কারো কথায় মনঃসংযোগ করল না।

সৃজনশীল কাজ

কোন মহান ব্যক্তির সম্পর্কে নিজ ভাষায় দুটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত মানুষ। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সন্তান রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই এক অভিজাত পরিমণ্ডলের মাঝে বড় হয়ে ওঠেন। শৈশব-কৈশোরে বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমন মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশ শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনের তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর।

কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি'(১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার রাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারি তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন।

রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখরভাবে রাজনীতি সচেতন মানুষ। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ-প্রশাসনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। হিটলার মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রবলভাবে প্রতিবাদমুখর।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। কবিতার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিত্য-নতুন পরীক্ষা বাংলা কবিতায় সমৃদ্ধ করেছে। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্য সাধারণ।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৩), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১১) বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ ১৯৩২), জন্মদিনে(১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১)।

উপন্যাস : রাজর্ষি (১৮৮৯), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)।

ছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড- ১৯২৬, ২য় খণ্ড- ১৯২৬), ৩য় খণ্ড- ১৯২৭), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১)।

নাটক : বিসর্জন (১৮৯০), চিরকুমার সভা (১৯০৮), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬)।
বিজ্ঞান : বিশ্ব পরিচয় (১৯৩৭)।
প্রবন্ধ : আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), কালান্তর (১৯৩৭), সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)।
ভাষাতত্ত্ব : বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮)।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। অনুকূলবাবুর শিশুপুত্র খোকাবাবু পদ্মা নদীতে পড়ে চিরতরে হারিয়ে যায়। এ-জন্যে ভৃত্য রাইচরণের মনোবেদনার শেষ নেই। খোকাবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই রাইচরণের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রাইচরণের দৃঢ় বিশ্বাস, খোকাবাবুই তার যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার জন্যে তার ঘরে এসে জন্মলাভ করেছে। তাই সে তার পুত্রকে খোকাবাবু জ্ঞানে ভিন্নভাবে আদর-যত্ন আর স্নেহ ভালবাসায় বড় করে তোলে। রাইচরণের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন বিষয়ক ভাবনাই তার পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। আলোচ্য গল্পের নাম নির্বাচনে রাইচরণের প্রাসঙ্গিক এ ভাবনাই রবীন্দ্র চিত্তে ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনুমান করা যায়।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সাধু-ভাষায় রচিত এ গল্পে রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রথম পর্বের শিল্পবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবেগ এবং গীতিময়তা, প্রকৃতি ও মানুষের বিজড়িত অস্তিত্ব, মানব জীবনের বিশেষ কোন পরিণাম সংগঠনে প্রকৃতির ভূমিকা - ইত্যাদি ভাব ও অনুষঙ্গ আলোচ্য গল্পের প্রধান শিল্পলক্ষণ।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
২. ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাংলাদেশের পারিবারিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- অনুকূল বাবুর পরিবারে রাইচরণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অনুকূলবাবুর পুত্র খোকাবাবুর শৈশবকালীন চঞ্চলতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাইচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনুকূল বাবু ও তার স্ত্রী-র চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
শ্যামচিক্কণ – তেলতেলে বা চকচকে কৃষ্ণবর্ণ। **কায়স্থ** – উচ্চবর্ণের হিন্দু। **কালক্রমে** – কালে-কালে বা	**প্রথম পরিচ্ছেদ** রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর

দিনে দিনে।

অধ্যবসায় – তপস্যা, প্রচেষ্টা।

মুন্সেফ – নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক।

উৎক্ষিপ্ত – ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, আকাশে ওড়ানো।

শিরশ্চালন – মাথা, নাড়ানো।

চমৎকৃত – মুগ্ধ, আনন্দিত।

সম্ভাষণ – সম্বোধন।

প্রত্যয়াতীত – বিশ্বাসের অতীত, যা সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

অলোকসামান্য – অনন্য সাধারণ, চমৎকার।

প্রত্যক্ষগোচর – যা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

লুব্ধদৃষ্টি – লোভী দৃষ্টি। এখানে কৌতূহল অর্থে ব্যবহৃত।

প্রত্যাবৃত্ত – পুনরাগমন, ঘুরে আসা। যেখানে ছিল সেখানে পুনরায় আসা।

বিবর্ণ – বর্ণহীন, বিকৃত বর্ণ, নিষ্প্রভ।

উৎকণ্ঠিত – চিন্তিত।

রক্ষণ ও পালন কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকুলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বাধিকার যতটা ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এ ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এ বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার– এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এ যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন'। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত– আবার পরাভুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এ সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে

ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধানক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই– মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদমস্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না– তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও– দেখো পাখি – ঐ উড়ে – এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।' এরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা– বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।' বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাই-চরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল– দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু–খোকাবাবু–লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

	কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এ সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাবু' 'খোকাবাবু আমার' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি' নে মা।' যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এ কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।' শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অনুকুলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এ অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্য করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, 'কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

সার-সংক্ষেপ

মুন্সেফ অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্য রাইচরণ। সে শৈশব থেকেই অনুকূলবাবুকে সেবা-যত্নে বড় করে তুলেছে। পরিণত বয়সে বিয়ের পর অনুকূল বাবু এক পুত্র সন্তানের জনক হলেন। পিতার পর এবার তার পুত্রকে বড় করে তোলার ভার পড়লো রাইচরণের উপর। খোকাবাবুর দায়িত্ব পেয়ে রাইচরণও খুব খুশি। সারাদিন খোকাবাবুকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। খোকাবাবুর সব আচরণ ও চঞ্চলতায় রাইচরণ খুঁজে পেত নিবিড় আনন্দ, আর তা-ই সগর্বে বলে শোনাত খোকাবাবুর মাকে।

সময় যতই গড়িয়ে চললো, ততই বড় হয়ে উঠলো খোকাবাবু, বাড়লো তার চঞ্চলতাও। ক্রমে সে কথা বলতে শিখলে মাকে বলতো 'মা', 'পিসিকে পিচি', আর রাইচরণকে 'চন্ন'। খোকাবাবুর একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠলো 'চন্ন'। খোকাবাবুর বুদ্ধি আর চঞ্চলতা দেখে রাইচরণের বিস্ময় যেন কাটে না।

কিছুদিন পর অনুকূলবাবু পদ্মা-তীরবর্তী এক অঞ্চলে বদলি হলেন। একসময় বর্ষাকাল এলো। অনুকূলবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা পদ্মা নদী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো। একদিন অপরাহ্নে ঠেলা গাড়িতে করে খোকাবাবুকে নিয়ে পদ্মাতীরে বেড়াতে এলো রাইচরণ। নদীতীরে কদম গাছে ফুল দেখে তা পেড়ে দেবার জন্য বায়না ধরলো খোকাবাবু। কিছুতেই তাকে ভুলাতে না পেরে অবশেষে রাইচরণ কদম গাছে উঠলো ফুল পাড়ার জন্য। যাবার সময় রাইচরণ খোকাবাবুকে জলের কাছে যেতে নিষেধ করলো। ফুল পেড়ে নীচে নেমে খোকাবাবুকে না-পেয়ে রাইচরণ ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়লো। চারদিক খোঁজ করেও খোকাবাবুকে পাওয়া গেল না। অবশেষে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে খোকাবাবুর জননীর পায়ের কাছে পড়ে নীরবে কাঁদতে লাগলো রাইচরণ। সকলেই বুঝলো যে নদীতে পড়েই খোকাবাবুর মৃত্যু হয়েছে তবু অনুকূলবাবুর স্ত্রীর সন্দেহ হলো যে, হয়তো বা খোকাবাবুর স্বর্ণালঙ্কারের লোভেই রাইচরণ এ-কাজ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খোকাবাবুর শৈশবকালীন আচরণ কেমন ছিল?
২. খোকাবাবুর শৈশবকালীন আচরণ দেখে রাইচরণের বিস্ময়বোধের পরিচয় দিন।
৩. খোকাবাবুর সঙ্গে রাইচরণের খেলার পরিচয় দিন।
৪. বর্ষাকালে পদ্মার রূপ বর্ণনা করুন।
৫. খোকাবাবুর কীভাবে নদীতে পড়ে গেল?
৬. খোকাবাবুকে না-পেয়ে রাইচরণ কী করলো?
৭. রাইচরণ সম্পর্কে খোকাবাবুর মায়ের সন্দেহ হলো কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : খোকাবাবুর শৈশবকালীন আচরণ কেমন ছিল?

উত্তর : শৈশবে খোকাবাবু ছিল খুব চঞ্চল। সে হামাগুড়ি দিয়ে অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হোত। এ-সময় কেউ তাকে ধরতে এলে খিল খিল করে হেসে দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করতো। খোকাবাবু যখন একটু একটু করে হাঁটতে শিখলো, তখন তার আচরণ দেখে রাইচরণ অবাক হয়ে যেতো। এ-সময় সে ধীরে ধীরে কথা বলতে আরম্ভ করে। খোকাবাবু প্রথম দিকে মা-কে বলতো 'মা', পিসিকে 'পিচি', আর রাইচরণকে 'চন্ন'।

প্রশ্ন : খোকাবাবুর সঙ্গে রাইচরণের খেলার পরিচয় দিন।

উত্তর : খোকাবাবুর সঙ্গে নানা রকম খেলা করে রাইচরণের দিন কেটে যেত। কখনো কখনো মুখে দড়ি বেঁধে রাইচরণকে ঘোড়া সাজতে হতো। কখনো বা মল্ল সেজে তাকে খোকাবাবুর সঙ্গে কুস্তি করতে হতো। কুস্তি খেলায় রাইচরণকে পরাভূত হয়ে ভূমিতে পড়ে যেতে হতো। তা না হলে খোকাবাবুকে নিয়ে কখনো কখনো ঠেলাগাড়িতে করে নদীতীরেও যেত। এভাবেই খোকাবাবু এবং রাইচরণের খেলা জমে উঠতো।

প্রশ্ন : বর্ষাকালে পদ্মার রূপ বর্ণনা করুন।

উত্তর : বর্ষাকালে পদ্মা নদী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। উন্মত্ত পদ্মার ভাঙনে উদ্যান, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র সবই একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পদ্মাতীরবর্তী বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবে যায়। পদ্মার তীরে শোনা যায় অবিরত ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ। জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। নদীতে ধাবমান জলের ফেনরাশি দেখা যায়। সব মিলে একটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বর্ষার পদ্মা নদী।

প্রশ্ন : খোকাবাবুকে না পেয়ে রাইচরণ কী করলো?

উত্তর : নদীতীরে খোকাবাবুকে না দেখে মুহূর্তেই রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। বুক-ভাঙা কান্না নিয়ে সে এদিক ওদিক তাকালো আর উচ্চস্বরে ডেকে উঠলো- "বাবু - খোকাবাবু - লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।" সন্ধ্যা পর্যন্ত উদভ্রান্তের মতো সমস্ত নদীতীরে সে 'বাবু, খোকাবাবু আমার' বলে ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে। অবশেষে ঘরে ফিরে খোকাবাবুর জননীর পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলো।

প্রশ্ন : রাইচরণ সম্পর্কে খোকাবাবুর মায়ের সন্দেহ হলো কেন?

উত্তর : খোকাবাবুর যখন রাইচরণের সঙ্গে ঠেলাগাড়িতে করে নদীতীরে বেড়াতে গেলো, তখন তার হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দু'গাছি মল ছিল। খোকাবাবুকে হারিয়ে রাইচরণ যখন ঘরে ফিরল, তখন খোকাবাবুর জননীর সন্দেহ হলো, হয়তো বা ঐ স্বর্ণের লোভেই রাইচরণ খোকাবাবুকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তাই অনুকূলবাবুর প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন- "কেন, তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১ পৃথিবীতে আর-কোন মানব সন্তান যে এ বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।
২ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফু"।
৩ কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল।
৪ দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।
৫ পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল, খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এ সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

উত্তর

পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে এ বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে খোকাবাবুর শৈশবকালীন চঞ্চলতা সম্পর্কে রাইচরণের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে।

শৈশবে খোকাবাবু ছিল খুবই চঞ্চল প্রকৃতির বালক। হামাগুড়ি দিয়ে সে চৌকাঠ পার হতো। কেউ তাকে ধরতে এলে মুহূর্তেই খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে সে অন্যত্র পালিয়ে যেত। খোকাবাবুর এসব চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখে রাইচরণ খুবই বিস্মিত হতো। তার ধারণা হলো, খোকাবাবু বড় হয়ে জজ হবে। খোকাবাবুর জননীর কাছেও এ সম্ভাবনাময় কথা রাইচরণ সগর্বে ঘোষণা করেছে। কেননা, তার ধারণা ভবিষ্যতে একমাত্র এ-ভাবনায় খোকাবাবুর প্রতি তার গভীর ভালোবাসার কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু ওই যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে খোকাবাবুর শৈশবকালীন চঞ্চলতার কথা বলা হয়েছে।

বর্ষাকালের এক বিকেলে খোকাবাবুকে নিয়ে রাইচরণ পদ্মাতীরে বেড়াতে গেল। পদ্মাতীরে কদম গাছে ফুল দেখে রাইচরণকে ফুল পেড়ে দিতে বায়না ধরলো খোকাবাবু। রাইচরণ প্রথমে যেতে চায়নি। কিন্তু খোকাবাবুকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে অবশেষে ফুল পেড়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল রাইচরণ। যাবার আগে সে খোকাবাবুকে জলের ধারে যেতে নিষেধ করলো। কিন্তু রাইচরণ গাছে উঠতেই খোকাবাবু জলের কাছে গেল। বস্তুত, রাইচরণের নিষেধই খোকাবাবুকে জলের ধারে যেতে যেন অদৃশ্য আহ্বান জানালো। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি শিশুর সহজাত আকর্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- অনুকূলবাবুর বাড়ি থেকে চলে যাবার পর রাইচরণের জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাইচরণের পুত্র ফেল্‌নার শৈশবকালীন অভিজাত পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার পটভূমি লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
দৈবক্রমে – দেবতার ইচ্ছায়, দেবতার কৃপায়। **লোকলীলা সম্বরণ করিল** – মৃত্যুবরণ করল, ইহজগৎ ত্যাগ করল। **বিদ্বেষ** – হিংসা, ঈর্ষা। **মহাপাতক** – মহাপাপী, মহাপাপ। **অকাট্য যুক্তি** – নির্ভুল যুক্তি। **অনুতাপ** – দুঃখবোধ, যন্ত্রণাবোধ। **উপহাস** – হাসি, তামাশা, কৌতুক। **উন্মত্তবৎ** – পাগলের মতো, উন্মাদের ন্যায়। **জোতজমা** – জায়গা জমি। **হৃষ্টপুষ্ট** – মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবান। **শিথিল** – আলগা, এখানে দুর্বল অর্থে ব্যবহৃত। **খুঁতখুঁত** – দোষ ধরা। কোন কিছু মন-মতো না হওয়া। **বসন-ভূষণ** – পোশাক-পরিচ্ছদ।	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল। এ নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না। আশ্চর্যের বিষয় এ যে, এ ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে। ফেল্না– রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না– যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' এ বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টলমল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে। তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল– আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল। এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল। ফেল্নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকুরি জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ– কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে– তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়– কিন্তু, যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সার-সংক্ষেপ

অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্যের চাকরি ছেড়ে রাইচরণ তার গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। এ যাবৎ তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ শেষ বয়সে তার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা গেলেন। পুত্রসন্তান পেয়ে রাইচরণ মোটেই খুশি হতে পারলো না। কেননা, তার ধারণা হলো, অনুকূল বাবুর পুত্র হারানোর যন্ত্রণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু তার বিধবা ভগ্নী শিশুটিকে আদর যত্নে বড় করে তুললেন। শিশুটির নাম দেয়া হলো ফেল্‌না।

দিনে দিনে ফেল্‌না বড় হতে লাগলো। অনুকূলবাবুর ছেলের মতোই সে-ও চৌকাঠ পার হতে আরম্ভ করলো, পিসিকে পিসি বলতে শিখলো। এসব দেখে রাইচরণের মনে দ্বিতীয় ভাবনার উদয় হলো। রাইচরণ ভাবলো, খোকাবাবুরই আসলে ফেল্‌নার রূপ ধরে তার সংসারে উপনীত হয়েছে। অতএব এবার সে ফেলনাকে যথাসাধ্য স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলো। ফেলনাকে সে বড় ঘরের ছেলের মতো করেই মানুষ করতে লাগলো।

ফেল্‌নার উচ্চশিক্ষার জন্য রাইচরণ জায়গা জমি বিক্রি করে কলকাতা চলে গেল। অতিকষ্টে সে একটা চাকরি জোগাড় করে নিলো। ফেল্‌নাকে হোস্টেলে রেখে পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. পুত্র লাভের পর রাইচরণ নিজেকে মহাপাপী বলে মনে করলো কেন?
২. অনুকূল বাবুর ছেলের সঙ্গে রাইচরণের পুত্রের আচরণগত কী সাদৃশ্য ছিল?
৩. খোকাবাবুই যে রাইচরণের ঘরে ফেল্‌না-র রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেছে, এর সপক্ষে রাইচরণ কী কী যুক্তি দাঁড় করিয়েছে?

৪. ফেল্‌নাকে শিক্ষা লাভের জন্য রাইচরণ কী কী করলো?
৫. ফেল্‌নার কলকাতা বাসের পরিচয় দিন।
৬. "সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে" – কথাটির অর্থ কী?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : পুত্রলাভের পর রাইচরণ নিজেকে মহাপাপী বলে মনে করলো কেন?

উত্তর : স্ত্রীর গর্ভে জাত পুত্র সন্তানের প্রতি রাইচরণ প্রথম থেকেই বিদ্বেষভাব পোষণ করতো। প্রথম দিকে সে ফেলনাকে কোন রকম আদর যত্ন করতো না। রাইচরণ ভাবলো, তার চিত্তলোকে খোকাবাবুর যে আসন, তাই যেন অধিকার করতে ফেলনা তার ঘরে এসেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, অনুকূল বাবুর পুত্র-হারানোর যন্ত্রণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। এ কারণেই রাইচরণ নিজেকে মহাপাপী হিসেবে কল্পনা করেছে।

প্রশ্ন : অনুকূলবাবুর ছেলের সঙ্গে রাইচরণের পুত্রের আচরণগত কী সাদৃশ্য ছিল?

উত্তর॥ : খোকাবাবুর সঙ্গে ফেলনার শৈশবকালীন অনেক আচরণেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। খোকাবাবু যেমন চৌকাঠ পার হতে পারতো, তেমনি পারতো ফেলনা। সেও খোকাবাবুর মতো পিসিকে 'পিসি' বলে ডাকতে শিখলো। খোকাবাবু এবং ফেল্‌না উভয়েই শৈশবজীবনে প্রবলমাত্রায় চঞ্চল ছিল।

প্রশ্ন : খোকাবাবুই যে রাইচরণের ঘরে ফেলনার রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেছে, এর পক্ষে রাইচরণ কী কী যুক্তি দাঁড় করিয়েছে?

উত্তর॥ রাইচরণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, খোকাবাবুই ফেল্‌নার রূপ ধরে তার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোকাবাবুর শৈশবকালীন অনেক আচরণের সঙ্গে ফেল্‌নার মিল খুঁজে পেয়েছে রাইচরণ। এ ছাড়া নিম্নোক্ত তিনটি অকাট্য যুক্তিও সে দাঁড় করিয়েছে তার ভাবনার স্বপক্ষে। যুক্তিগুলো হচ্ছে; (১) খোকাবাবুর নিরুদ্দেশ হবার অল্পকাল পরেই ফেলনার জন্ম, (২) বহুবছর পরে প্রায় শেষজীবনে তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তানধারণ এবং ফেল্‌নার জন্ম; (৩) খোকাবাবুর মতোই ফেল্‌না হামাগুড়ি দেয়, টলমল্ করে চলে, পিসিকে পিসি বলে এবং ভবিষ্যৎ জজ হওয়ার মতো আচরণ করে। এসব কারণে রাইচরণ ভেবেছিল যে, খোকাবাবুই ফেল্‌নার রূপ ধরে তার ঘরে এসে জন্মগ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন : "সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" - একথাটির অর্থ কী?

উত্তর : খোকাবাবুর নিরুদ্দেশ হবার অল্প কিছুদিন পরে রাইচরণের পুত্র ফেল্‌নার জন্ম হয়। প্রথম দিকে ফেল্‌নাকে রাইচরণ মোটেই সহ্য করতে পারতো না। তার মনে হতো, অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ত্রণার দিনে তার পুত্র লাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে তার ধারণার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। সে গভীরভাবে লক্ষ করে যে, খোকাবাবু শৈশবে যে সব আচরণ করতো, ফেল্‌নাও সে সব আচরণ করে – সেও চৌকাঠ পার হয়, পিসিকে পিসি বলে ডাকে আর টলমল করে চলে। তাই রাইচরণ ভাবলে। খোকাবাবুই ফেল্‌নার রূপ ধরে তার ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে। এ ভাবনার পিছনে তার অকাট্য যুক্তি ছিল এ খোকাবাবুর তিরোধানের অল্প কিছুদিন পরেই ফেল্‌নার জন্ম হয়। রাইচরণের এ ভাবনার পশ্চাতে তার জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিশ্বাস, খোকাবাবুই ফেল্‌না হয়ে নবজন্ম লাভ করেছে। "সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" –রাইচরণের এ সংলাপ দিয়ে লেখক উপরের কথাই বলতে চেয়েছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক।

২. তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
৩. আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।
৪. বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন মহাপাতক।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। খোকাবাবুকে হারানোর পর নিজের পুত্রলাভে রাইচরণের অপরাধবোধের কথা এখানে বলা হয়েছে।

খোকাবাবুর তিরোধানের পর রাইচরণ নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। এতকাল তার কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তাকে বিস্মিত করে তার স্ত্রী শেষজীবনে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ছেলেটিকে পেয়ে রাইচরণ মোটেই খুশি হতে পারে নি, বরং সে ছেলেটিকে রীতিমতো ঈর্ষা করতো। তার ধারণা হলো, ফেল্‌নাই খোকাবাবুকে মেরে তার ঘরে এসেছে আদর যত্ন পাবার লোভে। রাইচরণ মনে মনে ভাবলো – অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ত্রণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। এ কারণেই রাইচরণ তার পুত্র ফেল্‌নাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছে বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। ফেল্‌নার প্রতি রাইচরণের ভালোবাসা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে।

খোকাবাবুর তিরোধানের পর নিজের ঘরে ফেলনার জন্মকে রাইচরণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। রাইচরণ মনে মনে ভাবলো – অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ত্রণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু ক্রমে তার এ মনোভাব পরিবর্তিত হলো। সে লক্ষ করলো, ফেলনাও খোকাবাবুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পার হয়, পিসিকে বলে পিসি। এবার সে ভাবলো ফেলনাই আসলে খোকাবাবু। ফেলনাকে সে খোকাবাবু জ্ঞানে মানুষ করতে থাকে। পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতো না, দামী জামা কাপড় পরতে দিতো, ভালো ভালো খাবার দিতো। ফেল্‌নার যাতে কোন অসুবিধা না হয, সেদিকে রাইচরণের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফেল্‌না বড় হলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাকে কলকাতা পাঠানোর উদ্যোগ নিল রাইচরণ। নিজের জায়গা-জমি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করলো, নিজে অতি কষ্টে একটা চাকরিও সংগ্রহ করলো। নিজে কষ্ট করলেও, ছেলেকে তা বুঝতে দেয়নি রাইচরণ। ফেল্‌নাকে সে অনুকূলবাবুর পুত্রজ্ঞানেই আদর যত্ন করতে লাগলো। আর মনে মনে বলতো, বৎস, আমি কষ্ট করলেও তোমার কোন অযত্ন হবে না।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- রাইচরণের শেষ জীবন বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রী ফেল্‌নাকে কিভাবে নিজেদের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাইচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
কর্মে জবাব দিল – চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়া, চাকরি	**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,

ছেড়ে দেয়া।

কাছারি – বাইরের বসার ঘর।

আর্দ্র হওয়া – ভিজে যাওয়া, করুণায় ভরে যাওয়া অর্থে।

অন্তঃপুরে – ভিতরের ঘরে, অন্দরমহলে।

কৃতঘ্ন – যে উপকারীর অপকার করে।

পরশ্ব – পরশু।

নিরীক্ষণ – পর্যবেক্ষণ।

অদৃষ্ট – কপাল, ভাগ্য।

'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এ বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকুলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকুলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে।'

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।'

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকুলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।'

অনুকুল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এ আমি–'

অনুকুল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে। কোথায় সে।'

'আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।'

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকুলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ– বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকুলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পারিবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।'

	কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।' ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।' রাইচরণ অনুকুলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।' নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে।' রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু।' 'তবে কে।' 'আমার অদৃষ্ট।' কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না। রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।' ফেল্না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।' ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকুল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

সার-সংক্ষেপ

ফেল্নার বয়স যখন বারো বছর হলো, তখন রাইচরণ সিদ্ধান্ত নিলো, এবার তাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুর কাছে নিয়ে যাবে। বারাসতে অনুকূলবাবুর বাড়িতে গিয়ে সে সব কথা তার মতো করে সাজিয়ে বলে। অনুকূল বাবু প্রথমে রাইচরণের কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ফেলনাকে নিয়ে যখন সে অনুকূলবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলো, তখন ক্রমে অনুকূলবাবুর মনোভাব পরিবর্তিত হতে লাগলো। ফেলনার পোশাক পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণ দেখে তাকে দরিদ্র গৃহভৃত্যের সন্তান বলে মনে হলো না। সব ধরনের জেরার মুখেও রাইচরণ প্রকৃত সত্য প্রকাশ করলো না। কিন্তু পিতৃহৃদয়ের প্রবল টানে পুত্রের কাছাকাছি থাকার জন্য সে অনুকূল বাবুর বাড়িতে থাকতে চাইলো। কিন্তু রাইচরণের এ মিনতি রাখতে চাইলেন না অনুকূলবাবু।

মুন্সেফের ছেলে হয়েও এতকাল দরিদ্র গৃহভৃত্যের ঘরে থাকতে হয়েছে বলে ফেল্না রাইচরণের ওপর রেগে ছিল। তবু উদারভাবে সে অনুকূলবাবুকে পিতা সম্বোধন করে বললো রাইচরণ চলে যাক। শুধু মাসে মাসে তাকে কিছু টাকা পাঠানো হোক। ফেলনার এ কথায় অনুকূলবাবু রাজি হলেন। পুত্রের দিকে শেষবারের মতো একবার চেয়ে রাইচরণ চলে গেলো। পরের মাসে রাইচরণের ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠানো হলো, কিন্তু লোক না থাকায় সে টাকা ফিরে এলো। রাইচরণকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. বারাসতে গিয়ে অনুকূলবাবুর কাছে রাইচরণ কী বললো?
২. খোকাবাবু পরিচয়ে ফেলনাকে পেয়ে গৃহকর্মী ও অনুকূলবাবুর মনোভাব কেমন হলো?
৩. রাইচরণ যে ছেলেটিকে এনে দিল, তাকে নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করতে কেন রাজি হলেন অনুকূলবাবু?
৪. অনুকূলবাবুর কাছে রাইচরণের শেষ ইচ্ছা কি ছিল?
৫. রাইচরণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রী কী বললেন?
৬. রাইচরণের কাছে পাঠানো টাকা ফিরে এলো কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : বারাসতে গিয়ে অনুকূলবাবুর কাছে রাইচরণ কী বললো?

উত্তর : ফেলনার বয়স যখন বারো বছর পূর্ণ হলো, তখন তাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুর কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল রাইচরণ। তখন সে অনুকূলবাবুর কর্মস্থল বারাসতের বাড়িতে গেলো। সে অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রীর কাছে বললো যে, "আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এ আমি –।" একথা বলে রাইচরণ মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে রাইচরণ তার অপরাধের কথা স্বীকার করলো।

প্রশ্ন : খোকাবাবু পরিচয়ে ফেল্‌নাকে পেয়ে গৃহকর্ত্রী ও অনুকূলবাবুর মনোভাব কেমন হলো?

উত্তর : খোকাবাবু পরিচয়ে ফেল্‌নাকে পেয়ে অনুকূলবাবু প্রথমে বিস্মিত হলেন। তিনি কিছুতেই রাইচরণ আনীত ফেল্‌নাকে খোকাবাবু বলে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই সে রাইচরণের কাছে প্রমাণ চাইলো– আনীত ছেলেটিই খোকাবাবু কিনা। অপরদিকে গৃহকর্ত্রী কোন রকম বিচার না করেই ফেল্‌নাকে খোকাবাবুজ্ঞানে গ্রহণ করলেন। ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে, নানাভাবে স্পর্শ করে, তার ঘ্রাণ নিয়ে, অতৃপ্ত নয়নে তার মুখ নিরীক্ষণ করে, কেঁদে-হেসে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ছেলেটিকে পেয়ে গৃহকর্ত্রী আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটির পোশাক-পরিচ্ছদ এবং হাব-ভাব যেমন, তাতে নিশ্চিত যে এ ছেলেটিই তার হারিয়ে যাওয়া খোকাবাবু।

প্রশ্ন : রাইচরণ যে ছেলেটিকে এনে ছিল, তাকে নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করতে কেন রাজি হলেন অনুকূলবাবু?

উত্তর : রাইচরণ কর্তৃক আনীত ছেলেটিকে নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করতে রাইচরণ প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু আস্তে আস্তে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলো। অনুকূলবাবু মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটিকে পাওয়ামাত্র তার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে আগলে ধরেছেন, সেক্ষেত্রে প্রমাণ সংগ্রহ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতএব, এখন বিশ্বাস করাই ভালো। এ ছাড়া তিনি ভাবলেন, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাবে? তিনি ছেলেটির কাছে জিজ্ঞাসা করে আরও জানতে পেরেছেন যে, শিশুকাল থেকেই সে রাইচরণের কাছেই বড় হয়েছে। রাইচরণকেই সে পিতা বলে জানতো, কিন্তু রাইচরণকে সে কখনোই পিতার ন্যায় ব্যবহার করতে দেখে নাই, বরং অনেকটা ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতো। এসব কারণে রাইচরণ আনীত ছেলেটিকে অনুকূলবাবু নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করলেন।

প্রশ্ন: রাইচরণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রী কী বললেন?

উত্তর : রাইচরণ যখন বুঝতে পারলো যে ফেল্‌না অনুকূল বাবুর ঘরে খোকাবাবু পরিচয়ে আশ্রয় পাবে, তখন তার হৃদয়ে দেখা দেয় শূন্যতার উপলব্ধি। শেষজীবনে যাতে ছেলেকে দেখতে পায়, তাই সে বাকি জীবনটুকু অনুকূলবাবুর বাড়িতেই থাকতে চেয়েছে। কিন্তু তার এ অনুরোধে অনুকূলবাবু রাজি হননি, তাই রাইচরণকে তিনি বললেন– "রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পারিবি না।" ঈশ্বরের উপর দোষ চাপানোর অপচেষ্টা দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে রাইচরণকে আরও বললেন যে, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে, তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।" অন্যদিকে গৃহকর্ত্রী ছিলেন রাইচরণের উপর খুবই রাগান্বিত। কিন্তু ফেল্‌নাকে কোলে পেয়ে তার চিত্ত উদার হয়ে গেল। তাই রাইচরণের অন্তিম অনুরোধে অনুকূলবাবু যখন রাজি হলেন না, তখন গৃহকর্ত্রী বললেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হইক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. গৃহিনী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষে লালন করিতেছিলেন।
২. অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।
৩. যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।
৪. ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল।

উত্তর

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে খোকাবাবু পরিচয়ে ফেল্‌নাকে পেয়ে অনুকূলবাবুর স্ত্রীর আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে।

ফেল্‌নার বয়স যখন বারো বছর পূর্ণ হলো, তখন রাইচরণ তাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুকে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তাই একদিন সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অনুকূলবাবুর বারাসতের বাড়িতে গিয়ে উপনীত হলো। খোকাবাবু রূপী ফেল্‌নাকে পেয়ে অনুকূলবাবুর আনন্দ আর কে দেখে। কোনরূপ প্রমাণ বা বিচার না করেই তিনি ফেলনাকে কোলে বসিয়ে নানা ভাবে আদর করে এতদিনের হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে দেখতে লাগলেন। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুকূলবাবুর স্ত্রীর পুত্রস্নেহের প্রাবল্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে রাইচরণের প্রতি অনুকূলবাবুর সন্দেহপ্রবণতা এবং বিশ্বাসহীনতার ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

খোকাবাবু পরিচয়ে ফেলনাকে পেয়ে রাইচরণ ও তার স্ত্রী যার পর নাই খুশি হলেন। পুত্রকে হারিয়ে রাইচরণের হৃদয় শূন্যতায় ভরে গেল। বাকিজীবন পুত্রের কাছে থাকার জন্য সে অনুকূলবাবুর বাড়িতেই আশ্রয় প্রার্থনা করলো। কিন্তু একবার খোকাবাবুকে কথিত চুরি করার কারণে অনুকূলবাবু কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, নতুন কোনো উদ্দেশ্যে রাইচরণ তার বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। পুত্রকে একবার হারিয়ে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন, পুনরায় সে যন্ত্রণা তিনি পেতে চাইলেন না। তাই তিনি রাইচরণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যে একবার ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে আর কোনো ভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। কারণ সে ভবিষ্যতে আবার একই ধরনের বিশ্বসঘাতকতার কাজ করতে পারে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

২. রাইচরণ-চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।
৩. অনুকূলবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।
৪. অনুকূলবাবুর স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৫. ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের সার্থকতা বিচার করুন।

প্রশ্ন : 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : কোনো ছোটগল্প বা উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যিকরা কয়েকটি দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন। কখনো নায়ক নায়িকা বা বিশেষ কোনো চরিত্র, কখনো ঘটনা সংঘটনের স্থান বা পরিবেশ, কখনো বা অন্তর্নিহিত ভাবকে অবলম্বন করে ছোটগল্প বা উপন্যাসের নামকরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকে অবলম্বন করেই এর নামকরণ করা হয়েছে– 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'।

মহকুমা মুন্সেফ অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্য রাইচরণ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অনুকূলবাবুর পরিবারে কাজ করে আসছেন। অনুকূলবাবুকে ছোটবেলা থেকে তিনি দেখাশোনা করেছেন। অনুকূলবাবুর পর এবার তার সন্তান খোকাবাবুকে লালন-পালনের দায়িত্ব পড়লো রাইচরণের উপর। রাইচরণের সঙ্গেই কেটে যায় খোকাবাবুর সারাটি দিন। খোকাবাবুর সকল আবদার সে মিটিয়ে দেয়, খোকাবাবুকে আনন্দ দিতেই রাইচরণের যত আনন্দ।

অনুকূলবাবুর বাড়ি ছিল পদ্মানদীর তীরে। একদিন অপরাহ্নে খোকাবাবুকে নিয়ে রাইচরণ পদ্মার তীরে বেড়াতে গেল। বর্ষার পদ্মা জলে পরিপূর্ণ। পদ্মার তীরে একটা কদম গাছে কদমফুল দেখে তা পেড়ে দেয়ার জন্য খোকাবাবু আবদার করলো। অনেক চেষ্টা করেও খোকাবাবুকে নিবৃত্ত করতে না পেরে রাইচরণ খোকাবাবুকে নিচে রেখে কদমগাছে উঠলো ফুল পেড়ে দিতে। যাবার সময় সে খোকাবাবুকে নদীর কাছে যেতে নিষেধ করে গেল। কিন্তু এ নিষেধের আকর্ষণেই খোকাবাবু জলের কাছে গেল এবং এক সময় নদীতে পড়ে ভেসে গেল। অতঃপর অনুকূলবাবুর স্ত্রীর প্রবল রাগের মুখে রাইচরণ গৃহভৃত্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে এলো।

রাইচরণ ছিল সন্তানহীন। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আসার কিছুদিন পরে তার স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। রাইচরণ প্রথমে তার পুত্র ফেল্‌নাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু ক্রমে লক্ষ করলো, খোকাবাবুর শৈশবকালীন নানা গুণই ফেলনার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার বিশ্বাস হলো যে, খোকাবাবুই ফেল্‌না রূপে তার ঘরে এসে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। অতএব এবার থেকে সে ফেল্‌নাকে খোকাবাবু জ্ঞানে মানুষ করতে লাগলো। পাড়ার অন্য ছেলেদের সাথে ফেলনাকে মিশতে দিতে না। সব সময় দামি পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়ে রাখতো ফেলনাকে। বড় হলে নিজের জায়গা জমি বিক্রি করে ফেল্‌নাকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। নিজেও কোন রকমে একটা কাজ সংগ্রহ করে কলকাতায় থেকে গেল। বড় ঘরের ছেলের মত যাতে বড় হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাইচরণ হয়ে উঠলো বিশেষ বিশেষ যত্নশীল।

এভাবে বারো বছর কেটে যাবার পর রাইচরণ এক কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। নিজের ছেলেকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুকে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। ফেল্‌নাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সে অনুকূলবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে। খোকাবাবু পরিচয়ে ফেলনাকে পেয়ে অনুকূলবাবু ও তার স্ত্রী আবেগে স্নেহে ভালবাসার বেদনায় আপ্লুত হলো। ঘরের ছেলে এতকাল পরে আবার ঘরে ফিরে এসেছে। যে ছেলেকে মনে করা হয়েছিল চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, সে ছেলে ঘরে ফিরেছে। এ সূত্রেই গল্পের নাম রাখা হয়েছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। অতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, গল্পের নামকরণ সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন : রাইচরণ চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মুন্সেফ অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্য রাইচরণ। যশোর জেলার অধিবাসী এ মানুষটি বারো বছর বয়সেই অনুকূলবাবুদের পরিবারে গৃহভৃত্যের কাজে যোগ দেয়। দীর্ঘদিনের পরিচয়ে ও কর্মের মাধ্যমে সে সকলের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়, হয়ে ওঠে পরিবারের একজন সদস্য।

রাইচরণ ছিল কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। অনুকূলবাবুকে শৈশবে সে যেমন সযত্নে বড় করে তুলেছে, তেমনি সযত্নে বড় করে তুলেছে অনুকূলবাবুর পুত্র খোকাবাবুকে। তার সঙ্গেই কেটে যায় রাইচরণের সারাটা দিন। এক মুহূর্তের জন্যও

খোবাবুকে সে চোখের আড়াল করেনি। খোকাবাবুর সকল শৈশবকালীন চঞ্চলতার মধ্যে সে খুঁজে পেত অনাবিল আনন্দ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় লেখকের বর্ণনা "অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিলখিল হাস্য কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচার শক্তি দেখিয়া চমৎকৃৎ হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

রাইচরণ ছিলো অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মানুষ। খোকাবাবুর তিরোধানের পর যখন সকলেই অবিশ্বাস করতে লাগলো, তখন তার বলার বা করার কিছুই ছিল না। কিন্তু গৃহকর্ত্রী যখন তাকে সন্দেহ করলো এবং টাকার বিনিময়ে খোকাবাবুকে ফিরিয়ে দেবার কথা বললো, তখন তার বেদনার আর সীমা থাকলো না। তার প্রতি মাঠাকুরাণীর এ অবিশ্বাস তাকে বিস্মিত করলো। অন্যদিকে, ফেলনাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুর কাছে বুঝিয়ে দেয়ার পর রাইচরণ যখন অনুকূলবাবুর বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটাতে চাইলেন, তখন অনুকূল বাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। বরং তিনি বললেন, রাইচরণের প্রতি বিশ্বাসহীনতার কথা। "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।" – অনুকূলবাবুর এ কথা রাইচরণকে সীমাহীন যন্ত্রণা দিয়েছে। এ কথার পরই সে সবার সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজেই যে মানুষ ছিল সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভাজন, সেই পরিণতিতে বিশ্বাসঘাতক মানুষ হিসেবে পরিগণিত হলো। এটাই বোধ করি রাইচরণ চরিত্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক পরিণতি।

কৃতজ্ঞতাবোধ রাইচরণ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার সামান্য অবহেলার কারণে খোকাবাবু পদ্মায় পড়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। এ অপরাধবোধে সে সারাজীবন জ্বলেছে। তাই দীর্ঘকাল পরে জীবনের শেষলগ্নে পুত্রসন্তান লাভ করেও সে খুশি হতে পারেনি। নিজের পুত্র ফেল্‌নাকে সে রীতিমতো ঈর্ষা করতো। কেননা, তার ধারণা হলো, অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ত্রণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। অনুকূলবাবুর প্রতি এতই সুগভীর ছিল রাইচরণের কৃতজ্ঞতাবোধ। এ কৃতজ্ঞতাবোধের তাড়নাতেই সে নিজের পুত্রকে অনুকূলবাবুর হাতে তুলে দিয়েছে মিথ্যা ঘটনার জাল বিস্তার করে। নিজের পুত্রকে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার সময় পিতৃহৃদয়ের যন্ত্রণার কথা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু একজন সাধারণ গৃহভৃত্য তার সুগভীর অন্তর উপলব্ধিতে অন্য এক পিতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরেছে। এভাবেই সে হয়ে উঠেছে সাধারণের সীমানা ছাড়ানো এক অসাধারণ চরিত্র।

ধর্মপ্রাণ রাইচরণ বিশ্বাসী মানুষ। সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে জন্মান্তরবাদে। তাই প্রথম দিকে ফেল্‌নাকে ঈর্ষা ও অবহেলা করলেও, ক্রমে যখন ফেলনার মধ্যে খোকাবাবুর শৈশবকালীন অনেক আচরণের মিল খুঁজে পেল, তখন তার ধারণা হলো, খোকাবাবুই ফেলনা হয়ে তার ঘরে এসে জন্মলাভ করেছে। প্রসঙ্গত, রাইচরণের অন্তর্ভাবনা উপস্থাপন করা যায়– "ফেল্‌না .... যথা সময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল– 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" জন্মান্তরবাদে এ বিশ্বাসের কারণেই সে ফেল্‌নাকে খোকাবাবু জ্ঞানে মানুষ করেছে, বড় করে তুলেছে অভিজাত পরিমণ্ডলে।

রাইচরণ গৃহভৃত্য হলেও অনেক বিশাল মনের মানুষ। তাই অনুকূলবাবুর বাড়িতে তার শেষ আশ্রয় যখন মিললো না, তখন তার কয়েকটি টাকার সহানুভূতিকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছে। টাকার বিনিময়ে সে তার পিতৃহৃদয়কে অপমানিত করেনি। সামান্য মানুষ রাইচরণকে রবীন্দ্রনাথ এভাবে অসামান্য মানুষ হিসেবে নির্মাণ করেছে।

প্রশ্ন : ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যর আলোকে 'খোকাবাবুর প্রত্যার্বতন গল্পের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : ছোটগল্প হচ্ছে মানবজীবনের বিশেষ কোনো মুহূর্ত বা খণ্ডাংশের শিল্পরূপ। বিশেষ মুহূর্ত বা খণ্ডাংশকে নিয়ে রচিত হলেও ছোটগল্পের অবয়বে গোটা মানবজীবন সম্পর্কে আমরা লেখকের বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াপাত লক্ষ করি। অর্থাৎ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের একটা ব্যঞ্জনা নির্মাণই ছোটগল্পের অন্যতম শিল্প বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র আকৃতির মধ্যে এভাবে বৃহত্তর জীবন প্রতিবিম্বিত হয়, পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সম্পূর্ণ সূর্য। ছোটগল্পের মধ্যে মানবজীবনের ছোট ছোট দুঃখ-কথা ও আনন্দ-বেদনার ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়। ছোটগল্প শেষ হলেও একটা

অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা গল্পটিকে ঘিরে থাকে। ছোটগল্পের এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, গল্পের সার্থকতা বিচার করবো।

রাইচরণের জীবনের ছোট্ট একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আলোচ্য গল্প। তার সামান্য অবহেলার কারণে খোকাবাবুর হারিয়ে যাওয়া এবং সে কারণে অপরাধবোধই এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। অথচ গল্প যখন শেষ হয়, তখন আমরা কৃতজ্ঞতাবোধে মহীয়ান অসামান্য এক মানুষ রাইচরণের সাক্ষাৎ পাই। রাইচরণ গৃহভৃত্য হলেও অনেক বিশাল মনের মানুষ। তাই অনুকূলবাবুর বাড়িতে তার শেষ আশ্রয় যখন মিললো না, তখন তার কয়েকটি টাকার সহানুভূতিকে সে তার পিতৃ হৃদয়কে অপমানিত করেনি। সামান্য মানুষ রাইচরণের মধ্যে এ অসামান্যতা আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ মূলত মানবজীবনের মহানুভবতার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এখানেই নিহিত আছে এ গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনা তথা গভীর জীবনদর্শন। এভাবে খণ্ড ঘটনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড এক উপলব্ধি আরোপ করে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছেন।

ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আকৃতিগত সংক্ষিপ্ততা। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পও আকৃতিতে ছোট। কাজেই ছোটগল্পের অবয়বগত এ বৈশিষ্ট্যের আলোকেও 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনকে সার্থক গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

অন্তিমে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য শিল্প বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শেষ হয়েও হইলো না শেষ' – এ অতৃপ্তিই ছোটগল্পের প্রাণ। আলোচ্য গল্পেও আমরা এ অতৃপ্তির বেদনায় নিমগ্ন হই। রাইচরণের কাছে পাঠানো টাকা ফেরৎ এলো। কিন্তু রাইচরণ কোথায় গেল? ফেল্‌না খোকাবাবু হিসেবে অনুকূলবাবুর পরিবারে মিশে যেতে পারলো কি? গৃহকর্ত্রী ছেলেকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলো কি? অনুকূলবাবুর সন্দেহ দূর হলো কি? –এসব নানা প্রশ্নের আমরা কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। এ অতৃপ্তিই 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পকে আরও সার্থক করে তুলেছে।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

প্রশ্ন

১. বাক্য কাকে বলে? বাক্য কত প্রকার? খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প থেকে প্রত্যেক প্রকার বাক্যের দুটি করে উদাহরণ দিন।

২. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লিখুন। নিম্নের অংশগুলো চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন –

ক) তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল, তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

খ) বর্ষাকাল আসিল ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকা চরের কাশবন এবং বন ঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

গ) অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এ অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিনী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

৩. নিচের শব্দগুলো পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখ–

নদী, জননী, জল, ফুল, মেঘ, সূর্য, ভগ্নী, বিশ্বাস।

৪. বিশিষ্ট অর্থে বাক্যে প্রয়োগ দেখান –
গদ্‌গদ কণ্ঠ, ছায়া মাড়ানো, দারুণ সন্দেহ, খুঁত খুঁত করা, কৃতঘ্ন অধম।

উত্তর

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? বাক্য কত প্রকার? খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্প থেকে প্রত্যেক প্রকার বাক্যের দু'টি করে উদাহরণ দিন।

উত্তর : কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যদি একটা সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তবে তাকে বাক্য বলে। বাক্য তিন প্রকার। যথা– সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য–

ক) বর্ষাকাল আসিল।

খ) রাইচরণ জরির টুপি আনিল।

জটিল বাক্য

ক) ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল।

খ) মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল।

যৌগিক বাক্য

ক) পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

খ) ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

প্রশ্ন : সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লিখুন। নিম্নের অংশগুলো চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন-

উত্তর : সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, "সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে।" সাধুভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সাধারণত দীর্ঘ হয়, পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত হয়। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হলো –

সাধুভাষা	চলিতভাষা
১. সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি।	১. চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাধান্য বেশি।
২. সাধুভাষায় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন করিয়া, করিয়াছি, করিতেছি ইত্যাদি।	২. চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– করে, করেছি, করছি ইত্যাদি।
৩. সাধুভাষায় সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–তাহারা, তাহাতে, কাহারা ইত্যাদি।	৩. চলিত ভাষায় সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– তারা, তাতে, কারা ইত্যাদি।
৪. সাধুভাষার চাল গুরু গম্ভীর।	৪. চলিত ভাষার চাল অপেক্ষাকৃত লঘু।

সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর। ক-অংশের রূপান্তর দেখানো হলো, বাকি অংশদ্বয় নিজে করুন।

সাধুভাষা

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর ওপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল, তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

চলিত ভাষা

তার আর একটি মনিব বেড়েছে, মা-ঠাকুরাণী ঘরে এসেছেন। তাই অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের আগে যতটা অধিকার ছিল, তার অনেকটাই নতুন কর্ত্রীর হাতে গিয়েছে।

প্রশ্ন : নিচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখ—

নদী, জননী, জল, ফুল, মেঘ, সূর্য, ভগ্নী, বিশ্বাস।

উত্তর

জল — সলিল, পানি, অম্বু, বারি, জীবন।

জননী — মা, মাতা, আম্মা, প্রসূ, গর্ভধারিনী।

মেঘ — জলদ, জলধর, ঘন, জীমূত, অভ্র।

[বাকি শব্দগুলোর সমার্থ শব্দ অভিধান দেখে নিজে লিখুন।]

সৃজনশীল কাজ

১. আপনার জানা কোন গৃহভৃত্য সম্পর্কে একটি ছোটগল্প রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলো পড়ুন।

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

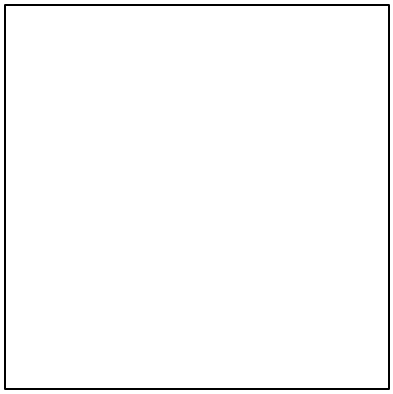

লেখক পরিচিতি

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে শরৎচন্দ্র লেখাপড়ায় বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। অল্প বয়স থেকেই তাঁকে অর্থোপার্জনে মন দিতে হয়। তিনি জীবনের প্রথম দিকে একটি জমিদারী এস্টেটে সামান্য চাকুরিতে যোগদান করেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর মন বসেনি। অল্পকাল পরেই তিনি চাকুরি ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু, এ বৈরাগ্যময় জীবনেও তাঁর মন টিকলো না। অবশেষে, তিনি সমুদ্র পথে বার্মায় রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রেঙ্গুনে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে তিনি চাকুরিতে নিয়োজিত হন। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র দীর্ঘ বার-তের বৎসর অবস্থান করেন।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচিত। বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অংকিত করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যে কারণে, আজও শরৎচন্দ্র সকল বাঙালি পাঠকের কাছে আদরনীয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি কল্পনার জগৎ থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে মাটির জীবনের কাছে নামিয়ে এনেছেন। সাধারণ বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্নার উপাখ্যান প্রীতি ও করুণার রসে সিক্ত করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি, পথ নির্দেশ, বিন্দুর ছেলে, বড় দিদি, মেজদিদি, মামলার ফল, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ইত্যাদি গল্প বাঙালি পরিবারের বৈচিত্র্যময় জীবনের গতিপথের অপরূপ আলেখ্য। উপন্যাসের মধ্যে দেবদাস, পল্লীসমাজ, দত্তা, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দেনা-পাওনা, ইত্যাদি বহুল সমাদৃত। তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৩৭ সালের ১৬ জানুয়ারি (১৩৪৪ বাংলা সনের ২ মাঘ) তারিখে কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভূমিকা

সেবা, স্নেহ, ভালোবাসা, ব্যক্তিত্বে ও ত্যাগে এক উজ্জ্বল চরিত্র শরৎচন্দ্রের বিলাসী। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারেই লেখক গল্পের নামকরণ করেছেন। সমগ্র গল্পটি যেন বিলাসীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শরৎ তাঁর অধিকাংশ কাহিনীর মধ্যেই নারীর চিরন্তন মহিমা বিধৃত করেছেন। স্বজনহীন, নিভৃতচারী মৃত্যুঞ্জয় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। অসহায়, অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবার জন্য তাঁর একমাত্র খুড়া অথবা সমাজের কেউই এগিয়ে আসেনি। নিম্ন বর্ণের সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে একান্ত সেবা শুশ্রুষা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তোলে।

এ গল্পের মধ্যে লেখক হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার নিষ্ঠুর আচরণের দিকটি তুলে ধরেছেন।

দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের সুন্দরতম প্রকাশ যে ভালোবাসার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার আবেদন এ গল্পের মূল বিষয়।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লী গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
ক্রোশ – এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **মা-স্বরস্বতী** – বিদ্যার দেবী (হিন্দু শাস্ত্রে স্বরস্বতীকে বিদ্যার দেবী হিসাবে আরাধনা করা হয়। **কৃতবিদ্য** – সুশিক্ষিত, বিদ্বান, **রম্ভা** – কলা।	পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই-দশ বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদের ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এ কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতের চারক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়- চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি- বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-স্বরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।
টীকা তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়া ও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। – সমাজের স্বচ্ছল অভিভাবকগণ লেখা-পড়ার প্রতি সব সময়ই সজাগ থাকেন। বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করা কষ্টকর। তাছাড়া, দীর্ঘ পথ যাত্রায়	তারপরে এ কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান-তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর দুর্দশা হয় না। ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ঐ চারক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই-দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এ পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এ সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা-কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে-এ সকল দরকারী তথ্য

ক্লান্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠাভ্যাস করা সম্ভব হয় না। ফলে, অনিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের কারণে পড়ালেখার প্রকৃত মান অর্জনে শিক্ষার্থীগণ সাফল্য লাভ করে না। সন্তানের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী ও ভবিষ্যত চিন্তায় উদগ্রিব অভিভাবকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতেন। শহরের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অভিভাবক ও সন্তান-সন্ততিগণ পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন না। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো সৃষ্টির অভাবে গ্রাম বাংলার এ করুণ চিত্র যেন চিরকালের।	অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না। কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ। এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে- তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেয়াই কর্তব্য।

সার-সংক্ষেপ

পল্লীগ্রামের বিদ্যার্থীদের শিক্ষার সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। শতকরা প্রায় আশি জন শিক্ষার্থীকে জীবনে এ দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য একটি গ্রাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে, বিদ্যাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় শ্রমক্লান্ত অবসন্ন শরীর প্রদান করতে পারে না। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীর নিকট বিদ্যালয়ে যাত্রাপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের আকর্ষণের উপকরণ এত বেশি প্রলুব্ধ করে যে, শিক্ষা লাভের জন্য আবশ্যক তথ্যগুলি বড় বেশি অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. লেখকের বিদ্যালয় ত্যাগ করা কর্তব্য বলে মনে হয়েছে কেন?
২. "দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলেনা" কোন প্রসঙ্গে লেখক এ কথা বলেছেন?
৩. "দুর্ভাগা বালকদের" কথাটি কাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।
৪. "ধূলার সাগর সাঁতার" শব্দ সহযোগে একটি সুন্দর বাক্য লিখুন।
৫. "তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।" বাক্যটি চলতি ভাষায় রূপান্তর করুন।

লেখক পল্লীগ্রামের লেখাপড়ার কী কী অসুবিধার কথা বলেছেন?

উত্তর : গ্রামে প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম। ফলে, শিক্ষার্থীদের দূরবর্তী স্থানের বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। এ দূরত্ব সাধারণত ৪/৫ মাইলের কম হয় না। প্রতিনিয়ত হাঁটা পথে চলাচলের জন্য শ্রম-ক্লান্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ার প্রতি যথেষ্ট মনযোগ প্রদান করতে পারে না। পল্লী রাস্তাঘাট বর্ষা-গ্রীষ্ম সব সময়ই দুর্গম। সেকালের পল্লী গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কোনো না কোনো সময় এ রোগের শিকারে পরিণত হত। দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথের দুপাশে ধরে থাকা নানা প্রকার ফলের প্রতি এ বয়সের কিশোরদের আকর্ষণ থাকে বেশি। পড়ার বিষয়বস্তু মনে রাখার চেয়ে কবে কোন ফলটি খাওয়ার উপযোগী হবে সেই বিষয়াদির আকর্ষণ কিশোর মনের নিকট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বালক বয়সে লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগের এ বোঝা পরিণত বয়সেও বহন করে চলতে হয়।

পল্লী গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা আলোচ্য অংশে কিভাবে প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর : বর্ষার দিনে অবিরাম বৃষ্টির কারণে পথ-ঘাট কর্দমাক্ত হয়ে যায়। পিচ্ছিল, দুর্গম রাস্তাঘাট পায়ে চলার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। গ্রীষ্মের দিনে অসহনীয় গরম ও প্রখর সূর্যতাপ। তাপদগ্ধ পথে হাঁটাচলা করা ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা।

লেখক এ বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রূপটিও তুলে ধরেছেন। ঝোপঝাড়ের মধ্যে রসাল আনারস, আম, কাঁঠাল, বইচি, কলা ও খেজুর ফলের অপরিমিত সমাহারের বর্ণনা এ অংশে বর্ণিত হয়েছে।

সাধুরীতি থেকে চল্‌তি গদ্যে রূপান্তর করুন : 'চার ক্রোশ পথ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই ছেলেপুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই।"

উত্তর॥ চারক্রোশ পথ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই ছেলেপুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালান, তার আর সংখ্যা নেই।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাথমিক পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সেবাপরায়ণা বিলাসীর চরিত্রের বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের মানুষের সাধারণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
থার্ড ক্লাস – ৮ম শ্রেণী। যম – মৃত্যুর অধিদেবতা। **সদ্ব্যয়** – সৎভাবে ব্যয়। **তক্তপোষ** – খাট। **শিয়রে** – মাথার নিকটে। **অচৈতন্য** – অজ্ঞান। **প্রদীপ** – বাতি, আলো।	আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এই খবর আমরা কেহই জানিতাম না-সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়-আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা- সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল

বাটীতে – বাড়িতে।

সহমরণে – একত্রে বা এক সংগে মরণ।

প্রকৃতিস্থ – স্বাভাবিক অবস্থা।

জ্যান্ত – জীবন্ত।

অভিপ্রায় – ইচ্ছা।

প্রত্নতাত্ত্বিক – প্রাচীন বা পুরাতন বিদ্যায় পারদর্শী

জনশ্রুতি – লোকে বলে এমন।

দণ্ড – শাস্তি।

যমরাজ – মৃত্যু দেবতা।

বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভাল করিয়াই চলিত। যেই দিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই-বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এ যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এই কথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না-গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এই যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি-মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বাচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ঐ মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এ যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ

করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এ বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রুষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এ অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমার রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এ বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম না। এ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় ত যে-কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এ বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এ প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি-বাটীতে ছেলেপুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এ রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তা পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেয়া চাই-অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে ত হইয়াছে, আর

	বাইরে গিয়া কি হইবে? রাতটা কাটুক না” বলিলাম “অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।” তিনি বলিলেন, “হোক কাজ, তুমি বসো।” বলিলাম, “বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে”, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওরে বাপরে। আমি একলা থাকতে পারব না।” কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এ মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে। কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এ কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এ ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহুস্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না। কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোন নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেয়ার আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নহে, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না। প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এ যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কিনা, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

সার-সংক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয় লেখকের একই গ্রামের ছেলে। নিরীহ, পরিজনহীন মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল পোড়ো বাড়িতে একাকী বসবাস করত। বাড়ি সংলগ্ন প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান থেকে প্রতি বৎসর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের ভালোভাবেই চলত। এ বাগানটির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র দূর সম্পর্কের খুড়া একজন ভাগীদার বলে সকলের নিকট বলে বেড়াত। কিন্তু এ দাবীর প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ না থাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাস অর্থাৎ ৮ম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু এ ক্লাসের ছাত্র হিসাবে কত দিন ধরে অধ্যয়ন করে আসছে সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় প্রতিদিন জীর্ণ মলিন পুস্তক বগলে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। কারো সংগে সে নিজে থেকে আলাপ না করলেও অনেকেই উপযাচক হয়ে আলাপ করতে

উৎসাহী ছিল। কারণ, অন্যকে খাওয়ানো এবং গোপনে অর্থ সাহায্য করতে মৃত্যুঞ্জয়ের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু এহেন পরোপকারী, নিরহংকার মানুষটির প্রতি গ্রামবাসী যে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল তা নয়।

দীর্ঘদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা না পেয়ে লেখক খোঁজ খবর নিতে গিয়ে লোকমুখে তার অসুস্থতার সংবাদ জানতে পারেন। একদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখক তাকে দেখতে যান। মরণব্যাধির সংগে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বেঁচে ওঠা, জীর্ণ কংকালসার শরীর দেখে লেখক বুঝতে পারেন, অপরিমেয় সেবা ও যত্নে এ যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয় রক্ষা পেয়েছে। দিবারাত্র অনলস সেবা ও অবিরাম রাত্রি জাগরণের ছাপ নিয়ে রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো নারীই যে দরিদ্র সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী একথা লেখক বুঝতে পারেন। সেবা, শুশ্রুষা, মমতা ও হৃদয়ের অপরিমিত প্রাণশক্তি নিয়ে পাশে না দাঁড়ালে এমন রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য। অসম গোত্রের এক নারী সমাজের সকল ভ্রূকূটি উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার এমন উদাহরণ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অথচ মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্য সাহায্য প্রাপ্ত কোনো গ্রামবাসী তার রোগশয্যা পার্শ্বে এ সময়ে উঁকি মেরে দেখে নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি পল্লীগ্রামের মানুষের বিপদে আপদে ঔদাসীন্যের পরিচয় লেখক আলোচ্য অংশে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. মৃত্যুঞ্জয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয় তার সম্পর্কে কী বলে বেড়াত?
৩. লেখক অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে কী পরিবেশ দেখেছিলেন?
৪. অন্ধকার রাতে রোগী দেখে ফিরে যাওয়ার পথে লেখকের কী মনে হয়েছিল?
৫. মৃত্যুঞ্জয়ের আয়ের উৎস কী ছিল?
৬. সেবাপরায়ণা বিলাসী চরিত্রের বর্ণনা লিখুন।
৭. নরনারী কোন শক্তির জোরে সমাজের সকল ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে?

উত্তর

১. মৃত্যুঞ্জয় স্বভাবে নিরীহ, নির্বিরোধ ও পরোপকারী। নিজ বাগান সংলগ্ন জীর্ণ গৃহে দিন যাপনে সে অভ্যস্ত। দীর্ঘ দিন ৮ম শ্রেণীতে সে অধ্যয়ন করে আসছে। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় কারো সংগে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। সে সহপাঠীদের খাওয়ার আব্দার সহজেই মেটায় এবং সাহায্যপ্রার্থী কোনো প্রতিবেশীকে কখনও বিমুখ করে না।

৩. জীর্ণ গৃহের পরিষ্কার ঝকঝকে বিছানায় কংকালসার দেহে মৃত্যুঞ্জয় শয্যাশায়ী। পাশে দাঁড়িয়ে বিলাসী পাখা হাতে রোগীর গায়ে বাতাস প্রদানে ব্যস্ত। সেবারত বিলাসীর বয়স অনুমান করা শক্ত। রাত্রি জাগরণ ও অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন বিলাসীকে দেখে লেখকের বাসী ফুলের মত নিস্প্রভ মনে হয়েছে।

৭. সমাজ, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক সকল প্রতিরোধকে হৃদয়ের অনাবিল ভালোবাসা দিয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

খ) ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

ব্যাখ্যার উত্তর

আলোচ্য অংশটি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্প থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বলছেন যে, নরনারীর পরস্পরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা নানাবিধ কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভিত্তির স্থানটি দুর্বল হলে বিপদের সময় তাকে মোকাবেলা করার মতো শক্তির অভাব হয়। মানুষের হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসার গভীর শক্তি যে কোনো সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সাহায্য করে।

চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন

ক) মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া পরা চলিত এবং ভাল করিয়াই চলিত।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার চিত্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবলের উপরে দুর্বলের অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সুবিধাভোগীর শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অসহায় ক্লিষ্ট মানুষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
অকালকুষ্মাণ্ড – অপদার্থ। **কালি** – আধুনিক কাল অর্থে। **বদনদগ্ধ** – লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারা অর্থে। **সম্ভাষণ** – সম্বোধন। **ম্লেচ্ছদেশে** – অনার্য, অস্পৃশ্যদের দেশ। **তিলার্ধ** – বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র। **বারওয়ারী** – সমবেতভাবে যে অনুষ্ঠান বা উৎসব করা হয়। **দক্ষিণা** – ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর পর প্রদত্ত অর্থ। **ফলাহার** – ফল-ভোজন, নিরামিষ দ্রব্য দ্বারা ভোজন বা	এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না-অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ে মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে-ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা-অ্যাঁ এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল। খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

আহার।	তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এজন্য। মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। খুড়ো ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোন কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো? খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না। কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষু লজ্জা হইবে। এখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন। মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে-রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।” মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক। আপনারা মনে করিবেন না; পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এ মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা- এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী। কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লীগায়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া।

এ ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধু মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এ ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারী পূজা বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণে নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এ দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেরই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

সার-সংক্ষেপে

মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ের সংবাদ এবং বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ার অপরাধে খুড়া সকল গ্রামবাসীকে জড়ো করে এরূপ সামাজিক অনাচার ও গর্হিত কাজের জন্য বিচার জানায়। মিত্র বংশের এত বড় সুনাম যে ব্যক্তি ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। গ্রামের অনেকে সোৎসাহে বিলাসীকে নির্দয় প্রহারে জর্জরিত করে তোলে। মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, সে অন্নপাপী। নিরীহ, সেবা ক্লান্ত, দরিদ্র অসহায় বিলাসী রোগাক্রান্ত স্বজনহীন মৃত্যুঞ্জয়কে অক্লান্ত পরিশ্রমে সুস্থ করে তোলার মধ্যে যে অপরাধ থাকতে পারে সে কথাটি তার কখনো মনে হয়নি। দুর্বল নারীর ওপর প্রবলের এ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করার ও কোন স্থান মৃত্যুঞ্জয় পায়নি। সমাজচ্যুত মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আপন অধিকার সমর্পণ করেই তো জীবন-যাপন করছিল। নির্দয় নিষ্ঠুর সমাজপতি ও পল্লীবাসীর নিকট মানবিক মূল্যবোধের সৌজন্য, স্বীকৃতি ও সহানুভূতির কোনো মূল্যই এ দুটি নর-নারীর কপালে জোটে নাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। -এ কথাটি কে কোন প্রসঙ্গে বলেছে- সে সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখুন।
২. বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহের সংবাদে গ্রামবাসীর আচরণের বিবরণ দিন।
৩. "ভাত খাওয়া যে অন্নপাপ"- প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে লিখুন।
৪. হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখকের মতামতগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর

প্রশ্ন : "ভাত খাওয়া যে অন্নপাপ"- প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে লিখুন।

উত্তর : পরম যত্ন, সেবা ও কৃচ্ছতার দ্বারা বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলে। শুধু কৃতজ্ঞতার বশেই নয় হৃদয়ের টানেও মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিবাহ করে। সেবা, কৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ধর্মের টানে মৃত্যুঞ্জয় জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে একান্ত মানবিক আচরণের পরিচয় প্রদান করেছে। কিন্তু অনুদার, জাত্যাভিমান ভারাক্রান্ত হিন্দু সমাজ এ অসম বিবাহ মেনে নিতে চায় না। কারণ, নীচ জাতের হাতে ভাত খাওয়া অন্নপাপ। মৃত্যুঞ্জয় অন্নপাপী ক্ষমার অযোগ্য মহাপাতক। ক্ষমাহীন সমাজের কাছে সে ঘোর পাপী। সমাজ তাকে ধর্মচ্যুত করে। হিন্দু শাস্ত্রে অন্নপাপীর জন্য কঠিন বিধান নির্দিষ্ট করা আছে। ন্যাড়া রূপী শরৎচন্দ্র সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এ ব্যঙ্গোক্তি করেছেন।

প্রশ্ন : হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখকের মতামতগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : আলোচ্য পাঠে শরৎচন্দ্র নির্দয়, লোভী, নিষ্ঠুর, সমাজপতিদের আচরণের নিন্দা করেছেন। অকৃতজ্ঞ সমাজ মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে গোপনে সাহায্য গ্রহণ করেছে অথচ তার বিপদের দিনে কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। প্রতিবেশী নিম্নবর্ণের সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী সেবা শুশ্রুষা দিয়ে যে মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুললো- তার মানবিক মহত্ত্বের গুণটি সমাজ উপেক্ষা করে জাতপাতের অজুহাতে নির্দয়ভাবে মানুষের আহাজারি উচ্চবর্ণের সবল সমাজপতি কখনও মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করে না। স্বদেশের, সমাজের ও ধর্মের নামে পল্লীগ্রামের অমানবিক, নিষ্ঠুর আচরণের কথা অত্যন্ত তির্যক ও বাস্তব সম্মত ভাবে লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইয়াছে।
খ) যাহারই গায়ে জোরে নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।
গ) বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।
ঘ) এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালি-গালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

উত্তর

ক. আলোচ্য অংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিলাসী" শীর্ষক গল্প থেকে নেয়া হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া মিত্র বংশের অধঃপতনের অনাচারে লিপ্ত ভাইপোর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করে।

উচ্চ বর্ণের মিত্র বংশ না হয় ছোটজাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে - তাও সহ্য করা যায়; কিন্তু অমন ছোটজাতের হাতে ভাত খাওয়া তো মহাপাপ। বিলাসীর প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ের মানবিক আবেদনটুকু জাতপাতের কাছে অনেক তুচ্ছ ব্যাপার। সমাজ সংসারের অধিকর্তাদের নিকট মৃত্যুঞ্জয় অন্নপাপী মহাপাতক। ছোটজাতের হাতে অন্নগ্রহণ শাস্ত্রমতে মহাপাপ। হিন্দু সংস্কারে অন্যজাতের ছোঁয়া ভাত খাওয়া নিষেধ। প্রচলিত সংস্কার বিরোধী কাজের শাস্তি স্বরূপ সমাজের শোকে অসহায় দুর্বল নারী বিলাসীকে শারীরিক ভাবেই নির্যাতন করে ক্ষান্ত হয়নি- মৃত্যুঞ্জয়কে পর্যন্ত সমাজচ্যুত করে ছেড়েছে।

খ. উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক আলোচ্য অংশে গ্রাম শুদ্ধ লোকে জাতপাতের কথা তুলে অসহায়, দরিদ্র দুর্বল নারী বিলাসীকে প্রহারের কারণে এ মন্তব্য করেছেন।

গ্রামে যার লোকবল নেই, যে দরিদ্র, অসহায় এবং সমাজের নিম্নস্তরে যার অবস্থান, সমাজপতিরা তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেও অত্যাচার করে থাকে। পল্লী সমাজের সবল যে, শাস্ত্রীয় বিধান তার পক্ষেই কার্যকর হয়। সমাজপতিরা ধর্মের নামে, সংস্কারের নামে অসহায় মানুষের হৃদয়ের বিধানকে কোন প্রকার মূল্য প্রদান করে না। দুর্বলকে পরাস্ত করা সহজ, নিপীড়ন করাও তেমনি কঠিন নয়। প্রতিবাদ করা ও প্রতিকার চাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। ফলে, অসহায় মানুষ সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক অত্যাচারের খড়্গ তার ওপরে অনায়াসেই নেমে আসে।

ভাষারীতি পরিবর্তন করুন

তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ পরিণতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভালোবাসার শক্তি যে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত ঘটনার আলোকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজে প্রচলিত অমানবিক আচরণের চিত্র অংকন করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
এন্ট্রান্স – এস.এস.সি পাশের সমতুল্য। **মনসা** – সাপের দেবী। **সাগরেদ** – শিষ্য। **পিন্ডি** – পরলোকগত পিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত অন্ন। **প্রায়শ্চিত্ত** – চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধন।	বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদম দুপুর বেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা-কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যে জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ -পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিত পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্যব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রাস পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে

কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে-তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিজের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে এ যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বইজন নরনারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এ সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।"

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা ওখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র--সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে-

-ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন-

মনসা দেবী আমার মা-

ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়-

ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে-

-দুধরাজ, মণিরাজ।

কার আজ্ঞা-বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে, কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন-

নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন-তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে এদিন এ মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এ যে, সাপধরাও কঠিন নয় এবং ধরাসাপ দুই চারিদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এ কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করে মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে-এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাইতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বার বার লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত-আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে ত একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এ পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে-সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় এক-জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিস গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়ে ঝর ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এ একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই "বিষহরির আজ্ঞা" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও বা একসঙ্গে কখনও বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম তাহার শ্বশুরের দেয়া মন্ত্রৌষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটি আর বাড়াইল না। কেবল এটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখনই যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে

পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোলআনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে যায় না-না হয় একটু নিন্দাই হত। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক document তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Contract পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী-অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নহে, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এ বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এ হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এ বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রির চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

সার-সংক্ষেপ

দীর্ঘ দিন যাবৎ ন্যাড়ারূপী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীদের সংগে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল না। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাস জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজগ্রামে চলে আসেন। এ সময়ে তিনি নতুন করে আবার বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের সংগে জড়িয়ে পড়েন।

মৃত্যুঞ্জয় লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়ে বিলাসীর সংগে দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। নিজ জাত ধর্ম ত্যাগ করে বিলাসীর পিতৃ পেশা গ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে হিসাবে এখন পরিচিত। সাপ ধরাই এখন তার একমাত্র পেশা। বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের এ নতুন পেশা গ্রহণের জন্য সব সময়ই উৎকণ্ঠিত থাকে। নানাভাবে সে স্বামীকে এ পেশা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নারাজ। বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের এ কাজে সব সময় সাথে সাথে থাকে। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে।

ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহা উৎসাহে সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত। মৃত্যুঞ্জয়ের পেশা সংক্রান্ত সকল কাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী সে। বিলাসী ন্যাড়া ও মৃত্যুঞ্জয়কে এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বহুভাবে অনুরোধ জানিয়ে ও ফেরাতে ব্যর্থ হয়। এমন একটি দুঃসাহসিক ও উত্তেজনাময় কাজের জন্য ন্যাড়া দারুন খুশী হয়। অবশেষে, একদিন সাপ ধরতে যেয়েই মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। ওঝা, বৈদ্যের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।

বিলাসী জীবনের সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার বিনিময়ে যে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল- তার পক্ষে মৃত্যুঞ্জয় বিহীন জীবন যাপন করা আর সম্ভব ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি একনিষ্ঠতা, প্রেমের প্রতি অবিচ্ছেদ্য অনাবিল আনুগত্য মহৎপ্রাণ বিলাসীর -- সহ্য করা সম্ভব ছিলনা। ছোটজাত, নিম্নবর্ণের বিলাসীর মহৎপ্রেমের এ একনিষ্ঠতা প্রকাশ পাঠক মনকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. "টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।" - কে এবং কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করা হয়েছে?

২. বিলাসীর আত্মহত্যা লেখক কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন?

৩. "সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে" আলোচ্য মন্তব্যটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

৪. "যে পল্লী গ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি এটা শুধু তাহাদেরই?" বক্তব্যটির তাৎপর্য প্রসঙ্গপূর্বক আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর

২. বিলাসী হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ সাপুড়ের কন্যা। মৃত্যুঞ্জয় ভালোবেসে বিলাসীকে বিয়ে করে। মৃত্যুঞ্জয় কায়স্থ ঘরের সন্তান। হিন্দুধর্ম ও বর্ণ প্রথায় বিশ্বাসী সমাজ তাদের এ সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ কাজ মেনে নিতে পারেনি। মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট প্রেমের মূল্য সামাজিক প্রথা ও রীতির চেয়ে অনেক বেশি; তাই সে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে সব কিছু ত্যাগ করে হৃদয়ের মূল্যকেই অনেক বেশি বড় করে দেখেছে। এমনকি, মৃত্যুঞ্জয় সমাজ, ধর্ম ত্যাগ করে পেশা হিসাবে সাপ ধরাকে পর্যন্ত গ্রহণ করেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের এ পেশাই একদিন জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। সাপ ধরতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সাপের কামড়ে মারা যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যুজনিত আঘাত সহ্য করতে না পেরে বিলাসী আত্মহত্যা করে। মৃত্যুঞ্জয়বিহীন বিচ্ছেদময় জীবন বিলাসীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন, একনিষ্ঠ ভালোবাসার পাত্র ছাড়া বিলাসীর জীবন শূন্য হয়ে পড়ে। এ শূন্য জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিলাসী অবশেষে আত্মহত্যা করে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে বিলাসীর আত্মহত্যা একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমায় উজ্জ্বল।

৩. সমাজে কীর্তিমান পুরুষদের যে মহিমা নিরন্তর উচ্চারিত হয় তার সবটুকু কৃতিত্ব কি পুরুষেরই? লেখকের নিকট প্রশ্ন এ যে, একজন পুরুষের উচ্চাসনে বসার জন্য সমাজ যে, গুণকীর্তন করে তার পশ্চাতে যে, একজন নারীর অপরিসীম নিষ্ঠা, শ্রম ও প্রেরণার অবদান আছে তা কি আমরা মূল্যায়ন করি? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এ অবমূল্যায়ন লেখকের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যে নারীর অনেক মহত্ত্ব, ত্যাগ ও মহিমাময় জীবনের আলেখ্য রচনা করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়ে ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়া চাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।"

২. অবশ্য দখল তিনি একদিন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে জেলা আদালতে নালিশ করিয়া নয়, উপরের আদালতের হুকুম।

৩. আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই।

৪. স্বদেশের মঙ্গলের জন্য অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. বিলাসীর চরিত্র অংকন করুন।

২. এ গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দু সমাজের পরিচয় প্রদান করুন।

৩. মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৪. বিলাসী গল্পের সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন।

৫. "বিলাসী শুধু সেকালের নারী সমাজের নয়" মনে হয় যেন একালের নারী সমাজেরও একজন প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র, আলোচনা করুন।

উত্তর

১. শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য কর্মে নারীর সত্যনিষ্ঠ মর্যাদা ও মানবিক মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। বিলাসী হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কিন্তু, তাঁর হৃদয়ে যে সেবাপরায়ণা, পরোপকারী, প্রেমময়ী ও সত্যনিষ্ঠ নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে তুলে ধরেছেন।

বিলাসী একনিষ্ঠ প্রেমময়ী নারী। বিলাসী প্রেমের নিভৃত প্রকাশ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করার যে প্রচেষ্টা তার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। মৃত্যুপথ যাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে রাতের পর রাত দিনের পর দিন একাকিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন পোড়ো বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পেরেছে- তা শুধু সম্ভব হয়েছে ভালোবাসার জন্যেই। গ্রামবাসী সম্মিলিত ভাবে তাকে যখন পীড়ন করেছে, প্রহার করেছে, , লাঞ্ছিত করেছে তখন এ ভালোবাসার জোরেই সে সবাইকে উচ্চস্বরে মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে তার বিয়ের কথা বলতে পেরেছে। বিলাসীর হৃদয় ছিল প্রেমের ব্যাকুল প্রকাশে উদ্বেগাকুল। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিটি মুহূর্তের ভালো মন্দ নিয়ে সব সময় উৎকণ্ঠিত। মৃত্যুঞ্জয়কে সে

সাপ ধরার পেশা অবলম্বন করতে নিরুৎসাহিত করত। বিলাসী প্রেমের আনন্দময় গভীর সুখকে এ ঝুঁকি পূর্ণ পেশা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংশয়াচ্ছন্ন করতে চায়নি। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে বিলাসী তার প্রেমের পরম নিষ্ঠার পরিচয় আমাদের কাছে রেখে গেছে।

আবার মৃত্যুঞ্জয়ের রোগ শয্যাপার্শ্বে সেবাময়ী এত মহিমান্বিতা নারীর পরিচয় ফুটে উঠেছে বিলাসীর চরিত্রে। মমতাময়ী নারীর সেবাপরায়ণতা সব লোক লজ্জা, ভয়, শংকার ঊর্ধ্বে আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেবা ধর্মে উজ্জীবিত এক কল্যাণময়ী নারীর প্রতীক যেন বিলাসী। সেবার কল্যাণময় আদর্শে উজ্জীবিত নারীর এ চিরকালের রূপটি মৃত্যুঞ্জয়কে আকর্ষণ করেছিল।

বিলাসী অস্পৃশ্য ছোটজাতের মেয়ে। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তায় সে সুস্থির। মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চবংশীয় খুড়া যখন, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি অধিকার লাভে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, দুর্নাম রটায়, সেক্ষেত্রে বিলাসী লোক ঠকানো শিকড় বিক্রির জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে নিষেধ করে। তার এ সততায় আমরা মুগ্ধ হই।

বিলাসী পতিগত প্রাণা। মৃতুঞ্জয়কে স্বামী হিসাবে পেয়ে সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেছে। সমাজের নির্মম শাসনকে উপেক্ষা করে সে পিতৃদত্ত সকল ধন মৃত্যুঞ্জয়কে দান করেছে। স্বামী তার নিকট অনেক, সাধনা ও গৌরবের ধন। সাপ ধরার সময় সর্বক্ষণ সে মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে থেকেছে। তার মঙ্গলের জন্য এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বারবার অনুরোধ করেছে। অবশেষে এ পেশাই তার জীবনে দুর্ভোগের পরিণতি ডেকে এনেছে। মৃত স্বামীর অনুপস্থিতির দুঃসহ জ্বালা বিলাসী সহ্য করতে পারেনি। আত্মহত্যা করে সে জ্বালার সমাপ্তি ঘটিয়েছে। নিষ্ঠুর সমাজ বিলাসীকে উপহাস করলেও প্রেমময়ী, সাধ্বী, সেবাপরায়ণা, ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসাবে অম্লান হয়ে থাকবে।

সৃজনশীল কাজ

১. গল্পের যে যে অংশে শরৎচন্দ্র সমাজের প্রতি তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করেছেন সেই অংশগুলি চিহ্নিত করে নিজের মত করে লিখুন।

২. আমাদের বর্তমান সমাজে নারীর অধিকারহীনতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. আপনার এলাকার একজন দুঃস্থ অধিকারহীন, নিগৃহীত নারীর জীবনের কাহিনী নিজের কথায় লিখুন।

৪. বিলাসী গল্পের মধ্যে কোনো বাক্য বা অংশ দুর্বোধ্য মনে হলে তা চিহ্নিত করুন। উক্ত অংশগুলো আপনার টিউটোরিয়াল ক্লাসের শিক্ষকের নিকট থেকে জেনে নিন। অথবা আপনার সহযোগী শিক্ষার্থীর সংগে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করুন।

আরোও যা পড়তে পারেন

শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গল্প ও উপন্যাসগুলো পড়ুন।

যৌবনের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে কখনই তিনি আকৃষ্ট হননি। কৈশোরে কিছুকাল গ্রাম্য 'লেটো' গানের দলে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কাউকে কিছু না বলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে করাচীতে চলে যান।

যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এক সময় তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়। নজরুলের কবিখ্যাতি তখন থেকেই বিস্তৃত হতে থাকে।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত বিকাশ মূলত কবি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি যখন মধ্যগগনে তখনই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে আপন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। সেই সঙ্গে রাজনীতিকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক অত্যাচারী ইংরেজদের শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অবিরাম চালনা করেছেন। মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও গদ্য সাহিত্য রচনায়ও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

নজরুলের উপন্যাসগুলোর পটভূমি গড়ে উঠেছে বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে। দেশপ্রেম এবং নির্যাতিত মানুষের কথা উপন্যাসগুলোতে বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

নজরুলের ছোটগল্প বেশিরভাগই প্রেমকেন্দ্রিক। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রই ভাষায় কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ।

নজরুলের প্রধান রচনাসমূহ :

কাব্য : অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী(১৯২৪), সাম্যবাদী(১৯২৫), সর্বহারা(১৯২৬), ফণিমনসা(১৯২৯), ছায়ানট প্রভৃতি।

উপন্যাস : বাঁধনহারা(১৯২৭), কুহেলিকা(১৯৩১), মৃত্যুক্ষুধা(১৯৩০)।

গল্প : ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন(১৯৩২)

প্রবন্ধ : যুগবাণী(১৯২২), রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, কাব্যে আমপারা।

সম্পাদনা : দৈনিক নবযুগ, ধুমকেতু, 'লাঙল' পত্রিকা।

নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন।

১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেলেও গদ্য রচনাতেও তিনি যোগ্যতার ছাপ রেখেছেন।

"যৌবনের গান' প্রবন্ধ হিসাবে সঙ্কলিত হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভাষণ। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উদ্যোগে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সমাজের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম সভাপতি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন। এ অভিভাষণটি পরে দ্বিমাসিক সাম্যবাদী পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে 'যৌবনের গান' নামে প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের আবেগপূর্ণ ও উদ্দীপনার এ ভাষণে মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করি।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারণ, উদ্দীপনাময় ও আবেগপ্রবণ গদ্যরচনার পরিচিতি লাভ করবেন।
২. জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
৩. বক্তৃতার ভাষা সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কাজী নজরুল ইসলাম কেন গান করেন তা লিখতে পারবেন।
- নজরুল বক্তা এবং কবিদের বাণীর পার্থক্য কিভাবে করেছেন তা বলতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মুলপাঠ
দ্বিধা – সংশয়, সংকোচ। **কর্মী** – যারা কাজ করে। **ধ্যানী** – যারা ধ্যান করেন। **সাধন** – শেষ করা। **মহৎ** – মহান। **রুধির ধারা** – রক্তের ধারা। **মমতারস** – মমতা হতে যে রসের সৃষ্টি। **অলক্ষ্যে** – দৃষ্টির অগোচরে। **বনের পাখী** – বনে যে পাখি থাকে। **বায়স** – কাক। **ফিঙে** – এক ধরণের পাখি।	আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন—ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, ধর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ, কিন্তু সেই মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নহেন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে। আমি কবি—বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাহি, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আন্ গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান! সে গান করে আপন মনের আনন্দে-যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা, মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই। কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে,

গানের পাখী – কোকিল।

চঞ্চু – ঠোঁট।

অলসতন্দ্রা – আলস্য থেকে যে ঘুমের আমেজ সৃষ্টি হয়।

দৈব – আকস্মিক।

পরিক্রমণ – চারিদিকে ঘোরা।

তারুণ্য – তরুণের বিশেষণ।

ভরাভাদর – ভাদ্রমাসের পরিপুর্ণ নদী।

জোয়ার – চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদ-নদীর জল স্ফীতি।

অগোচরে – দৃষ্টির বাইরে, অজ্ঞাতে।

না-ওয়াকিফ – ওয়াকিবহাল নয়, জানেনা।

বক্তা – যিনি বক্তৃতা করেন।

কমবক্ত – হতভাগ্য। ফারসি শব্দ।

বক্তিয়ার খিলজী – ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জী। বিশিষ্ট মুসলিম সেনানায়ক। কথিত আছে তিনি মাত্র ১৭জন অশ্বারোহীর সাহায্যে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবিজয় করেন।

দিগ্বিজয়ী – চারিদিক জয় করেছে যে।

বাক্যের সৈন্য-সামন্ত – এখানে বাক্যের সৈন্য সামন্ত বলতে শব্দ, ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

লক্ষ্মণসেন – ইনি বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা। বখতিয়ার খিলজীর অতর্কিত আক্রমণের সময় তিনি গোপনে পালিয়ে যান।

অবিরল – অনবরত, বিরামহীন।

ক্ষীণ – সরু, সংকীর্ণ।

পদ্মা – নদী।

খরস্রোতা – প্রবল স্রোত যার।

তাহা আমার অগোচরে; যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায়, সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ।

আমি বক্তাও নহি। আমি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী, বক্তিয়ার খিলজী, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমি বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝর্ণা-ধারার মতো। ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সংগীত-গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী, আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

সার-সংক্ষেপ

লেখক মনে করেন তিনি ধ্যানীদের দলে। ধ্যানীরাই মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। বনের পাখি যেমন নিজের আনন্দের গান করে, কবিও তেমনি নিজের আনন্দের জন্য যৌবনের গান গেয়ে চলেছেন।

কবি নিজেকে ভাল বক্তা মনে করেন না। তিনি কবি, তাই তিনি ছন্দের সুরে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারেন। বক্তাদের মতো শুধু কথার মায়াজালে মানুষকে তিনি আকৃষ্ট করতে পারেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. 'কবির স্বভাব গান করা' এ বাক্যটির অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

২. ''পদ্মা-ভাগরথীর'মত খরস্রোতা যাহাদের বাণী, আমি তাহাদের বহু পশ্চাতে।'' এ-কথা কেন বলা হয়েছে।

উত্তর ॥ এ অংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের অন্তর্গত। কবি বাগ্মীদের সঙ্গে নিজের পার্থক্যকে অত্যন্ত সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন।

মুসলমান তরুণসমাজের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে নজরুল এখানে রসিকতা করে বলেছেন তিনি ভাল বক্তা নন, তিনি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যারা পারদর্শী তাঁরা এক নাগাড়ে কথা বলে মানুষকে অভিভূত করে রাখেন। কবির মতে বাগ্মীদের মুখে কথা আসে বৃষ্টির মত অবিরল ধারায়। বক্তৃতা শুনে তিনি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর হঠাৎ আক্রমণে হতবুদ্ধি লক্ষ্মণ সেনের চেয়ে বেশি অভিভূত হয়ে যান। কবিদের বাণী ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত। ছন্দের দু-কূল আকড়ে ধরে কবিদের কথা গুঞ্জন করতে করতে প্রবাহিত হয়। পদ্মা-ভাগীরথীর মতো তীব্র বেগে শব্দতুলে কবিদের কথা এগিয়ে চলে না। নজরুল এখানে বিনয়ের সঙ্গে নিজেকে কথা বলার ক্ষেত্রে বাগ্মীদের চেয়ে কম পারদর্শী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তিনি যে কবি সে পরিচয় এ উপমায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সাধুরীতি - আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন- ধ্যানী।

চলিতরীতি- আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি আজ তাঁদেরই দলে, যাঁরা কর্মী নন–ধ্যানী।

সাধুরীতি– কাহারও ভালো লাগিলেও গাহি, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই।

চলিতরীতি–কারও ভালো লাগলেও গাই, ভালো না লাগলেও গেয়ে যাই।

সাধুরীতি– কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান।

চলিত রীতি– কাজেই আমি যে গান গাই, তা যৌবনের গান

সাধুরীতি – ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীত-গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়।

চলিতরীতি– ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে সে সঙ্গীত গুঞ্জন করতে করতে বয়ে যায়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নজরুলের সাহিত্য রচনার প্রধান অবলম্বন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ টীকা	মূলপাঠ
সম্বল – অবলম্বন। **তারুণ্য** – তরুণের বিশেষণ। **সশ্রদ্ধ** – শ্রদ্ধাসহ, শ্রদ্ধার সঙ্গে। **নমস্কার** – প্রণাম, অভিবাদন। **জবাকুসুম সঙ্কাশ** – জবা ফুলের মতো। **অরুণ** – সূর্য।	আমার একমাত্র সম্বল আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেদিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছিলেন, জবাকুসুম-সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ প্রভাতে তেমন সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির-বিদারী, সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যেথায়

স্তবগান – প্রশংসাসূচক গান।

তিমির বিদারী – তিমির বিদীর্ণ করে যা, অর্থাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে যা, সূর্য।

আলোর দেবতা – সূর্য।

উদয় – আবির্ভাব।

অস্ত – বিলীন।

যৌবন-সূর্য – যৌবন রূপ সূর্য। রূপক কর্মধারয় সমাস।

তিমির-কুন্তলা – চুলের মতো কাল অন্ধকার। তিমির রূপ কুন্তলা। রূপক কর্মধারয়।

লীলাভূমি – ক্রীড়াক্ষেত্র।

নিশীথিনী – রাত।

পূজারী – উপাসক, পূজা করে যে।

মধ্যমনি – মাঝখানের রত্ন।

সানন্দে – আনন্দের সঙ্গে।

শির – মস্তক, মাথা।

দলভুক্ত – দলের একজন।

দলপতি – দলের নেতা।

শতদল – পদ্মফুল।

সিদ্ধি – সাধনায় সাফল্য লাভ।

মৃণাল – পদ্মফুলের ডাঁটা।

বিকশিত – প্রকাশিত।

অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেইতো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালায় মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

সার-সংক্ষেপ

লেখক মনে করেন দেশের তরুণদের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর কাব্য রচনার সম্বল। যেদিন থেকে তিনি গান রচনা শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি যৌবনের অমিত শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি মনে করেন তারুণ্যই পারে সমস্ত অন্ধকার দূর করে মানব সমাজকে আলো দান করতে। তাই যেখানে যৌবনের সমাপ্তি সেখানেই দুঃখের সূচনা।

কবি যৌবনের পূজারী। তিনি চান তরুণদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে। নেতা হবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. *নজরুল তাঁর গান রচনার প্রথম থেকেই কাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং কেন?*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর একমাত্র সম্বল হল তরুণদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও প্রাণের টান। যেদিন থেকে তিনি গান রচনা করতে শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি যৌবনের পূজারী এবং তরুণদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সূর্যের প্রথম আলো যেমন রাতের ঘন অন্ধকারকে দূর করে, তেমনি তারুণ্য বা যৌবনের শক্তিও জীবনের সমস্ত অন্ধকার এবং গ্লানি দূর করতে সক্ষম। সৃষ্টির আদিযুগে মানব সন্তান সূর্যের আলোকে দেবতা মনে করে পূজা নিবেদন করত। কারণ মানুষ দেখেছে রাতের বেলা অন্ধকারে জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু জবাফুলের মত রঙ নিয়ে যখন প্রথম সূর্যের আলোর আবির্ভাব হয়, তখন রাতের ভয় আর থাকে না। লেখক এ জন্য যৌবনকে আলোর দেবতা সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌবন যতদিন থাকে ততদিনই আনন্দ, আর যেদিন জীবন থেকে তারুণ্য বা যৌবন বিদায় নেয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ হয়। যৌবনের এ অশেষ মহিমা লেখকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তাই তিনি যৌবনের জয়গানে মুখর।

২। "রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত।" একথা কেন এবং কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

চলিতরীতিতে রূপান্তর করুন

সাধুরীতি – আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শতাধিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি।

চলিতরীতি– ----------

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- যৌবন এবং বার্ধক্যের পার্থক্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- যৌবনের মাতৃরূপ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ/টীকা	মূলপাঠ
বার্ধক্য – বৃদ্ধ অবস্থা, জরা, বৃদ্ধের বিশেষণ। **আঁকড়িয়া** – জাপটে ধরে রাখা। **মায়াচ্ছন্ন** – যার সত্যিকার কোন অস্তিত্ব নেই এমন কিছুতে আচ্ছন্ন। **অভিনব** – নতুন। **জয়যাত্রা** – জয়ের জন্য যে যাত্রা। **বিঘ্ন** – বাধা। **শতাব্দী** – একশত বছর। **কুচকাওয়াজ** – সৈনিকদের সমবেত। **জড়** – প্রাণহীন।	বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়-যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ-স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক-পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার– বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল

অটল সংস্কার – যে বিশ্বাস টলেনা বা ভাঙেনা।
পাষাণ স্তূপ – পাথরের স্তূপ।
অরুণোদয় – সূর্যের উদয়।
নিদ্রাভঙ্গ – ঘুমভাঙ্গা।
রুদ্ধ – বদ্ধ।
আলোক-পিয়াসী – আলোর জন্য যারা পিপাসার্ত।
কল - কোলাহল – হৈচৈ।
অভিসম্পাত – অভিশাপ।
জীর্ণ – প্রাচীন।
পুঁথি – হাতে লেখা বই।
নাভিশ্বাস – মৃত্যুকালীন শেষ নিঃশ্বাস ওঠা, মর মর অবস্থা।
অতিজ্ঞান – জ্ঞানের অসহনীয় অবস্থা।
অগ্নিমান্দ্য – পরিপাক শক্তি বা ক্ষুধা হ্রাস, অজীর্ণ রোগ।
কঙ্কালসার – হাড় সর্বস্ব।
ফ্রেম – কাঠামো।
নির্মেঘ – মেঘহীন।
জয়মুকুট – সাফল্যের জন্য যে মুকুট।
মেঘলুপ্ত – মেঘের আড়ালে হারানো।
মার্তণ্ড প্রায় – দুপুরের সূর্যের ন্যায়।
ঔদার্য – উদারতা।
বেদুইন – আরবের যাযাবর জাতি।
অসি – তরবারি।
বৈমানিক – যারা বিমান চালান।
অনন্ত – অন্ত নেই যার।
গৌরীশৃঙ্গ – হিমালয়ের চূড়া।
কাঞ্চন জঙ্ঘা – হিমালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ।
শীর্ষদেশ – শিখর, উঁচুস্থান।
নীল মঞ্জুষার মণি – এক প্রকার মূল্যবান রত্ন।
সলিল সমাধি – পানিতে ডুবে যে মৃত্যু।
পবন গতি – বাতাসের গতি।
যৌবনের মাতৃরূপ – যৌবনের কোমল রূপ।
শব – মৃতদেহ।
গোরস্থান – মুসলমানদের কবরস্থান।
শ্মশান – যেখানে হিন্দুদের শব দাহ করা

মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি—যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই-যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট, ঔদার্য যাহার অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-মুসোলিনি-সানাইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে-যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে-যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক রূপে সব-পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষারে ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষা মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল সমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। পবন গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহার উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন মণি নিভিয়া যায়। যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি– শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

হয়। **পরিচর্যা** – সেবা করা। **দুর্দশাগ্রস্ত** – খারাপ অবস্থায় পতিত। **হতাশা** – আশাহীন।	

টীকা

কালাপাহাড়

ইতিহাস-খ্যাত মুসলিম সেনাপতি। প্রথমে বাংলার নবাব সুলেমান কররাণী ও পরে দাউদের সেনাপতি হন। তার জাতি পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে তিনি আদিতে হিন্দু-ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। পরে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবার অনেকের মতে তিনি আফগান মুসলিম। হিন্দুদের প্রতি তার প্রবল বিদ্বেষ ছিল।

কামাল

নব্য তুরস্কের জন্মদাতা। জীবনকাল ১৮৮১ তেকে ১৯৩৮। জন্ম তুরস্কের স্যালোনিকা নামক গ্রামের এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে। ১৯২২-এ এশিয়া মাইনর থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। ১৯২৩-এ তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় তুরস্ক সার্বিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি আমূল সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন।

করীম

জন্ম আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কোতে। রীফ গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। সম্পূর্ণ নাম মুহম্মদ ইবনে আব্দুল করীম। অসমসাহসী বীর যোদ্ধা ও কুশলী সংগঠক। ১৯২৪ সালে রীফ হতে স্পেনীয় সেনাদলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

মুসোলিনি

সম্পূর্ণ নাম সিনর বেনিটো মুসোলিনি। জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই ইটালির ভেরিয়ার প্রিদাপ্পিও নামক গ্রামে। পিতার নাম আলোসান্দ্রো। পেশায় তিনি ছিলেন একজন কর্মকার। মুসোলিনির কর্মজীবন শুরু স্কুল শিক্ষক হিসেবে। ১৯১৭-এ গঠন করেন ফ্যাসিস্ট পার্টি। ১৯২২-এ হন ইটালির প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্ররোচনায় ইটালি আবিসিনিয়া অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহেই ইটালি জার্মানীর সাথে যোগ দেয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে ইটালি মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হয়। ২৫ জুলাই, ১৯৪৩-এ পদচ্যুত ও বন্দী হন। কিছুকাল পর জার্মানীর সহায়তায় মুক্তিলাভ ও পুনরায় ইটালির শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ক্ষমতাগ্রহণের দু'বছর পর আততায়ীর হাতে নিহত হন।

সান ইয়াৎ

চীনা রাজনীতিবিদ। নবচীনের জন্মদাতা। জীবনকাল ১৮৬৬-১৯২৫। জন্ম ক্যান্টনের অন্তর্গত কোয়হা নামক গ্রামে। বিপ্লবী জীবনের সূচনা ১৮৯২ সালে। ১৮৯৫ এর ব্যর্থ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। পরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করে বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করেন। সফল বিদ্রোহের মাধ্যমে মাঞ্চু রাজবংশের পতন হয় ১৯১১ সালে। পরবর্তীতে অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হন। অন্যান্যদের সাথে মতানৈক্যের কারণে স্বল্পকাল পরই পদত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালে চীনের সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর ১৯২৩ সালে ক্যান্টনে তার ক্ষমতা সংহত করতে সক্ষম হন। কুওমিংটাং দলের অভ্যুত্থান ঘটে এ সময় থেকেই। চিয়াং কাইশেক ছিলেন তার সেক্রেটারী। সানইয়াৎ রাজনীতি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

লেনিন

সোভিয়েত রাষ্ট্রের জনক। প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির ইলিচ। জন্ম ১০ এপ্রিল, ১৮৭০ সিমবিরস্ক নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কসের ভাবশিষ্য হন সিমবিরস্ক জিমনাসিয়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগদানের পর ১৮৮৬ সালে নির্বাসিত হন। পরবর্তীতে দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে সেন্ট পিটার্স বার্গে কয়েক বছর আইন ব্যবসা করেন। বৈপ্লবিক তৎপরতা ও পত্রিকা সম্পাদনার অপরাধে ১৮৯৬ সালে এক বছরের কারাভোগ ও সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসন দণ্ড পান। নির্বাসিত অবস্থাতেই বিয়ে করেন নাদেজদা নামক এক মহিলাকে। মুক্তি পাওয়ার পর মিউনিকে ফিরে ইসক্রা নামক পত্রিকা বের করেন। ১৯০৩ সালে লন্ডনের কংগ্রেসে বলশেভিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৪ সালে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পত্রিকা New life প্রকাশ্যে বের করেন। ফলে পুনরায় নির্বাসিত হন এবং বারো বছর সুইজারল্যাণ্ডে থাকেন। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় ফিরে জনমত সংগঠিত করেন এবং কেরেনস্কি মন্ত্রী মন্ডলের পতন ঘটান। এ বছরেই নৌ এবং স্থল সৈন্যের বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করেন। এ সময়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চারপাশে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও লালফৌজের সহায়তায় তিনি উদ্ধার পান। ১৯২১ সাল হতে জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ২১ জানুয়ারি, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

লেখক মনে করেন যারা পুরাতনকে আঁকড়ে থাকে, মিথ্যা কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে মানুষের নতুন কিছু করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তারা জীব হয়েও জড়ের মতো। এরা নতুন কিছুর আগমনে ভীত হয়ে ওঠে। কেবল বয়স দিয়ে বার্ধক্য নির্ধারিত হয় না। যুবক হয়ে অনেকে বৃদ্ধের মতো আচরণ করে। অন্যদিকে অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিও মন-মানসিকতায় যুবকদের মতো হয়েও থাকে। তারুণ্যের লক্ষণ প্রাণপ্রাচুর্য, অমিত তেজ, অটল সাধনা ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করার মতো সাহস। আকাশ বিজয়ী বৈমানিকদল, পর্বতশীর্ষে আরোহনকারী দুঃসাহসী অভিযাত্রীদল, সমুদ্রের রহস্য সন্ধানী ডুবুরী, নতুন গ্রহ-নক্ষত্র সন্ধানীরা সবাই পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতীক। যৌবনের মাতৃরূপ পরিলক্ষিত হয় সেবা এবং সহানুভূতিশীলদের মাঝে, দুর্বলের মধ্যে যারা সাহসের সঞ্চার করে, আশাহীনদের যারা আশার বাণী শোনায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১। "বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাধা যায় না"। উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

যৌবনের মাতৃরূপ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম "যৌবনের গান" প্রবন্ধে যৌবনের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক যেহেতু যৌবনের পূজারী, তাই এর কোমল ও কঠোর দুই দিকই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তরুণেরা এদিকে নিত্যনতুন আবিষ্কার করে মানব সমাজকে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অন্যদিকে রয়েছে তরুণদের কোমল রূপ। লেখক তরুণদের সেবামূলক কর্মতৎপরতাকে যৌবনের মাতৃরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। শবদেহ বহন করে নিয়ে যায় শ্মশান ঘাটে, গোরস্থানে সুষ্ঠু সৎকারের জন্য, নিজে অনাহারে থেকে সে অন্ন তুলে দেয় দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িতদের মুখে, যার কোন বন্ধু নেই সে অসুস্থ হলে রাতের পর রাত জেগে সেবা করে, পথে পথে গান গেয়ে দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য টাকার যোগাড় করে। এককথায় অসহায়ের মনে আশার সঞ্চার করে, দুর্বলের পাশে ভরসা হয়ে দাঁড়ানোকে লেখক যৌবনের মাতৃরূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। মা যেমন নিজের কষ্ট উপেক্ষা করে সন্তানের জন্য, তরুণেরাও তেমন নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের দুঃখ দূর করার পবিত্র দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। তরুণদের এ সেবাধর্মকে লেখক যৌবনের মাতৃরূপ হিসেবে বর্ণনা করে যৌবনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

চলিত ভাষার রূপান্তর করুন

সাধুরীতি – বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

চলিতরীতি– ----------।

সাধুরীতি – বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি।

চলিতরীতি – ----------।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নজরুল মুসলিম তরুণদের কাছে কী আশা করেন তার বিবরণ লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
সেনানিবাস – সৈনিকদের আবাস। **অকুণ্ঠিত** – দ্বিধাহীন হৃদয় যাদের। **মুরীদ** – শিষ্য। **মহাত্মা** – মহান আত্মা যার। **অট্টালিকা** – বড় দালান। **জীর্ণ** – পুরাতন। ধ্বংসপ্রায়। **সংস্কারাতীত** – মেরামত করা যায় না যা। **গড়বার** – তৈরি করার। **নিয়ামত** –অনুগ্রহ। **মোনাজাত** – প্রার্থনা। **বেহেশতী** – স্বর্গীয়।	ইহাই যৌবন, এ ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ–কাল–জাতি ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা - মুসলিম তরুণেরা-যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি-ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য যৌবন। আমরা সকল দেশের সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের। এ জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে। পথ-পার্শ্বের ধর্ম অট্টালিকা আজ পড়-পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদের মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেয়া এ পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতী চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য,ভিখারীর মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো গড়িয়া লইব। ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বের সমস্ত তরুণদের একই ধর্ম। তাই তরুণরা দেশ-কাল জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে। আর যারা এ ধর্ম ও কালকে অতিক্রম করতে পেরেছেন তারাই মহামানব হিসেবে সকল দেশের সকল মানুষের কাছে সমান শ্রদ্ধা লাভ করতে পেরেছেন।

ধর্মের মাঝেও কিছু কুসংস্কার আছে, যা দূর করার সময় এসেছে। যে ধর্মরূপ অট্টালিকা আমাদের আশ্রয় দান করেছে, তা নতুন করে সংস্কার করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে মুসলিম তরুণদের। আল্লাহ আমাদের যে উদ্দেশ্যে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা আমাদের সফল করতে হবে। এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে বেহেশত এবং বেহেশতী বস্তু অর্জন করার সাধনা করে এ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব তরুণদের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নমুনা উত্তর

১. লেখক মুসলিম তরুণদের কাছ থেকে কী আশা করেন?

"যৌবনের গান" প্রবন্ধটি মুসলিম তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে দেয়া একটি ভাষণের অংশ বিশেষ। কবি মুসলিম তরুণদের সত্যিকার তারুণ্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যৌবনের অপরিমেয় শক্তি, বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, অটল জীবন সাধনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যেন মুসলিম তরুণ সমাজের প্রাণের মন্ত্র হতে পারে সেটাই কবির একান্ত কামনা। তারুণ্যের এই ধর্ম দেশ-কাল-জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে। তিনি তাই মনে করেন ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। লেখক মনে করেন, আল্লাহ এ পৃথিবীতে সবই দিয়েছেন। মানুষকে দিয়েছেন সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা। মানুষকে তার কর্ম এবং সাধনার দ্বারা এ পৃথিবীতেই স্বর্গীয় বস্তু অর্জন করতে হবে। আল্লাহ হাত দিয়েছেন কাজ করার জন্য, অন্যের দ্বারস্থ হওয়া মানে বিধাতার দেয়া মর্যাদাকে অপমান করা। লেখকের আকাঙ্ক্ষা মুসলিম তরুণ সমাজ পূর্ণ যৌবন শক্তির অধিকারী হয়ে সমস্ত কুসংস্কারের বাধা অতিক্রম করে এ পৃথিবীতে তাদের সম্মানজনক আসন প্রতিষ্ঠিত করবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১। যৌবনের গান প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লিখুন।

২। যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসরণে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

১। যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসরণে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ তেজোদীপ্ত ভাষায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুই ভিন্ন সত্তা তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। তারুণ্য এবং বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি গতানুগতিক বয়সের মাপকাঠিকে অতিক্রম করে মানুষের মন-মানসিকতার আলোকে যৌবন ও বার্ধক্যের পার্থক্য করেছেন।

সাধারণ অর্থে আমরা নবীন বয়সীদেরই তরুণ বলে আখ্যায়িত করি। এরাই তারুণ্যের অধিকারী বলে মনে করি। কিন্তু নজরুল এ সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় তারুণ্যকে সীমাবদ্ধ করেননি। তিনি বলেছেন, "বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরনের তলে মেঘ লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।" এ বক্তব্যে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বয়স বাড়লেই মানুষ বৃদ্ধ হয়না। বৃদ্ধ তারাই যারা পুরাতনকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে। এদের মধ্যে জীবের মতো প্রাণচাঞ্চল্য নেই বলে এরা জড়ের মতো নিস্প্রাণ। তাই নতুন যাত্রাপথে এরা পা মিলিয়ে চলতে পারে না। পুরাতন ধ্যান-ধারনা প্রাচীন সংস্কারের নিচে মাথা গুজে পড়ে থাকে। এরা তাই চলার পথের শুধু বোঝা নয়, বিঘ্নও বটে। এ কারণেই লেখক বয়স নয় এবং বরং এমন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদেরই বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আর তরুণ হল তারাই যাদের প্রাণশক্তি অপরিসীম, বিপুল যাদের আশা, উৎসাহে যাদের কখনো ভাটা পড়ে না। এরা নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত থাকে; মৃত্যুভয়কে এরা জয় করেছে। তাই এরা কখন গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া

জয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তুষারে হারিয়ে যায়, আকাশের রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর ফেরে না, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আনতে গিয়ে পানিতে হারিয়ে যায়। কখনো বা এরা দুঃখ পীড়িত অনাহারীদের কাছে এগিয়ে যায় মমতার স্পর্শ নিয়ে। স্বজনহারা মানুষ অসুস্থ হলে রাত জেগে মায়ের মতো সেবা করে। শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে বন্যাপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় শান্তির কোমল আশ্রয় হিসাবে। যৌবন এখানে মায়ের স্নিগ্ধ কোমলরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। কবি মনে করেন এ সমস্ত গুণ যাদের মাঝে দেখা যায় তারাই তরুণ এবং তারাই যৌবনের অধিকারী। তাই কবি যৌবনকে দেখেন কালাপাহাড়ের তরবারিতে, আরবের বেদুইনদের প্রাণশক্তিতে, কামাল, করিম মুসোলিনী ও লেনিনের মধ্যে। কারণ এরা সবাই জাতির দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন মনোবলের সঞ্চার করেছেন। দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রার জন্য নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ করে তাঁরা পৃথিবীর বুকে নিজের দেশকে বড় করে তুলেছেন। তাই আজ সমস্ত বিশ্বের মানুষ এঁদের চেনে।

কবি মুসলিম তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন তারুণ্যের অপরিমেয় গতিময়তা ও প্রাণ প্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে মুসলমানদের জন্য নতুন সমাজ এবং নতুন যুগ গড়ে তোলে। কারণ তরুণরাই পারে পুরাতন ঘুণে ধরা জীর্ণ সমাজ ভেঙে নতুন করে গড়তে। অশিক্ষা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রক্ষণশীল প্রবীণেরা সামনে চলার পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। সেই রুদ্ধপথকে ভেঙে নতুন আলো ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব যারা নেবে তারাই তরুণ। সর্বকালে সর্বযুগে তরুণরাই সমস্ত অন্ধকারের বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষের মুখে নতুন আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়। এভাবে লেখক তারুণ্য ও বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মের পার্থক্য নির্ধারণ করে শেষ পর্যন্ত বলিষ্ঠভাবে যৌবনের জয়গান গেয়েছেন।

প্রশ্ন : ***কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসরণে যৌবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।***

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধটির নামের মাঝেই সুস্পষ্ট যে এখানে যৌবনের প্রশংসা করা হয়েছে। যৌবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যৌবন বলতে তিনি এখানে তারুণ্যের কথা বলেছেন। আমরা সাধারণত মনে করি তরুণদেরই কেবল তারুণ্য আছে। কিন্তু লেখক এখানে বয়স দিয়ে যৌবনকে বিচার না করে মন-মানসিকতাকে যৌবনের মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যার ফলে যৌবনের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখকের বক্তব্যের মাঝে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

অনেক সময় যুবক হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মধ্যে প্রবীণদের মতো পুরাতন সংস্কার নিয়ে বেঁচে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। আবার কখনও দেখা যায় বৃদ্ধের মনেও এমন প্রাণ প্রাচুর্য আছে, যার ফলে তিনি সহজে নতুনকে বরণ করে নিতে পারেন। যৌবনের শক্তি অপরিসীম, গতিবেগ ঝড়ের মতো, যার তেজ আষাঢ় মাসের মধ্য আকাশের সূর্যের মতো। বিপুল যার আশা, সাধনার পথে হাজার বাধা এলেও অটল থাকে, মানব জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে তারাই তরুণ। কবি যৌবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের মাঝে যারা অন্তহীন, আকাশের সীমা খুঁজতে যায়, নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় দুর্বার অভিযানে বের হয়ে যারা আর ফেরে না, অজানাকে জানার নেশায়, অচেনাকে চেনার নেশায় যারা জীবন দেয়। নিপীড়িত, দুঃস্থ মানুষের সেবায় যারা এগিয়ে আসে, হতাশাগ্রস্তদের মনে আশার বাণী জাগ্রত করে নবজীবনের আশ্বাস দান করে তাদের মাঝে। যৌবনই মানব জীবন থেকে সমস্ত অন্ধকার দূর করে আলোর বন্যা এনে দিতে পারে। সমস্ত জীর্ণতা, কুসংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার সাহস থাকে তাদের। যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর যাদের জীবন তারা সব সময় পরের কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবন নিয়োজিত করে। সেজন্যই কবি মনে করেন এ প্রাণ প্রাচুর্য না থাকলে সে যেমন বৃদ্ধের মতো, তেমনই যদি বয়স বেশি হলেও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে যৌবনের চাঞ্চল্য ভরপুর হয়, তবে তাকে তরুণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিরাই সমাজ থেকে, জীবন থেকে সমস্ত জীর্ণতাকে, পুরাতনকে, কুসংস্কারকে দূর করে মুসলিম জাতিকে সম্মানের সাথে বসবাস করার মত নতুন পৃথিবী গড়ে দেবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের।

২। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশত ও বেহেশতী চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব।

তারুণ্যের ভরা ভাদরে আজও না ওয়াকিফ।

আলোচ্য অংশটুকু কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে কবি নিজের কাব্য রচনার পটভূমি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

কবি মনে করেন, তিনি বনের পাখির মতোই নিজের মনের আনন্দে গান করেন। যেহেতু তিনি মনে করেন যৌবনের সীমা পরিক্রমন তার শেষ হয়নি, তাই তিনি যে গান করেন তা যৌবনেরই গান। তিনি তরুণদের আকর্ষণ করার জন্যে বিশেষভাবে এমন গান করেননি, কবির এই গান যে তরুণদের মনে উন্মাদনা জাগিয়েছে সেটা হয়েছে তার অগোচরে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পৃথিবীতে সমুদ্রের বুকে জোয়ার ভাটা হয়, এটা যেমন চাঁদের জানা নেই, তেমনি কবির নিজের মনের আনন্দ সৃষ্টির জন্য যে কাব্য রচনা করেন তা যে তরুণদের অনুপ্রেরণা জোগায় তাও কবির জানা নেই। কবি এখানে চমৎকার উপমার সাহায্যে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার সৃষ্টি এবং কবির রচনায় তরুণদের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

উত্তর ॥ আলোচ্য অংশটুকু কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক তরুণদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়ে এ চমৎকার উপমাটি ব্যবহার করেছেন।

তরুণদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই কবির একমাত্র পাথেয়। কারণ একমাত্র তারুণ্যই পারে সমস্ত অন্ধকার দূর করে আলোর ধারা বইয়ে দিতে। কবির গানে তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য দেখে তরুণেরা তাঁকে যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা দিয়েছে তা কবি মহা আনন্দে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে কবি তাদের নেতা হতে চান না। পদ্ম যেমন শত পাঁপড়িসহ একটি মৃণাল বা ডাঁটা অবলম্বনে ফুটে ওঠে, তেমনি কবিও শত শত তরুণদের সঙ্গে একই সাথে বিকশিত হতে চান। কারণ কবির এবং তরুণদের একই উদ্দেশ্য ধ্যান। মুসলিম সমাজের মধ্যে তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া বইয়ে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য। তাই কবি মনে করেন দলপতি না হয়ে তরুণদের সঙ্গে ওদেরই একজন হয়ে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করাই হবে তার উদ্দেশ্য।

বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ব্যাখ্যেয় অংশটুকু যৌবনের পূজারী কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত। বয়স দিয়ে যে বার্ধক্যকে নির্ণয় করা যায় না, এ সত্যটিকে লেখক এখানে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

লেখকের ভাষায় বয়স দিয়ে নয় মানুষের কর্মশক্তি ও মানসিক সজীবতার মাধ্যমেই তরুণ ও বৃদ্ধদের স্বরূপ চিহ্নিত করা উচিত। যারা প্রাচীনকে, জীর্ণতাকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় তারাই বৃদ্ধ। এরা সব সময় নতুন কিছুকে গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যারা সব সময় নতুনকে বরণ করে নেবার জন্য উন্মুখ, মনের উদার আলোকে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে তারাই তরুণ। বয়সে প্রবীণ বা স্থবির হলেই তাকে বার্ধক্যের গণ্ডীতে ফেলা যাবে না। কারণ অনেক বৃদ্ধ আছেন যারা নতুন পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর, প্রগতিশীল জীবনে যারা আস্থাবান, সামনে এগিয়ে যাওয়া যাদের একমাত্র ধর্ম। তারা বয়সে প্রবীন হলেও যৌবন-ধর্মের বিচারে তারা তারুণ্যের অধিকারী। তাই বয়সের সংকীর্ণ সীমারেখায় বার্ধক্যকে পরিমাপ করা উচিত নয়। বার্ধক্য এবং তারুণ্য বিচার করতে হবে মানুষের কর্মচেতনা, বিশ্বাস ও সৃষ্টিশীল মন-মানসিকতার দ্বারা। কাজেই বয়স যা-ই হোক না কেন সৃষ্টিধর্মীতা যার মনে ক্রিয়াশীল সে-ই তরুণ। সে কারণেই কবি বলেছেন বার্ধক্যকে বয়সের ফ্রেমে বাধা যায় না।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

প্রশ্ন : নিচের অংশটুকু সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন।

"তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি, জবাকুসুম সঙ্কাশ, তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ প্রভাতে তেমন সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি।"

সৃজনশীল কাজ

বর্তমান বাংলাদেশের তরুণদের সাধনা কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে আপনার মতামত প্রবন্ধের আকারে লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ছাড়াও তাঁর উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, পড়তে পারেন। এগুলো পাওয়া যাবে—'নজরুল রচনাবলী'-তে।

জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলাতেই পিতামাতা কুমিল্লায় চলে আসেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কুমিল্লাতেই অতিবাহিত করেন।

১৯৪৩ সালে বহিরাগত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে বিভিন্ন সরকারী কলেজে চাকুরি করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয় ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠির সংস্পর্শে এসে। এ কারণে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহে যুক্তিনিষ্ঠা এবং মুক্তবুদ্ধির পরিচয় বিশেষভাবে বিধৃত। একই সাথে তাঁর জীবন ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল ক্লাইভ বেল ও বার্টান্ড রাসেলের দ্বারা। ক্লাইভ বেল রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিভিলিজেশন' এর তিনি সাবলীল অনুবাদ করেন। আর মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাসমূহ তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্লাইভ বেল ও বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তাধারা ও রচনা তাঁর মানসিক গঠন ও সাহিত্য রচনায় বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর রচনা সংখ্যা খুবই অল্প। তিনি ছিলেন প্রবন্ধকার। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিত। জীবিত অবস্থায় তাঁর কোন লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। গুণগ্রাহী বন্ধুরা মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলীকে সংকলিত করে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে "সংস্কৃতি কথা' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন বের করেন। এটিই তার একমাত্র গ্রন্থ। তিনি যেমন লিখতেন কম, তেমনি খুব অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশের একটি ব্যতিক্রমী ক্ষমতা ছিল তাঁর। সৃষ্টি পরিমাণগত দিক থেকে নয়, গুণগত দিক থেকে বিচার্য। এদিক থেকে বিচার করলে তিনি বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের বাংলা সাহিত্যের কৃতি প্রবন্ধকারদের মধ্যে অন্যতম। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন যুক্তিবাদী। তবে একই সাথে তিনি ছিলেন জীবন রসের রসিক। এ কারণেই বলা হয় তাঁর গদ্যরচনা "বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন এবং স্মিতরসে স্নিগ্ধ।"

ভূমিকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক বৃক্ষের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে মানবজীবনের তুলনা করেছেন। গাছ বিকাশশীল। অঙ্কুরোদগমের পর্যায় থেকে শুরু করে নানা রূপান্তর ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বৃক্ষ এক সময় পূর্ণতা পায়। তাতে ফুল ধরে, ফল হয়। মানবজীবনও একই রকম। কেবল বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বৃক্ষ যেমন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি মানুষও বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে অন্যের প্রেমে, সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার মাঝেই পরিপূর্ণ সার্থক হয়। লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মানব জীবনের সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা করেছেন। তাই প্রবন্ধটির 'জীবন ও বৃক্ষ' নামকরণ সার্থক হয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবন্ধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
২. লেখকের যুক্তিবাদী মন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সমাজের বেশিরভাগ মানুষের চরিত্র কেমন তা বলতে পারবেন।
- বৃক্ষ কেন মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
স্বল্পপ্রাণ – ক্ষীণজীবী। **স্থূলবুদ্ধি** – যাদের বুদ্ধি কম বা বোকা। **জবরদস্তি প্রিয়** – যে অন্যের ওপর জোর খাটাতে ভালবাসে। **অন্তরায়** – বাধা। **বিকৃত বুদ্ধি** – অসৎবুদ্ধি। **নিশান** – পতাকা। **উপলব্ধি** – গভীর অনুভূতি। **সূক্ষ্মবুদ্ধি** – জীবনের জটিল বিষয়ও বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি। **প্রতীক** – কোন কিছুকে বা জিনিসকে বোঝানোর জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।	সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার। তারই চরণে তারা নিবেদিত-প্রাণ। ব্যক্তিগত অহঙ্কার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতিগত অহঙ্কার– এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি। এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ-সূক্ষ্মবুদ্ধি উদার হৃদয় গভীর-চিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ-যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

সার-সংক্ষেপ

মানুষকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই সমাজের কাজ। পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই কেবল নিজের জন্য চিন্তা করে। তাই তারা নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তো তোলেই না, বরং অন্যের সার্থকতার পথেও বাধা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত মানুষ সব সময় অহঙ্কারে মত্ত থাকে। মাঝে মাঝে তারা মানব প্রেমের কথাও বলে, কিন্তু তা আন্তরিকতাশূন্য। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে এদের জায়গায় আনতে হবে উদার হৃদয়ের ব্যক্তি। যাদের উদ্দেশ্য সমাজে কেবল টিকে থাকা নয়, বরং জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করা। লেখকের মতে এদের জীবনাদর্শের প্রতীক হবে সজীব বৃক্ষ। কারণ মানব জীবনের আদর্শ হিসেবে বৃক্ষের মতো জীবন্ত উপমা আর নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সমাজের বেশির ভাগ মানুষের চরিত্র কেমন হয়?

২. "বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়" – লেখকের এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন : "বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়" - লেখকের এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমেই বৃক্ষের দিকে তাকালে কেন জীবনের সার্থকতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় সে সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ পৃথিবীতে কেবল কোনরকমে বেঁচে থাকাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। জীবনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে অন্যের জন্যে কিছু করার মন মানসিকতা মানুষের থাকা উচিত। গতিশীল, বিকশিত ও সেবাপরায়ণ জীবনই মানুষের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে বৃক্ষের কোনও মহৎ ও সেবাপরায়ণ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু গভীর ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় বৃক্ষের জীবন পুরোপুরি অন্যের জন্য নিবেদিত। তার ছায়া, ফুল, ফল সবই অন্যের জন্য। ফুলের সুগন্ধ বৃক্ষ নয়, মানুষের জন্য, ফলও মানুষের জন্য, ছায়াও মানুষের জন্য। তাই কেবল মাটি থেকে রস গ্রহণ করে বিশালাকার হওয়াতেই গাছের সার্থকতা নয়, যেদিন গাছটিতে ফুল হয়, ফল ধরে সেদিনই গাছ হয় পরিপূর্ণ। গভীর অভিনিবেশসহ গাছকে লক্ষ করলে তাই বলা যায় বৃক্ষই মানব জীবনের সবচেয়ে সার্থক প্রতীক। গাছে আছে একসঙ্গে সজীবতা ও সার্থকতা।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত পার্থক্য সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।
- লেখক বৃক্ষকে কেন মানব জীবনের প্রতীক মনে করেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
মনুষ্যত্ব – দয়া, ধর্ম, প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। **ডিঙানো** – লাফিয়ে পার হওয়া। **তপোবন** – তপস্যার জন্য যে বন। **অনুভূতিরচক্ষু** – সংবেদনশীল মনের চক্ষু। **ধেয়ে চলা** – এগিয়ে চলা। **নতি** – আনত, নম্র, নিচের দিকে নিবদ্ধ। **আত্মবিসর্জন** – পরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন। **পতিত** – পড়ে যাওয়া, ঝরে	অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়-তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল। জানি, বলা হবেঃ নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে উঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে উঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন। উত্তরে বলব ঃ চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনার যেমন একটা ধীর স্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে

যাওয়া।

টীকা

তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতে মুনি-ঋষিরা বনের মাঝে আশ্রম তৈরি করে থাকতেন। সেখানেই সাধনা করতেন। আবার সেই আশ্রমে গুরুর শিষ্য (ছাত্র, শিক্ষার্থী) দের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ তা তার বহু রচনায় বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক নগর সভ্যতা থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরে শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রথম অবস্থায় আশ্রমের মতোই পড়াশোনা হত। তাই লেখক বলেছেন 'তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ'।

পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাইনা। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরের পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে উঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এইতো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি, তাই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেনি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

সার-সংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের জীবনকে ফুল ফোটার সাথে তুলনা না করে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ ফুল ফোটা সহজ, কিন্তু নদীকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়। ফুল ফোটানোর জন্য গাছের যে দীর্ঘ সাধনা তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু নদীর উৎস থেকে সমুদ্রে পতিত হওয়ার আয়োজন দেখা যায়। নদীর সাগরে পতিত হওয়ার দৃশ্য আমরা প্রত্যহ দেখি না, কিন্তু গাছকে আমরা সহজে দেখি। নদী ক্রমাগত এগিয়ে চলে, কিন্তু বৃক্ষের সার্থকতার পেছনে রয়েছে ধীর-স্থির নীরব সাধনা। নদী যখন সাগরে পতিত হয় তখন সে সমুদ্রে একাকার হয়ে যায়, তখন আর তার নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না বলে নদীর সাধনায় প্রাপ্তিযোগ নেই। কিন্তু বৃক্ষের সাধনায় সিদ্ধি রূপ ফুল ও ফল সে পরের জন্য দান করে। সৃষ্টিধর্মী মানুষও জীবনে সাধনা করে সার্থকতা লাভ করে। জ্ঞানকে নিজস্ব সম্পদ করে না রেখে অপরের জন্য দান করেন বলেই লক্ষ লক্ষ মনিষীর জ্ঞান ও সাধনার সম্পদে মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। তাই লেখক মনে করেন বৃক্ষই সার্থক জীবনের প্রতীক হওয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ কেন নদীর গতির মধ্যে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখেছেন ব্যাখ্যা করুন।

২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কেন নদীর চেয়ে বৃক্ষকেই আদর্শ জীবনের প্রতীক মনে করেছেন তা আলোচনা করুন।

প্রশ্ন : মোতাহের হোসেন চৌধুরী কেন নদীর চেয়ে বৃক্ষকেই আদর্শ জীবনের প্রতীক মনে করেছেন তা আলোচনা করুন।

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বহু রচনায় জীবনের সঙ্গে নদীর তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ফুলের ফোটা এবং নদীর গতি দুটো তুলনা করে মনুষ্যত্বের সঙ্গে নদীরই অধিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই অভিব্যক্ত হয়। নদীর গতি সরল নয়, তাকে বহু বাধা পেরিয়ে চলতে হয়। মানব জীবনও বন্ধুর। আনন্দ-বেদনা ভাল মন্দ মিলিয়েই সমগ্র জীবন। কিন্তু লেখক রবীন্দ্র-অনুসারী হয়েও এটা মানতে পারেননি। কেননা নদী যখন সাগরে মিলিত হয়, তখন নদীর নিজস্ব কোনও সত্তা থাকেনা, কিংবা কোনও বৈশিষ্ট্যও থাকেনা। সাগরই তখন মুখ্য। লেখকের মতে এটা নদীর আত্মবিসর্জন। কিন্তু বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনে ছবির মতোই ফুটে ওঠে। ফুলে-ফলে গাছ যখন ভরে ওঠে তখন তার সাধনা ও সার্থকতার দিকটি আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দানে কোন ভেদ নেই। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে কোনো ভেদ নেই। ফলে আমরা এক পরিপূর্ণ মানবসত্তাকেই প্রত্যক্ষ করি। তাই লেখক জীবনের সঙ্গে নদীর চেয়ে বৃক্ষেরই অধিক মিল খুঁজে পেয়েছেন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- প্রকৃতি ও মানুষের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বস্তু জিজ্ঞাসা বা বিজ্ঞান কেন শিক্ষার প্রধান বিষয় হতে পারে না তা বর্ননা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
আত্মিক – আত্মা সম্বন্ধীয়। **পরিপক্বতা** – পূর্ণ পরিণতি। **বস্তু জিজ্ঞাসা** – পদার্থ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা। **মূল্যবোধ** – জীবনের মূল মর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা। **জীবনবোধ** – জীবনের স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধি।	নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে, বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাইতো আত্মা। এ আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : Ripeness is all–পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তু-জিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না-জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য–শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এতো মূল্য। উপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের

	অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি–জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে। বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়-প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।

সার-সংক্ষেপ

বৃক্ষ নীরবে আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। জীবজন্তু ও তরুলতার জীবন বিকাশে তাদের নিজস্ব কোনো হাত নেই। কিন্তু মানুষের বিকাশে তার নিজস্ব হাত আছে। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। নিবিড় প্রেম ও সুগভীর অনুভূতির দ্বারাই মানবাত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। বস্তুজিজ্ঞাসা কিংবা বিজ্ঞানশিক্ষা কখনও আত্মা নির্মাণ প্রক্রিয়ার উপযোগী নয়। সাহিত্য ও শিল্পকলাই এজন্য সবিশেষ উপযোগী।

মানুষকে ছায়া দেয়, ফল দান করে। গাছ তার বেড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত। বৃক্ষের দিকে তাকালে তাই আমরা মানব জীবনের গুঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন হই। তাই বিকশিত বৃক্ষই হয়ে উঠতে পারে মানব জীবনের প্রাপ্তি, প্রশান্তির রূপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে-সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বস্তু জিজ্ঞাসা বা বিজ্ঞান কেন শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না?

২. "প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপরে তার নিজের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে।" কোন উপলক্ষে এবং কেন লেখক এ মন্তব্য করেছেন? এর তাৎপর্য কী?

প্রশ্ন : "প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপরে তার নিজের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে।" কোন উপলক্ষে এবং কেন লেখক এ মন্তব্য করেছেন? এর তাৎপর্য কী?

উত্তর : প্রকৃতির ধর্ম ও মানুষের ধর্ম এক হলেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য নির্দেশ করতেই মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন। তরুলতা ও জীবজন্তুর মধ্যে বৃদ্ধির প্রবণতা আছে। কিন্তু এ বৃদ্ধি একান্তই প্রকৃতির নিয়মে হয়, সে বৃদ্ধির ওপর তাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু মানুষের বৃদ্ধি তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষের সবচেয়ে সারবান বস্তু তার আত্মা। সুখ-দুঃখ বেদনা বিষাদের মধ্য দিয়ে মানুষ তার যে অন্তর্গত সত্তার সন্ধান পায় সেই চৈতন্যই হচ্ছে আত্মা। এ মানবাত্মা তৈরি কিংবা কিনতে পারা যায় না বা এটা প্রকৃতির নিয়মে পাওয়া যায় না। মানুষকে তা একাগ্র সাধনা ও পরম নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। এ জন্যই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ মর্যাদা পেয়েছে। প্রকৃতি জগতের অন্যান্য জীবজন্তু বা তরুলতার দ্বারা তা সম্ভবপর নয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সমাজের কাজ কেবল টিকিয়া থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া।

২. মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও।
৩. বৃক্ষ কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়, প্রশান্তিরও ইঙ্গিত।
৪. সেতো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন।

সমাজের কাজ কেবল টিকিয়া থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া।

আলোচ্য অংশটুকু মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'জীবন ও বৃক্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। মানবজীবনে সমাজের অবদান ও ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক উক্তিটি করেছেন।

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি। মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করাই সমাজের কাজ। কিন্তু মানব সমাজে বেশির ভাগ ব্যক্তিই অত্যন্ত স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণমনা। এরা নিজের জীবন যেমন সার্থক ও সুন্দর করে তোলেনি, তেমনি আবার অন্যের বিকাশের পথেও তারা বাধার সৃষ্টি করে। প্রেম ভালবাসা বঞ্চিত বলে এসব ব্যক্তি নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী হয়। এরা কেবল আত্ম-অহংকার দ্বারা চালিত। মাঝে মাঝে স্বার্থের কারণে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাদের অন্তঃসারশূন্য চরিত্রের কারণে তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

লেখকের মতে সমাজে কেবল মানুষ হিসেবে বেঁচে থেকে নিজের স্বার্থ দেখলে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যাবে না। মানুষকে হতে হবে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রেম-ভালবাসা পূর্ণ ও উদারহৃদয়। তখনই মানুষ পরের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারবে। কাজেই মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে সমাজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সমাজ থেকে স্থূলবুদ্ধি ও বিকৃতবুদ্ধির মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য সমাজ থেকে অশুভ ও অকল্যাণবোধ দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

সেতো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। নদী ও বৃক্ষের সাধনার পার্থক্য নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এ উক্তিটি করেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের সঙ্গে নদীর গতির সাদৃশ্য দেখে মনুষ্যত্বের সঙ্গে নদীর তুলনা করেছেন। লেখক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের মত-পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনের উদ্দেশ্য কেবল নদীর মতো ক্রমাগত এগিয়ে চলা নয়। সাধনার সফলতার পর প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। সাধনায় যদি কোনো সিদ্ধি না থাকে তবে সাধনার দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হবেন না। কিন্তু নদীর জীবনে এ প্রাপ্তি জিনিসটা চোখে দেখা যায় না। নদী সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে যখন তার সাধনায় সফলতার চরম সীমায় পৌঁছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নদী নিঃশেষিত হয়ে যায়। নদীর আর কোনো বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় থাকে না, সাগরের পরিচয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। নদী তাই সাগরে মেলে না, আত্মবিসর্জন দেয়। এখানে নদীর কোনো প্রাপ্তি নেই। অথচ বৃক্ষের সাধনা ও প্রাপ্তি আমরা সহজে দেখতে পাই। বৃক্ষ যখন ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন বোঝা যায় তার এতদিনের নীরব সাধনার সার্থকতা। তাই লেখক নদীর সাগরে মিলিত হওয়াকে সাধনার প্রাপ্তি না বলে আত্মবিসর্জন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যেসব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
২. জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লিখুন।

প্রশ্ন : জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লিখুন।

উত্তর : "জীবন ও বৃক্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গ্রন্থ "সংস্কৃতি কথা" থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ প্রবন্ধে তিনি বৃক্ষকেই মানব জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সে আলোকেই জীবন-রচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃদ্ধির দিক থেকে মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সাদৃশ্য রয়েছে। অঙ্কুরোদ্‌গমের পর্যায় থেকে শুরু করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গাছ একদিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাতে ফুল ধরে, ফল হয়। তখনই গাছ হয় সার্থক। কেবল মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠাতেই বৃক্ষের সার্থকতা নয়। তাকে ফুল ফোটাতে ও ফল ধরাতে হয়। একাজ একদিনে হয় না, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষাতেই এ কাজ সম্পূর্ণ হয়। গাছের এ সাধনার সঙ্গে মানুষের অধ্যবসায়ের মিল রয়েছে। মানুষের কেবল বেঁচে থাকার জন্য জীবন যাপন করা উচিত নয়। প্রথম থেকেই তার অন্যের কল্যাণ কামনা করার মন-মানসিকতা থাকা দরকার। এভাবেই মানুষের জীবন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

প্রবন্ধকার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যুক্তির অবতারণা করেছেন। ফুলের ফোটা ও নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নদী একদিন সমুদ্রে পতিত হয়। মানবজীবনও এমনই কঠিন। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। আনন্দ বেদনা, ভাল-মন্দ মিলেই জীবন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু নদী কখনও মানব জীবনের উপমা হতে পারে বলে লেখক মনে করেন না। যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, নদী সাগরে মিলিত হলে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন নদীর আর কোনো বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় থাকে না, সাগরের পরিচয়েই তার পরিচয়। নদী তাই সাগরে মিলিত হয় না, আত্মবিসর্জন দেয়। কিন্তু বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনে ছবির মতোই ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে গাছ যখন ভরে যায়, তখন তার সাধনা ও সার্থকতার দিক দুটোই আমরা সহজে বুঝতে পারি। বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দানে তাই কোনো ভেদ নেই। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে কোনো পার্থক্য নেই। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের পর দীর্ঘ সময় ধরে, বৃক্ষ প্রতীক্ষার পর একদিন ফুলে-ফলে সার্থক হয়। মানুষও তার সাধনার প্রথম স্তর পার হয় নীরবে এবং গোপনে। তারপর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে সবাই তা জানতে পারে। সাধনার পর যা তার প্রাপ্তি, তা কেউ নিজের করে রাখে না; দান করে মানব কল্যাণে। বৃক্ষ জীবনেও তাই। সাধনার পর ফুলের সৌরভ, ফলের স্বাদ কোনোটাই গাছ নিজের জন্য রাখে না, সবই মানুষের জন্যে। এভাবে বিচার করলে দেখা যায় নদীর চেয়ে বৃক্ষই মানুষের জীবনাদর্শ হওয়ার জন্য শ্রেয়। তাছাড়া বৃক্ষের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কারণ প্রতিদিনই আমরা গাছ দেখি। নদীকে দেখা কিংবা তার সাগরে মিলিত হবার দৃশ্য আমরা এত সহজে দেখতে পারি না। অথচ একটি পরিপূর্ণ বিকশিত বৃক্ষ প্রতিদিন আমাদের মানবজীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আমরা বুঝতে পারি কেবল নিজের জন্য জীবন নয়; আমরা সবাই যদি নিজেকে অন্যের কল্যাণের জন্য তৈরি করতে পারি, তবেই হবে মানব জীবনের সার্থকতা। তাই লেখক যথার্থই বলেছেন, "নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।"

আরও যা পড়তে পারেন-

মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে ভাল করে বোঝার জন্য লেখকের 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক পরিচিতি

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর পিতার কর্মস্থল তদানীন্তন বৃহত্তর সিলেট জেলার করিমগঞ্জ (বর্তমান ভারতের কাছাড় জেলার অন্তর্গত) শহরের নাটখাল এলাকায় সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতা খান সিকন্দর আলী ও মাতা আমতুল মন্নান খাতুন।

শিক্ষানুরাগের পারিবারিক পরিবেশে এবং নবোদ্ভূত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের উদার ও উচ্চ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবন শুরু হয় সুনামগঞ্জ শহরের একটি বিদ্যালয়ে, এরপর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৌলবীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পিতার বদলির সূত্রে সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, কিশোর মুজতবা তার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন। এরপর নিজ উদ্যোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ শুরু করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সিলেটের তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ মুজতবা আলীর শিক্ষাজীবনে বিঘ্ন ঘটায়, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই, পিতার অবাধ প্রশ্রয়, দুই অগ্রজের সম্মতি ও অনুপ্রেরণা এবং সতীর্থদের শুভেচ্ছা সম্বল করে সৈয়দ মুজতবা আলী সিলেট থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুজতবা শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিলেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিক্ষালাভ তাঁর জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মুজতবা আলী জার্মানের বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ডক্টর অব্ ফিলসফি উপাধি অর্জন করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর কর্মজীবন ছিলো বিচিত্রমুখী। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় আফগানিস্তানের শিক্ষাবিভাগের চাকুরি দিয়ে। এরপর মধ্যবর্তী বিরতিসহ বরোদা কলেজে 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব' বিষয়ে অধ্যাপনা এবং বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মুজতবা আলী দিল্লীস্থ 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স্'-এ সচিব পদে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-তে চাকুরি নেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র চাকুরিতে ইস্তফা দেয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন পাটনা স্টেশনের 'স্টেশন ডিরেক্টর'। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে রীডার পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণ করে সার্বক্ষণিকভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ভ্রমণ ও রম্যসাহিত্য রচয়িতা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত। বাংলা গদ্যে এক বিশেষ বাক্ভঙ্গির প্রবক্তারূপে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বহুভাষাবিদ মুজতবা আলী বৈঠকি ঢঙে সাহিত্যে বিদ্রূপ ও কৌতুক এবং এর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন বৈদগ্ধ্যের।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জন্মভূমি স্বাধীন বাংলাদেশে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিজি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর উল্লেখযোগ্য রচনা

দেশে বিদেশে (১৩৫৬), পঞ্চতন্ত্র ১ম ও ২য় খন্ড (১৩৫৯, ১৩৭৩), চাচাকাহিনী (১৩৫৯), ময়ূরকণ্ঠী (১৩৫৯), জলেডাঙ্গায় (১৩৬৩), শবনম (১৩৬৭), ভবঘুরে ও অন্যান্য (১৩৬৯), টুনিমেম (১৩৩), তুলনাহীনা (১৩৭৪)।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করবেন।
২. লেখকের অসাধারণ বাকপটুত্ব ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় লাভ করবেন।
৩. বাঙালি জীবনের কিছু ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কথা জানতে পারবেন।

ভূমিকা

"বই কেনা" প্রবন্ধটি সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব (১৩৫৯) থেকে সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, কিন্তু এর পরিবেশনা পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ দিয়ে সাজানো। মুজতবা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো- তিনি গুরু বিষয়কে লঘু চালে উপস্থাপন করে পাঠক-বিবেককে জাগিয়ে তোলেন। তাঁর রচনায় কৌতুক বিদ্রূপ এবং পরিহাসের বৈঠকি আলাপচারিতার আবরণ থেকে বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। বিষয় ও শৈলীর এ 'মণিকাঞ্চন যোগ' বাংলা গদ্যে সুলভ নয়। সৈয়দ মুজতবা আলী তাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের চর্চায় এক বিরল ব্যতিক্রম।

"বইকেনা" প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্রের জাতিগত দীনতার একটি দিক কৌতুক ও বিদ্রূপের আবরণে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

এ প্রবন্ধে একদিকে যেমন বাঙালির স্বভাব জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসবোধের স্বীকৃতি আছে, অন্যদিকে তেমনি তার বই কেনার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অনীহার কথাও অকপটে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ জীবনে বইয়ের ভূমিকা, মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বইয়ের অবদান অত্যন্ত রসালো ভাষায় ও যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন লেখক। বাঙালির বইকেনার ক্ষেত্রে অনীহার অবসান কামনাই 'বই কেনা' প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে লেখককে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আনাতোল ফ্রাঁস-এর অনুসরণে মনের চোখ প্রসারিত করার উপায় সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- মনের চোখে ফোটানোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে বইয়ের গুরুত্ব বিচার করতে পারবেন।
- বাঙালি-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মাছি-মারা কেরানী – যে কর্মচারী বিচার না করে অন্ধভাবে কাজ করে যায়। **পর্যবেক্ষণশীল** – যিনি ভাল করে দেখেন। **চক্রাকার** – চাকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। **আনাতোল ফ্রাঁস** – ফরাসি সাহিত্যিক। জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯২৪। প্রকৃত নাম	মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত, সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়। তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, "হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবাল, বিস্তৃত এ সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।" কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায় এবং

বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, "কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।"

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটি প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন-সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া।" যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল–আরো কত কি!

কিন্তু প্রশ্ন, এ অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশভ্রমণ করার মতো সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন–

Here with a loaf of bread beneath the bough,
A flask of wine, a book of verse and thou,
Beside my singing in the wilderness
And wilderness is Paradise Enow

রুটি মদ ফুটিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা–যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেননি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী হয়রত মুহাম্মদ (স) শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে, 'আল্লামা বিল কালাম' আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই– Per Excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক – The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেশভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা– "অত কাঁচা পয়সা কোথায় বাওয়া যে বই কিনব"।

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য– কনিষ্ঠ পরিমাণ লুকানো রয়েছে। সেটুকু এ যে, বই কিনতে পয়সা লাগে–ব্যস্। এর বেশি কিছু নয়।

সান্‌কোয়েজ আনতোলে থিবোল্ট। গল্প, রাজনৈতিক উপন্যাস এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিখ্যাত গ্রন্থ থেইস (১৮৯০), জোকাস্টে এট্‌লী চ্যাট সেইগ্রে (১৮৭৯), এল ওরমে ডু মেইল (১৮৯৭)।

আচক্রবাল – দিগন্তবৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

ধরণী – পৃথিবী।

সান্ত্বনা – আশ্বাস, প্রবোধ।

আরব্য উপন্যাস – আরবদেশীয় উপাখ্যান।

প্রবৃত্তি – স্পৃহা।

বারট্রান্ড রাসেল – জন্ম ১৮৭২, মৃত্যু ১৯৭০। পৃথিবী-বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। বিখ্যাত গ্রন্থ 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'।

ভবযন্ত্রণা – জীবনযন্ত্রণা।

দর্শন – যুক্তি ও প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানশাস্ত্র।

ওমর খৈয়াম – জন্ম খ্রি ১০৭৫, মৃত্যু ১১২৩। ফারসি ভাষার বিশ্ববিখ্যাত কবি। তাঁর রচিত বিশেষ এক ধরনের চতুষ্পদী কবিতার সংকলন 'রুবাইয়াত'। তিনি একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ।

"Here with ... Paradise Enow" – ওমর খৈয়াম-এর এ রুবাইটির অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ড (১৮০৯-৮৩)।

সার-সংক্ষেপ

মাছির মাথায় নাকি অনেক চোখ বসান আছে। তাই সে একইসঙ্গে চারদিকের সবকিছু দেখতে পায়। মাছির মতো এত চোখ মানুষের নেই বলে আনাতোল ফ্রাস দুঃখ করেছেন। কিন্তু একই সাথে সান্ত্বনাও লাভ করেছেন এ বলে যে মানুষের মনের চোখ তো দুটি হয়। যত ইচ্ছা ততই মনের চোখ বাড়ান যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আয়ত্ত করা যায় ততই একটি একটি করে মনের চোখ ফুটতে থাকে।

চোখ বাড়ানোর প্রধান উপায় বই পড়া। বারন্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার জন্য মনের ভুবন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর মনের ভুবন সৃষ্টি করতে হলে পড়তে হয় বই। কবি ওমর খৈয়াম বেহেশতের ফিরিস্তি বানাতে যেয়ে বই-এর কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্মে 'আল্লামা বিল কালাম' বলে পুস্তকের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ পুস্তক। হিন্দুধর্মে গণের দেবতা অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা গণপতি ভারবহন করেন গ্রন্থ রচনার।

সবধর্মের বই-পুস্তকের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতি নাকি বই কেনে না পয়সার অভাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আনাতোল ফ্রাঁস মনের চোখ প্রসারিত করার কী উপায় নির্দেশ করেছেন?
২. প্রবন্ধকারের অনুসরণে মাছি ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. মনের চোখ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে লেখক কী মন্তব্য করেছেন?
৪. ওমর খৈয়াম তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বর্গকে কী কী সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়েছেন?
৫. ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহে বইয়ের গুরুত্ব কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে?
৬. বারট্রান্ড রাসেলের অনুসরণে মনের চোখ প্রসারিত করার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : আনাতোল ফ্রাঁস মনের চোখ প্রসারিত করার কী উপায় নির্দেশ করেছেন?

উত্তর : মাছির মাথার চারদিকে গাদা গাদা চোখ বসানো থাকার কারণে মাছি একসঙ্গে সবদিক দেখতে পায়। কিন্তু দুচোখ থাকার কারণে মানুষ কেবল তার সামনের বস্তুকে দেখতে পায়। ফরাসি সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস মানুষের এ সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে প্রথমে আপসোস করলেও, পরে এ সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, মানুষের আছে মনের চোখ। মনের এ চোখকে সংকুচিত-প্রসারিত করা মানুষেরই এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ তার জানার আকাঙ্ক্ষাকে তুষ্ট করার জন্য যতোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করবে, ততোই তার মনের চোখ প্রসারিত হতে থাকবে। মাছি অনেক চক্ষুবিশিষ্ট হলেও সে হৃদয়শূন্য। পক্ষান্তরে মানুষ দুই চক্ষুবিশিষ্ট হলেও বিশাল মনের অধিকারী। মনের চোখকে প্রসারিত করার জন্য মানুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, চর্চার মাধ্যমে অসংখ্য মনের চোখকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

প্রশ্ন : প্রবন্ধকারের অনুসরণে মাছি ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : শিক্ষিত বাঙালি সমাজে 'মাছিমারা কেরানি' বহুল প্রচলিত একটি প্রবচন। যে কর্মচারী শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার না করে অন্ধভাবে কাজ করে যায়; শিক্ষিত বাঙালিসমাজে তাকেই বলা হয় মাছিমারা কেরানি। এ শ্রেণীর কর্মচারীর বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিত্বহীনতা। এ প্রবচনটির পেছনে যে জনশ্রুতি প্রচলিত তাহলো কোনো এক কেরানিকে কিছু নথি নকল করার

নির্দেশ দেয়া হলে ঐ ব্যক্তি মূল নথিতে একটি মৃত মাছি দেখতে পেয়ে একটি জ্যান্ত মাছি মেরে নকল করা কাগজের নির্ধারিত স্থানে সেটি জুড়ে দেয়। বিচার বুদ্ধি অন্ধ অনুকরণের এ দৃষ্টান্তই মাছিমারা কেরানি প্রবচনটির জন্ম-উৎস। প্রবচনের কেরানি মাছি বধ করলেও, মাছি মারা কিন্তু সহজ কাজ নয়। লেখক জানাচ্ছেন যে, মাছির মাথার চারদিকে চক্রাকারে অসংখ্য চোখ থাকে বলে মাছি একই সময়ে সবদিক দেখতে পায়। ফলে সামনে বা পিছনে যেদিক থেকেই মাছিকে আক্রমণ করা হোক না কেন, পূর্বেই দেখে ফেলে বলে মাছিকে মারা খুবই কঠিন কাজ। মানুষ দুই চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণী-মাছির মতো একসঙ্গে সে সবদিক দেখতে পায় না। মাছির তুলনায় মানুষের এ দীনতা কিন্তু প্রকৃত অর্থে দীনতা নয়। কারণ মাছি বহুচোখের অধিকারী হলেও সে হৃদয় বা মন শূন্য। পক্ষান্তরে মানুষ দুচক্ষুবিশিষ্ট হলেও মানুষের রয়েছে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মনশ্চক্ষু।

প্রশ্ন : ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহে বইয়ের গুরুত্ব কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে?

উত্তর : হজরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, যা পবিত্র আল-কুরআন-এর প্রথমেই লিপিবদ্ধ আছে, তাহলো – 'আল্লামা বিল কালাম' আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের' মাধ্যমে। কলমের আশ্রয় গ্রন্থ। এ হিসেবে পবিত্র আল-কুরআনে গ্রন্থের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল-এর অর্থ বই, Per Excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক 'The Book`। খ্রিস্ট ধর্মেও তাই গ্রন্থের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু ধর্মে সর্ব পূজার শুরুতে বিঘ্ন সংহারক রূপে যে দেবতার পূজা করা হয়, সেই দেবতা গণপতি বা গণেশ বৃহত্তম গ্রন্থ লেখার গুরুভাবে নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। 'গণ' অর্থ জনগণ, আর জনগণের দেবতাই গণপতি। কাজেই জনগণ যদি গ্রন্থের সম্মান না করতে শেখে, তাহলে দেশভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. "হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবাল, বিস্তৃত এ সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।"

২. "... নানা জ্ঞান বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।"

৩. পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

৪. "সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া"

৫. রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা– যদি তেমন বই হয়।

৬. কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না।

ব্যাখ্যার নমুনা উত্তর

"সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া"

উদ্ধৃতিটি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'বই কেনা' নামক রচনা থেকে চয়ন করা হয়েছে। উক্তিটি দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেলের।

মাছির মাথার চারদিকে চক্রাকারে অসংখ্য চোখ সাজানো থাকলেও মানুষের মতো তার মনের চোখ নেই। মানুষ তার মনের চোখকে সংকুচিত-প্রসারিত করতে পারে। দেশ বিদেশের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মানুষ মনের চোখের প্রসারণ ঘটাতে পারে। পৃথিবীর অন্য সব সভ্য জাতি যতোই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, বাঙালি ততোই নিজের সীমাবদ্ধ জগতে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে। বাঙালি অনায়াসে বই পড়ে এবং বই কেনার প্রবৃত্তি অর্জন করে চোখকে প্রসারিত করার শক্তি অর্জন করতে পারে। মনের চোখ ফোটানোর আবশ্যকতা ব্যাখ্যায় দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল-এর বক্তব্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাসেল মনে করেন সামাজিক জীবন হিসেবে মানুষকে অনেক দুখ-কষ্ট সইতে হয় বলে এর থেকে পরিত্রাণের পথও তাকে সন্ধান করতে হয়। তিনি মনে করেন জীবনযন্ত্রণাকে এড়িয়ে চলার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর স্বকীয় ভুবন বা জগৎ সৃষ্টি করে নেয়া এবং বিপদ কালে তার মধ্যে ডুব দেয়া। মনশ্চক্ষুর অধিকারী মানুষের সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের কথা রাসেলের এ বক্তব্যের মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে।

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা- যদি তেমন বই হয়।

উদ্ধৃত বাক্যটি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'বই কেনা' রচনার অন্তর্গত। এ অংশে কবি ওমর খৈয়াম-এর একটি রুবাই-এর অনুসরণে লেখক প্রকৃত গ্রন্থের চিরায়ত মূল্য সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম স্বরচিত একটি রুবাই-এ কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের উপকরণের তালিকায় রুটি, মদিরা এবং প্রিয়ার সঙ্গে পদ্যগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রন্থের সাহচর্যে স্বর্গবাসও যে মোহনীয় হয়ে উঠতে পারে ওমর-এর কবিতায় সে সত্যই প্রকাশিত। বর্তমান নিবন্ধের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী কবিতাটির বিষয়বস্তু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ওমর এর কাঙ্ক্ষিত স্বর্গে একসময় রুটি ও মদ ফুটিয়ে যাবে, মদের প্রতিক্রিয়ায় প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইটি থেকে যাবে অনন্তযৌবনা – 'যদি তেমন বই হয়'। একটি মহৎ গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন থাকে অপার সম্ভাবনা। প্রতিবার পাঠে একটি মহৎ গ্রন্থ নতুন-নতুন তাৎপর্য নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। এজন্যেই কালজয়ী গ্রন্থের আবেদন নিঃশেষ হয় না। লেখক তাই যথার্থভাবেই গ্রন্থকে অনন্তযৌবনা বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্বের 'বই কেনা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত বাক্যটি নেয়া হয়েছে। এতে বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির স্বভাব কৃপণতা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন লেখক।

ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থসমূহে পুস্তকের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআন এর শুরুতেই আল্লাহ যে মানুষকে 'কলম এর মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন, তার উল্লেখ আছে। বাইবেল শব্দের অর্থও বই। হিন্দুদের সনাতন ধর্মে যে দেবতাকে সকল বিপদের ত্রাতারূপে স্মরণ করা হয়, সেই দেবতা গণপতি বা গণেশ বৃহত্তম গ্রন্থ লেখার গুরুভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মের দৃষ্টান্ত বই কেনার ব্যাপারে স্বভাব কৃপণ বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করে না। সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত প্রবচন 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' কে পরিবর্তন করে বাঙালির উদ্দেশ্যে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করেছেন। বাঙালি বই কেনার প্রসঙ্গ আসলেই ধর্মের দৃষ্টান্তকে এড়িয়ে চলে, অজুহাত তোলে কাঁচা টাকার অভাবের। লেখকের মতে এ মনোভাবের পশ্চাতে যে সত্য প্রচ্ছন্ন তা নিতান্তই তুচ্ছ; কড়ে আঙুল পরিমাণ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাঙালি পাঠক ও প্রকাশকের মনোভাব ব্যাখ্যা করে লিখতে পারবেন।
- লেখকের অনুসরণে বই কেনার উপযোগিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
প্রকাশক – গ্রন্থ প্রকাশ করেন যে ব্যবসায়ী। **আনা** – $\frac{১}{১৬}$ টাকা। **পাঁচসিকে** – ১টাকা ৪ আনা। **নাভিশ্বাস** – মুমূর্ষু অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী শ্বাসের টান। **দেউলে** – নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য। **চক্র** – কর্মবিপাক, ঘটনার ফের। **এক্সপেরিমেন্ট** – পরীক্ষা, experiment। **নারাজ** – অসম্মত। **বাজেট** – অর্থ সংস্থান ও ব্যয় পরিকল্পনা, budget. **অগ্রপশ্চাৎ** – আগ-পাছ, পূর্বাপর। **সংসারী** – হিসেবী অর্থে। **পাঁড় পাঠক** – সাহিত্যরসে অতিশয় আসক্ত পাঠক। **খিচিয়ে** – ভেংচিয়ে, মুখ বিকৃত করে। **ক্ষ্যাপা** – উন্মাদ। **চুর হয়ে থাকা** – বুঁদ হয়ে থাকা। **ব্যসন** – নেশা। **লিভার** – যকৃৎ। **পটল তোলা** – মারা যাওয়া। **Producer**– উৎপাদক। **তামাকের মিকচার** – তৈরি করা তামাক।	বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও' তবে সে বলে, "বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে।" "কেন মশাই, সংখ্যার দিক দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এ ধরুন, ফরাসি ভাষা। এ ভাষায় বাংলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচসিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?" "আজ্ঞে, ফরাসি প্রকাশক নির্ভয়ে যে কোন ভাল বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস উঠে দুজাহার ছাপাতে গেলেই। বেশি বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?"। তাই এ অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না। এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ–দেউলে হবার ভয়ে। কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন। ভেবে- চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যখানে। এ একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুন সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয়না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না। আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে Producer এবং Consumer। তামাকের মিকচার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে Producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই Consumer; আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই Produce করেছি। কেউ কেনে না বলে আমিই Consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

সার-সংক্ষেপ

বইয়ের দাম কম হলে অধিক সংখ্যক বই বিক্রি হবে নিশ্চয়। কিন্তু বাঙালি প্রকাশকের পক্ষে বইয়ের দাম কমানো ঝুঁকিপূর্ণ। পাঠক যদি অধিক সংখ্যক বই ক্রয় করে তাহলে প্রকাশনার জগতে সংকট থাকে না। কিন্তু বই কেনার ক্ষেত্রে বাঙালির রয়েছে স্বভাবগত অনীহা।

পাঠক প্রকাশকের এ চক্র ছিন্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু কে করবে এ কাজ? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কেননা এর সঙ্গে তার রুটি-রুজির তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। দেউলে হওয়ার আশঙ্কায় ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। কাজেই এ ক্ষেত্রে পাঠককেই এগিয়ে আসতে হবে। কেননা বই কিনে কেউ কখনো দেউলে হয়নি।

হিসেবি লোক ভেবেচিন্তে বই কেনে। সাহিত্য রসে নিমজ্জিত পাঠক প্রথমে বই কেনে দাঁতমুখ খিচিয়ে, এবং শেষে বেহিসেবির মতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বইয়ের দাম না কমানোর পক্ষে প্রকাশকের যুক্তি ব্যাখ্যা করুন।
২. বই না কেনার পক্ষে বাঙালি পাঠকের অজুহাত ব্যাখ্যা করুন।
৩. ক্রেতা-সমস্যা এবং প্রকাশনার সংকট নিরসনে লেখকের অভিনব উদ্যোগের পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : ক্রেতা-সমস্যা এবং প্রকাশনার সংকট নিরসনে লেখকের অভিনব উদ্যোগের পরিচয় দিন।

উত্তর : বইয়ের দাম কম থাকলে অধিক সংখ্যক বই বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশি সংখ্যক বই বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কম রাখা সম্ভব হয় না। পাঠক এবং প্রকাশক দুই তরফের দিক থেকেই বিষয়টি সমস্যার। লেখকের বিশ্বাস বই কিনে মানুষ কখনো দেউলে হয় না। প্রকাশনার সঙ্গে রুটিরুজির প্রশ্ন জড়িত থাকায় প্রকাশকের পক্ষে যা ঝুঁকি, পাঠকের পক্ষে তা নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। লেখক উপর্যুক্ত সমস্যা নিরসনে এক কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি একাধারে গ্রন্থ প্রকাশ করে Producer হয়েছেন, আবার গ্রন্থটির কাটতি কম হওয়ায় মাঝে মাঝেই Consumer সেজে বইটি কিনে এনেছেন। লেখকের এ কৌতুকের মধ্যে কিন্তু প্রচ্ছন্ন রয়েছে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ। বাঙালি পাঠকের গ্রন্থ ক্রয়ে অনীহার কারণেই কখনো কখনো লেখককে নিজের এ কেনার বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এ ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখক বাঙালি মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।
২. কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।
৩. মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।
৪. এ একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুন সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

আলোচ্য বাক্য সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের 'বই কেনা' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাক্যটিতে 'বই কেনা' প্রসঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।

বইয়ের দাম বেশি বলে বাঙালি পাঠক বই কিনতে নারাজ, অন্যদিকে পাঠক বই কেনে না বলে বাঙালি প্রকাশক বইয়ের দাম কমাতে অপারগ। ব্যবসায়ী প্রকাশকের পক্ষে আর্থিক কারণে বইয়ের দাম কমানো ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু একটি বই কেনা পাঠকের জন্য নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির রয়েছে বই কেনায় স্বভাব-অনিচ্ছা। অথচ বই কিনে কেউ কপর্দকশূন্য বা দেউলে হয় না কখনো। পক্ষান্তরে প্রচুর বই কিনে চেতনাগতভাবে সে সমৃদ্ধ হতে পারে। জ্ঞানের ঐশ্বর্যে, দৃষ্টিভঙ্গির বিশালতায় সে হতে পারে বিশিষ্ট। বইকেনার বাজেট তিনগুণ বাড়িয়ে একজন পাঠক তার মনের চোখকে প্রসারিত করতে পারে, পারে আনাতোল ফ্রাস কথিত মাছির মতো অনেকগুলি চোখের অধিকারী হতে; সৃষ্টি করতে পারে বারট্রান্ড রাসেল কথিত অসংখ্য আত্মগত ভুবন।

এ একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুন সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত **পঞ্চতন্ত্র ১ম** পর্ব গ্রন্থের 'বই কেনা' প্রবন্ধের অন্তর্গত। লেখক গ্রন্থপাগল ক্রেতার বেহিসেবি বই কেনার ইতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বই কেনে কেউ কখনো দেউলে হয় না। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশেষত মদ্যাসক্তদের মধ্যে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত হয়ে মদ্যপের চোখে বস্তুজগৎ বিকৃত রূপে ধরা দেয়, যকৃতের রোগে আক্রান্ত হয়ে তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। কিন্তু গ্রন্থাসক্তের পক্ষে এ-রকম কোনো আশঙ্কার অবকাশ নেই। তার আসক্তি তাকে আবদ্ধ করে না, জ্ঞানের বৃহত্তর জগতে তার প্রবেশাধিকারকে বাধামুক্ত করে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দুনিয়ার মানুষ কীভাবে লাইব্রেরী গড়ে তোলে তা বলতে পারবেন।
- লেখকের অনুসরণে জ্ঞানী ও ধনীর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বই কেনার ক্ষেত্রে বাঙালি মানসিকতা এবং বই সম্পর্কে বাঙালি দম্পতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মার্ক টুয়েন – জন্ম ১৮৩৫, মৃত্যু ১৯২০। প্রকৃত নাম স্যামুয়েল এল. ক্লেমেনস। ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ টম সয়ের, হকেলবেরি ফিন্। **কার্পেট** – গালিচা। **স্তূপীকৃত** – রাশীকৃত। **শেলফ** – বইয়ের তাক। **লাইব্রেরি** – গ্রন্থাগার। **বিবেক বর্জিত** – বিবেকশূন্য। **কামানো** – রোজগার করা। **বিচক্ষণ** – জ্ঞানী, সুবিবেচক।	মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের ওপরও গাদা গাদা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত– পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, "বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেল্ফ যোগাড় করছ না কেন?" মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, "ভাই, বলেছেন ঠিকই– কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্ফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।" শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকেই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক- বিবর্জিত। তার কারণটা কি? এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম। পণ্ডিত লিখেছেন, "ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম।

চক্ষুগোচর – দৃষ্টিসীমার অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে – অপরপক্ষে।

কিউ.ই.ডি. Q.E.D.– quod erat demonstrandum যা দেখানো হবে/প্রমাণিত হবে।

মহত্তর – অধিকতর মহৎ।

অকাতরে – খেদ না করে, বিনা দুঃখে।

ড্রইংরুম বিহারিনী – বিভিন্ন বাড়ির বৈঠকখানায় বিচরণ করে বেড়ান যে নারী।

সওগাত – উপহার।

গরবিনী – গর্বিতা।

ধনী – বিত্তশালিনী এবং যুবতী এ দুঅর্থে লেখক শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

ওঁর – উনার (সংক্ষিপ্ত রূপে সম্মানার্থে ‘ঁ’ ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন– না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহনতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে, জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে পায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না–বই পড়তে পারে না।”

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ.ই.ডি. দিয়ে ‘অতএব সপ্রমাণ হলো জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।’

সেদিন তাই শোক প্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছু তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, “তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?” গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, “সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।”

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।

সার-সংক্ষেপ

বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে ঔপন্যাসিক মার্ক টুয়েন গড়ে তুলেছিলেন বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। শুধু মার্ক টুয়েনই নন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে এবং কিছু ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে। যে ব্যক্তি প্রখর নীতিবোধ সম্পন্ন, তার কাছেও পরের বই দিয়ে গ্রন্থাগার সাজানোর ব্যাপারটি অপরাধ বলে গণ্য হয় না। গলা কেটে ফেল্‌লেও যে ব্যক্তি পরের জিনিস স্পর্শ করে না, সে লোকই রহস্যজনকভাবে বইয়ের ক্ষেত্রে বিবেকশূন্য! এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যায় এক আরব পণ্ডিতের লেখায়। তিনি দুই বিত্তশালী ও জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে ধনী প্রচুর অর্থ আয় করে যদি জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয় তবে জ্ঞানী ব্যক্তিটি পরমানন্দে মহৎ কাজে ব্যয় করতে পারেন। অপরপক্ষে জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে যে পুস্তকগুলোয় সেগুলি ধনীর হাতে তুলে দিলেও তার পক্ষে সেগুলির যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয় না। আরব পণ্ডিত তাই এ সিদ্ধান্ত পৌঁছান যে জ্ঞানার্জনের পথ ধনার্জনের চেয়ে অধিকতর মহৎ। এজন্যেই, কেবল বাংলাদেশ ছাড়া সকল দেশের প্রকৃত মানুষ বই সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী এক বাঙালি নগরবাসিনীর কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দিয়ে বাঙালির গ্রন্থবিমুখতার স্বরূপটি চিহ্নিত করেছেন। অফুরন্ত অবসর যাপন করে বিভিন্ন বৈঠকখানায় বিচরণ করে বেড়ান যে মহিলা, তিনি তার স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে উপহার সামগ্রী কেনার জন্য দোকানে যান। কিন্তু সবকিছুই নিজের সংগ্রহে থাকার কারণে তার পক্ষে কিছুই কেনা হয় না। দোকানি এটা-ওটা দেখিয়ে গলদকর্ম হয়ে শেষ অবধি একটি বই কেনার প্রস্তাব রাখে। কিন্তু গর্বিতা ও ধনাঢ্য এ যুবতী নাক সিট্‌কে জবাব দেন যে, এ রকম একটা জিনিস তার স্বামীর সংগ্রহে রয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই একটি বই সংগ্রহে থাকার গর্বে কীভাবে নির্বোধের মতো তৃপ্তি অনুভব করতে পারে- এ কাহিনী উপস্থাপন করে লেখক গ্রন্থবিমুখ বাঙালি সমাজের ভেতরের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঔপন্যাসিক মার্ক টুয়েন কীভাবে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন?
২. বই সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ বিবেক বর্জিত হয় কেন? এ ব্যাপারে আরব পণ্ডিত কী মনে করেন?
৩. পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ লাইব্রেরি গড়ে তোলে কীভাবে?
৪. বইয়ের ব্যাপারে 'ড্রইংরুম বিহারিনী' বাঙালি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : বই সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ বিবেক বর্জিত হয় কেন? এ ব্যাপারে আরব পণ্ডিত কী মনে করেন?

উত্তর : পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই গ্রন্থাগার গড়ে তোলে কিছু বই কেনে এবং কিছু ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে। যে ব্যক্তির জীবন প্রখর নীতিবোধ দ্বারা চালিত, তাঁর কাছেও পরের বই দিয়ে গ্রন্থাগার সাজানোর ব্যাপারটি বিবেকবর্জিত বিষয় বলে গণ্য হয় না। কেননা পরের এ সংগ্রহ করে ধন অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় জ্ঞান। আর জ্ঞান আহরণের মধ্যে নেই কোনো অপরাধ। আরব-পণ্ডিত ধনী ও জ্ঞানীর মধ্যে তুলনা বিচার করে বিষয়টির গ্রহণযোগ্য মীমাংসা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ধনীর আয় করা প্রভূত অর্থ সৎকাজে ব্যয় করার সামর্থ্য রাখেন জ্ঞানী ব্যক্তি। অপরপক্ষে জ্ঞানীর জ্ঞানসাধনার ফল সঞ্চিত থাকে যে সব পুস্তকে, সেগুলি ধনীর হাতে জোর করে তুলে দিলেও ধনী ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির যর্থাথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। আরব পণ্ডিত তাই মনে করেন যে 'জ্ঞানার্জন' ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর'।

প্রশ্ন : বইয়ের ব্যাপারে 'ড্রইংরুম বিহারিনী' বাঙালি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

উত্তর : বাঙালির গ্রন্থবিমুখতার ও অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী এক নগরবাসিনীর কৌতুককর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। অফুরন্ত অবসর যাপন করে শহরের বিভিন্ন বৈঠকখানায় বিচরণ করেন ঐ মহিলা। তিনি তার স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে কিছু উপহার কেনার জন্য দোকানে যান। দোকানের কোনো কিছুই তার পছন্দ হয় না। তার ড্রইংরুমে সাজানো আছে সবকিছুই। দোকানি এটা ওটা দেখিয়ে গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে একটি বই কেনার প্রস্তাব রাখে মহিলাটির কাছে। এ প্রস্তাবের উত্তরে ধনাঢ্য ও গর্বিতা এ যুবতী নাক সিট্‌কে জবাব দেন, এ-রকম একটা জিনিসও তার স্বামীর সংগ্রহে রয়েছে। অন্যান্য প্রদর্শন যোগ্য বস্তুর মতোই যে একটি বইয়ের মূল্য এবং একটি মাত্র বই সংগ্রহে থাকলেই যে গ্রন্থ জাতীয় বস্তু সংগ্রহের দৃষ্টান্তটি পূর্ণ হয়ে যায় – এ রকম স্থূল এবং মেধাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি মহিলাটির সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে।
২. যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকেই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক বিবর্জিত।
৩. 'অতএব সপ্রমাণ হলো জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর'।
৪. প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।
৫. যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।

'অতএব সপ্রমাণ হলো জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর'।

উদ্ধৃত বাক্যটি সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের 'বই কেনা' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ অংশে বই সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষের বিবেকবর্জিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় এক আরব পণ্ডিতের মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি কঠিন নীতির শাসন দ্বারা চালিত হয় সে ব্যক্তিত্ব অন্যের কাছ থেকে ধার করা বই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। কঠোর নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিও বই সংগ্রহের ঐ পদ্ধতিকে বিবেকবর্জিত ব্যাপার বলে মনে করেন না। এক আরব পণ্ডিতের দেয়া ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে লেখক ব্যাপারটির কারণ সন্ধান করেছেন। আরব-পণ্ডিত দুই বিত্তবান ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রসঙ্গে ধরে দেখিয়েছেন যে, ধনী ব্যক্তি প্রচুর অর্থ যদি জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয় তবে জ্ঞানী ব্যক্তিটি মহানন্দে তা সৎ-উদ্দেশ্যের ব্যয় করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে জ্ঞানীর জ্ঞানসাধনার ফল সঞ্চিত থাকে যে সব পুস্তকে সেগুলি ধনীর হাতে জোর করে তুলে দিলেও ধনী ব্যক্তিটির পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয় না। এ দৃষ্টান্ত থেকেই আরব পন্ডিত এ-রকম সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, জ্ঞানার্জন ধন অর্জনের চেয়ে অধিকতর মহৎ কাজ।

প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।

আলোচ্য অংশ রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্বের 'বই কেনা' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে বাংলার মানুষের গ্রন্থবিমুখতার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক।

জ্ঞানের বাহন পুস্তক। পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে ধার করা বই পর্যন্ত ফেরৎ দেয় না। কিন্তু বাঙালি স্বভাবতই গ্রন্থবিমুখ। গ্রন্থ ক্রয় করে অর্থ ব্যয় করাকে অপব্যয় বিবেচনা করে বাঙালি। বাঙালিরা অনাবশ্যক খাতে অর্থ খরচ করে। কিন্তু গ্রন্থ ক্রয় করা যে খরচ নয়, সঞ্চয় তা তারা ভেবে দেখে না। পৃথিবীর প্রকৃত মানুষের তুলনায় বাঙালি মানসের এ দীনতা পীড়িত করেছে লেখককে।

বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য মানুষ অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু গ্রন্থ বিমুখতা বাঙালির স্বভাবের অংশ।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ফরাসিরা গ্রন্থের প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বন্ধু-লেখকদের বিরুদ্ধে আঁদ্রে জিদের প্রতিশোধ নেয়ার কাহিনীটি লিখতে পারবেন।
- জ্ঞানতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মোক্ষম – নির্ঘাত। **মারাত্মক** – সাঙ্ঘাতিক। **ডাহা** – সম্পূর্ণ। **বেইজ্জত** – অপদস্থ, অপমানিত। **দংশন** – কামড়ান। **আঁদ্রে জিদ** – জন্ম ১৮৬৯, মৃত্যু ১৯৫১। ফরাসি ঔপন্যাসিক। ১৯৪৭-এ সাহিত্যে নোবেল	অথচ এ বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন, আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জত করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশগুণ নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে। আঁদ্রে জিদের মেলা বন্ধু-বান্ধব ছিলেন–অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসে স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদের পিছনে–গালিগালাজ কটুবাটব্য করে

জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সবকিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল–তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুর্চ্ছা গেল। কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যেসব লেখক জিদের হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষরসহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভুমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম–কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন–জাহাজের টাইপ করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিলেন।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন–যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাংলাদেশে নাকি একবার এ রকম টিকিট বিক্রি হয়েছিল)।

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেননি।

আর কত বলবো? বাঙালির কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত, আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটেট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভু-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালির পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা?ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না, সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খোশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হলো। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এ প্রতিহিংসার খবরটিও রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

পুরস্কার লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ রচনা- টেসে (১৯৪৬), লা পোর্টে (১৯০৯), সোল (১৮৯৫)।

প্রাণঘাতী – মৃত্যু ঘটায় এমন।

কেতাব – গ্রন্থ।

প্যারিস – ফ্রান্সের রাজধানী।

স্তালিনীয়রা – জে.ভি. স্ট্যালিন-এর (১৮৭৯-১৯৫৩) অনুসারীবৃন্দ। ১৯২৪ সনে লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর হাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন সোভিয়েত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

কটুকাটব্য – কড়া কথা, গালমন্দ।

জিগরে – কলিজায়, যকৃতে।

মূর্চ্ছা – অচৈতন্য, অজ্ঞান অবস্থা।

সম্বিত – জ্ঞান, হুঁশ।

মুক্তকচ্ছ – কাছাখোলা।

চক্ষুস্থির – বিস্ময়জনিত হতবুদ্ধিতা।

জঞ্জাল – আবর্জনা।

ভুমধ্যসাগর – ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত সাগরবিশেষ।

রয়টার – বার্তা সংস্থা।

সাড়ম্বরে – আড়ম্বরসহ।

টিকি – ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুগণ কর্তৃক মস্তকের মধ্যভাগে সংরক্ষিত কেশগুচ্ছ।

হটেনটেট – আফ্রিকার নির্বোধশ্রেণীর উপজাতি।

ভূ-ভারত – পৃথিবী ও ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবী।

অবলা – বলহীনা; বাকশক্তিহীন।

কিউ – অপেক্ষমান মানুষের সারি Queue।

গূঢ়ার্থ – মর্মার্থ, অপ্রকাশিত অর্থ,

গুপ্ত অর্থ। **হেকিম** – ইউনানি চিকিৎসক। **বাহ্যজ্ঞান** – ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, চেতনা। **বিষবাণ** – বিষ রূপ বাণ। **বৈরাগ্য** – অনাসক্তি, উদাসীনতা।	

সার-সংক্ষেপ

বইকে প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফরাসিরা। কাউকে অপমান করতে হলেও তারা বইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্যারিস শহরে যোশেফ স্ট্যালিন-এর অনুসারী যারা ছিলেন তারা জিদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। জিদ-এর বন্ধু বান্ধবদের অধিকাংশই ছিলেন ফ্রান্সের নামকরা লেখক। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করলেন তাঁরা; জিদের পক্ষ হয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন না। অপমানিত জিদ স্থির করলেন এর উচিত প্রতিশোধ তিনি নেবেন। কিছুদিন পরেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরুলো আঁদ্রে জিদ তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বিক্রি করে দিতে মনস্থির করেছেন। জিদ জঞ্জাল সাফ করার জন্য সেই সব বইই নিলামে উঠিয়েছিলেন, যে বইগুলি তিনি উপহার পেয়েছিলেন সেই সব বন্ধুদের কাছ থেকে যারা তাঁর পক্ষ হয়ে লড়েন নি। অপমানিত লেখকরা তখন তড়িঘড়ি লোক পাঠিয়ে তাঁদের উপহার দেয়া বইগুলি দ্বিগুণ দামে কিনিয়ে নিয়েছিলেন।

বাঙালি আফ্রিকার আদিবাসী অসভ্য কোনো জনগোষ্ঠী নয়। অথচ বাঙালির মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক স্ববিরোধিতা। এরা জ্ঞানের জন্য তৃষিত অথচ প্রবলভাবে গ্রন্থবিমুখ! বই কেনার কথা বললেই বাঙালির মুখে রা সরে না। অন্যভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু বই কেনার প্রসঙ্গ আসলেই তার পকেট ফাঁকা। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তীব্র বিদ্রূপ করে লিখেছেন যে, বাঙালির বইয়ের প্রতি উদাসীনতা দেখে মনে হয়, বাঙালি আরব্য উপন্যাসের রাজা ও হেকিমের গল্পটি জানে। আর জানে বলেই মরার ভয়ে বই কেনা ও পড়া ছেড়ে দিয়েছে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফরাসিদের গ্রন্থপ্রীতির পরিচয় দিন।
২. আঁদ্রে জিদ কর্তৃক নিলামে লাইব্রেরি বিক্রি করে দেয়ার কী উদ্দেশ্য ছিলো?
৩. আঁদ্রে জিদ বন্ধু লেখকদের বিরুদ্ধে কোন উপায়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন?
৪. নিজের বন্ধুরা অপমান এড়ানোর জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেছিলেন?
৫. "এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি" লেখক কথাটি বলেছেন কোন্ প্রসঙ্গে?
৬. রাজা ও হেকিমের গল্পের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : আঁদ্রে জিদ কর্তৃক নিলামে লাইব্রেরি বিক্রি করে দেয়ার কী উদ্দেশ্য ছিলো?

উত্তর : ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ তাঁর লেখক বন্ধুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার নিলামে বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফরাসিরা গ্রন্থকে প্রকৃত সম্মান করতে জানে। কাউকে অপমান করতে হলেও তারা বইকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। জিদও অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গ্রন্থকেই বেছে নিয়েছিলেন।

আঁদ্রে জিদ রাশিয়া থেকে ফিরে সোভিয়েট প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্যারিস শহরে স্ট্যালিন-এর অনুসারীবৃন্দ যারা ছিলেন তারা গালিগালাজ করে জিদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। জিদের এ-দুঃসময়ে তাঁর ফরাসি লেখকবন্ধুরা আশ্চর্য নীরবতা পালন করলেন। তাঁদের কেউ জিদ-এর পক্ষ হয়ে কথা বললেন না। অন্তরে ঘা খেলেন জিদ; তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এর উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। এরই সূত্র ধরে সমগ্র ফ্রান্সকে হতচকিত করে তিনি নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রচার করলেন। দলে দলে ফরাসিরা ছুটে এলো নিলামখানায়। কিন্তু নিলামখানার অবস্থা দেখে তাদের চক্ষুস্থির। জিদ নিলামে উঠিয়েছেন সেইসব গ্রন্থ যেগুলিকে তাঁকে তাঁর ফরাসি লেখকবন্ধুরা উপহার দিয়েছিলেন। জিদ-এর মনোভাব যেন এ রকম যে, তিনি তাঁর গ্রন্থাগার-এর আবর্জনা সাফ করতে মনস্থ করেছেন। অপমানিত লেখকবন্ধুরা বড় ধরনের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দ্রুত বইগুলি কিনে ফেললেন। এতে অবশ্য জিদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি বিন্দুমাত্র।

প্রশ্ন : "এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি" লেখক কথাটি বলেছেন কোন্ প্রসঙ্গে?

উত্তর : বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির স্বভাব-অনীহা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্যটি করেছেন। বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু এ-তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম যে বই, তা কেনার ক্ষেত্রে বাঙালি আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন। লেখকের বেদনার কারণ এজন্য যে, বাঙালি আফ্রিকার আদিবাসী অসভ্য কোনো জনগোষ্ঠী নয়, তার রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। অথচ জ্ঞানতৃষ্ণা ও গ্রন্থবিমুখতা এ দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতা বাঙালি লালন করে তার চেতনায়। বাঙালির জাতিগত চৈতন্যে এ দুই বিরোধী চেতনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি লেখক।

প্রশ্ন : রাজা ও হেকিমের গল্পের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু গ্রন্থ কেনায় বাঙালি উৎসাহ বোধ করে না। খেলার মাঠের সামনে কিংবা সিনেমার টিকেট কাটার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বাঙালি নির্লজ্জের মতো অনায়াসে বলতে পারে "বাঙালির পয়সার অভাব"। বাঙালির মানসিকতার গুপ্ত অর্থ লেখক আরব্য উপন্যাসের একটি গল্পের তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন।

আরব্য উপন্যাসের ঐ গল্পের রাজা তাঁরা চিকিৎসকের একটি মূল্যবান গ্রন্থ বাগাতে না পেরে অবশেষে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হলে রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বই খানি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু বইয়ের পাতাগুলি একটির সঙ্গে আরেকটি এমনভাবে জড়ানো ছিলো যে, রাজাকে থুথুর সাহায্যে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে হচ্ছিলো। হেকিম কিন্তু নিজের মৃত্যুর অমোঘতা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে নিশ্চিত হয়েই বইয়ের প্রতি পাতায় বিষ মাখিয়ে নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বইটির শেষ পাতায় তাঁর প্রতিহিংসার বিষয়টিও তিনি লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু রাজা যখন শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছিলেন এবং হেকিমের প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের উপায়টি পাঠ করলেন তার পরপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙালির বই কেনা ও পড়ার ব্যাপারে উদাসীনতার প্রসঙ্গ ঐ গল্প দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, বাঙালি পূর্বাহ্নে এ গল্পটি পড়ে ফেলেছে বলেই, আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে যে বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। লেখকের এ বক্তব্যের অন্য একটি তাৎপর্যও রয়েছে। লেখক যেন বলতে চান বই পড়লে বাঙালির জ্ঞানজগৎ বিকশিত হবে আর বিকশিত হতে চায় না বলেই বাঙালি বই পড়ে না।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. অথচ এ বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে।
২. নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশগুণ নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।
৩. প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুর্চ্ছা গেল। কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।
৪. বাঙালি যদি হটেনটেট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না।
৫. জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা।
৬. বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে; আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশগুণ নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আলোচ্য অংশ রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের "বই কেনা" প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ অংশে ফরাসিদের দেশচেতনা সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন।

ফরাসিরা বইয়ের সমঝদার। তাঁরা প্রিয়জনকে যেমন বই উপহার দেয় তেমনি কাউকে অপমান করতে হলেও বইকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। আঁদ্রে জিদ তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মূলত ফরাসিদের দেশ ও জাতিসত্তার মর্মমূলেই আঘাত করেছিলেন। লেখক মনে করেন কারো বিরুদ্ধে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা জানাতে হলে সর্বোত্তম পন্থা হলো তার দেশকে অপমান করা। নিজের অপমান পঞ্চাশগুণ ভয়াবহ হলেও তা সহ্য করার শক্তি হয়ত থাকে, কিন্তু দেশের অপমান কোনো ব্যক্তিই সহজে মেনে নিতে পারে না। দেশের অপমান দংশনের বেদনা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের অন্তরে সক্রিয় থাকে। ফরাসিদের স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত হিসেবেই লেখক আঁদ্রে জিদ-এর প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং সেই সূত্রে বইয়ের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি উন্মোচন করেছেন।

প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুর্চ্ছা গেল। কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।

ব্যাখ্যেয় বাক্য দুটি রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের রম্যপ্রবন্ধ 'বই কেনা' থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অংশে লেখক ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রেঁ জিদের গ্রন্থাগার বিক্রয় করে দেয়ার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসিদের প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন সকৌতুকে।

রাশিয়া থেকে ফিরে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন আঁদ্রে জিদ। স্ট্যালিনের অনুসারীবৃন্দ যারা প্যারিসে অবস্থান করছিলেন তারা এ ঘটনার শোধ নিতে জিদের পেছনে লাগলেন। গালিগালাজ ও কটুকাটব্যে তারা অস্থির করে তুললেন জিদ-এর জীবন। জিদ আশা করেছিলেন তাঁর লেখক বন্ধুরা এর প্রতিবাদ করবেন; জিদ-এর হয়ে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর লেখক-বন্ধুরা কেউই জিদের পক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন না, পালন করলেন নীরব ভূমিকা। এতে আঁদ্রে জিদ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হলেন। তিনি এঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। ফরাসিরা গ্রন্থপ্রেমিক, কাউকে অপমান করতে হলেও তারা বইকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। আঁদ্রে জিদ কিন্তু অপমানের শোধটি কেবল লেখক বন্ধুদের বিরুদ্ধেই নিলেন না, সমগ্র ফ্রান্সকেই তিনি আঘাত করলেন। তিনি নিলামে উঠালেন ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সেই সব বই, যেগুলি ঐ লেখক বন্ধুরা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নিতে জিদ এর পক্ষ হয়ে দাঁড়াননি। জিদ এর গ্রন্থাগার নিলামে উঠার বিজ্ঞাপন যখন প্রচারিত

হলো তখন স্বভাবতই সমগ্র ফ্রান্সের চেতনা লুপ্ত হওয়ার কথা। কারণ সমকালীন একজন শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বিক্রয় করে দেবেন এটি যে কোনো সভ্য জাতির জন্যই অপ্রত্যাশিত ও দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ। ফলে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার পর প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ফরাসিরা তড়িঘড়ি করে নিলামখানায় ভিড় জমালো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "বই কেনা" প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

২. "বই কেনা" প্রবন্ধ অবলম্বনে বই পড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩. বাঙালির চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখকের পরিহাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৪. লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুসরণে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বইয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৫. "বই কেনা" প্রবন্ধ অবলম্বনে সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : "বই কেনা" প্রবন্ধ অবলম্বনে বই পড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসবোধের বিপরীতে বই পড়া ও কেনায় সহজাত অনীহা বাঙালির একটি নেতিবাচক চরিত্রবৈশিষ্ট্য। প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী "বই কেনা" শীর্ষক রম্যপ্রবন্ধে বই পড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির উদাসীনতার বিষয়টি তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত বই কেনার ক্ষেত্রে বাঙালির স্বভাব-অনীহার অবসান কামনাই "বই কেনা" প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে লেখককে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বই পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বইয়ের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পায়। এর ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। আনাতোল ফ্রাঁস মাছির মাথার চারদিকে চক্রাকারে থাকা অসংখ্য চোখের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আপসোস প্রকাশ করলেও শেষে এ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন যে, মাছির অসংখ্য চোখ থাকলেও তার মনশ্চক্ষু নেই। ফলে মাছি কেবল বস্তুজগৎকেই দেখতে পায়। কিন্তু মানুষ তার দুচোখ দিয়ে বইয়ের মাধ্যমে বিশাল জ্ঞান জগতে প্রবেশ করতে পারে। বারট্রান্ড রাসেলও মনে করেন মানুষের মনশ্চক্ষু আছে বলেই যে বইয়ের মাধ্যমে তার মনের চোখকে বিকশিত করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে অসংখ্য নিজস্ব ভুবন। আনাতোল ফ্রাঁস এবং বারট্রান্ড রাসেল এভাবেই মানবজীবনে গ্রন্থের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেছেন।

বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসবোধের স্বীকৃতি সানন্দে তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করে বই পড়া ও কেনার ব্যাপারে বাঙালির উদাসীনতা, অনীহা ও খোড়া অজুহাতকে উপহাস করেছেন তিনি। লেখক স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন :

"পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা বইয়ের ক্রমবর্ধমান মূল্য বাঙালির গ্রন্থ বিমুখতার অন্যতম একটি কারণ, তবে এটি মুখ্য কারণ নয়। বইয়ের দাম যদি কম হয়, তবে তার কাটতি বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সংখ্যার বিচারে পৃথিবীতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের অবস্থান ছয়/সাত নম্বরে হলেও ফরাসি প্রকাশক যেখানে একটি গ্রন্থের বিশ হাজার কপি নির্দ্বিধায় ছাপাতে পারেন, বাঙালি প্রকাশকের পক্ষে সেখানে দু'হাজার কপি বই ছাপাতে নাভিশ্বাস উঠে। ফলে বইয়ের দাম বেশি বলে বাঙালি বই কেনে না, আবার বইয়ের কাটতি কম বলেই প্রকাশক বইয়ের দাম কমাতে পারে না। পাঠক প্রকাশক সম্পর্কের এ চক্র অচ্ছেদ্য। সম্পর্কের এচক্র ছিন্ন করা প্রয়োজন বলে লেখক মনে করেন। এবং এক্ষেত্রে ক্রেতা বা পাঠককে এগিয়ে আসার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস বই কিনে কেউ কখনো দেউলে বা সর্বস্বান্ত হয় না। সমগ্র পৃথিবীর সভ্য মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক সংগ্রহের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করে। ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে পর্যন্ত

তারা গড়ে তোলে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। কিন্তু বাঙালির কাছে গ্রন্থ ক্রয় করা অপব্যয় তুল্য। অথচ গ্রন্থ ক্রয় করা যে খরচ নয় বিনিয়োগ এ চিন্তা বাঙালি মাথায় রাখে না। বাঙালির বই দীনতা পীড়িত করেছে লেখককে। বাঙালি যদি আফ্রিকার কোনো আদিবাসী অসভ্য জনগোষ্ঠী হতো তাহলে কথা ছিলো না। বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু বই কেনার সময় প্রচণ্ড উদাসীন এবং কৃপণ।

বই পড়া এবং বই কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার এ সব কারণই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কৌতুক ও পরিহাসের ছলে উপস্থাপন করে বাঙালি মানসের এ গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সংশোধন প্রত্যাশা করেছেন লেখক।

প্রশ্ন : "বই কেনা" প্রবন্ধ অবলম্বনে সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ চিহ্নিত করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের পর যে ক'জন গদ্যশিল্পী বাংলা গদ্যচর্চায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁদের অন্যতম। সৈয়দ মুজতবা আলীকে বাক্‌শিল্পী কথা-রসিক ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। তবে ভ্রমণ ও রম্যসাহিত্য লেখক হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন 'বহুভাষাবিদ' এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রচনায় বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে বিদ্রূপ-কৌতুক ও হাস্যরসের। তবে নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই তিনি লেখেননি, তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীর অর্থ।

পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত 'বই কেনা' প্রবন্ধটি সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি বিশিষ্ট রচনা। এতে হাস্য-কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়ে বাঙালির গ্রন্থবিমুখতার সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য বাঙালি নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য বই পড়ুক, বেশি বেশি করে বই কিনুক। কেননা বইয়ের মাধ্যমেই বাঙালি অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করতে পারবে। জ্ঞানজগৎ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুসভ্য পৃথিবীর বৃহত্তর আঙ্গিনায় সে তার সুদৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর স্বতন্ত্র গদ্যশৈলীর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত "বই কেনা" প্রবন্ধ। হাসি ও কান্না, পরিহাস ও অভিমান এবং লঘু ও গুরুর মতো পরস্পর বিপরীত বিষয় অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর গদ্যে ধারণ করতে পারেন। তাঁর গদ্যের এ বিশিষ্টতা "বই কেনা" প্রবন্ধেও সহজেই লক্ষ করা যায়। এ প্রবন্ধে লেখক বাঙালিদের নিয়ে পরিহাস করেছেন, তীব্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সাহায্যে বাঙালির মানস-দৈন্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তবে বিদ্রূপ ও পরিহাসের মধ্যেই প্রবন্ধটির আবেদন নিঃশেষিত হয়নি তাঁর প্রত্যাশা বাঙালির বোধোদয় ঘটবে; বই পড়া ও কেনার অভ্যাস তৈরি হবে বাঙালি সমাজে। জ্ঞানজগতের বৃহত্তর আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করবে বাঙালি এ বিশ্বাস তাঁর এ জন্যেই তীব্র বিদ্রূপবাণ ছুঁড়ে তিনি বলেন।

"বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে; আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।"

বাংলা গদ্যে বৈঠকি রীতির সার্থক ব্যবহার সৈয়দ মুজতবা আলীর বড় অবদান। বৈঠক বা আড্ডায় আলাপচারিতার যে রীতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত, লেখক বাংলা গদ্যে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। "বই কেনা" রচনাটিকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হলেও, প্রবন্ধের প্রচলিত কাঠামোর সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর। এতে রয়েছে বিভিন্ন কাহিনী ও টিপ্পনী যার গভীরে নিহিত আছে লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য। যেমন, বাঙালির মানস দীনতার স্বরূপ উন্মোচনে লেখকের কৌতুকবোধ ও বৈঠকি চালের মিশ্রণ লক্ষ করা যায় নিম্নে উপস্থাপিত দুটি উদ্ধৃতিতে :

ক) "পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত। আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

খ) কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা– "অত কাঁচা পয়সা কোথায় বাওয়া, যে বই কিনব"।

ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষ সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে লিখেছেন– "পরিহাসের তলায় অনেক গ্লানি লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ।" "বই কেনা" প্রসঙ্গেও এ-মন্তব্য সমান প্রাসঙ্গিক। বই কেনা ও পড়ার ব্যাপারে বাঙালির স্বভাবগত অনিচ্ছার কলঙ্ক জাতিসত্তার উত্তরাধিকারী হিসেবে লেখককেও যে স্পর্শ করে প্রবন্ধটি পাঠশেষে এ ভাবনা পাঠককে বিমূঢ় করে তোলে। তিনি যখন লিখেন–

"জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না, সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ, থেকে?"

–তখন জাতিগত পরিহাস নির্মম আত্মপরিহাসে পরিণত হয়। পরিহাসের উপযুক্ত গদ্য তাঁর আয়ত্তে ছিলো বলেই লেখকের পক্ষে এ রকম আত্মঘাতী কৌতুক পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছে।

"বই কেনা" প্রবন্ধের বৈঠকি-রীতির গদ্যে প্রবন্ধকার একটি গুরুগম্ভীর বিষয়কে লঘু আবরণে ঢেকে রেখেছেন। বক্তব্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য এতে একাধিক জ্ঞানগর্ভ ও কৌতুক বা গল্প তিনি উপস্থাপন করেছেন। ভাষায় আলাপচারিতার বা বৈঠকি ঢং সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি আরবি ফারসি ও ইংরেজি ফরাসি শব্দ ব্যবহার করেছেন অবলীলায়।

যুক্তির ব্যবহার, বুদ্ধির প্রয়োগ, ভাষার সহজতা, আড্ডা বা বৈঠকের ভঙ্গি, বিভিন্ন ভাষার শব্দের উল্লেখ এবং কৌতুক বিদ্রূপ পরিহাস সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সবকটিরই প্রকাশ লক্ষ করা যায় "বই কেনা" প্রবন্ধে। "বই কেনা" সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

সন্ধি : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা লোপ হতে পারে। ধ্বনির এরকম মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে **সন্ধি বলে।** সন্ধি তিন রকম : স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি; বিসর্গসন্ধি।

স্বরসন্ধি : একটি স্বরধ্বনির সঙ্গে আর একটি স্বরধ্বনির মিলনকে বলা হয় **স্বরসন্ধি**। "বই কেনা" প্রবন্ধে স্বরসন্ধি যোগে গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত– চক্র+আকার (চক্রাকার), যথা+ইষ্ট (যথেষ্ট); ন+ছেদ্য(অচ্ছেদ্য), জন+এক (জনৈক)।

ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিকে বলা হয় ব্যঞ্জনসন্ধি। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যঞ্জনসন্ধি যোগে গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত– সম্+মান(সম্মান); বিপৎ+কালে (বিপদকালে)।

বিসর্গসন্ধি : পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরপদের ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা স্বরধ্বনির সন্ধিকে **বিসর্গসন্ধি** বলা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বিসর্গসন্ধি যোগে গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত চতুঃ+দিক (চতুর্দিক); মনঃপুত (মনঃপুত)।

বিপরীতার্থক শব্দ : একটি শব্দ যে ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, অন্য একটি শব্দ, তার বিপরীত ভাব বা অর্থবোধক হলে, শব্দ দুটিকে পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ বলা হয়। 'বই কেনা' প্রবন্ধ থেকে কিছু শব্দ বাছাই করে সেগুলির বিপরীত শব্দ নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

শব্দ	**বিপরীত শব্দ**
বন্ধু	শত্রু
নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ
উত্তম	অধম
সম্মান	অসম্মান
বিষ	অমৃত
খাঁটি	নকল
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ

বিশেষ্য ও বিশেষণ

যে পদ কোনো কিছুর নাম প্রকাশ করে তা-ই **বিশেষ** বা **নামপদ**। আর, বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে বিশেষণ বলে। 'বই কেনা' প্রবন্ধ থেকে কিছু বিশেষণ পদ বাছাই করে সেগুলির বিশেষ্য রূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

বিশেষণ	বিশেষ্য
গুণী	গুণ
জ্ঞানী	জ্ঞান
পণ্ডিত	পাণ্ডিত্য
মঙ্গল	মাঙ্গলিক/মাঙ্গল্য
নিরাশ	নৈরাশ্য/নিরাশা

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

- সংকলিত প্রবন্ধ থেকে পাঁচটি শব্দ বাছাই করে এগুলির একাধিক প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ উপস্থাপন করুন।
- "বই কেনা" প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রথমে সাধু ভাষা রীতিতে রূপান্তর করুন। এরপর মূল প্রবন্ধটি দূরে সরিয়ে রেখে রূপান্তরিত অংশটি পুনরায় চলিত ভাষারীতিতে রূপান্তর করুন। এ ব্যাপারে প্রবন্ধের মূল অনুচ্ছেদটির সঙ্গে আপনার নিজের অনুশীলনীটি মিলিয়ে নিন। আপনার কোনো ভুল হলে সংশোধন করে নিন।
- নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি রচনা লিখুন :
  আমার দেখা একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

আরও যা পড়তে পারেন

সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'দেশে বিদেশে', পঞ্চতন্ত্র ১ম ও ২য় খণ্ড, চাচা কাহিনী, জলেডাঙায় ইত্যাদি গ্রন্থ।

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

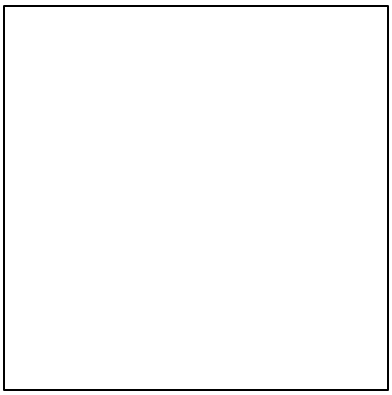

লেখক পরিচিতি

বাংলা কথাসাহিত্যে যে ক'জন শিল্পীর নাম অবিস্মরণীয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। পিতার কর্মস্থল, বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার দুমকা শহরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯মে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। মানিক তাঁর ডাকনাম, পিতার দেয়া নাম প্রবোধকুমার। তাঁর লেখক-নামের মহিমায় প্রবোধচন্দ্র নামটি ঢাকা পড়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা সুন্দরী দেবী। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস ছিলো বাংলাদেশে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতার সরকারি চাকুরির কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এবং বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয় মিশন কলেজ থেকে আই এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । এরপর অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। এ-সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসী মামী', যা ছাপা হয় বিচিত্রা পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। বিচিত্রা-য় গল্প প্রকাশের পর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন সার্বক্ষণিক লেখক। ফলে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে বিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে।

শেষ অবধি সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক রূপেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ মার্কসবাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাভ করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয় সীমাহীন আর্থিক অনটন আর মৃত্যুমুখী ব্যাধির মধ্য দিয়ে। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

মনোবিশ্লেষণ, বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টি, সাম্যবাদী জীবনদৃষ্টি, সাম্যবাদে আস্থা এবং মানুষের মধ্যকার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যের মূল প্রেরণা। ছোট গল্প ও উপন্যাস এ দু'শাখাতেই সমান কুশলী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত শিল্পসফল অসামান্য কিছু ছোট গল্প ও উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) অহিংসা (১৯৪১), চিহ্ন (১৯৪৭, চতুষ্কোণ (১৯৪৮)।

ছোটগল্প : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪০), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)।

নাটক : ভিটেমাটি (১৯৪৬)

কবিতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)

প্রবন্ধ : লেখকের কথা (১৯৫৭)

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করবেন।

২. দরিদ্র মানুষের জীবন নিয়ে লিখিত একটি অসাধারণ সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভূমিকা

লেখক জীবনের সূচনা পর্যায়ে রচিত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা থেকে কিছু অংশ সংকলন করা হয়েছে বর্তমান পাঠে।

***পদ্মানদীর মাঝি** উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী মাঝি ও জেলেশ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার কথা এবং ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের মাঝিরও জীবিকার অবলম্বন পদ্মা, এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসটির সার্থক নামকরণ 'পদ্মানদীর মাঝি'।*

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রচনাংশে পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুমে জেলে জীবনের বাস্তবতা মাছ ধরার খুটিনাটি দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন ইত্যাদি শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

***পদ্মানদীর মাঝি** সাধু ভাষারীতিতে লিখিত। তবে সর্বনামপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ সহজেই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের রচনায়ও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সচেতন কথা শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রচনারীতির এটি এক বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মৎস্যজীবী সমাজের চরিত্রসমূহের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে উপন্যাসটি অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে।*

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ইলিশ মাছ ধরার মরসুমে পদ্মার পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কয়েকজন মৎস্যজীবীর পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় বলতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
পদ্মা – বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গার নিম্নভাগ পদ্মানদী নামে পরিচিত। **মরসুম** – (আ. মৌসিম>মৌসুম> মরসুম। **কামাই** – (ফা. কম্+বা আই) বিরাম। **অনির্বাণ** – কখনো নেভে না এমন, চির জ্বলন্ত। **সঞ্চারিত** – পরিচালিত, আন্দোলিত।	বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ-ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদী বক্ষে রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চারিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে রেল-ষ্টেশনে ও জাহাজ ঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রের ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চক্‌চক্ করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা – এখানে ছেঁড়া ছেঁড়া অর্থে।

খোল – কোটর, গহ্বর।

নিস্পলক – পলকহীন।

স্বচ্ছনীলাভ – অতিশয় পরিষ্কার। নীলবর্ণযুক্ত।

উজান – স্রোতের বিপরীত দিক।

পাটাতন – তক্তার তৈরী নৌকার মেঝে।

ফ্রেম – কাঠামো।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

আরও দু-মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড় নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটি ছাউনি আছে। বর্ষা বাদলে দুতিন জনে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এ ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বফ্রেমের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এ হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশের বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ করা জাল নামাইয়া দেয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নিচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

সমান্তরাল – সমান ব্যবধান বিশিষ্ট।

নেংটি – ছিন্ন মলিন বস্ত্র, লজ্জা নিবারণের অপর্যাপ্ত বস্ত্রখণ্ড।

বিনিদ্র – নিদ্রাহীন, ঘুমছাড়া।

আরক্ত – গাঢ় লাল, রক্তাভ।

যদু এ এ এ – মাছ কিবা? ওহে যদু, মাছ কেমন ধরা পড়েছে?

জবর – দারুণ, বেজায়, অত্যন্ত (আ. জবর>জবর)

সাঁঝের – সন্ধ্যার।

হালায় – শালায়, ঢাকার আঞ্চলিক উচ্চারণ।

জুত – মনমতো, নিখুঁত আরাম (সংযুক্তি>প্রা.যুক্তি>আঞ্চ.জুত)।

ঐ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগা-গোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীত শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত্র মাছ ধরে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একেবারে বাঁকের মধ্যে জাল ঠেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জে মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না। সকলেরই যদি এ রকম মাছ পড়ে, দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে, বিশেষ কোন লাভের আশা থাকিবে না। তবে বড় মাছের বড় ঝাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না। এ যা ভরসার কথা। বেশি মাছ সকলের নাও উঠিতে পারে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, –যদু হে এ-এ -এ মাছ কিবা?

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর। জবাবের পর সে নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর।

ধনঞ্জয় বলে, সাঁঝের দরটা জিগা দেখি, কুবের।

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামব।

	হালায় মাছ ধইরা জুত নাই। কুবের কিছু বলে না। ঝপ্ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।

সার-সংক্ষেপ

পদ্মানদীতে ইলিশ মাছ ধরার মৌসুম বর্ষাকাল। রাতের বেলা অন্ধকার পদ্মাবক্ষে নৌকার শত শত আলো জানিয়ে দেয় মাছ শিকারিদের কথা। শহরে গ্রামে, রেলস্টেশনে ও জাহাজ ঘাটে মানুষ যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায় তখন রাতের অন্ধকারে দরিদ্র জেলে ও মাঝির দল মাছ ধরে। কুবের, ধনঞ্জয় আর গণেশ আজ মাছ ধরছিল। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়। সে তাই কেবল নৌকার হাল ধরে বসে থাকার সুবিধা নেয়, মাছ ধরার মূল পরিশ্রম করে কুবের আর গণেশ। মাছ বিক্রির অর্থের অর্ধেক পায় ধনঞ্জয়, বাকি অর্ধেক ভাগ হয় কুবের আর গণেশের মধ্যে।

বর্ষা প্রকৃতির জোর বাতাসও নৌকার আঁশটে গন্ধ ছাড়াতে পারে না। এক হাত মাপের কাপড় নেংটির মতো কোমরে জড়িয়ে ঘুমহীন রাতে জলে ভিজে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় কুবের আর গণেশ মাছ ধরে। আজ মাছ ধরা পড়ছিলো খুব। তবে সকল মাঝির জালেই যদি প্রচুর মাছ ধরা পড়ে তাহলে ব্যাপারটি আর লাভজনক হবে না। পর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে দেবীগঞ্জের মাছের দর পড়ে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. ইলিশ ধরার মরসুমে পদ্মার জেলে নৌকাগুলির বর্ণনা দিন।

২. কুবের, ধনঞ্জয় ও গণেশের বাড়ি কোথায়?

৩. ধনঞ্জয়-এর সম্পত্তির পরিচয় দিন। মাছ শিকারের সময় ধনঞ্জয় কী ভূমিকা পালন করে?

৪. জালে মাছ কিভাবে ধরা পড়ে তার বর্ণনা দিন।

৫. বেশি মাছ ধরা পড়ার অর্থই সৌভাগ্য নয় কেন?

৬. 'যদু হে এ এ এ মাছ কিবা? – কার উক্তি? এ উক্তি ও তার উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ধনঞ্জয় এর সম্পত্তির পরিচয় দিন। মাছ শিকারের সময় ধনঞ্জয় কী ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : কুবের ও গণেশ যে নৌকা ও জালের সাহায্যে মাছ ধরে তার মালিক ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের নৌকাটি বেশি বড় নয়। বর্ষা বাদলে দু'তিনজন কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকতে পারে এমন একটু ছাউনি আছে নৌকাটির পেছনের দিকে। বাকি সবটুকুই খোলা। নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক এ ফাঁকা– গলিয়ে খোলের মধ্যে ধরা মাছ রাখা হয়। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমের বিরাট পাখার মতো জালটির দুটি হাতল। হাতল ধরে জাল ফেলা ও উঠানো হয়। জালটি নৌকার পাশে লাগানো থাকে। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার সুবাদে ধনঞ্জয় ধরা মাছের অর্ধেক ভাগ পায়। বাকি অর্ধেক পায় কুবের ও গণেশ। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। মাছ ধরার পুরো সময়টাই সে হাল ধরে বসে থাকে।

প্রশ্ন : বেশি মাছ ধরা পড়ার অর্থই সৌভাগ্য নয় কেন?

উত্তর : পদ্মার ইলিশ ধরার মরসুমে বেশি মাছ ধরা পড়া সময় সময় সৌভাগ্য বহন করে আনে না। সকল জেলের জালেই বেশি মাছ ধরা পড়লে দেবীগঞ্জের হাটে মাছের দর পড়ে যায়। কাজেই দেবীগঞ্জের মাছের দর না জানা অবধি

কুবের বা গণেশ মাঝিরা সব সময় বিষয়টিকে সৌভাগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে না। তবু তারা আশায় বুক বাঁধে এ ভরসায় যে বড় মাছের বড় ঝাঁকে একই সময়ে পুরো নদী জুড়ে চলাচল করে না।

প্রশ্ন : 'যদু হে এ এ এ মাছ কিবা? - কার উক্তি? এ উক্তি ও তার উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : অদূরবর্তী নৌকার জেলে যদুর উদ্দেশ্যে এটি বলা হয়েছে। উক্তিটি কুবের এর খানিক দূরের নৌকা থেকে জিজ্ঞাসাসূচক এ উক্তির জবাব আসে 'জবর'।

ধনঞ্জয়ের নৌকা ও জাল দিয়ে ইলিশ ধরছিল কুবের ও গণেশ। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয় নিয়ম মাফিক হাল ধরে বসেছিল। আজ জালে মাছ ধরা পড়ছিলো প্রচুর। কিন্তু প্রচুর মাছ সব সময় সৌভাগ্য বহন করে আনে না। অন্যান্য জেলের জালেও যদি প্রচুর মাছ ধরা পড়ে তাহলে দেবীগঞ্জের হাটে মাছের দর পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে প্রচুর মাছ ধরেও গনেশ কুবের ধনঞ্জয় বাড়তি টাকার মুখ দেখবে না। নিজেদের জালে প্রচুর মাছ ধরা পড়তে দেখে কুবের অনতিদূরের জেলে নৌকার মাঝি যদুর উদ্দেশে মাছ কেমন ধরা পড়েছে জানতে চেয়েছে ঐ উক্তির মাধ্যমে। জবাব এসেছে 'জবর'। অর্থাৎ অন্য নৌকার জালেও ধরা পড়েছে প্রচুর মাছ। কুবের জিজ্ঞাসায় আশার যে দ্যুতি জড়ানো ছিলো, অদূরবর্তী নৌকা থেকে আসা উত্তর 'জবর' ঐ প্রত্যাশাকে স্তিমিত করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না।
২. আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।
৩. 'কাইল চাইরে নামব। হালায় মাছ ধইরা জুত নাই,

শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না।

আলোচ্য অংশটুকু কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের সংকলিত আখ্যান ভাগ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ভরা বর্ষার শেষরাতে ইলিশ মাছ ধরার মরসুমে পদ্মার পরিবেশ এ অংশে লেখক চমৎকারভাবে অঙ্কন করেছেন।

ভরা বর্ষা পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিনরাত মাছ ধরায় নিযুক্ত থাকে জেলেরা। বেশি শ্রমের অর্থই যেহেতু বেশি উপার্জন সেহেতু দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ইলিশের মরসুমে বিশ্রামের কথা ভাবে না। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে চোখে পড়ে 'নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকীর মতো' ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলি আসলে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য জেলে নৌকার আলো। সারারাত ধরেই রাতের রহস্যময় অন্ধকারে ঐ আলোগুলো চলাচল করে। মাঝরাত্রি যখন পার হয়ে যায়, তখন শহরে গ্রামে রেল স্টেশনে ও জাহাজ ঘাটে শ্রান্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু জেলে নৌকার আলো তখনও নেভে না। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তারা। ইলিশের সন্ধানে জীবনীশক্তির অবশেষটুকু তারা উজাড় করে দেয়। সারা দেশের মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন ভাঙা ভাঙা মেঘের আড়ালে থেকে জেগে ওঠে আকাশের ক্ষীণ চাঁদ। যে ইলিশ দিনের বেলা শহর বন্দরের ভোজন রসিকের রসনাকে তৃপ্ত করবে, সেই ইলিশ শিকার কাহিনীর সাক্ষী থাকবে কেবল ঐ ক্ষীণ চাঁদ। মরা ইলিশের নিষ্পলক চোখ যাদের কাছে নীলাভ মণির মতো মনে হয়, সেই জেলেদের নৌকার আলো শেষ রাতেও নেভে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কুবের-এর সাংসারিক জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা লিখতে পারবেন।
- গণেশ ও কুবের-এর মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- দিবসের সূচনায় জাহাজ ঘাট ও মেছো নৌকার ঘাটের পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
বারণ – নিষেধ। **জমা (আ. জম্‌আ)** – থোক অর্থের বিনিময়ে বার্ষিক বন্দোবস্ত। **নড়াইল** – বৃহত্তর যশোরের একটি মহকুমা। বর্তমানে বাংলাদেশের একটি জেলা। **মীনসন্তান** – মৎস্য, মাছ। **নদীর মালিক** – সরকার, জমিদার। **খাজনা** – রাজস্ব, জমিদারের প্রাপ্য কর। **জীবিকা** – জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত পেশা বা বৃত্তি। **জিরাই (ফা. জির্‌য়ান)** – বিশ্রাম করি, আরাম করি। **খুড়া** – চাচা, কাকা, এখানে পিতৃব্য স্থানীয় অর্থে। **মরস ক্যান** – ব্যাকুল কেন। **খেপ** – মাছ ধরবার জন্য জাল নিক্ষেপণ। **তামুক** – তামাক। **সাড়া** – চেতনা, অনুভূতি। **ছই** – নৌকার ছাদ। **হুঁকা** – নারকেলের খোলে প্রস্তুত তামাক সেবনের হাতে তৈরি যন্ত্র। **দা-কাটা** – দা দিয়ে কাটা।	শরীরটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাকে এমনিভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে, তার দু-তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এ ইলিশের মরসুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না। মাঝরাত্রে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল-একটু জিরাই গো, আজান খুড়া। জিরানের লাইগা মরস ক্যান, ক দেখি? বাড়িতে গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল। কুবের বলিল, উহু তামুক বিনা গায়ে সাড়া লাগে না। দেহখানা জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভাল নাই। জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কলিকাটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল-ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। একহাতে তীরের দিকে কোণাকুণি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, দে কুবের আমারে দে, ধরাই। কলিকাটি তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল। কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্য সত্যই শীতকাল। হঠাৎ সে বলিল, ইঃ, আজ কি জাড়, কুবের।

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারো সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁটা দিয়া গণেশ আবার বলিল, জানস কুবের, আইজকার জাড়ে কাইপা মরলাম।

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সে কোন কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না, এটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বারবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মতো করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয়, তাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোট বড় সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এ আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে ঘনিষ্ঠ বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে, কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুকাটি ছইয়ে টাঙ্গাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল।

গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখানা গীত ক দেখি কুবের।

- হ, গীত না তর মাথা।

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে। যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়।

পূর্বদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল। তারপর রওনা হইল জাহাজ-ঘাটের দিকে। সেখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল।

নদীর তীরে নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া স্টীমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়, কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। কলিকাতা হইতে ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে। ঘাটের ও স্টেশনের দোকান-পাট সমস্ত খোলা হইয়াছে। অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে। মোটরবাহী অসংখ্য ছোট বড় নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায় পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই।

নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে-স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ। মেছো নৌকার ঘাটটি একপাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনা-বেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

এ ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধ হয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটোর যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচ বারের বেশি।

কল্কে – মাটির তৈরি ছোট যে পাত্রে তামাক সাজা হয়।

কলিকাটি – কল্কেটি।

বাড়াবাড়ির – ভীষণভাবে।

জাড় (হি. জাড়, সং জাড্য) – শীত, ঠাণ্ডা, হিম।

কাঁইপা – কেঁপে।

শ্লথ গতি – ধীর গতি।

পুনরাবৃত্তি – পুনরায় বলা কথা।

অনুগত – বাধ্য (বিশেষণ পদ)।

আনুগত্য – (সং অনুগত+ম) বাধ্যতা (বিশেষ্যপদ)।

কলহ – ঝগড়া।

পুনর্মিলন – বিচ্ছেদের পর মিলন, এখানে ঝগড়ার পর মীমাংসা অর্থে।

বইঠা – নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়বিশেষ।

গীত – গান।

জীবনের সাড়া – জীবনের জাগরণ।

নোঙর – শিকলের সঙ্গে বাঁধা লৌহ অঙ্কুবিশেষ যা জলের নিচে ফেলে জাহাজ বেঁধে রাখা হয়।

স্টিমার – জাহাজ।

জেটি – জাহাজ থেকে মালপত্র নামাবার ও যাত্রী নামবার মঞ্চ।

মোটরবাহী – ইঞ্জিনচালিত।

লগি – বাঁশের লম্বা দণ্ড যা দ্বারা নৌকা চালানো হয়।

অবিরাম – বিরামহীন।

মেছো-নৌকার ঘাট – মাছ

বহনকারী নৌকা যে ঘাটে ভিড়ে। **দরাদরি** – দরকষাকষি। **হরদম** – সর্বদা, প্রতিনিয়ত। **চালান** – রপ্তানি, বিক্রয়ার্থে মাল প্রেরণ।	

সার-সংক্ষেপ

কুবের-এর শরীর ভালো না থাকায় স্ত্রী মালা মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করেছিলো আজ। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাবার অবসর কোথায় কুবের-এর। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুর এবার বন্দোবস্ত নিতে পারেনি কুবের। পদ্মার ওপর নির্ভর করেই সারাটা বছর কাটাতে হবে তাকে। অন্যের নৌকা ও জাল ব্যবহার করে ভাগে মজুরি ছাড়া উপায় নেই তার।

কুবের কল্কেতে তামাক সাজে। ধনঞ্জয় হাত বাড়িয়ে দেয় কল্কেটির জন্য। কুবের কল্কেটি দিয়ে রাগ করে বসে থাকে। গণেশ শীতে ভীষণ রকম কাঁপছিলো।

পুড়ে শেষ হওয়া অবধি পালা করে তারা তিনজন তামাক টানে। শেষে জাল নামিয়ে কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরে।

পূর্বদিক লাল হয়ে ওঠা পর্যন্ত তারা জাল ফেলে বেড়ালো। শেষে রওয়ানা হলো জাহাজ ঘাটের দিকে। নদীর তীরে এবং নদীর বুকে এখন জীবনের সাড়া পড়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য নৌকার ভিড় জমেছে ঘাটে ।

মেছো নৌকার ঘাটটি এক প্রান্তে। ইতোমধ্যে অনেকগুলো নৌকা মাছ সমেত ঘাটে ভিড়েছে। দরাদরিতে সরগরম হয়ে উঠেছে ঘাট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. স্ত্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে কুবের কোন মাছ ধরতে এসেছে?
২. কুবেরের তামাক সাজার বর্ণনা দিন।
৩. গণেশ চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।
৪. দেবীগঞ্জের প্রভাতকালীন জাহাজ ঘাটের বিবরণ দিন।
৫. সকালের মেছো-নৌকার ঘাটের পরিবেশ সম্পর্কে লিখুন।

প্রশ্ন : গণেশ চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : কেতুপুর গ্রামের অধিবাসী গণেশ কিছুটা নির্বোধ প্রকৃতির। মনের ক্রিয়াগুলি তার মন্থরগতিতে সম্পন্ন হয়। একই কথা বারবার উচ্চারণ করা তার অভ্যাস অথচ তার কথা যে লোকে অবহেলা করেই কানে তোলে না এটুকু সে বুঝতে পারে না। জবাবে কেউ ধমক দিলেও সে রাগ করে না। দুঃখ পায় না।

মৎস্যজীবী গণেশ কুবের মাঝির অত্যন্ত অনুগত। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে কুবেরের পরামর্শ নিয়ে চলে। গণেশের একতরফা আনুগত্যের কারণেই কুবেরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছে। এ দুজনের সম্পর্কের মধ্যে দাবি ও প্রত্যাশা এবং সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে। তাদের মধ্যে সাময়িক কলহ হয় আবার পুনর্মিলনও ঘটে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবের বলেই এ-দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয় খুবই কম। গণেশ অত্যন্ত পরিশ্রমী। আপন মনে কাজ করে সে। গলায় সুর না থাকলেও শান্তিতে আপন মনে গান করে সে। স্বভাব বোকা বলেই ধনঞ্জয় প্রায়ই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে।

প্রশ্ন : দেবীগঞ্জের প্রভাতকালীন জাহাজ ঘাটের বিবরণ দিন।

উত্তর : প্রভাতে পূর্বদিক যখন লাল হয়ে ওঠে দেবীগঞ্জের জাহাজঘাটে তখন জীবনের সাড়া জাগে। থেকে থেকে বাঁশি বেজে ওঠে স্টিমারের । সশব্দে নোঙর তোলে কোনো স্টিমার ছেড়ে যায়, কোনটি জেটিতে গিয়ে ভিড়ে, এ সময় কলকাতার ট্রেনও স্টেশনে এসে পৌঁছে। ঘাটেরও স্টেশনের সমস্ত দোকান চালু হয়ে যায়। নদীর জলে অনেকে স্নান করতে নামে। বিভিন্ন রকমের অসংখ্য ছোটবড় নৌকা ঘাটে এসে ভিড় করে। ঘাটের তীর ঘেঁষে বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয় নৌকার সারি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়।
২. তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।
৩. স্থলে মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ।

ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়।

উদ্ধৃত বাক্যটি কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের সংকলিত আখ্যান ভাগ থেকে নেয়া হয়েছে। এ বাক্যে ইলিশের মরসুম শেষে পদ্মার পরিবেশ সম্পর্কে লেখক একটি গভীর ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন।

কুবের মৎস্যজীবী দিনমজুর। পদ্মা তার জীবিকার সহায়স্থল। এ-বছর টাকার অভাবে সে অখিল সাহার পুকুর বন্দোবস্ত নিতে পারেনি। ফলে সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। কিন্তু তার নিজের নৌকা নেই, জাল নেই। বাধ্য হয়েই তাকে ধনঞ্জয় কিংবা যদুর সঙ্গে ভাগে মজুর খাটতে হবে। ইলিশ মরসুমে সে যদি বেশি শ্রম না দিয়ে ঘরে বসে থাকে তাহলে অকালে সংসার নির্বাহ হবে কীভাবে? কুবের জানে, ইলিশের মরসুম ফুরালেই বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়। নিজের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পদ্মা মাছগুলিকে লুকিয়ে ফেলে। নদীর মালিককে খাজনা দিয়ে হাজার টাকা দামের বিরাট জাল যারা ফেলতে পারে তারাই কেবল এ সময় বিশাল পদ্মার মাছ শিকার করতে পারে। কিন্তু ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থায় মাছ শিকারের সামান্য যে ভাগ পাওয়া যায় তাকে কুবেরের মতো দরিদ্র জেলের সংসার চালানো দুঃসাধ্য।

ইলিশের মরসুমে যে পদ্মা অকৃপণভাবে নিজের ভাণ্ডার জেলেদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, ইলিশের মরসুম শেষে সেই পদ্মাই কৃপণ হয়ে যায়, বিস্তৃত বুকে মাছগুলিকে লুকিয়ে রাখে। দরিদ্র জেলেরা ছোট জাল দিয়ে মাছের হদিস পায় না।

স্থলে মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ।

উপস্থাপিত বাক্যটি বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের সংকলিত আখ্যান ভাগের অন্তর্গত। আলোচ্য বাক্যে প্রভাতে পদ্মার বুকে এবং পদ্মাতীরবর্তী মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহের মধ্যে যে সচলতা ও সজীবতা সে দিকে লেখক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

প্রভাতে পূর্বদিক যখন লাল হয়ে ওঠে সারারাত শিকার করে মেছো নৌকাগুলি তখন দেবীগঞ্জের ঘাটে এসে ভিড়ে। নদীর তীরে আর নদীর জলে জীবনের সাড়া জাগে। থেকে থেকে বেজে ওঠে স্টিমারের বাঁশি। স্টিমার ঘাট ছেড়ে যায়, কোনোটি জেটিতে এসে ভিড়ে। গঞ্জের সমস্ত দোকানপাট খুলে যায়। মানুষের কোলাহলে সরগরম হয়ে পড়ে চতুর্দিক। মেছো নৌকার ঘাটে দর কষাকষি করে মাছ বেচাকেনা চলে হরদম। মাছ চালানের ব্যবস্থাও হয় সঙ্গে সঙ্গেই। জলে ও স্থলে এ-ভাবেই প্রবাহিত হয় মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ।

নদীবক্ষে জেলে নৌকাগুলির অবিশ্রাম চলাচল আর নদীতীরবর্তী মানুষের গতিময় কর্মচাঞ্চল্য অবিরাম জীবন প্রবাহেরই ইঙ্গিতবহ। মানুষের জীবন প্রবাহ নদীর জলস্রোতের মতোই প্রবাহিত হয়ে চলে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- দেবীগঞ্জের হাটে মাছ কেনাবেচা ও চালানের ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছ চুরি করে কুবেরের প্রতারিত হওয়ার কাহিনী বলতে পারবেন।
- ধনঞ্জয়ের চাতুর্যের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দরিদ্র ও বঞ্চিত কুবেরের দুঃখের কথা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নেংটি – লেঙ্গটি-র কথ্যরূপ। কৌপিন। লজ্জা নিবারণের ক্ষুদ্রবাস। **চালানবাবু** – যে কর্মচারি পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করেন। **প্যাকিং কেস** – এখানে যে বাক্সে চালানের মাছ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। **এক পরত** – এক স্তর। **চালান** – রপ্তানি অর্থে। **ওয়াগন** – রেলের মাল গাড়ি। **উদাসভাবে** – নির্লিপ্তভাবে। **তিনডা** – তিনটা। **সিদা** – সোজাসুজি। **আইজ** – আজ। **কয়ডা** – কয়টা। **তালি** – তাহলে। **নিরতিশয়** – অত্যন্ত বেশি। **অবসর** – ফুরসৎ অর্থে। **দিমু** – দেবো। **রন** – দাঁড়ান, অপেক্ষা করুন। **ত্বরা** – তাড়াহুড়ো। **খাওয়ামু** – খাওয়াবো। **হালা** – শালা, শ্যালক। **গলুই** – নৌকার উভয় প্রান্তের সরু অংশ।	নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোট ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশ' মাছ গোনা হইবামাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে একসারি মাছ ও এক পরত করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে যেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উচুনিচু ও প্রায় অকেজো লাইনের ওপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ। একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল। কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী, কন? সে রাগ করিয়া বলিল, কী, কন! কী, জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস। মাছ ত নাই, শেতলবাবু। নাই কি রে, নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে আয় গা, যা। বড় দেইখা আনিস্। কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে, দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ। কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয়, বাজারে কিনিতে গেলে তার দ্বিগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না। সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে, কুবের। অমন করস্ ক্যান? পয়সা না হয় কয়ডা বেশি লইস্, অ্যাঁই? তা'লি খানিক খাড়াও, শেতলবাবু। কুবের ফিরিয়া গিয়া, কাপড়টা ভাল করিয়া

এলাইয়া – আলগা করে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে।

ভাগ – অংশ।

ফাউ – অতিরিক্ত, উপরি।

ইটা – এটি।

এক্কেরে – একেবারে।

জিগাইস – জিজ্ঞাসা করিস।

মিছা – মিথ্যা।

নিমীলন পিপাসু চোখে – বুজতে উন্মুখ চোখে।

বঞ্চিত – প্রতারিত, ন্যায্য পাওনা যে পায়নি।

অসঙ্কোচে – সঙ্কোচহীনভাবে।

উজান (উদ্‌যান>উজান) – স্রোতের বিপরীত দিকে, জোয়ারে।

আঁজলা – অঞ্জলি পরিমাণ, করপুট পরিমাণ।

বাইবার – নৌকা বাওয়ার।

গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপি চুপি মাছ লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এ যে, সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে। তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারো নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটা মাছ কুবের এক সময় গায়ের কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

পয়সা কাইল দিমু, কুবের।

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, র'ন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না। দামটা দ্যান দেহি।

কাইল দিমু, কইলাম যে?

অঁই, অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?

পয়সা নাই ত দিমু কি? দিমু, নিঘ্যাত দিমু।

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে কুবের বলিল, হালা ডাকাইত! বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরও কয়টা গাল দিয়া কুবের নৌকায় গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয় তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল। একা একা দাম লইবার সুযোগ সে কোনদিনই প্রায় পায় না। কুবের এ সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। টাকা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ চায়ের কম না, অ্যাঁ?

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, হ, চাইর শ না হাজার। দুইশ সাতপঞ্চাশখানা মাছ। সাতটা ফাউ নিয়ে আড়াই শর দাম দিছে।

কুবের উঠিয়া বসিল।

ইটা কি কও, খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুই শ সাতাশটা মাছ হইছিল?

ধনঞ্জয় তৎক্ষণৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কইলাম নাকি রে কুবের? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।

কুবের নরম হইয়া বলিল, জিগানের কাম কি? তা কই নাই, খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না। মাছ নি কাল বেশি পড়ছিল, তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।

গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাঠাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেয়া হইল। এখন বৈঠা না ধরিলেও চলে; উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া

	চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা ঢেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কাক-চিল-মাছরাঙা প্রভৃতি পাখিগুলি ক্রমাগত জ্বলে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট সংকেতের মতো একত্র স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই। গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, না আইলি পারতি কুবের আইজ। কুবের কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে। গণেশ বলে, মাথা টিপা দিমু নাকি? কুবের বলে, অই। গণেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলে, হাল ধইরা যদি যাইবার পারস কুবির, খুড়া আর আমি বৈঠা বাই, তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়।

সার-সংক্ষেপ

নেংটি ছেড়ে তিনহাতি একখানা ময়লা কাপড় পরে কুবের তীরে ওঠে। চালানবাবু কেদারনাথ তখন খাতায় মাছের হিসাব লিখে মাছ চালানের ব্যবস্থা করছেন। প্রতি একশ মাছ পিছু চাঁদা হিসেবে চালানবাবু বরাদ্দ পাঁচটি মাছ দ্রুততার সঙ্গে বাক্সে জমা করছে তার চাকর। মাছের প্যাকিং বক্সগুলি চালান হয়ে যাবে কলকাতায়। কলকাতার মানুষ পদ্মার এ ইলিশ বাজার থেকে কিনে বাড়ি ফিরবে। কলকাতার বাতাসে পাওয়া যাবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

কুবের সুযোগ পেলেই নৌকা থেকে মাছ তুলে লুকিয়ে বিক্রি করে। ধনঞ্জয় ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে যেটুকু বঞ্চিত করে, এতে সেটা পুষিয়ে। দেবীগঞ্জ হাটের শেতলবাবু তার নিয়মিত খদ্দের। আজ শেতল বাবুকে কাছে মাছ বিক্রি করতে প্রথমে কুবের রাজি হয় না। ধরা পড়লে তার লজ্জার সীমা থাকবে না। তবে ভরসা এ যে, নিজের নৌকা থেকে কে কয়টা মাছ চুরি করছে তা দেখার অবসর কারও নেই।

গণেশ নির্বোধ প্রকৃতির মানুষ। কুবের যখন শেতলবাবুর কাছে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছে, সেই সুযোগে নির্বোধ গণেশকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে ধনঞ্জয় মাছ গুণে গুনে বিক্রি করে দেয়। কুবের ফিরে এলে বলে মাছ বেশি ধরা পড়েনি গত রাতে। কুবের ধনঞ্জয়ের চালাকি বুঝতে পেরেও নৌকা ও জালের মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ বুজে আসতে চায়। রাগে-দুঃখে তার সে-চোখে জল আসতে চায়। কুবের জানে গরিবের মধ্যে আরো গরিব, ছোট লোকের মধ্যে আরো বেশি ছোট লোক। তার এ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্যই মানুষ তাকে প্রতারিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন।

১. চালান বাবুর মাছ চালানের ব্যবস্থা বর্ণনা দিন।
২. দেবীগঞ্জের হাট থেকে পদ্মার ইলিশ কোথায় যায়?
৩. কুবেরের মাছ চুরির এবং প্রতারিত হওয়ার ঘটনা লিখুন।
৪. ধনঞ্জয় কোন্ কৌশলে গণেশ ও কুবেরের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে?

প্রশ্ন : দেবীগঞ্জের হাট থেকে পদ্মার ইলিশ কোথায় যায়?

উত্তর : দিন-রাত পরিশ্রম করে পদ্মা নদীর মাঝিরা ইলিশ শিকার করে। সকাল-সন্ধ্যায় দেবীগঞ্জের মাছের হাটে দরকষাকষি করে মাছ কেনাবেচা হয়। মাছ চালানের ব্যবস্থাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। চালানবাবু কেদারনাথের তৎপরতায় প্যাকিং বাক্সে বরফ দিয়ে সাজানো হয় মাছ। ওয়াগন বোঝাই করে ইলিশের প্যাকিং বাক্সগুলো ট্রেনযোগে কলকাতায় পৌঁছে। সকাল বিকাল কলকাতার বাজারগুলো পদ্মার ইলিশ কেনাবেচায় সরগরম হয়ে উঠে। কলকাতার নাগরিক বাজার থেকে পদ্মার ইলিশ কেনে বাড়ি ফেরে। ইলিশ মাছ ভাজার স্বাদ-গন্ধে কলকাতার বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। জেলেদের কঠিন পরিশ্রমে ধরা পদ্মানদীর ইলিশ যুক্তিসঙ্গত দ্রুততায় কলকাতায় পৌঁছে পরিতৃপ্ত করে নাগরিক মানুষের রসনা।

প্রশ্ন : ধনঞ্জয় কোন্ কৌশলে গণেশ ও কুবেরের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে?

উত্তর : ধনঞ্জয় কুবের ও গণেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে ধনী। একটি ছোট জেলে নৌকা এবং একটি জালের মালিক সে। ধনঞ্জয়ের জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থাতেই কুবের ও গণেশের সামান্য উপার্জন হয়। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার সুবাদে ধনঞ্জয় সব সময় সুবিধা ভোগ করে। শারীরিক শ্রম কম দেয় সে। মাছ শিকারের পুরো সময়টাই সে নৌকার হাল ধরে বসে থাকে। উপকরণের মালিকানা স্বত্বের বদৌলতে মাছের অর্ধেক ভাগ পায় সে। সুযোগ পেলেই ধনঞ্জয় কুবের ও গণেশকে তাদের প্রাপ্য ভাগ থেকে ঠকায়। বর্তমান আখ্যান ভাগের ঘটনার দিনও ধনঞ্জয় কুবেরের সাময়িক অনুপস্থিতিতে নির্বোধ গণেশকে কাজের অছিলায় অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে অসম্ভব দ্রুততায় মাছ বিক্রি করে ফেলে। গতদিনের হাটে তারা মাছ বিক্রি করেছিলো দুশো সাতাশ টি। সেদিন বেশি মাছ ধরা পড়েনি বলে তাদের আপসোস ছিলো। অথচ 'জবর' মাছ ধরা পড়ার পরও আজ দুশো সাতান্নটি মাছ বিক্রি করার হিসেব দেয় ধনঞ্জয়। কুবের ধনঞ্জয়ের প্রতারণা বুঝতে পারে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করে না। সে জানে প্রতিবাদ করার অধিকারটুকু থেকে সে বঞ্চিত।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

২. নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারো নাই।

৩. আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল, 'হালা ডাকাইত!'

৪. গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোট লোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক।

৫. এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।

আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল, 'হালা ডাকাইত!'

ব্যাখ্যেয় অংশটি কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র সংকলিত আখ্যানভাগের অন্তর্গত। উদ্ধৃত বাক্যটি কুবেরের একটি সংলাপ।

ধনঞ্জয় নৌকা ও জালের মালিকানার সুবাদে উপার্জিত অর্থের অর্ধেক ভাগ পায়। ওপরন্তু সুযোগ পেলেই কুবের ও গণেশকে ঠকাতে সে পিছপা হয় না। দু-চারটি মাছ চুরি করে কুবের এ ক্ষতিটা কখনো কখনো পুষিয়ে নেয়। তার চুরি করা মাছের নিয়মিত খদ্দের দেবীগঞ্জ হাটের শেতলবাবু। চুরির মাছের দাম স্বভাবতই কম। সুযোগসন্ধানী শেতলবাবু তাই কুবেরের খোঁজেই থাকেন।

গত রাতে অসুস্থ শরীর নিয়ে কুবের মাছ ধরেছে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে প্রভাতী হাটে মাছ বিক্রি করতে এসেছে তারা। এ-সময়েই আবির্ভাব ঘটে শেতলবাবুর। ইশারায় ডাকেন তিনি কুবেরকে। প্রথমে সে সাড়া না দিলে, বেশি মূল্য দেয়ার লোভ দেখান শেতলবাবু। কিন্তু ধনঞ্জয়কে ভয় কুবেরের। এছাড়া অসংখ্য মানুষের চলাচলে সরগরম পুরো হাট। তবু ভরসা এ যে, নিজের নৌকা থেকে কে কয়টি মাছ চুরি করল তা দেখার সময় নেই কারও। এ-ভরসাতেই শেষে প্রলুব্ধ কুবের তিনটি ইলিশ কাপড়ের আড়াল করে শেতলবাবুর চটের থলিতে পুরে দেয়। কিন্তু 'পয়সা কাইল দিমু কুবের' বলে শেতলবাবু দ্রুত পা বাড়ান। নিজের এবং ছেলেদের ক্ষুধা মেটাতে হবে কুবেরকে। তাই অনুনয় করে সে মাছের মূল্য প্রার্থনা করে। কিন্তু আগামীকাল নিশ্চয় মূল্য পরিশোধ করবে এ কথা বলে পিছল মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে টিপে শীতল চলে যায়। প্রতারিত হয়ে চাপা ক্ষোভে ফেটে পড়ে কুবের। কথ্য ভাষায় অস্ফুট স্বরে সে গালি দেয় 'হালা ডাকাইত'।

বঞ্চিত হয়েও প্রতিবাদ করার অধিকারটুকু কুবেরের নেই। প্রতারিত হয়ে চাপা ক্ষোভে ফেটে পড়লেও অস্ফুট স্বরেই শিতলবাবুর উদ্দেশে গালি দিতে হয়েছে কুবেরকে। কুবেরের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণেই শেতলবাবুকে সরাসরি মোকাবেলা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত কুবের।

এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে ।

আলোচ্য অংশটুকু ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে ধনঞ্জয় কর্তৃক প্রতারিত কুবেরের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে।

কুবের অতি দরিদ্র জেলে। তার নিজের নৌকা নেই, জাল নেই। ধনঞ্জয়ের জেলে নৌকা ও জাল ব্যবহার করে কুবের ভাগে মাছ ধরে। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার সুবাদে শিকার করা মাছের অর্ধেক ভাগ নেয় ধনঞ্জয়। বাকি অর্ধেক দুভাগ করে নেয় কুবের ও গণেশ। ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। অধিকাংশ সময়ই সে হাল ধরে বসে থাকে, জাল ফেলা আর তোলার কাজটি করে কুবের ও গণেশ। বাড়তি উপার্জন সত্ত্বেও ধনঞ্জয় সুযোগ পেলেই কুবের ও গণেশকে ঠকায়।

গত রাতে 'জবর' ইলিশ ধরা পড়েছে জেলেদের জালে। কুবের ও গণেশও ধরেছে প্রচুর ইলিশ। সকালে দেবীগঞ্জের মাছের হাটে চালান বাবুর কাছে মাছ বিক্রি করতে এসেছে তারা। কুবের তিনটি ইলিশ চুরি করে শেতলবাবুর কাছে বিক্রি করতে গেলে ধনঞ্জয় কুবেরের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। নির্বোধ গণেশকে কাজের অছিলায় অন্যত্র পঠিয়ে দিয়ে দুশো সাতাশটি মাছ বিক্রি হয়েছে। কুবের মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। গত রাতের আগের রাতে মাছের আকাল ছিলো পদ্মায়। সে রাতেও তারা দুশো সাতাশটি মাছ ধরেছিলো। কুবের ধনঞ্জয়ের কৌশল ও প্রতারণা বুঝতে পারে। কুবের জানে যে 'গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক'। কাজেই বঞ্চিত প্রতারিত হয়ে প্রতিবাদ করার অধিকার তার নেই। পক্ষান্তরে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার সকলে সামাজিক প্রথা এবং ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতোই অবলীলায় প্রয়োগ করে।

প্রথা কিংবা নিয়ম মনে করেই দরিদ্রকে বঞ্চিত করে। দারিদ্র্যের কারণেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কুবেরের মতো দরিদ্র মৎস্যজীবীরা প্রতারণার শিকার হয়েও মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারে না।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ার পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জেলেপাড়ার মানুষের জীবন বাস্তবতার কথা লিখতে পারবেন।
- জেলেপাড়ার মানুষের জীবনে পদ্মানদীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিজের ভাষায় পদ্মার রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
জমাট – এক স্থানে আবদ্ধ। **অনাবশ্যক** – আবশ্যক নয় যা। **সঙ্কীর্ণতা** – অপ্রশস্ততা। **উন্মুক্ত** – খোলা, অবরোধমুক্ত। **প্রবঞ্চনা** – প্রতারণা। **ভূস্বামী** – জমির মালিক, জমিদার। **কুঁড়ে** – কুঁড়েঘর। **পুরুষানুক্রমে** – বংশক্রমে। **প্রথা** – সামাজিক নিয়ম। **ঋতুচক্র** – ঋতুর আবর্তন। **পাক খায়** – আবর্তিত হয়। **ক্ষুধাতৃষ্ণার ... দেবতা** – দেবতা, যাঁদের পূজা দিয়ে তুষ্ট রাখতে হয় দরিদ্র অসহায় মানুষদের।	পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতের নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিবার বাড়িতে পায় না; একটি কুঁড়ের আনাচে কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট। দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এ-দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদের, তালের রস গঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।
ব্রাহ্মণ – হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের উচ্চতম শ্রেণী। **ব্রাহ্মণেতর** – ব্রাহ্মণের চেয়ে নিম্নতর কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর। **রেষারেষি** – পরস্পর হিংসা। **কাড়াকাড়ি** – পরস্পর টানাটানি। **হয়রান (আ.)** – ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। অভ্যর্থনা – (সং **অভি+অর্থ+অন+আ)** সম্ভাষণ, সংবর্ধনা। **নিরুৎসব** – উৎসবহীন, অনাড়ম্বর। **কাম** – যৌন সম্ভোগেচ্ছা। **উপজীবিকা** – জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায়	পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ-গাঁয়ের মানুষকে ও-গাঁয়ে পৌছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জল জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এ সময়ে মানুষের বাড়ি ঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিযা থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরও একমাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এদেশের একরকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়। নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল কাটা রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়। নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, তা কে জানে। সমুদ্রগামী জল-প্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে। জেলেপাড়া নদী হইতে বেশি দূরে নয়। তবু এটুকু পথ চলিতেই কুবেরের কষ্ট

কুঁড়োজাল – মাছ ধরার ছোট জাল। **উঠান** – প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা। **সম্বল** – অবলম্বন। **রিক্ততা** – শূন্যতা। **আল** – জমির সীমা নির্দেশক বাঁধ, উঁচুপথ। **গ্রামান্তর** – অন্যগ্রাম। **বিরাম** – বিশ্রাম। **পদ্মার মাটির বুক** – পদ্মানদীর তলদেশ। **কুটুমবাড়ি** – আত্মীয়বাড়ি।	হইতেছিল। নৌকায় সমস্ত পথটা আবোল তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চুপ করিয়াছে। ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশে কুটুমবাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা লইয়া সে একা সেখানে চলিয়া গিয়াছে। গণেশের বাড়িটাই পড়ে আগে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

সার-সংক্ষেপ

কেতুপুর গ্রামের বাইরে পূর্বপ্রান্তে জেলেপাড়া। চারদিকে ফাঁকা জমির অভাব না-থাকলেও জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছে। প্রথম দেখলে মনে হয় এ-বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই অনুভব করা যায় প্রকৃত সত্য। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামী বা জমিদারের অধিকার প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত কম খাজনার জমি অতিক্রম করে জেলেপাড়ার পরিসর তাই বাড়তে পারে না। দিন কাটে, জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুর পর ঋতু আসে, প্রমত্তা পদ্মার এক তীর ভাঙে, অন্য তীরে জাগিয়ে তোলে সুবিশাল চর। সময়ের এ আবর্তনের মধ্যেই সচল থাকে জেলেপাড়ার জীবন। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে বর্ষার জল প্রবেশ করে, কনকনে 'শীতের আঘাত' হাড়ে গিয়ে বাজে। এদের জীবনে আসে রোগ, আসে শোক। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারা ক্লান্ত হয়। জন্মধারা এখানে সচল কিন্তু জন্মের অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণ এখানে উৎসব আড়ম্বরহীন জীবনের স্বাদ বা অর্থ তাদের জীবন ক্ষুধার নিবৃত্তি, যৌন সম্ভোগ ও স্বার্থরক্ষার সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ। জেলে পাড়ায় ঈশ্বর অবস্থান করেন না। তিনি থাকেন ভেতর গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে।

পদ্মা এবং পদ্মার খালগুলি জেলেপাড়ার অধিকাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। কেউ মাছ ধরে, কেউবা মাঝিগিরি করে। কেউ ক্ষুদ্র জাল নিয়ে খালে-খালে দিন কাটায়, কেউবা কুবেরের মতো জাল ফেলে বেড়ায় পদ্মার বিশাল বুকে।

স্রোতস্বিনী পদ্মা যেমন কখনো শুকায় না, তার বুকে নৌকার চলাচলও তেমনি কখনো থামে না। আজও পদ্মার সমুদ্র অভিমুখী স্রোতধারার মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। জলে ঢাকা পদ্মার তলদেশের মাটির বুকে কেউ কখনো দেখেনি, সে বুক চিরকাল ধরে গোপন হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. জেলেপাড়ার পরিবেশ বর্ণনা করুন।

২. 'জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না'। কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩. জেলেপাড়ার জীবনধারার পরিচয় নিজের ভাষায় লিখুন।
৪. পদ্মা কীভাবে জেলেপাড়ার অধিকাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
৫. জেলেপাড়ার মানুষের জীবিকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : জেলেপাড়ার পরিবেশ বর্ণনা করুন।

উত্তর : পূর্বপ্রান্তে, গ্রামের বাইরে জেলেপাড়ার অবস্থান। এ পাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছে। চারপাশের প্রচুর সমতল ফাঁকা ভূমিতে ভূস্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু বেশি খাজনার ঐ জমিতে জেলেপাড়া প্রসারিত হওয়ার সুযোগ নেই। কম খাজনার জমিতে একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে অন্য কুঁড়ে গড়ে ওঠে।

জেলেপাড়ার জীবনও একঘেয়ে। ভেতর গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র সমাজ তাদের দূরে ঠেলে রাখে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিপর্যস্ত করে তোলে তাদের জীবনধারা। তবু বংশবিস্তার কখনও এখানে বন্ধ হয় না। যদিও জেলেপাড়ায় জন্মের সংবর্ধনা উৎসবহীনতায় বিষণ্ন।

বর্ষার জেলেপাড়ায় জল উঠান পর্যন্ত ওঠে আসে। নৌকা তখন যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম।

প্রশ্ন : 'জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না'। কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বংশানুক্রমে কম খাজনার নির্দিষ্ট ভূমিতে অসংখ্য জমাট বাঁধা কুঁড়ে ঘরে বাস করে জেলেপাড়ার মানুষ। মূল গ্রামের বাইরে এ অদৃশ্য মানুষদের পাড়া। গ্রামের ভেতরে ভদ্রপল্লী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র সমাজের বসবাস সেখানে।

মানুষ কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত তবু জেলেপাড়ার জীবনধারা থেমে থাকে না। অস্তিত্ববান এসব মানুষ যুগ যুগ দরে শত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজেদের অস্তিত্বকে সচল রেখেছে। তবে জীবনের আনন্দ উৎস এখানে ভিন্ন। ক্ষুণ্নিবৃত্তিতে, যৌনসম্ভোগে, মায়া মমতায় এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় এরা সন্ধান পায় জীবনের স্বাদ। জীবন থেমে থাকে না বলেই জেলেপাড়ায় শিশুর ক্রন্দন কখনো থামে না। নবজাতকের ক্রন্দনে জীবনের প্রবহমানতা এখানে সংকেতিত হয় প্রতিনিয়ত। তবে অভাব-অনটনের কারণেই জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, আড়ম্বরহীনতায় বিষণ্ন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।
২. জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না।
৩. জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন।
৪. জীবনের স্বাদ এখানে ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়।
৫. ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।
৬. নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না।

ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

উদ্ধৃত অংশটুকু কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে ঔপন্যাসিক জেলেপাড়ার বঞ্চিত মানুষের জীবন, ঈশ্বরের অনুদারতা ও পক্ষপাতিত্বের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন।

কেতুপুর গ্রামের একপ্রান্তে, গ্রামের বাইরে অস্পৃশ্য মানুষ জেলেদের পাড়া। জেলেপাড়ার প্রসারিত হওয়ার সুযোগ নেই, পুরুষানুক্রমে এরা সুনির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ। মূল গ্রামে বসবাস করেন ভদ্রশ্রেণী, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর ভদ্রসমাজের তারা অংশ। ভদ্রপল্লীর মানুষ অচ্ছুৎজ্ঞানে জেলেদের দূরে ঠেলে রাখে। জেলেরা একদিকে মানুষের দ্বারা বঞ্চিত প্রতারিত হয়, অন্যদিকে বিপর্যস্ত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে। কালবৈশাখীর ঝড় সংহারমূর্তিতে আবির্ভূত হয় এদের জীবনে, শীতের আঘাত' এদের হাড়ে গিয়ে বাজে। রোগ-শোক এসে বিপন্ন করে তোলে এদের অস্তিত্ব। কিন্তু বংশধারার বিস্তার এখানে থামে না। জীবনের আনন্দ এরা খুঁজে পায় ক্ষুধার নিবৃত্তিতে, যৌনসম্ভোগে, মায়ামমতায় আর পরস্পর রেষারেষিতে। তালের রস, ও ক্ষুধার অন্ন পচিয়ে যে মদ তৈরি হয় সে মদ তাদের জীবনানন্দের অন্যতম উপকরণ-উৎস। জেলেদের গৎবাঁধা রোগ শোক বিপর্যস্ত জীবনে উদার ঈশ্বরের আর্শীবাদ নেই। ঈশ্বর অবস্থান করেন ভদ্রপল্লীতে। স্বচ্ছল ভদ্রসমাজেই ঈশ্বরের আর্শীবাদ বর্ষিত হয়, ধনীরাই দখল করে রাখে ঈশ্বরকে - এ মনোভাবই তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য অংশে।

সবদিক থেকে যে মার খায়, ঈশ্বরও তাকে বঞ্চিত করেন। জেলেপাড়ার সংকীর্ণ দুঃখপীড়িত জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর অবস্থান করেন ভদ্র পল্লীতে সুখ সমারোহে তিনি সমুপস্থিত।

নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না।

উদ্ধৃত অংশটুকু ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অংশে ঔপন্যাসিক চিরযৌবনা পদ্মানদীর আবহমান গতিধারার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এ-উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরযৌবনা প্রমত্তা পদ্মার রূপ অঙ্কন করেছেন। নৌকা পদ্মার ভূষণ। এ-নদী কখনো শুকায় না বলেই পদ্মায় নৌকা চলে সর্বদা। পদ্মার স্রোতধারার অনুষঙ্গে চলমান নৌকার গতিভঙ্গি নদীর সামগ্রিক প্রবহমানতাকেই মূর্ত করে তোলে।

অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জেনেছে চিরযৌবনা পদ্মা কখনো শুকায় না। কে জানে কবে এ-নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এ-নদী শুধু চলতেই জানে– সমুদ্রমুখী যাত্রায় তার মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। জলে ঢাকা পদ্মার তলদেশের মাটির বুক সমকালীন মানুষের কাছে গোপন হয়ে আছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'পদ্মানদীর মাঝি' আখ্যানভাগের অনুসরণে জেলেদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।
২. 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বনে কেতুপুর গ্রামের জেলেদের জীবনচিত্র অঙ্কন করুন।
৩. ইলিশমাছ ধরার মরসুমে পদ্মার পরিবেশ বর্ণনা করে মাছ ধরার কৌশল ও মাছ কেনাবেচার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৪. 'জীবনের স্বাদ এখানে শুদু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়'। –জেলেপাড়ার মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-মন্তব্যের তাৎপর্য বিচার করুন।
৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' আখ্যানভাগের অনুসরণে কুবেরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : 'পদ্মানদীর মাঝি' আখ্যানভাগের অনুসরণে জেলেদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। 'পদ্মানদীর মাঝি' নামে সংকলিত বর্তমান আখ্যানভাগে পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কেতুপুর গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা, অভাব অনটন, সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা-বিপর্যয় এবং পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বাস্তববাদী শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

জীবনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য এবং জীবনের সত্যকে অবিকৃত রেখে শৈল্পিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই বাস্তববাদী সাহিত্যের সাফল্য নির্ভরশীল ও পদ্মাতীরবর্তী মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে যে অভিজ্ঞতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জন করেছিলেন, 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তারই শিল্পিত প্রতিফলন ঘটেছে।

কেতুপুর গ্রামের বাইরে পূর্বপ্রান্তে জেলেপাড়ার অবস্থান। জেলেপাড়ার অধিকাংশ মানুষই মৎস্যজীবী। পদ্মা এদের উপজীবিকার অবলম্বন। জলে ঝড়ে পদ্মায় নৌকা ভাসিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে এরা মাছ শিকার করে। ইলিশের মরসুম ফুরালে বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়। ফলে পদ্মা হয়ে উঠেছে এদের জীবনেরই এক অনিবার্য অংশ। বর্ষাকালে পদ্মা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসে। তখন চারদিকে জলে জলময় হয়ে যায়। পথ ঘাটের চিহ্নও থাকে না তখন চৈত্রে যখন পথঘাট শুকায় তখন পায়ে হেঁটে মানুষ গ্রামান্তরে যায়। কিন্তু নৌকা চলে পদ্মায় সব সময়। পদ্মা কখনো শুকায় না, সমুদ্রমুখী চলার তার বিরাম নেই। পদ্মার বয়ে চলার মতোই সুখে-দুখে, রোগে শোকে, আনন্দ-বেদনায় জেলেপাড়ার মানুষের জীবনও পুরুষানুক্রমে অতিবাহিত হয়ে চলেছে।

জেলেপাড়ার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ ধনঞ্জয় কুবের গণেশ। এরা তিনজনই দরিদ্র। কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্যের মাত্রাগত তারতম্য। ধনঞ্জয় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তার রয়েছে নিজের নৌকা ও জাল। কুবের ও গণেশ ধনঞ্জয়ের নৌকা ও জাল ব্যবহার করে ভাগে ইলিশ শিকার করে পদ্মায়। মালিকানা স্বত্বের কারণেই ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম। ওপরন্তু সুযোগ পেলেই সে ঠকায় কুবের ও গণেশকে। চোরাই মাছের ক্রেতা যে শেতলবাবু, তিনিও সুযোগ বুঝে প্রতারণা করেন এ দরিদ্র জেলেদের সঙ্গে। দেবীগঞ্জ হাটের মাছ বাজারের চালানবাবুও বখরা আদায় করেন এ শ্রমজীবী নিঃস্ব জেলেদের উপার্জনের অংশ থেকে। এভাবেই বঞ্চিত প্রতারিত হয়ে চলে এসব দরিদ্র জেলের জীবন। সগোত্রীয় ধনঞ্জয় কর্তৃক প্রতারিত হয়ে কুবের এ অনুভবে উপনীত হয়েছিলো যে "গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক, এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।"

কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ায় একান্তভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ই কেবল বাস করে। এদের কেউ মাছ ধরে, কেউ করে মাঝিগিরি। এ-পাড়ার চারদিকে ফাঁকা জমির অভাব না-থাকলেও গায়ে-গায়ে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছে এদের কুঁড়েঘর। জমাট বাঁধা এ কুঁড়েঘরগুলি দেখে প্রথমে মনে হয় এ-বুঝি এদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আসলে বেশি খাজনার পার্শ্ববর্তী জমি ভূ-স্বামীর অধিকারভুক্ত। এজন্যেই জেলেপাড়ার পরিসর তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। বংশানুক্রমে একটি কুঁড়ের আনাচে কানাচে অন্য কুঁড়ে গড়ে ওঠে। গ্রামের বাইরের এ জেলেপাড়ার মানুষকে গ্রামের ভেতরকার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রসমাজ দূরে ঠেলে রাখে। অন্যদিকে বিরূপ প্রকৃতি সংহার মূর্তি আবির্ভূত হয় এদের জীবনে। একদিকে মানুষের দ্বারা তারা বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় লণ্ডভণ্ড করে দেয় এদের গোছানো সংসার। বর্ষার ঘরে ঘরে জল প্রবেশ করে, শীতে কনকনে ঠাণ্ডার 'আঘাত' এদের হাড়ে এসে বাজে। আসে রোগ শোক। অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই জেলেপাড়ার মানুষ কখনো পরস্পর সংঘাতেও লিপ্ত হয়। তবু বংশধারার বিস্তার এখানে থামে না কখনো। এদের কাছে জীবন হলো – ক্ষুধার নিবৃত্তিতে, যৌনসম্ভোগে, মায়ামমতায়, রেষারেষিতে। তালের রস গেঁজিয়ে বা ক্ষুধার অন্ন পচিয়ে তৈরি মদ এদের আনন্দের অন্যতম এক উৎস।

দুঃখ-সুখ, রোগ শোক, বঞ্চনা-প্রতারণা মিলেই জেলেপাড়ার জীবনধারা প্রবহমান। জেলেপাড়ায় নবজাতক শিশুর অভ্যর্থনা 'গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন' হলেও "জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না।" নবজাত শিশুর ক্রন্দনে জীবনের প্রবহমান ধারা এখানে সংকেতিত হয় প্রতিনিয়ত। বঞ্চিত ও বিপর্যস্ত গঁৎবাঁধা জীবনে বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা থাকলেও উদার ঈশ্বরের আর্শীবাদ জেলেপাড়ার জীবনে বর্ষিত হয় না। এ জীবনে ক্ষুধার অন্ন মদে পরিণত হয়, উপার্জিত অর্থ সুযোগ সন্ধানীর প্রতারণায় হাতছাড়া হয়ে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাই এ-পাড়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর অবস্থান করেন ভদ্রপল্লীতে। ধনীরাই দখল করে রাখে ঈশ্বরকে, তাদের ওপরই বর্ষিত হয় তাঁর অপার করুণা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই পদ্মাতীরবর্তী মৎস্যজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, আনন্দ-বেদনার স্বরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যে উপস্থাপন করেছেন।

সংকলিত আখ্যান ভাগে বাস্তববাদী শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের রূঢ় জীবন– বাস্তবতা ও নিয়তি।

প্রশ্ন : 'পদ্মানদীর মাঝি' আখ্যানভাগের অনুসরণে কুবেরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। 'পদ্মানদীর মাঝি' শিরোনামে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত আখ্যানভাগে পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনযাত্রার পটভূমিতে কুবের মাঝির যে পরিচয় প্রকাশিত, তা থেকে সহজেই কুবের চরিত্রের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে নেয়া যায়। কুবের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অসামান্য সৃষ্টি। নিয়তিতাড়িত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিপর্যস্ত এবং মানুষ কর্তৃক বঞ্চিত-প্রতারিত সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই কুবের চরিত্রের সার্থকতা।

পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত জেলেপাড়ার এক দরিদ্র মৎস্যজীবী কুবের মাঝি। পদ্মা তার জীবন-জীবিকার অবলম্বন। দরিদ্র কুবেরের জাল নেই, নৌকা নেই। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয় কিংবা যদুর সঙ্গে ভাগে পদ্মায় মাছ শিকার করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। জেলেপাড়ার মানুষ সকলেই দরিদ্র, তবে তাদের দারিদ্র্যের মধ্যেও রয়েছে তারতম্য। যেমন ধনঞ্জয় নৌকা ও জালের মালিকানার সুবাদে বেশি অর্থ আয় করে। পরিশ্রমও করে সে কম। ওপরন্তু সুযোগ পেলেই সে সহজীবীদের ঠকাতে পিছপা হয় না। সারারাত 'জবর' মাছ ধরেও ধনঞ্জয়ের কূটকৌশলে যখন কুবের প্রতারিত হয় প্রকৃত প্রাপ্য থেকে তখন সে প্রতিবাদ করতে পারে না। দারিদ্র্যের শেকলে আবদ্ধ কুবের মাঝি। প্রতিবাদ তার নিরাপদ জীবিকা উৎসের পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে বলেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না কুবের। তবে ঠকে ঠকে সেও শিখে নিয়েছে প্রাপ্য আদায়ের অসৎ কৌশল। কুবের জানে–

"গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।"

এ-কারণেই নিজেদের ধরা ইলিশ থেকেই দু'দিনটা লুকিয়ে গিয়ে প্রায়শ বিক্রি করে কুবের। চোরাই মাছের দাম যেহেতু কম, সেহেতু ঐ মাছ কেনার সুযোগ গ্রহণ করে দেবীগঞ্জ হাটের শেতলবাবু। সুযোগসন্ধানী শেতলবাবুও সুযোগ বুঝে কুবেরকে ঠকাতে পিছপা হয় না। এভাবে দুদিক থেকেই প্রতারিত হয় কুবের। জীবনের নিয়তিই বঞ্চিত করে রেখেছে কুবেরকে। নিয়তির এ অনুশাসন অমান্য করা যায় না, মেনে নিতে হয়।

কুবের নিরলস কর্মোদ্যোগী মৎস্যজীবী। জীবনও জীবিকার প্রয়োজনে, সন্তানদের ক্ষুধার অন্নের স্বার্থে অসুস্থ শরীর নিয়েও সে ইলিশ শিকারে অংশগ্রহণ করে। শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়েও কুবের কাজে ফাঁকি দেয় না। কুবের জানে ইলিশের মরসুম শেষে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হয়ে যাবে। পদ্মা তার বিশাল বক্ষে মাছগুলিকে লুকিয়ে ফেলবে, ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থায় তখন মাছ ধরার সুযোগ থাকবে না। এজন্যেই ভরা মরসুমে বেশি পরিশ্রম করে ভবিষ্যৎ আকালের রসদ সে সংগ্রহ করে রাখতে চায়। তার এ প্রত্যাশা ও প্রয়াসের মধ্যে পরিণামদর্শিতা আছে কিন্তু জীবনের বাস্তবতাই কুবের-এর নিরাপদ ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে রাখে। কেননা গরিব সে, মার খাওয়া আর প্রতারিত হওয়াই তার জবিনের পুরুষানুক্রমিক নিয়তি।

কুবের যে জেলেপাড়ার অধিবাসী সেখানে জীবনধারা অত্যন্ত সংকীর্ণ। নবজাতকের কান্না প্রতিনিয়ত জেলেপাড়ার জীবনের সচলতাকে অক্ষুণ্ন রাখলেও জন্মের অভ্যর্থনা সেখানে আড়ম্বরহীনতায় বিষণ্ন। এ জেলেপাড়ারই মানুষ কুবের। এখানে রোগ শোক জীবনের নিত্য সহজর। যৌন সম্ভোগে, মমতায়, পরস্পর রেষারেষিতে এবং তালের রস গেঁজিয়ে এবং ক্ষুধার অন্ন পচিয়ে তৈরি মদ, এখানকার মানুষের জীবনে আনন্দের উৎস। কুবের মাঝি এ জীবন ধারার অংশিদার। জেলেপাড়ার এ জীবনবোধেরই ধারক ও বাহক সে।

কুবের সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি। নিয়তির অমোঘ বিধানে জন্মেই যাদের গঁৎবাঁধা ভাগ্য চিহ্নিত হয়ে যায় – নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কন করেছেন কুবের চরিত্র। কুবের অভ্যাস ও নিয়মের দাস, শাসন- অনুশাসনে বন্দী। সর্বোপরি অন্তরে বিক্ষোভ লালন করেও সে প্রতিবাদ প্রকাশে অসমর্থ। অচ্ছুৎ বলে সামাজিক জীবনে তার স্বীকৃতি নেই, বিপর্যস্ত বঞ্চিত জীবনে নিরাপত্তাও নেই। সর্বোপরি, তার

জীবনে নেই ঈশ্বরের উদার আর্শীবাদ। সবদিক থেকে মার খাওয়া কুবেরের জীবনের একমাত্র অবলম্বন পদ্মা তার জবিন জীবিকার উৎস। মাটির মানুষের সঙ্গে নদীর জলের এক নিবিড় সম্পর্ক উদ্ভাসনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুবের মাঝি চরিত্রকে চিরায়ত মহিমা দান করেছেন।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

উপভাষা : অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে বলা হয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের সংলাপে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে আঞ্চলিক ভাষার কয়েকটি সংলাপ এবং সেগুলির বাংলা প্রমিত রূপ উপস্থাপন করা হলো :

আঞ্চলিক ভাষা :

'যদু হে এ এ এ – মাছ কিবা?

'জবর'।

'সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।'

'কাইল চাইরে নামব। হালায় মাছ ধইরা জুত নাই।'

প্রমিত রূপ

'ওহে যদু – মাছ কেমন ধরা পড়েছে?"

'সন্ধ্যার দরটা (মাছের) জিজ্ঞেস কর দেখি কুবের।'

'কাল চারে (টাকায়) নামবে। শালার মাছ ধরে সুখ নেই।

সমাস

একাধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ তৈরি করাকে বলা হয় সমাস। সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে দুটি সমাসবদ্ধ পদ নিম্নে উপস্থাপিত হলো -

দা-কাটা – দা দ্বারা কাটা। এটি তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

কাদায় পোঁতা – কাদাতে পোঁতা। এটি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে এ ধরনের সমাসবদ্ধ পদ গঠিত হয়।

প্রতিশব্দ

যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে অথবা যে সব শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়, তাদের বলা হয় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। বর্তমান আখ্যানভাগ থেকে কিছু শব্দ এবং সেগুলির কিছু প্রতিশব্দ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

মূল শব্দ	**প্রতিশব্দ/সর্মাথক**
অনির্বাণ	জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত, বহ্নিমান, অগ্নিমান ইত্যাদি।
চাঁদ	চন্দ্র, ইন্দু, শশী, শশাঙ্ক, নিশাপতি, শশধর ইত্যাদি।
বিনিদ্র	অনিদ্র, নিদ্রাহীন, নিদ্রাহারা, ঘুমহীন, জাগ্রত, জাগরূক ইত্যাদি।

সৌভাগ্য	ভাগ্যগুণ, ভাগ্যবর, জোরকপাল, বরকত ইত্যাদি।
নিরীহ	অবিরোধী, নির্বিরোধ, নির্বিবাদী, গোবেচারা ইত্যাদি।

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

◊ সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা সংলাপগুলি আলাদা করে প্রমিত বাংলায় রূপান্তর করুন।

◊ চারটি পাঠ থেকে চারটি শব্দ বাছাই করে শব্দগুলি বিপরীতার্থক রূপ উপস্থাপন করুন।

◊ নিজের মাছ ধরার অথবা মাছ-শিকার দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন-

'পদ্মানদীর মাঝি' পুরো উপন্যাসটি পড়ুন। হাতের কাছে পেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও অন্যান্য উপন্যাস পড়ুন।

সূর্য গ্রহণ

জহির রায়হান

লেখক পরিচিতি

১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জহির রায়হান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। জহির রায়হানের পিতার নাম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ এবং মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।

জহির রায়হানের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় কলকাতায়। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা মডেল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জহির রায়হান তাঁর পিতার সঙ্গে মজুপুর গ্রামে চলে আসেন এবং স্থানীয় আমিরাবাদ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আই.এস.সি পাস করেন। অতঃপর পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভাগ পরিবর্তন করে ১৯৫৮ সালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ ক্লাসে ভর্তি হলেও নানা কারণে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি অবতীর্ণ হননি।

জহির রায়হানের জীবনকে আমরা চারটি প্রধান ধারায় বিন্যস্ত করতে পারি। এ ধারাগুলো হলো সাহিত্যজীবন, সাংবাদিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং চলচ্চিত্র জীবন। বস্তুত, তাঁর কাছে এ চারটি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় দুরূহ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি কবিতা, নাম "ওদের জানিয়ে দাও"। ১৯৪৯ সালে কবিতাটি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জহির রায়হান সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে কিশোরজীবন থেকেই জড়িত হন। অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রেরণায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৭ সালের পর থেকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাব যুক্ত না থাকলেও, বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তার যোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির নানা কাজেও তিনি কখনো কখনো অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও তিনি অবিস্মরণীয় কৃতির স্বাক্ষর রেখে যান। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর ছবি 'স্টপ জেনোসাইড' সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া জাগায়। এ-ছাড়াও তিনি আরো অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারায় তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাই তাঁর সাহিত্যকর্মের মৌল বিষয়। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত তাঁর গল্প ও উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) উপন্যাসের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সার নিখোঁজ হন। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁকে খুঁজে বের করতে মিরপুর যান জহির রায়হান। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ।

জহির রায়হানের প্রধান প্রধান রচনা

উপন্যাস : শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), আর কতদিন (১৩৭৭), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২)।

ছোটগল্প : সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।

জহির রায়হানের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র

জহির রায়হান পরিচালিত ছবি : কখনো আসেনি (১৯৬১), সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), সঙ্গম (১৯৬৪), বাহানা (১৯৬৪), বেহুলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৭), জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)।

জহির পরিচালিত প্রামাণ্য চিত্র : STOP GENOCIDE (1971) BIRTH OF A NATION (1971)

ভূমিকা

"সূর্যগ্রহণ" জহির রায়হানের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে জহির রায়হানের আলোচ্য গল্প। গল্পটি জহির রায়হানের একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ'-এর অন্তর্গত। অর্থাৎ আলোচ্য গল্পটির নামেই জহির রায়হান তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন।

চলিত ভাষারীতিতে রচিত আলোচ্য গল্পে ভাষা আন্দোলনে শহীদ তসলীমের বন্ধু আনোয়ার এবং তসলীম বধূ হাসিনার জীবনের যন্ত্রণা ও অসহায়তা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ফলে, এ বিষয় নিয়ে তিনি অনেক সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু এবং শিল্পরীতির বিষয়ে 'সূর্যগ্রহণ' বাংলাদেশের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসেবে বিবেচিত।

গ্রহণের সময় সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে না। ফলে পৃথিবীতে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। ভাষা আন্দোলনও তেমনি হাসিনার কাছে যেন গ্রহণ লাগা সূর্য। কেননা ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবের অধ্যায় সৃষ্টি করলেও, তা হাসিনার বুক থেকে তার স্বামী তসলীমকে চিরদিনের জন্য দূরে সরিয়ে নেয়। সেদিক বিবেচনায় গল্পটির নাম 'সূর্যগ্রহণ' খুবই সার্থক ও তাৎপর্যময় হয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. জহির রায়হানের ছোটগল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

২. ছোটগল্প হিসেবে 'সূর্যগ্রহণ' এর সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।

৩. ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক ও সাহিত্যিকদের কীভাবে আলোড়িত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- স্বামী তসলীমের প্রতি হাসিনার মিথ্যা অনুযোগের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আনোয়ার সাহেবের মনোবেদনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
পাওনাদার – যিনি টাকা পান, যার কাছ থেকে টাকা ঋণ আনা হয়েছে।	সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিলো আকাশটা। দুপুর গড়াতেই বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিলো। আবার কমছিলো। রাস্তায় পায়েচলা পথিকের সাড়াশব্দ

চিবুক – থুতনি।

আলতো নাড়া – আস্তে করে নাড়া দেয়া। এখানে আস্তে করে আদর করা অর্থে।

অভিমান – প্রিয়জনের ব্যবহারে বেদনাবোধ বা রাগান্বিত হওয়া।

কলগোড়া – টিউবওয়েলের কাছে, বা টিউবওয়েলের নিচে অর্থে।

টীকা :

সকাল থেকে মেঘ মেঘ করছিলো সারা আকাশটা।

কবি বা সাহিত্যিকরা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কখনো কখনো কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতি-চিত্র ব্যবহার করেন। আলোচ্য গল্পে তসলীমের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী হাসিনাকে অর্থ সাহায্যসহ নানাভাবে সহানুভূতি জানিয়ে এসেছেন আনোয়ার সাহেব। তিনি গোপনেই এ কাজটি করেছেন। তসলীম যে ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এ কথা এখনো জানেনা হাসিনা। আজ হাসিনার চিঠি পেয়ে একে একে সব অতীত কথা আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠেছে। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর জন্য বেদনায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। আনোয়ার সাহেবের মনোযন্ত্রণা প্রকাশের জন্যই লেখক মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির ছবি নির্মাণ করেছেন।

ছিলো না। শুধু, দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো গানের টুকরো টুকরো কলি। অস্পষ্ট তার সুর। তবু বেশ লাগছিল তাঁর। আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব।

সবেমাত্র ফিরেছেন অফিস থেকে।

একটু পরেই আবার বেরুতে হবে বাইরে। টিউশনির টাকাগুলো আজ পাবার কথা। আজ দেবেন কাল দেবেন করে অনেক ভুগিয়েচেন ভদ্রলোক। এদিকে টাকার ভীষণ দরকার আনোয়ার সাহেবের। পাওনাদাররা তাড়া দিচ্ছে সকাল বিকেল। তার ওপর - হঠাৎ কড়া নড়ে উঠলো জোরে। বাবু চিঠি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আধভাঙ্গা চশমাটা ধীরে নাকের ডগায় বসিয়ে দিলেন আনোয়ার সাহেব।

হাসিনার চিঠি।

অতি পরিচিত একটা সম্বোধনের পর লিখেছে–

ওগো! এমন করে আর কতদিন দূরে ঠেলে রাখবে আমায়। আজ পুরো একটি বছর হতে চললো প্রায়, বাড়ী আসনি তুমি। একবারটির জন্যেও তোমায় দেখিনি এ একটি বছর। আগে, বছরে কতবার আসতে তুমি। মনে আছে সেবার খুব ঘন ঘন এসেছিলে। মা বলছিলেন কিরে তমু। এবার যে খুব তাড়াতাড়ি এলি। অফিস বন্ধ নাকি?

মায়ের প্রশ্নটা মৃদু হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলে তুমি। রাতের বেলা আমার কানে কানে বলেছিলে, কেন এত ঘন ঘন আসি জানো?

কেন?

তোমায় বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, তাই।

হুঁ। মিথ্যে কথা : কে বললো তোমায় মিথ্যে। বলে আমার চিবুকে আলতো নাড়া দিয়েছিলে তুমি।

কিন্তু, সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেলে কেন? একি তোমার অভিমান, না আর কিছু। কিন্তু কেনই বা তুমি অভিমান করবে। আমি তো কোন অন্যায় করেছি বলে মনে হয় না। আর যদি করেই থাকি, তুমি কি ক্ষমা করে দিতে পারো না আমায়। ওগো তোমাকে কেমন করে বোঝাই কত কষ্টে দিন কাটে আমার।

এখানে এসে হঠাৎ থামলেন আনোয়ার সাহেব। যদিও চিঠিটা শেষ হয়নি এখনও। এখনও অনেক–অনেক কিছু লেখা আছে তার ভেতর তবু থামলেন তিনি। কেননা ইতোমধ্যেই মাথাটা কেমন গরম হয়ে ওঠেছে তাঁর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে এসে।

চিঠিটা টেবিলের ওপর বই চাপা দিয়ে রেখে ধীরে ওঠে দাঁড়ালেন আনোয়ার সাহেব। কলগোড়ায় গিয়ে চোখেমুখে পানি দিলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার ফিরে এলেন ঘরে।

কি মনে করে হঠাৎ বাক্স থেকে পুরোন চিঠিগুলোকে একে একে বের করলেন আনোয়ার সাহেব। গত এক বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক–অনেক লিখেছে।

কিন্তু কেন লিখেছে?

কার কাছে লিখেছে হাসিনা?

আনোয়ার সাহেবের কাছে?

	না-না আনোয়ার সাহেবের কাছে লিখবে কেন সে। আনোয়ার সাহেব তো কেউ নন তার। যদিও সব। তবুও কেউ নন। হায়রে। হাসিনা যদি জানতো।

সার-সংক্ষেপ

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ জমে আছে। দুপুরের পর বেশ জোরে বৃষ্টি নামলো। বাইরে বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া কখনো বাড়ে, কখনো কমে। একটু আগেই অফিস থেকে ফিরে আনোয়ার সাহেব বিশ্রাম করছিলেন। কিছুসময় পরে তাকে বাইরে যেতে হবে। এক বাসায় টিউশনির টাকা আনতে যাবেন। আজ আনোয়ার সাহেবের টাকার খুব বেশি প্রয়োজন।

টাকার কথা চিন্তা করতে করতে আনোয়ার সাহেব যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এমন সময় পিওন এল হাসিনার চিঠি নিয়ে। হাসিনা আনোয়ার সাহেবের বন্ধু তসলীমের স্ত্রী। তসলীম ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু আনোয়ার সাহেব একথা হাসিনাকে জানান নি। বরং তসলীমের নাম করে প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, চিঠি দিয়েছে। তসলীম যে মরে গেছে এ কথা হাসিনা কিছুতেই ভাবতে পারেনি। আজ বর্ষালগ্নে হাসিনার চিঠি পেয়ে এ-সব কথা আনোয়ার সাহেবের মানসপটে ভেসে উঠলো।

হাসিনা যেহেতু কিছুই জানে না, তাই স্বামীর কাছে অভিমান করে সে নানা কথা লিখেছে চিঠিতে। গত এক বছরে কেন তসলীম বাড়ি যায়নি এটাই হাসিনার প্রধান অভিযোগ। তাই আনোয়ার সাহেব মনে মনে ভাবছেন, হাসিনা যদি সত্যি ঘটনা জানতো, তাহলে তার জীবনে কি বেদনা নেমে আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করুন।

২. একটু পরে আনোয়ার সাহেব বাইরে যাবেন কেন?

৩. চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেব থেমে গেলেন কেন?

৪. 'হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।' আনোয়ার সাহেবের দৃষ্টিকোণে লেখক একথা কেন বলেছেন?

৫. তসলীমের প্রকৃত খবর আনোয়ার সাহেব হাসিনাকে জানাননি কেন?

উত্তর

প্রশ্ন : সূর্যগ্রহণ' গল্পের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করুন।

উত্তর : কবি বা সাহিত্যিকরা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কখনো কখনো প্রকৃতি-চিত্র ব্যবহার করেন। আলোচ্য গল্পের প্রথমেই আমরা এমন একটি প্রকৃতির ছবি পাই। সকাল থেকেই সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আসছিল। দুপুরের পরেই খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বেড়ে যাচ্ছিলো। বৃষ্টির বেগ কখনো বাড়ছিলো, কখনো কমছিলো। রাস্তায় পায়ে চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিলো না। শুধু দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো গানের টুকরো টুকরো কলি। প্রকৃতির এ খণ্ডচিত্র আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় উপস্থাপনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতির এ বিষণ্ন ছবির অন্তরালে মূলত শিল্পিত হয়েছে আনোয়ার সাহেবের মনের যন্ত্রণার ছবি।

প্রশ্ন : একটু পরে আনোয়ার সাহেব বাইরে যাবেন কেন?

উত্তর : দুপুরের পর থেকে একটানা বৃষ্টি পড়লেও আনোয়ার সাহেবকে বাইরে যেতে হবে। কেননা তার টিউশনির টাকাগুলো আজ পাবার কথা। যার কাছে টাকা পান, তিনি আজ দেবেন কাল দেবেন বলে অনেক ঘুরিয়েছেন। আনোয়ার সাহেবের টাকারও খুব দরকার। এদিকে পাওনাদাররাও প্রতিনিয়ত তার কাছে টাকা চাচ্ছে। কাজেই বৃষ্টি হলেও টাকা আনার জন্য একটু পরে আনোয়ার সাহেবকে বাইরে যেতে হবে।

প্রশ্ন : 'হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।' - আনোয়ার সাহেবের দৃষ্টিকোন একথা লেখক কেন বলেছেন?

উত্তর : ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তসলীম নিহত হয়। তসলীমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তসলীমের স্ত্রী হাসিনাকে কিছু জানাননি। হাসিনা মর্মান্তিক বেদনা পাবে, তাই প্রথমে আনোয়ার সাহেব প্রকৃত সত্য হাসিনাকে জানায়নি। কিন্তু পরেও সত্য কথা আর হাসিনাকে জানানো হয়নি। বরং প্রতিমাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছেন, হাসিনার নামে তসলীমের হয়ে চিঠি দিয়েছে। হাসিনা কিছুই বুঝতে পারেনি। সবই ঠিক ঠাক চলছিলো, শুধু তসলীম গত এক বছরে বাড়ি যায়নি, এটাই হাসিনার একমাত্র অভিযোগ। হাসিনা তার চিঠিতে একথাই বার বার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছে। হাসিনার সেই চিঠি পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেব ভাবছেন, হায়রে কপাল! হাসিনা যদি সত্য কথা জানতো! তাহলে নিশ্চয়ই তার বেদনার কোন সীমা থাকবে না।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিলো সারা আকাশটা।

২. সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেছো কেন? একি তোমার অভিমান; না আর কিছু।

৩. না-না আনোয়ার সাহেবের কাছে লিখবে কেন সে। আনোয়ার সাহেব তো কেউ নন তার।

৪. হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।

উত্তর

সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেছো কেন? একি তোমার অভিমান, না আর কিছু।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে তসলীমের প্রতি হাসিনার তীব্র অভিমানের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়। একথা তসলীমের স্ত্রী হাসিনা জানেনা। কেননা বিগত এক বছরে তসলীমের বন্ধু আনোয়ার সাহেব তসলীমের হয়ে হাসিনাকে চিঠি দিয়েছে, টাকা পাঠিয়েছে। চিঠি ও টাকা পেয়ে হাসিনা বুঝেছে তসলীম ঠিকই আছে, কিন্তু বিশেষ কোন কারণে হয়তো বাড়ি আসছে না। হাসিনা ভাবছে, হয়তো তার ওপর রাগ বা অভিমান করেই তসলীম দীর্ঘ দিন বাড়ি আসেনি। তাই অভিমানাহত হৃদয়ে হাসিনা তসলীমের কাছে তার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছে আলোচ্য অংশে।

হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান রচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে রাখার কারণে আনোয়ার সাহেবের মনোবেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তসলীম নিহত হয়। তসলীমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তসলীমের স্ত্রী হাসিনাকে কিছু জানায়নি। হাসিনা মর্মান্তিক বেদনা পাবে, একথা ভেবে আনোয়ার সাহেব প্রথমে প্রকৃত সত্য তাকে জানায়নি। বরং প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, হাসিনার নামে তসলীমের হয়ে চিঠি দিয়েছে। এ সব কথা হাসিনা কিছুই বুঝতে পারেনি। সবই ঠিক ঠিক চলছিলো, শুধু তসলীম গত এক বছরে বাড়ি যায়নি, এটাই হাসিনার একমাত্র অভিযোগ। হাসিনা তার চিঠিতে এ কথাই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছে। হাসিনার সেই চিঠি পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেব ভাবছেন, হায়রে কপাল! হাসিনা যদি সত্য কথা জানতো! তাহলে নিশ্চয়ই তার বেদনার কোন সীমা থাকবে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- তসলীমের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তসলীমের শহীদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাষা আন্দোলনের সময় জনতার বিক্ষোভ এবং পুলিশের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
অন্যমনস্কভাবে – অন্য বিষয়ে মন আছে এমন, অমনোযোগী। **আলতো** – হালকা ভাবে। **উস্কোখুস্কো** – এলোমেলো, অমসৃণ। **আলবত** – নিশ্চয়, অবশ্য। লিকলিকে – লম্বা গড়নের। **আকাশ থেকে পড়া** – বিস্মিত হওয়া। হঠাৎ কোন বিস্ময় জাগানো কথা শোনা। **মেডিকেল কলেজ** – যে কলেজে ডাক্তারি শাস্ত্র পড়ানো হয়। **মিছে কথা** – মিথ্যা কথা। **বিঁধবে** – বিদ্ধ হবে, আঘাত করবে।	ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে আনোয়ার সাহেবের। চিঠিগুলোকে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ পুরোন একখানা চিঠির ওপর আলতো চোখ বুলোতে থাকেন তিনি। টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টা পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো তাহলে আর বলার কিছুই নেই আমার। যাক, মানু এখন সব সময় বাবা বাবা বলে ডাকে। যে বাবাকে জন্মের পর থেকে একবারটির জন্যেও দেখেনি। সে বাবার নামটাকেই প্রথম উচ্চারণ করেছে। কি আশ্চর্য দেখতো পূরোন চিঠিটাকে খামের ভেতর পুরে রেখে আবার নতুন চিঠিটা হাতে তুলে নেন আনোয়ার সাহেব। মানুর জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি। কেমন হয়েছে মেয়েটা? সে কি দেখতে ঠিক তার বাবার মতই হয়েছে? মানুর কথা ভাবতে গিয়ে আর একটা মুখের আদল ভেসে উঠলো আনোয়ার সাহেবের চোখের ওপর-সুন্দর গোলগাল একখানা মুখ। প্রশস্ত কপালের ওপর তেলা বিহীন উস্কোখুস্কো চুল। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, হপ্তায় মাত্র একবার সেইভ করতো তসলীম। আনোয়ার সাহেব বকতেন খুব। এ আবার কেমন স্বভাব বলতো। দাড়ি রাখতে হোলে রীতিমত রেখে দাও। আর যদি মুখটাকে ন্যাড়া রাখবারই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে রোজ একবার করে সেইভ করো। এমন মুখভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি–একটা সৌন্দর্যজ্ঞান থাকাও তো দরকার। বকুনি খেয়ে এরপর কয়দিন ঠিকমতো দাড়ি কামাতো তসলীম। চুলে তেলও লাগাতো বেশ পরিপাটি করে। তারপর আবার সেই অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আনোয়ার সাহেব বলতেন। আচ্ছা তসলীম। তোমার এ স্বভাবের জন্য বৌয়ের কাছ থেকে বকুনি খাও না তুমি? আর বকুনি। কথাই বলে না বৌ। বলে মৃদু হাসতো তসলীম। বড় লাজুক মেয়ে কিনা। তাই তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলতো। কবিরা এ রকম একটু একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ই আনোয়ার সাহেব। এ শুধু আমার বেলা নয়। কবিদের এটা স্বভাব ধর্ম।

তসলীম কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওটাই ছিলো ওর একমাত্র নেশা।

আনোয়ার সাহেব ছিলেন ওর কবিতার প্রথম শ্রোতা আর প্রথম সমালোচক। শুনতে না চাইলেও জোর করে শোনাত তসলীম। তবু না শুনলে ক্ষুণ্ন হতো সে। মাঝে মাঝে, অভিমানে কথা বলাই বন্ধ করে দিতো সে। মান ভাঙ্গতে আনোয়ার সাহেবের কর্ম সাবাড়। দেখো তসলীম। আমায় শুনিয়ে কি লাভ বলতো। আমি না কবি, না সাহিত্যিক! আমি কি বুঝবো তোমার ও কবিতার। তুমিই বলো।

মুখ টিপে হাসতো তসলীম। আলবত বুঝবেন। বুঝবেন না কেন? একটু চুপ থেকে আবার বলতো সে। পড়বো, শুনবেন?

পড় না, শুনি। বলতেন আনোয়ার সাহেব।

হাত নেড়ে নেড়ে পড়তো তসলীম। পড়তো না ঠিক যেন অভিনয় করতো সে।

পড়া শেষ হলে যদি বলতেন ভালো হয়েছে, তাহলে খুব খুশি হতো তসলীম। আর যদি বলতেন। কেমন যেন ভাল লাগলো না আমার। তাহলে মুখ কালো করে বলতো সে, কবিতা বোঝেনই না আপনি।

আনোয়ার সাহেব হাসতেন। কিছু বলতেন না।

কিন্তু আজ দীর্ঘ এক বছর পর হঠাৎ হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?

না। আজ বলে নয়। প্রতিদিন, যখনই হাসিনার চিঠি এসেছে তখনই তসলীমকে মনে পড়েছে আনোয়ার সাহেবের। বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে যেন। রোগা লিকলিকে ছেলেটার কথা বারবার করে চোখের ওপর ভেসে ওঠেছে তাঁর।

বড্ড বেশি কথা বলতে পারতো তসলীম। যতক্ষণ ঘরে থাকতো, ঘরটাকে সরগরম রাখতো সে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে অশান্ত পদক্ষেপে তসলীমকে ঘরময় পায়চারি করতে দেখে প্রথমটায় কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন আনোয়ার সাহেব। কি ব্যাপার তসলীম। পাগলের মতো এমন ছুটোছুটি করছো কেন। কি হয়েছে?

কেন। আপনি কিছুই শোনেননি? উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলো তসলীম। ঘাড় নেড়েছিলেন আনোয়ার সাহেব। কই না তো। কেন কি হয়েছে? গুলি। গুলি করেছে সাহেব। আর কি হয়েছে। ইউনিভারসিটির ছেলে আর একটাও বেঁচে নেই। গিয়ে দেখে আসুন।

সে–কি? যেন আকাশ থেকে পড়েছেন আনোয়ার সাহেব।

খুব যে অবাক হচ্ছেন। বানিয়ে বলছি নাকি? গিয়ে একবার দেখে আসুন না। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক হাঁটু রক্ত জমেছে। বিবেক বিরুদ্ধে যে কোন কথাকেই বাড়িয়ে বলা তসলীমের স্বভাব ছিলো। কিন্তু তসলীম মিছে কথা বলতো না কোনদিন।

তাই সব কিছু বিশ্বাস না হলেও গুলি চলার খবরটা যে সত্য তা বিশ্বাস না করে

	পারেননি আনোয়ার সাহেব। গুলি সত্যই চলেছিল। কিন্তু, সে গুলি যে তার পরদিন তসলীমের বুকেও এসে বিঁধবে তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন আনোয়ার সাহেব? উঃ! আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।

সার-সংক্ষেপ

হাসিনার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে আনোয়ার সাহেবের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বের হলো। অনেক করেও তিনি হাসিনার দুঃখের কোনো উপশম খুঁজে পান না। হাসিনার লেখা পুরোনো চিঠিগুলো বের করে তিনি পড়তে থাকেন। এক একটা চিঠিতে এক এক ধরনের অভিমানের কথা লেখা। ইতোমধ্যে হাসিনার গর্ভে এক কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে মানু। মানু জন্ম নেয়া সত্ত্বেও তসলীম এখনো তাকে দেখতে যায়নি। —একথা উল্লেখ করে হাসিনা তার দুঃখের কথা লিখেছে।

হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেবের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তসলীমের মুখ। তসলীম উদাসীন ভাবে থাকতেন – চুল ছিল তার উস্কোখুস্কো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আনোয়ার সাহেবের বকুনি খেয়ে তসলীম কয়েকদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চলতো। তারপর আবার পূর্ববৎ হয়ে যেতো। আনোয়ার সাহেব তসলীমের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন। তার এ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য বৌ রাগ করতো কিনা, তা জিজ্ঞাসা করতেন। তসলীম সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতো।

তসলীমের চরিত্রে অনেক ইতিবাচক গুণের সমাবেশ ছিল। সে কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে প্রায়ই সে কবিতা লিখতো। এ অর্থে ওটাই ছিল তার একমাত্র নেশা। তসলীমের কোনো নতুন কবিতা আনোয়ার সাহেবকেই প্রথম শুনতে হতো। আনোয়ার সাহেবই ছিলেন তসলীমের কবিতার প্রথম শ্রোতা এবং প্রথম সমালোচক। আনোয়ার সাহেবের সামনে অভিনয়ের মতো করে তসলীম তার নতুন লেখা কবিতা পড়ে শোনাতো। তসলীমের কবিতা শুনে আনোয়ার সাহেব প্রশংসা করলে সে খুব খুশি হতো, আর বিরূপ সমালোচনা করলে ক্ষিপ্ত হয়ে বলতো – 'আপনি কবিতাই বোঝেন না'। হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তে এভাবে আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তসলীমের নানা কথা। যতবারই তিনি হাসিনার চিঠি পড়েছেন, ততবারই সেখানে বিশাল স্মৃতি হয়ে উপস্থিত থাকে তসলীম।

হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তে তসলীমের শেষ স্মৃতি ভেসে ওঠে আনোয়ার সাহেবের হৃদয়পটে। ভাষা আন্দোলনের পূর্বদিনে সে আনোয়ার সাহেবকে পুলিশী অত্যাচারের কথা বলেছে, সারারাত ধরে পোস্টার লিখেছে। ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগদান করার সময় পুলিশের গুলি লেগে পরদিন যে তসলীম শহীদ হবে, এ-কথা সেদিন রাতে তারা কেউ-ই জানতেন না। সেই সব বেদনাদায়ক স্মৃতি বর্ষণসিক্ত এ দিনে আনোয়ার সাহেবের মনটা ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ন করে তুলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হাসিনা চিঠিতে তসলীমের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উত্থাপন করেছে?
২. মানর কথা ভাবতে ভাবতে আনোয়ার সাহেবের আচরণগত কী পরিবর্তন ঘটলো?
৩. তসলীমের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন।
৪. আনোয়ার সাহেবের তসলীমের কবিতা শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।
৫. ভাষা-আন্দোলনের পূর্বদিনে তসলীমের অস্থিরভাবে পায়চারী করার কারণ কী?
৬. মিছিলে অংশগ্রহণের ফলে তসলীমের কী হয়েছিল?

উত্তর

প্রশ্ন : হাসিনা তার চিঠিতে তসলীমের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উত্থাপন করেছে?

উত্তর : হাসিনা তার চিঠিতে তসলীমের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রথম, তসলীম গত এক বছরে একবারও বাড়ি যায়নি। এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তাই সে লিখেছে টাকা পাঠানোই বড় কথা নয়, বরং স্বামী হিসেবে তার আরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। হাসিনার ভাষায় "টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো, তাহলে আর বলার কিছুই নেই আমার।" তসলীমের বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আছে হাসিনার। হাসিনার গর্ভে যে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সে এখনো তার পিতার মুখ দেখেনি। কন্যাকে একবারও দেখতে না আসার জন্যও তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনা প্রবল অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

প্রশ্ন : তসলীমের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন।

উত্তর : আলোচ্য পাঠে আমরা তসলীমের বেশ কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। প্রথমত, তসলীম ছিল উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সুন্দর গোলগাল মুখের অধিকারী প্রশস্ত কপালধারী তসলীমের চুল ছিল তেলহীন ও উস্কোখুস্কো। তার মুখভরা ছিল খোঁচা-খোচা দাড়ি। আনোয়ার সাহেব বকা দিলে কয়েক দিন সে পরিচ্ছন্ন থাকতো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তসলীম আবার পূর্ববৎ। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শরীরের দিকে তার কোন খেয়াল থাকতো না। তসলীমের চিত্তের মধ্যে সর্বদা সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বিরাজ করতো। তাই অফিসের কর্মচারী হয়েও সে ছাত্রদের মিছিলে যোগদান করেছে, সারা রাত ধরে লিখেছে পোস্টার। তসলীম ছিল সাহসী মানুষ। তাই পুলিশের অত্যাচারের সামনেও সে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। গুলিবর্ষণের মুখেও সে পালিয়ে যায়নি, বরং বীরের মতো আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

তসলীম ছিলো সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। সে কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে সে কবিতা লিখতো। বস্তুত, এটাই ছিল তার একমাত্র নেশা। আনোয়ার সাহেবকে কবিতা শুনিয়ে সে খুব আনন্দ পেতো। বর্তমান পাঠে তসলীমের এসব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আনোয়ার সাহেবের তসলীমের কবিতা শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

উত্তর : তসলীম ছিলো সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। সে কবিতা লিখে প্রথমেই আনোয়ার সাহেবকে শোনাতো। বস্তুত, আনোয়ার সাহেবই ছিলেন তার কবিতার প্রথম পাঠক এবং প্রথম সমালোচক। আনোয়ার সাহেব কবিতা শুনতে না চাইলেও তসলীম তাকে জোর করে কবিতা শোনাতো। আনোয়ার সাহেব যদি বলেন, আমি কবিতা বুঝবো না। বরং অন্য কাউকে শোনাও। এ কথায় তসলীম বলতো 'আলবত বুঝবেন। বুঝবেন না কেন', আনোয়ার সাহেবের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে তসলীম কবিতা পড়তো, মনে হতো সে যেন অভিনয় করছে। আনোয়ার সাহেব তসলীমের কবিতা শুনে যদি প্রশংসা করতেন, তাহলে সে খুব খুশি হতো। আর যদি বলতেন, কবিতাটা তেমন ভালো লাগেনি, তাহলে রাগ করে তসলীম আনোয়ার সাহেবকে বলতো - "কবিতা বোঝেনই না আপনি।" তসলীমের এমন কথা শুনে আনোয়ার সাহেব হাসতেন, কিছু বলতেন না। এভাবেই চলতো আনোয়ার সাহেবের তসলীমের কবিতা শোনার পালা।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলনের পূর্বদিনে তসলীমের অস্থিরভাবে পায়চারী করার কারণ কী?

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের পূর্বদিন বিকেলে বাসায় ফিরে তসলীম অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে। কি করবে তা যেন স্থির করতে পারছিল না তসলীম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি করেছে। মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ গুলি চালিয়েছে। ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামীকাল তারা আবার মিছিল করবে, পুলিশী বাধা অমান্য করবে। আগামীকালের সেই যুদ্ধে তসলীম কিভাবে অংশগ্রহণ করবে, তার দায়িত্ব কি হবে ইত্যাদি ভাবতে ভাবতেই সে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো তা হলে আর বলার কিছুই নেই আমার।

২. মানুর জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি।

৩. .... আজ দীর্ঘ এক বছর পর হঠাৎ হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?

৪. তাই সব কিছু বিশ্বাস না হলেও গুলি চলার খবরটা যে সত্য তা বিশ্বাস না করে পারেননি আনোয়ার সাহেব।

৫. উঃ! আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।

মানুর জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে তসলীমের শিশুকন্যার কথা ভেবে আনোয়ার সাহেবের অন্তর্বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়েছে। একথা তসলীমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব জানলেও তিনি তা তসলীমের বাড়িতে জানাননি। বরং তসলীমের পরিবারে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছেন, হাসিনার কাছে তসলীমের নামে চিঠি পাঠিয়েছেন। এ-ঘটনার পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তার স্ত্রী কিছুই জানে না বলে তসলীমের বিরুদ্ধে অভিমান করে চিঠি লিখেছে, কেন এক বছরেও সে একবার বাড়ি গেল না। এমনকি কয়েকমাস পূর্বে জন্ম নেয়া তার শিশুকন্যাটিকে দেখতেও একবার এলো না তসলীম। হাসিনার চিঠিতে শিশুকন্যা মানুর কথা পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেব উন্মনা হয়ে যান। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে উস্কো-খুস্কো চুলের এক যুবকের মুখচ্ছবি। তিনি ভাবেন, যদি একবার মানুকে দেখতে পেতেন। কেননা, তার ধারণা মানুর চোখে মুখে তিনি খুঁজে পাবেন চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া তসলীমের মুখের আদল।

উ : ! আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।

আলোচ্য অংশটুকু কথাশিল্পী জহির রায়হান রচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এখানে তসলীমের মৃত্যুতে আনোয়ার সাহেবের অন্তঃরস্থ বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়েছে। একথা তসলীমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব জানলেও তিনি তা তসলীমের বাড়িতে জানাননি। বরং তসলীমের পরিবারের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছেন, তার বিধবা স্ত্রী হাসিনার কাছে তসলীমের নামে চিঠি লিখেছে। তসলীমের মৃত্যুর পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। হাসিনা কিছুই জানেনা বলে এ এক বছরে তসলীমের বিরুদ্ধে নানা অনুযোগ করে অভিমানাহত হৃদয়ে অনেক চিঠি লিখেছেন। সে চিঠিতে কখনো আছে ভালোবাসার কথা, কখনো আবেগের কথা, কখনো

অভিমানের কথা, কখনো বা অনুযোগের কথা। বৃষ্টিভেজা দুপুরে সে সব চিঠি পড়তে পড়তেই আজ বিশেষ মুহূর্তে বার বার আনোয়ার সাহেবের চোখের সামনে ভেসে উঠছে তসলীমের মুখচ্ছবি। তসলীম যেদিন শহীদ হয়, তার পূর্বরাত্রে তার অস্থিরতার কথা আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিতে এখনো জীবন্ত। যতই তসলীমের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন আনোয়ার সাহেব, ততই তার হৃদয় বেদনা ও বিষণ্নতায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। তাই তিনি ভাবছেন, দীর্ঘ এক বছর পর আজ তসলীমের কথাটা মনে না হলেই ভাল হতো।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- তসলীমের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তসলীমের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা প্রহসনের আশ্রয় নেয়া সম্পর্কে আনোয়ার সাহেবের গভীর অন্তর্যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- তসলীমের পরিবারের দুরবস্থার পরিচয় দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নবজাত – নতুন জাত, সদ্য প্রসূত বা সদ্য উৎপন্ন। **বন্দোবস্ত** – ব্যবস্থা। **অন্তর্দ্বন্দ্ব** – ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব, নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ। **তোলপাড়** – আলোড়ন, ওলট-পালট। **চুকিয়ে** – শেষ করে, সমাপ্ত করে। **শিকড় গাড়ছে** – মাটিতে শিকড় প্রোথিত হওয়া। এখানে তসলীমের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত। **প্রহসন** – পরিহাস। এখানে মিথ্যা অভিনয় অর্থে ব্যবহৃত। **আশঙ্কা** – ভয়, ভীতি, সংশয়। **পদক্ষেপ** – পদচারণা, পা ফেলার কাজ। **ডুকরে কাঁদা** – হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদা। **রুদ্ধ** – বদ্ধ। **উপার্জনক্ষম** – যিনি উপার্জন করতে পারেন বা করেন, যিনি অর্থ	মাথাটা ভীষণ ধরেছে আনোয়ার সাহেবের। টেবিলের ওপর হাসিনার পুরোন চিঠিগুলোর দিকে একবার তাকালেন। এ এক বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক- অনেক লিখেছে। বাড়ী না আসার কি কারণ থাকতে পারে তোমার? আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, না হয় আমার ওপর রাগ করেছো তুমি। কিন্তু তোমার নবজাত শিশু, সেতো কোন অপরাধ করেনি। তাকে দেখবার জন্যেও কি একবার বাড়ী আসতে পারো না তুমি? মিনুর বিয়ের বয়স হয়েছে। তার বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত একটা করতে হবে বইকি। মা-তো তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। তুমি ছাড়া পরিবারে আর কেই বা আছে যে তার বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত করবে? চিঠিটা মুড়ে আবার খামের ভেতর রেখে দিলেন আনোয়ার সাহেব। দু'হাতের তালুতে মুখ গুঁজে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর। না-না মানু, মিনু সবাইকে ভুলে যেতে চান তিনি। ভুলে যেতে চান হাসিনাকে। আম্মাকে। সবাইকে। গোটা পরিবারটাকে। তবু, ভুলতে পারেন কই আনোয়ার সাহেব? যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন। তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়ছে ওরা। সারাদিন ওদের কথাই শুধু ভাবেন আনোয়ার সাহেব। উঃ এ-প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি! স্মৃতিপটে আবার উঁকি মারছে তসলীম। তসলীমের রক্তাক্ত দেহ। কিন্তু, দেহের কথাটা নিছক কল্পনাই করছেন আনোয়ার সাহেব। গুলিবিদ্ধ তসলীমের রক্তাক্ত দেহটা দেখেননি তিনি। দেখেননি বলে তো একটা গভীর সন্দেহে আজো মন তোলপাড় করছে তাঁর। সত্যিই কি মরেছে তসলীম?

আয় করেন।	একুশের সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি সে। বসে বসে পোস্টার লিখেছে, অসংখ্য পোস্টার। পরদিন সকালে যখন বাইরে বেরুচ্ছিলো তখন নিষেধ করেছিলেন আনোয়ার সাহেব। আজ তোমার বাইরে বেরোনো ঠিক হবে না তসলীম। যা মেজাজ তোমার। কি করতে কি করে বসবে ঠিক নেই। তার চাইতে ঘরে বসে বসে ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লিখো। সেটাও একটা কাজ। সে কথা শুনেও আমল দেয়নি তসলীম। বলেছে। আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে? বলে বেরিয়ে গেছে সে। সেদিন আর ফেরেনি। তার পরদিন। তার পরদিনও না। থানায় খোঁজ করে দেখেছেন আনোয়ার সাহেব। জেল গেটে খোঁজ করেছেন। খোঁজ করেছেন হাসপাতালে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠেছে আনোয়ার সাহেবের। অশান্ত পদক্ষেপে, অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। শেষে তাঁর এক সহকর্মী বজলু সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন আসল খবরটা। হাইকোর্টের মোড়ে গুলি চলবার সময় তসলীমকে একবার দেখেছিলেন তিনি। আর দেখেননি। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তসলীমের। তসলীম মারা গেছে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠেছিলেন আনোয়ার সাহেব। এ কি হলো বজলু সাহেব। ওর বৌ পরিবারের কি হবে। ওদের যে কেউ নেই। কেউ নেই! ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন বজলু সাহেব। না। কেউ নেই। বলেছিলেন আনোয়ার সাহেব। ওর বৌ, মা, বোন ওদের কি হবে বজলু সাহেব? কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠস্বর। অনেকটা মাতালের মত টলতে টলতে বাসায় ফিরে এসেছিলেন আনোয়ার সাহেব। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই নজরে পড়ছিলো তাঁর। ডাক বাক্সে একখানা চিঠি। তসলীমের চিঠি। পরের চিঠি পড়ার অভ্যাস কোনদিনও ছিল না আনোয়ার সাহেবের। কিন্তু, সেদিন পড়েছেন। বহু পরিচিত একটা সম্বোধনের পর, গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলী লেখা। আজ ক'দিন থেকে মিনুর জ্বর। আমারও শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। কানু শেখ তার পাওনা টাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। মাইনে পাওয়া মাত্র টাকা পাঠিয়ো। ঘরে চাল ডাল কিছুই নেই। এক বেলা আলু আর এক বেলা ভাত খাচ্ছি। চিঠিটা পড়ে মনটা আরো বেশি রকম খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আনোয়ার সাহেবের। সারা রাত জেগে শুধু ভেবেছেন তিনি তসলীমের মৃত্যু খবরটা কি জানাবেন হাসিনাকে। চিঠি লিখে কি জানিয়ে দেবেন ওদের যে তসলীম মারা গেছে। ওদের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটা আর বেঁচে নেই। এ আঘাত কি সইতে পারবে ওরা? মাথার ভেতরটা আবার গরম হয়ে ওঠেছে আনোয়ার সাহেবের। সামনে টেবিলের ওপর রয়েছে হাসিনার চিঠিগুলো। এ ক'বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক-

	অনেক লিখেছে। ওগো, আর কতদিন বাড়ী আসবে না তুমি? তুমি কি মাস মাস টাকা পাঠিয়েই শুধু নিশ্চিন্ত থাকবে? মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো। ওগো.....।

সার-সংক্ষেপ

হাসিনার চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেব অতীত-স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকেন। এ এক বছরে অনেক চিঠি লিখেছে হাসিনা। চিঠিতে আছে নানা অভিমান-অভিযোগের কথা। এবার যে চিঠিটা পড়ছেন, তাতে হাসিনা লিখেছে নবজাত কন্যা মানুকে আজ পর্যন্ত কেন দেখতে এলো না তসলীম? শিশুকন্যা মানু এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ দেখতে পেলো না? অন্য চিঠিতে লিখেছে তসলীমের বোন মিনুর বিয়ে দেয়ার কথা। মিনুর বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বোনের বিয়ের জন্যও তো তসলীমের বাড়ি আসা প্রয়োজন। এসব কথা ভেবে ভেবে আনোয়ার সাহেবের মনটা বিষণ্নতায় ভরে যায়। এতকাল সত্য কথা না জানিয়ে একটা মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছে বলে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের ভিতরটায় আলোড়ন ওঠে।

আনোয়ার সাহেব বহুবার ভেবেছেন তসলীমের পরিবার থেকে তিনি নীরবে দূরে চলে যাবেন। কিন্তু ভাবনাই সার, দূরে আর চলে যাওয়া হয় না। বরং যতই দূরে যেতে চান, ততই যেন ওদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান।

যেদিন তসলীম শহীদ হলো, তার পূর্বরাত্রের স্মৃতি আনোয়ার সাহেবের মনে বারবার ভেসে ওঠে। সারা রাত ধরে তসলীম পোস্টার লিখেছে, অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে। পরদিন সকালে মিছিলে না যাবার জন্যে আনোয়ার সাহেব তাকে অনুরোধ করেছেন, বলেছেন 'মিছিলে না গিয়ে ঘরে বসে কবিতা লেখো। ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও তো একটা কাজ।' কিন্তু তসলীম তার সিদ্ধান্তে ছিল অটল। তাই চটপট উত্তর দিয়েছে – "আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?" এ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তসলীম। কিন্তু আর সে ফেরেনি। আনোয়ার সাহেব তাকে অনেক খুঁজেছেন। অবশেষে জেনেছেন, তসলীম শহীদ হয়েছে।

তসলীমের মৃত্যুর সংবাদ জেনে বিষণ্ন মনে বাসায় ফেরার পরই পেয়েছেন হাসিনার চিঠি। বাধ্য হয়েই সেদিন তসলীমকে লেখা হাসিনার চিঠি পড়েছেন। সেই থেকে মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছেন তিনি। হাসিনাকে বুঝতে দিচ্ছেন না যে তার স্বামী মারা গেছেন। অথচ এ দুর্ভার আর বহন করতেও পারছেন না তিনি। এমনি এক জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আনোয়ার সাহেব। হাসিনার চিঠি একটার পর একটা পাঠ করছেন, আর ভয়াবহ বেদনার মধ্যে, মর্মান্তিক স্মৃতির মধ্যে তিনি নিপতিত হচ্ছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. বর্তমান পাঠের চিঠিতে হাসিনা তসলীমের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ উত্থাপন করেছে?

২. তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান কেন?

৩. একুশের সকালে তসলীম ও আনোয়ার সাহেবের কথোপকথনের পরিচয় দিন।

৪. কান্নায় আনোয়ার সাহেবের কণ্ঠস্বর কেন রুদ্ধ হয়ে এলো?

৫. তসলীমের মৃত্যু সংবাদ হাসিনাকে কেন জানান নি আনোয়ার সাহেব?

৬. হাসিনার পরিবারের দুরবস্থার কি পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য পাঠে?

উত্তর

প্রশ্ন : বর্তমান পাঠের চিঠিতে হাসিনা তসলীমের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করেছে?

উত্তর : হাসিনা তার সব চিঠিতেই অভিমানাহত হৃদয়ে নানা অভিযোগের কথা উত্থাপন করেছে। হাসিনার জানা মতে তার স্বামী তসলীম বেঁচে আছে। কিন্তু বিগত এক বছরেও সে একবার বাড়ি আসেনি। এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ। হাসিনার যে চিঠিটা এবার আনোয়ার সাহেব পড়ছেন, তাতে সে লিখেছে নবজাত কন্যা মানুকে আজ পর্যন্ত কেন দেখতে এলো না তসলীম? শিশুকন্যা মানু এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ দেখতে পেলো না? অন্য চিঠিতে লিখেছে, তসলীমের বোন মিনুর বিয়ে-দেওয়ার কথা। মিনুর বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বোনের বিয়ের জন্যও তো তসলীমের একবার বাড়ি আসা প্রয়োজন। তসলীমের আম্মাও পুত্রের জন্য সব সময় কান্না করেন। অথচ পুত্রের বাড়ি ফেরার কোনো সংবাদ নেই। এইসব নানা অভিযোগে পূর্ণ হাসিনার চিঠি।

প্রশ্ন : তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান কেন?

উত্তর : তসলীমের মৃত্যুর পর পুরো একটি বছর ধরে তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছেন। তসলীমের মৃত্যুসংবাদ তিনি হাসিনাকে জানাননি। কেননা, তিনি ভেবেছেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষের মৃত্যুসংবাদ পেলে গোটা পরিবার ভেঙে পড়বে। তাই তিনি মিথ্যা প্রহসনের আশ্রয়ে প্রতি মাসে তসলীমের বিধবা-স্ত্রী হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছেন, তসলীমের নামে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু এতকাল পরে পুরো বিষয়টি এখন আনোয়ার সাহেবের কাছে দুর্ভার বলে মনে হচ্ছে। মানু, মিনু, হাসিনা, তসলীমের আম্মা গোটা পরিবারকেই এখন ভুলে যেতে চান আনোয়ার সাহেব। তিনি ভাবছেন, সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে পারলেই প্রবল দুর্ভার ও যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু তার ভাবনাই সার হয়, তসলীমের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি আর চুকিয়ে দিতে পারেন না। যতই তিনি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়ার কথা ভাবেন, ততই তিনি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আটকা পড়ে যান তসলীমের পরিবারের সঙ্গে।

প্রশ্ন : একুশের সকালে তসলীম ও আনোয়ার সাহেবের কথোপকথনের পরিচয় দিন।

উত্তর : হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তসলীমের মুখচ্ছবি। এভাবেই এক সময় তিনি একুশের রাতের স্মৃতি রোমন্থন করেন। একুশের রাতে তসলীম অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে, সারারাত ধরে পোস্টার লিখেছে। বিপদের আশঙ্কা করে আনোয়ার সাহেব তসলীমকে মিছিলে যেতে বারণ করেছেন। বলেছেন, ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও একটা বড় কাজ, তুমি বাসায় বসে কবিতা লেখো। কিন্তু তসলীম তার কথা শোনেনি। চটপট উত্তর দিয়েছে– "আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?" এ-কথা বলে একুশের সকালে ভাষার মিছিলে বেরিয়ে পড়ে তসলীম।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

২. যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন। তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়ছে ওরা।

৩. দেখেন নি বলে তো একটা গভীর সন্দেহে আজো মন তোলপাড় করছে তাঁর।

৪. আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?

৫. মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো।

উত্তর

একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। হাসিনার চিঠি পাঠ করতে করতে নিজের মিথ্যা অভিনয়ের কথা ভেবে আনোয়ার সাহেবের মনের যন্ত্রণার কথা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

একুশের সকালে ভাষার দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়। তসলীমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তসলীমের মৃত্যু সংবাদ হাসিনার কাছে জানায়নি। বরং প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, তসলীমের নামে চিঠি পাঠিয়েছে। হাসিনা ভেবেছে, তসলীম বুঝি অভিমান করে বাড়ি আসছে না। তাই সে-ও অভিমানাহত চিত্তে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করে তসলীমের কাছে চিঠি লিখেছে। হাসিনা লিখেছে, নবজাত কন্যা মানুকে আজ পর্যন্ত কেন দেখতে এলো না তসলীম। শিশুকন্যা মানু এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ দেখতে পেলো না? অন্য চিঠিতে লিখেছে তসলীমের বোন মিনুর বিয়ে দেয়ার কথা। মিনুর বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বোনের বিয়ের জন্যও তো তসলীমের বাড়ি আসা প্রয়োজন। হাসিনার অভিমান আর অনুযোগে পূর্ণ এসব চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেবের মনটা গভীর বিষণ্নতায় ভরে যায়। এতকাল সত্য কথা না জানিয়ে একটা মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছে বলে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে তার মনের ভিতর তোলপাড় ওঠে।

যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে বেবেন, তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়ছে ওরা।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। মিথ্যা প্রহসন করে যাচ্ছেন বলে সে সীমাহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্ভার যন্ত্রণায় নিপতিত হয়েছেন আনোয়ার সাহেব, তার পরিচয় ফুটে ওঠেছে আলোচ্য অংশে।

তসলীমের মৃত্যুর পর পুরো একটি বছর ধরে তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছেন। তসলীমের মৃত্যুসংবাদ এ-যাবৎ তিনি হাসিনাকে জানাননি। কেননা, তিনি ভেবেছেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষের মৃত্যুসংবাদ পেলে গোটা পরিবার ভেঙে পড়বে। তাই তিনি মিথ্যা প্রহসনের আশ্রয়ে প্রতি মাসে তসলীমের বিধবা-স্ত্রী হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছেন, তসলীমের নামে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এতকাল পরে পুরো বিষয়টি এখন আনোয়ার সাহেবের কাছে দুর্ভার বলে মনে হচ্ছে। শানু, মিনু, হাসিনা, তসলীমের আম্মা গোটা পরিবারকেই এখন ভুলে যেতে চান আনোয়ার সাহেব। তিনি ভাবছেন, সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে পারলেই প্রবল দুর্ভার ও মনোযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু তার ভাবনাই সার হয়, তসলীমের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি আর চুকিয়ে দিতে পারেন না। যতই তিনি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়ার কথা ভাবেন, ততই যেন তিনি আষ্টে-পৃষ্ঠে আটকা পড়ে যান তসলীমের পরিবারের সঙ্গে।

আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান লিখিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে মাতৃভাষার প্রতি তসলীমের গভীর অনুরাগ ও ভালবাসার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

একুশের রাতে তসলীম কখনো অস্থির ভাবে পায়চারি করেছে, কখনো বা পোস্টার লিখেছে। একুশের দিন সকালে মিছিলে যাবার জন্যে উদ্যোগ নিতে থাকলে আনোয়ার সাহেব মিছিলে না যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি তসলীমকে বলেছেন, 'ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও একটা মস্ত কাজ। অতএব, তুমি বাসায় বসে কবিতা লেখো।' কিন্তু আনোয়ার সাহেবের এ-বক্তব্য তসলীম মেনে নিতে পারেনি। বরং সে দপ করে জ্বলে ওঠেছে, ভাষার মর্যাদা রক্ষার অসীম সাহসী যোদ্ধার মতো বলে ওঠেছে ভাষাই যদি না থাকে, তাহলে কবিতা লিখবো কি দিয়ে। তসলীমের এ মন্তব্যে মাতৃভাষার প্রতি তার গভীর অনুরাগ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামেই অবশেষে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

২. তসলীম চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

৩. আনোয়ার সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪. তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনা যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।

৫. ছোটগল্প হিসেবে 'সূর্যগ্রহণে-র সার্থকতা বিচার করুন।

প্রশ্ন : তসলীম চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : জহির রায়হানের 'সূর্যগ্রহণ' ছোটগল্পের একটি পরোক্ষ চরিত্র তসলীম। পরোক্ষ হয়েও এ চরিত্রই হয়ে ওঠেছে আলোচ্য ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আমরা গল্পের মধ্যে যখন তসলীমকে পাই, তারো এক বছর পূর্বে ভাষার দাবীতে মিছিল করতে গিয়ে সে শহীদ হয়। কাজেই গল্পে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রশ্ন আসে না। বরং পরোক্ষে থেকেও আনোয়ার সাহেবের স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে তসলীমই হয়ে ওঠেছে বর্তমান ছোটগল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র।

তসলীম ছিল উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সুন্দর গোলগাল মুখের অধিকারী প্রশস্ত ললাটধারী তসলীমের চুল ছিলো তেলহীন ও উস্কোখুস্কো। তার মুখভরা ছিলো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আনোয়ার সাহেব বকা দিলে কয়েক দিন সে পরিচ্ছন্ন থাকতো, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তসলীম আবার পূর্ববৎ। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শরীরের দিকে তার কোন খেয়াল থাকতো না। তসলীমের মনের মধ্যে সর্বদা সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বিরাজ করতো। তাই অফিসের কর্মচারী হয়েও সে ছাত্রদের মিছিলে যোগ দিয়েছে, সারারাত ধরে লিখেছে পোস্টার, তসলীম ছিলো সাহসী মানুষ। তাই পুলিশের অত্যাচারের সামনেও সে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। গুলিবর্ষণের মুখেও সে পালিয়ে যায়নি, বরং বীরের মতো আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

তসলীম ছিলো সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। তসলীম কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে সে কবিতা লিখতো- বস্তুত, এটাই ছিলো তার একমাত্র নেশা। আনোয়ার সাহেবকে কবিতা শুনিয়ে সে খুব আনন্দ পেতো। তসলীমের কবিতা শুনে আনোয়ার সাহেব যদি প্রশংসা করতেন, তাহলে সে খুব খুশি হতো। আর যদি বলতেন, কবিতাটা তেমন ভালো লাগেনি, তাহলে রাগ করে তসলীম বলতো "কবিতা বোঝেনই না আপনি।"

বিশেষ ঘটনাকে একটু বাড়িয়ে বললেও, তসলীম কখনো মিথ্যা কথা কলতো না। বিবেক বিরুদ্ধ ও অন্যায় কর্মকে সে সব সময় বাড়িয়ে বলতো। তাই মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলি বর্ষণের ঘটনাকে আনোয়ার সাহেবের কাছে বলেছে এভাবে- "গুলি, গুলি করেছে সাহেব। আর কি হয়েছে। ইউনিভারসিটির ছেলে আর একটাও বেঁচে নেই। গিয়ে দেখে আসুন। .... মেডিক্যাল কলেজের সামনে একহাঁটু রক্ত জমেছে।

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে তসলীম কখনো অবহেলা করেনি। দরিদ্র পরিবারকে একাই সে টেনে তোলার চেষ্টা করেছে। চাকরি করলেও প্রায়ই সে বাড়িতে যেত সকলের খোঁজ-খবর নিতে। এ-কারণেই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে হাসিনা তাকে বহু অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, মেলাতে পারেনি পূর্বের মানুষের সঙ্গে বর্তমান মানুষের আচরণ।

মাতৃভাষার প্রতি প্রবল ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তসলীম চরিত্রের গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। একুশের রাতে তসলীম কখনো অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে, কখনো বা পোস্টার লিখেছে। একুশের দিন সকালে মিছিলে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকলে আনোয়ার সাহেব তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আনোয়ার সাহেব বলেছেন, ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও একটা মস্ত কাজ। অতএব, তুমি বাসায় বসে কবিতা লেখো।' কিন্তু আনোয়ার সাহেবের এ বক্তব্য তসলীম মেনে নিতে পারেনি। বরং সে দপ করে জ্বলে ওঠেছে, ভাষার মর্যাদা রক্ষায় অসীম সাহসী যোদ্ধার মতো বলে ওঠেছে– "আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?" তসলীমের এ সংলাপে মাতৃভাষার প্রতি

তার গভীর অনুরাগ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামেই অবশেষে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

প্রশ্ন : তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনা যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর : আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তসলীম নিহত হয়। তসলীমের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তা তিনি তসলীমের বিধবা স্ত্রী হাসিনাকে জানাননি। হাসিনা মর্মান্তিক বেদনা পাবে, তাই প্রথমে আনোয়ার সাহেব প্রকৃত সত্য হাসিনাকে জানায়নি। কিন্তু প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, হাসিনার নাম তসলীমের হয়ে চিঠি দিয়েছে। হাসিনা সত্য ঘটনা কিছুই জানেনা। সবই ঠিক ঠাক চলছিলো, শুধু তসলীম গত এক বছরে বাড়ি যায়নি, এটাই হাসিনার প্রধান অভিযোগ। হাসিনা তার চিঠিতে এ-কথাই বার বার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছে।

গত এক বছরে একবারও বাড়ি যায়নি বলে হাসিনা তসলীমকে অভিযুক্ত করে লিখেছে– "..... টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো, তা হলে আর বলার কিছুই নেই আমার।" একথা লিখে হাসিনা লিখেছে, তার কোনো ভুলের জন্য যদি তসলীম রাগ করে থাকে, তাহলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেয় তসলীম।

তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনার দ্বিতীয় অভিযোগ, বিগত এক বছরে একদিনের জন্য সময় করেও সে শিশুকন্যা মানুকে দেখতে আসেনি। তার অভিমানাহত জিজ্ঞাসা, শিশুকন্যা মানু এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ পর্যন্ত দেখতে পেলো না? হাসিনার ভাষায় এ অভিযোগ ছিল নিম্নরূপ– ", মানু এখন সব সময় বাবা বাবা বলে ডাকে। যে বাবাকে জন্মের পর থেকে এক বারটির জন্যেও দেখেনি, সে বাবার নামটাকেই প্রথম উচ্চারণ করেছে সে। কি আশ্চর্য দেখতো। .... আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, না হয় আমার ওপর রাগ করেছো তুমি। কিন্তু, তোমার নবজাত শিশু, সেতো কোন অপরাধ করেনি। তাকে দেখবোর জন্যেও কি একবার বাড়ী আসতে পারো না তুমি?"

তসলীমের বিরুদ্ধে গুরুত্বর এক অভিযোগ উত্থাপন করেছে হাসিনা ভিন্ন এক চিঠিতে। তসলীমের বোন মিনু বড় হয়েছে, তাকে এখন বিয়ে দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু তসলীম বাড়ি না যাওয়ার কারণে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তাই হাসিনা খুবই চিন্তিত হয়ে তসলীমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। হাসিনার ভাষায়– "ওগো, আর কত দিন বাড়ী আসবে না তুমি? তুমি কি মাস মাস টাকা পাঠিয়েই শুধু নিশ্চিন্ত থাকবে? মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো।"

অর্থের অভাবে পরিবারের সকলের ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না। অথচ এ ব্যাপারে তসলীম উদাসীন। তাই এ ক্ষেত্রেও সে তসলীমের বিরুদ্ধে অভিমানাহত হৃদয়ের অনুযোগ উত্থাপন করেছে। হাসিনার ভাষায় তার সে সাংসারিক দুরবস্থার ছবি– "আজ ক'দিন থেকে মিনুর জ্বর। আমারও শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। কানু শেখ তার পাওনা টাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। মাইনে পাওয়া মাত্র টাকা পাঠিয়ো। ঘরে চাল-ডাল কিছুই নেই। এক বেলা আলু আর এক বেলা ভাত খাচ্ছি।" এভাবে হাসিনা তার চিঠিতে একটার পর একটা অভিমানের কথা, অভিযোগের কথা উত্থাপন করেছে। প্রকৃত ঘটনা জানে না বলেই, তার অভিযোগগুলো ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে আলোচ্য গল্পে।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. আপনার পঠিত গল্পটি থেকে পাঁচটি ইংরেজি, পাঁচটি আরবি-ফারসি এবং পাঁচটি তৎসম শব্দ শনাক্ত করুন।

২. পঠিত ছোটগল্পটি থেকে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পাঁচটি শব্দ ও সন্ধি নিষ্পন্ন পাঁচটি শব্দ শনাক্ত করুন এবং প্রত্যয় ও সন্ধির সূত্র নির্দেশ করুন।

৩. নিচের প্রশ্নসূচক বাক্যগুলোকে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে রূপান্তর করুন–

ক) সে কি দেখতে ঠিক তার বাবার মতোই হয়েছে?

খ) হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?
গ) তুমি ছাড়া পরিবারে আর কেই বা আছে যে তার বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত করবে?
ঘ) এ প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি?
ঙ) ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?

৪. নিচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে প্রতিশব্দ লিখুন
বাতাস, আগুন, আশ্চর্য, চুল, রক্ত।

৫. নিচের অংশটুকু সাধুভাষায় রূপান্তর কর–
সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিলো সারা আকাশটা। দুপুর গড়াতেই বৃষ্টি নামলো জোরে। বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিলো। আবার কমছিলো। রাস্তায় পায়ে চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিলো না। শুধু দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো গানের টুকরো টুকরো কলি। অস্পষ্ট তার সুর। তবু বেশ লাগছিল তাঁর। আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব।

উত্তর

প্রশ্ন : আপনার পঠিত গল্পটি থেকে পাচটি ইংরেজি, পাঁচটি আরবি-ফারসি এবং পাঁচটি তৎসম শব্দ শনাক্ত করুন।

উত্তর :

ইংরেজি শব্দ – টিউশনি, অফিস, ইউনিভারসিটি, মেডিক্যাল কলেজ।

আরবি-ফারসি শব্দ – আনোয়ার, তসলীম, আলবত, বন্দোবস্ত, আম্মা।

তৎসম শব্দ – রাস্তা, সুর, সকাল, দৃষ্টি, রক্ত।

প্রশ্ন : নিচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে প্রতিশব্দ লিখুন- বাতাস, আগুন, আশ্চর্য, চুল, রক্ত।

উত্তর

বাতাস – বায়ু, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, পবন।

আগুন – অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন।

আশ্চর্য – অবাক, অদ্ভুত, বিস্ময়, অপূর্ব, আজব।

চুল – কেশ, অলক, কুন্তল, কচ, চিকুর।

রক্ত – রুধির, শোণিত, লোহু, রস্য, অশ্র।

সৃজনশীল কাজ

একুশের প্রভাত ফেরিতে আপনার অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতামূলক একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন

একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে লেখা জহির রায়হানের "আরেক ফাল্গুন" উপন্যাসটি পড়তে পারেন।

সম্ভব হলে STOP GENOCIDE প্রামাণ্য চিত্রটি দেখুন।

বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নানা বিতর্ক ও ভিন্নমত থাকলেও, একথা আজ সকলেই মেনে নিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের বয়স আনুমানিক এক হাজার বছর। পৃথিবীর সব সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু কবিতা দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। আনুমানিক এক হাজার বছর পূর্বে এগুলো রচিত হয়েছে বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত এ পদগুলো দীর্ঘদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলো নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে উদ্ধার করেন। চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের নানা ছবি চিত্রিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা অবলম্বনে রচিত হলেও, চর্যাপদগুলো সাহিত্যগুণেও অনন্য। চর্যাপদের প্রধান কবিরা হলেন লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, শান্তিপাদ ও শরপাদ। চর্যাপদ ছাড়া প্রাচীন যুগের (৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়) আর কোন সাহিত্য নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে এ কাব্য রচিত হয়েছে বলে পন্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। তবে চর্যাপদের মতোই এ কাব্যও রচনার বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে কাব্যের পুঁথিটি উদ্ধার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। এটি রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের (১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়) প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতা প্রধানত চারটি শাখায় বিকাশ লাভ করে। এ শাখা চারটি হলো বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য এবং অনুবাদ-কাব্য। চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মতো এ-সব সাহিত্যশাখাও ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মমতকে অবলম্বন করে রচিত হয় বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) মানবতাবাদী ধর্মচিন্তা বৈষ্ণব সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা সঞ্চার করে। সাহিত্যগুণে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্যলীলাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কবিরা হচ্ছেন- বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য রচনার পশ্চাতেও ধর্মীয় প্রেরণা কাজ করেছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা প্রচার সম্পর্কিত এক প্রকার আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে। মধ্যযুগের মানুষ জাগতিক নানা প্রয়োজনে ও বিপদে-আপদে এ-সব দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। এভাবে হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চন্ডীদেবীর পরিকল্পনা, সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মনসাদেবীর অধিষ্ঠান, বসন্ত রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য শীতলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এরূপে আরও বহু দেব-দেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নানা দেব-দেবীর পরিকল্পনার কারণে মঙ্গলকাব্যেও রয়েছে নানা শাখা। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, প্রভৃতি হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান শাখা। মনসামঙ্গলের প্রধান কবিরা হচ্ছেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ন দেব, বিপ্রদাস প্রমুখ। চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি হচ্ছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, যিনি কবিকঙ্কন নামে সমধিক পরিচিত। অন্নদামঙ্গলের প্রধান কবির নাম ভারতচন্দ্র রায়। মঙ্গলকাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণার রচিত হলেও এ-সব কাব্য মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার নানা দিক বিধৃত হয়ে আছে। সাহিত্যগুণেও এ-কাব্য বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে অনুবাদ কাব্য। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে এ কাব্যশাখার সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুবাদকাব্য বিশেষ বিকাশ লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে নতুন জীবনাদর্শে সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন অনুবাদকরা। বাল্মীকির মূল রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন। মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদক হচ্ছেন কাশীরাম দাস। আরও অনেক কবি রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ কাব্যের শাখাটি সমৃদ্ধ করেছেন।

মধ্যযুগে এ পর্যন্ত যে-সব সাহিত্যশাখার কথা আমরা জেনেছি, তার সবগুলোই হিন্দু ধর্মের বিষয় ও বিধানকে অবলম্বন করে রচিত। ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারকল্পে সুফী ধর্মমতের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এ-সময় মুসলিম কবিদের হাতে নতুন এক কাব্যশাখার সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাব্যশাখা রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য নামে পরিচিত। এগুলো মূলত

আখ্যান কাব্য। বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্যের ধারায় যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হচ্ছেন সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, মুহম্মদ কবীর, কাজী দৌলত, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর প্রভৃতি আলাওলের উল্লেখযোগ্য কাব্য। রোমান্সমূলক প্রণয়কাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্টি হলেও, এগুলোর মধ্যেও মধ্যযুগের বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য কেবল কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বহু বিচিত্র শাখায় বিচিত্র ভাবে তা বিকাশ লাভ করে। তবে এখানে আমরা কেবল কবিতা সম্পর্কেই জানার চেষ্টা করবো। আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তবে তাঁর পূর্বে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। এজন্য তাঁকে 'যুগ-সন্ধিক্ষণের' কবি বলা হয়। তিনি খণ্ড কবিতা রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর অমর কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। তিনি পত্রকাব্য এবং সনেটেরও প্রবর্তক। 'বীরাঙ্গনা কাব্য', ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রভৃতি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনা।

মধুসূদন যেমন মহাকাব্য, পত্রকাব্য এবং সনেটের প্রবর্তক, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) তেমনি গীতি কবিতার প্রবর্তক। তার 'সঙ্গীত শতক-ই (১৮৬২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবিতার সঙ্কলন। গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভোরের পাখি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্যের নাম বঙ্গ-সুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, বন্ধু বিয়োগ, সাধের আসন, সারদামঙ্গল ইত্যাদি।

এ পর্বেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) উজ্জ্বল আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য নতুন নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত হলো। দুই শতাব্দী জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বিস্তৃত। ১৯৭৬ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'শেষলেখা' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। মাঝখানে রয়েছে পঞ্চাশের অধিক কাব্যগ্রন্থ। এ-সব কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পুনশ্চ, পত্রপূট, জন্মদিনে প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও প্রকরণে বাংলা কবিতার মান বহুগুণে সমৃদ্ধ করেন। মানবতাবাদী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন-নতুন ছন্দোরীতি, বিস্ময়কর সংক্ষিপ্তরূপ, অলঙ্কারের স্বল্পতা এবং ভাবসংগতিতে শেষ পর্বের রবীন্দ্রকবিতা বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ। কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, এঁরা মূলত রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তাতেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত। তাই এঁদেরকে রবীন্দ্র-বলয়ের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এ কালের অন্য তিনজন কবি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে প্রকাশের একটা স্বতন্ত্র পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এ কবিত্রয় হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। কবিতার বিষয় এবং আঙ্গিকে এঁরা রবীন্দ্রনাথের দূরবর্তী জগতের মানুষ।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম কবি হিসেবে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) অবদানও এখানে স্মরণীয়। 'মহাশ্মশান' কাব্য রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য কাব্য হচ্ছে 'অশ্রুমালা', 'অমিয়ধারা' প্রভৃতি। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনা কায়কোবাদের কবি প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের সর্বাপেক্ষা প্রবল-প্রাণ কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। নজরুল ইসলাম মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিকতার অন্তর-প্রেরণায় তিনি কখনো উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, কখনো বা গেয়েছেন প্রেম সৌন্দর্যের গান। শব্দব্যবহার ও অলঙ্কার নির্মাণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যের নাম অগ্নিবীণা, সাম্যবাদী, ভাঙার গান, দোলন চাঁপা, পুবের হাওয়া, চক্রবাক, সিন্ধু-হিন্দোল, মরুভাস্কর ইত্যাদি।

এ পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। পল্লী বাংলার জীবন ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাংলা কবিতায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা নির্মাণ করেছেন। রাখালী, নক্‌শী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট প্রভৃতি জসীমউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে এসে বাংলা কবিতায় নতুন পরিবর্তন সূচিত হলো। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৯৩), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। এঁরা তিরিশোত্তর কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের কবিতার প্রধান প্রবণতা আধুনিক জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অবিশ্বাস রূপায়ণ ও রবীন্দ্র-বিরোধিতা। তিরিশোত্তর এ কবি সমাজের হাতে বাংলা কবিতা বিষয় ও আঙ্গিকে নতুন মাত্রা অর্জন করে।

চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় সমাজমনস্কতার ছায়াপাত ঘটে। পুঁজিবাদ বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রকাশ এ-পর্বের কবিতার প্রধান লক্ষণ। এ দশকের প্রধান কবিরা হলেন, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাশ, কিরুণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে বাংলা কবিতা দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব বাংলা কেন্দ্রিক কবিরা বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ ধারার কবিদের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদী চেতনা সৃষ্টি করে। এ ধারার কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্যা হলেন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গণি হাজারী, সানাউল হক, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। ষাটের দশকের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আরও অনেক কবি পূর্ববালা তথা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক কাব্যধারা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৪৭ পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার কবিতাও স্বতন্ত্র পথে বিকাশ লাভ করে। এ-পর্বে পশ্চিমবাংলার প্রধান কবিরা হচ্ছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। অনেক নবীন কবি সম্মিলিত সাধনায় পশ্চিম বাংলার কবিতা বিকাশে এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে ওপরের আলোচনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এ আলোচনা পাঠ করে আপনি কবিতা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করুন, তাহলে পাঠ অনুধাবন আপনার জন্য সহজ হবে।

গদ্য

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কবিতা

সমুদ্রের প্রতি রাবণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তৎকালে বাংলাদেশের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি কলকাতার সদর দেয়ানী আদালতে ওকালতী করতেন।

মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। সাগরদাঁড়ির দত্ত পরিবারে ঐতিহ্যগতভাবে ফারসি এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা বহমান ছিল। মধুসূদনও শৈশব শিক্ষায় প্রধানত ফারসি এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বাল্যকাল থেকেই মধুসূদন ইংরেজি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিলেত গিয়ে তিনি বড় কবি হবেন। এ-ই ছিল তাঁর বাল্যের স্বপ্ন। এ উদ্দেশ্যেই ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর তিনি কলকাতার বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু লেখাপড়া সমাপ্ত না করেই অনেকটা আকস্মিকভাবে তিনি মাদ্রাজ গমন করেন। ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ পৌঁছার অব্যবহিত পরেই সেখানকার এক এতিমখানার স্কুলে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন।

মাদ্রাজ বাসকালে, ১৮৪৮ সালে, মধুসূদন রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস নাম্নী এক ইংরেজ নীলকর কন্যাকে বিয়ে করেন। সম্ভবত ১৮৫৬ সালে তিনি হেনরিয়েটা সোফিয়া নাম্নী জনৈক ফরাসি মহিলার পাণি গ্রহণ করেন।

১৮৫৬ সালে মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর জনক-জননী উভয়েই পরলোকগমন করেন। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইউরোপ যান। তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারী পাস করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যেয়ে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সময় অর্থ প্রেরণ করে মধুসূদনকে দেনার দায় থেকে মুক্ত করেন ও দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার উচ্চ আদালতে আইন ব্যবসা করে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তি অর্জন করেন মধুসূদন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি পুনরায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হন এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। হাজার বছরের বাংলা কাব্যের প্রথাগত ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বন্ধনমুক্তির অগ্রনায়ক। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতির আবিষ্কার তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। মহাকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্র্যাজেডি নাটক ইত্যাদি সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। মাদ্রাজ বাসকালে তিনি সাংবাদিকতা পেশায়ও সাফল্যের পরিচয় দেন। এ সময় তিনি The Madars Chronicle (১৮৪৩) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করলেও, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনাবলী

কাব্য : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৫৯), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৫)।
ইরেজি কাব্য : Captive Lady (1848), Visions of the Past (1849).
নাটক : পদ্মাবতী (১৮৫৮), শর্ম্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৫৯), মায়াকানন (অসমাপ্ত,) Rizia (অসমাপ্ত)।
প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ(১৮৬০)।
গদ্য-কাব্য : হেকটর-বধ (অসমাপ্ত)।

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুবিখ্যাত গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গ থেকে আলোচ্য কবিতাংশটুকু চয়ন করা হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে দূত মুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ বিচলিত হয়ে ওঠেন। পুত্রের শব দেখার জন্য তিনি প্রাসাদ শিখরে ওঠেন। রণক্ষেত্র দর্শন শেষে তার চোখ পড়ে অদূরবর্তী সমুদ্রের প্রতি। তিনি লক্ষ করেন, লঙ্কার গৌরব সমুদ্রের বুকে শিলার বাঁধ শোভা পাচ্ছে। যে সমুদ্র ছিল চির অজেয়, তা আজ সামান্য রামের কাছে বন্দীত্ব স্বীকার করেছে। এ শোকে-দুঃখে-অভিমানে-বেদনায় রাবণ সমুদ্রকে লক্ষ করে খেদোক্তি করেছে- নির্বাচিত কবিতাংশটির এটিই বিষয়। মূল কাব্যের প্রথম সর্গে আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে এ অংশটুকুও আছে। কিন্তু সেখানে আলোচ্য কাব্যাংশটুকুর কোনো নাম নেই। সঙ্কলক-সম্পাদকরা আলোচ্য কবিতাংশের বর্তমান নাম প্রদান করেছেন।

আলোচ্য কাব্যাংশের শুরুতেই রাবণের দৃষ্টিকোণে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। নগরীর চতুর্দিকে রামের সৈন্যবাহিনী সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। রামের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান বর্ণনা শেষে কবি রণক্ষেত্রের হৃদয়বিদারক ও বীভৎস রূপ উপস্থাপন করেছেন। এরপর রণক্ষেত্রে পতিত পুত্রের মৃতদেহের ওপর রাবণের চোখ পড়ে। প্রিয়পুত্রের শব দেখে রাবণ বিচলিত, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ক্রমে রাবণের চোখ পড়ে অদূরবর্তী সমুদ্রের প্রতি। রামের হাতে শৃঙ্খলিত সমুদ্রকে দেখে রাবণ বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হৃদয়ে সমুদ্রের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি উচ্চারণ করেন। যে সমুদ্র ছিল চির অলঙ্ঘ্য, চির অজেয়- তাই আজ রামের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। লঙ্কার প্রতি সমুদ্রের এ বৈরী আচরণের জন্যই রাম লঙ্কানগরীতে আসতে পেরেছে, পতন ঘটেছে লঙ্কার স্বাধীনতার। তাই রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়েছেন। কেবল ধিক্কারই নয়, তিনি সমুদ্রকে পুনরায় স্বমহিমায় আবির্ভূত হওয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। এদিক বিবেচনা করেই কাব্যাংশটুকুর নামকরণ করা হয়েছে 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ'। তবে সমুদ্রের প্রসঙ্গ ছাড়া আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আলোচ্য কবিতাংশে। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য, যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রিয়পুত্র বীরবাহুর শব-দর্শন, পুত্রশোকে চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকুল কান্না ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্তমান নামকরণের মধ্যে প্রতিভাত হয়নি। সেদিক থেকে বর্তমান নামকরণ যে পূর্ণ সার্থক এমন কথা বলা যাবে না। তবে অন্যদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, সমুদ্র বশ্যতা স্বীকার করেছে বলেই রামচন্দ্র সৈন্যসহ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছে, যুদ্ধে বীরবাহু মারা গেছে এবং সে কারণেই চিত্রাঙ্গদা দেবী হয়ে পড়েছেন শোক-বিহ্বল। এ-দিক বিবেচনায় আনলে, আলোচ্য কবিতাংশের 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' নামকরণের গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য।

মাইকেল মধূসূদন দত্ত মহাকবি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' মহাকাব্যের কাহিনী অংশ নিয়ে রচনা করেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রামায়ণের মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়ে মধুসূদন নির্মাণ করেছেন নতুন মূল্যচেতনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সীমাবদ্ধ নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল, তারই আলোকে মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীকে ভেঙে নতুন জীবনভাবনা প্রকাশ করেছেন। এ কারণেই 'রামায়ণ'-এর ঘৃণিত চরিত্র রাবণ তাঁর কাব্যে হয়েছে নায়ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে আত্মস্থ করেই নির্মিত হয়েছে রাবণ চরিত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্য-এর সম্পূর্ণ রাবণ চরিত্রের এক অতি খণ্ড অংশকে আমরা আলোচ্য কবিতাংশে লক্ষ করি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' আঙ্গিকে মহাকাব্য। মহাকাব্যের একটি খণ্ড অংশকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য কবিতাংশটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণের শেষে মিল রাখেন নি বলে মেঘনাদবধ কাব্যের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমধিক পরিচিত। বাংলা কাব্যে এ নতুন ছন্দরীতিরও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" কাব্যের আংশিক পরিচিতি লাভ করবেন।
২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের আধুনিক জীবনচেতনার পরিচয় দিতে পারবেন।
৩. অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রীতির মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- লঙ্কানগরীর ঐশ্বর্য ও বৈভব বর্ণনা করতে পারবেন।
- লঙ্কানগরী অবরোধকারী রামের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মুলপাঠ
রাক্ষসপতি – রাক্ষদের পতি বা প্রভু, রাবণ।	উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
প্রাসাদ শিখরে – প্রাসাদের শীর্ষদেশে, অট্টালিকার চূড়ায়।	কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
কনক-উদয়াচলে – সোনার বর্ণে রঞ্জিত পূর্ব দিগন্তে।	অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন–
দিনমণি – সূর্য।	সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা–মনোহরা পুরী! –
অংশুমালী – যা অংশু বা রশ্মির মালা ধারণ করে আছে, সূর্য। সূর্যের চতুর্দিকে রশ্মির জাল বিস্তারিত থাকে বলে সূর্যের আরেক নাম অংশুমালী।	হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কাঞ্চন – স্বর্ণ।	কমল-আলয় সর : ; উৎস রজচ্ছটা;
কিরীটিনী – মুকুট পরিহিতা নারী। এখানে লঙ্কানগরীর সুউচ্চ প্রাসাদ বুঝানো হয়েছে, যা লঙ্কানগরীর মুকুট স্বরূপ।	তরুরাজী, ফুলকুল– চক্ষু-বিনোদন,
কমল আলয় সর : – যে সরোবরে পদ্ম ফোটে, এমন।	যুবতীযৌবন যথা, হীরাচূড়াশির :
হীরাচূড়াশির : – মূল্যবান হীরকখচিত মন্দিরের শীর্ষদেশ।	দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
দেবগৃহ – দেবতাদের ঘর, মন্দির।	বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন
রাগে – রঙে, বর্ণে।	আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রঞ্জিত – রঙিন।	রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
বিপণি – বাজার, দোকান, পাট।	জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন!
সদন – আবাস, গৃহ।	
রাক্ষসেশ্বর – রাক্ষসদের ঈশ্বর। এখানে রাবণকে বুঝানো হয়েছে।	দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর–
অটল – দৃঢ়।	অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে – বীরত্বগর্বে।	বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
	শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
	(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহী-হর; তথা
	জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
	অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
	রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
	নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।
	হানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে,
	বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে

বৈদেহীহর – যিনি বিদেহ রাজকন্যা সীতাকে হরণ করেছেন, রাবণ।

রথ – প্রাচীন কালের যান বিশেষ।

রথী – রথে আরোহণকারী সৈনিক।

গজ – হাতি।

পদাতিক – যে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে।

রিপুবৃন্দ বালিবৃন্দ সিন্ধু তীরে যথা ... মণ্ডলে – সমুদ্র তীরবর্তী বালুকারাশি অথবা আকাশে অবস্থিত তারকারাজির মতো অগণিত শত্রু সৈন্য। সাহিত্যে এ ধরনের তুলনাকে উপমা বলে। যখন সমধর্মী দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন সৃষ্টি হয় উপমার। আলোচ্য কবিতায় আমরা এ ধরনের বহু উপমার উপস্থিতি লক্ষ করি।

হানা দিয়া – হামলা করে।

দুর্বার – দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধ্য।

নীল – রামচন্দ্রের বানর বাহিনীর এক বীর যোদ্ধা।

অঙ্গদ – বানররাজ বালির পুত্র, কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ।

করভসম – হস্তীশাবকের মতো।

বলী – বলবান, শক্তিমান।

কঞ্চুক – খোলস, গাত্রাবরণ।

ভূষিত – সজ্জিত।

হিমান্তে – শীতের শেষে।

অহি – সাপ।

ভ্রমে – ভ্রমণ করে, চলাফেরা করে এমন। ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা ত্রিশূলের মতো তিনভাগে চেরা জিহ্বা, সাপের জিভ তিনভাগে চেরা থাকে বলে কবি এ ধরনের চিত্র নির্মাণ করেছেন।

লুলি – সঞ্চালন করে।

অবলেপে – সদর্পে।

সুগ্রীব – কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজা।

বীরসিংহ – সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী।

দাশরথি – রাজা দশরথের পুত্র, রামচন্দ্র।

এবে – এক্ষণে।

জানকী বিহনে – সীতার অবর্তমানে; সীতা জনক রাজার কন্যা বলে তাকে জানকী বলা হয়েছে।

কৌমুদী – জ্যোৎস্না।

কুমুদরঞ্জন শশাঙ্ক – চন্দ্রের আলোয় পদ্ম শাপলা ইত্যাদি জলজ পুষ্প বিকশিত হয়, তাই চন্দ্রকে কুমুদরঞ্জন বলা হয়েছে।

লক্ষ্মণ – রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই।

বায়পুত্র হনু – রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্গত মহাবীর হনুমান।

অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক–
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্ধ্ব-ফণা-
ত্রিশুলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে–
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক। লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী–
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা!

মিত্রবর – বিশিষ্ট বন্ধু। **বিভীষণ** – রাক্ষসরাজ রাবণের ছোট ভাই। ইনি খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেন। **প্রসরণে** – বেষ্টনে। **বেড়িয়াছে** – ঘিরে রেখেছে। **বৈরিদল** – শত্রুদল। **গহন** – গভীর, ঘন। **কাননে** – অরণ্যে, বাগানে। **কেশরিকামিনী** – সিংহী। **নয়ন-রমনীরূপে** – নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে। **ভীমা** – প্রচণ্ড শক্তিশালী। **ভীমাসমা** – চণ্ডীসদৃশ, দুর্গার মতো।	

ভাবসংক্ষেপ

পূর্ব আকাশে নবীন সূর্যের মতো চোখ ঝলসানো দীপ্তি ও শোভা ছড়িয়ে লঙ্কা অধিপতি রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করলেন। প্রথমেই তার চোখ পড়লো লঙ্কানগরীর সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও বৈভবের প্রতি। স্বর্ণময় কিরীটশোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী। সুদৃশ্য ফুলের বাগানে সারি সারি স্বর্ণময় হর্ম্য, কমলশোভিত সরোবর, রূপার মতো শুভ্র জলধারা ও ফোয়ারা, হীরকচূড়াশোভিত দেবমন্দির, সুসজ্জিত দোকানপাট- ইত্যাদি লঙ্কানগরীকে মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ব যেন লঙ্কানগরীর পদমূলে সেরা ধন-রত্ন সমর্পণ করেছে। প্রাসাদশীর্ষ থেকে লঙ্কানগরীর এ মনোহর রূপ দেখে চরম বেদনার মাঝেও রাবণের চিত্তে আনন্দের ধারা বয়ে গেল।

লঙ্কানগরীর সুউচ্চ ভবনসমূহ দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল নগরীর বহির্দেশে। তিনি দেখলেন, সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্কানগরীকে বেষ্টন করে আছে। প্রাচীরের উপরে সৈনিকেরা সিংহের মতো বীরদর্পে পাহারা দিচ্ছে। রাবণ দেখলেন, নগরীর চারটি সিংহদ্বারই এখন বন্ধ। সিংহদ্বারের পাশে অগণিত রথ, রথী, হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য নিয়োজিত আছে। এরপর রাবণের চোখ পড়ল নগরীর বহির্দেশে অগণ্য শত্রুসৈন্যের প্রতি। রাবণের মনে হলো, সমুদ্রের তীরে যে অগণন বালুকারাশি আছে, কিংবা আকাশে যে অসংখ্য তারা আছে, রামের সৈন্যবাহিনীও তেমনি অগণন। রাবণ দেখলেন, বীর নীল পূর্ব দ্বারে অবস্থান করছে। দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ, উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব এবং পশ্চিম দুয়ারে স্বয়ং রামচন্দ্র অবরোধ সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্মণ, হনুমান এবং বিভীষণকেও দেখতে পেলেন রাবণ, রামের সৈন্যবাহিনী লঙ্কানগরীকে বৃত্তাকারে অবরোধ করে রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

—রাক্ষসপতি কে? তিনি কেন প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করেছিলেন?

২. প্রাসাদ শীর্ষ থেকে রাবণ যেভাবে লঙ্কানগরীকে দেখেছেন, তার পরিচয় দাও।

৩. 'জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন'। —একথা কে, কাকে এবং কেন বলেছে?

৪. লঙ্কানগরীর চার সিংহদ্বারের কোনটিতে শত্রুপক্ষের কোন বীর অবস্থান করছিল?

৫. কবি রামচন্দ্রের বীর সেনাদের বীরত্বের পরিচয় কিভাবে তুলে ধরেছেন?

উত্তর :

উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

-রাক্ষসপতি কে? তিনি কেন প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করেছিলেন?

উত্তর : রাম-রাবণের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাবণপুত্র বীরবাহু নিহত হয়। দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জেনে রাবণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। দূতের কাছে রাবণ ক্রমে জানতে পারেন, সম্মুখ যুদ্ধে বীরবাহু অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিধন করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ শুনে চরম শোকের মাঝেও মহাবীর রাবণ পুত্রের গৌরবদীপ্ত মৃত্যুর জন্য গৌরববোধ করলেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এবং প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করলেন।

প্রশ্ন : 'জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।' একথা কে, কাকে এবং কেন বলেছে?

উত্তর : লঙ্কার ঐশ্বর্য ও বৈভবের কথা ভাবতে ভাবতে রাক্ষসরাজ রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছে। কৃষ্ণের বক্ষদেশে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভমণির মতোই সমুদ্রের শোভাবর্ধনকারী ছিল মনোহর স্বর্ণলঙ্কা। পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণের পর রাবণের চোখে লঙ্কার এ ঐশ্বর্য ও বৈভব ধরা পড়ে। স্বর্ণময় কিরীটশোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী। সুদৃশ্য ফুলের বাগানে সারি সারি স্বর্ণময় হর্ম্য কমল শোভিত সরোবর, রূপার মতো শুভ্র জলধারা ও ফোয়ারা, হীরক চূড়াশোভিত দেবমন্দির, সুসজ্জিত দোকানপাট ইত্যাদি লঙ্কানগরীকে মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ব যেন লঙ্কানগরীর পদমূলে সেরা ধন-রত্ন সব সমর্পণ করেছে। তাই পরিপূর্ণ সুখের আলয় লঙ্কানগরী বিশ্ববাসীর কাছে পরম আরাধ্য স্থান। এ কারণেই লঙ্কানগরীকে উদ্দেশ্য করে রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন : লঙ্কানগরীর চার সিংহদ্বারের কোনটিতে কোন বীর অবস্থান করছিল?

উত্তর : রামচন্দ্র ভাসমান শিলার সাহায্যে সেতুনির্মাণ করে লঙ্কানগরীতে উপনীত হন। পরে তিনি লঙ্কানগরীকে বৃত্তাকারে অবরোধ করে ফেলেন। লঙ্কানগরীতে অনুপ্রবেশের জন্য ছিল চারটি মূল সিংহদ্বার। কৌশলগত কারণে এ চারটি সিংহদ্বার অবরোধ করাই রামচন্দ্র যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কেননা, অবরুদ্ধ থাকলে রাবণের সৈন্যরা নগরের বাইরে এসে যুদ্ধ করতে পারবে না। এজন্য রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীর চার সিংহদ্বার চারজন বীর সেনানীকে নিয়োজিত করেন। লঙ্কা পূর্বদ্বারে অবস্থান নিলেন মহাবীর নীল, দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ, উত্তর দ্বারে বীরসিংহ রাজা সুগ্রীব আর পশ্চিমদ্বারে স্বয়ং রামচন্দ্র। এভাবে চার বীরযোদ্ধা লঙ্কানগরীকে চারদিক থেকে অবরোধ করে ফেলে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ব্যাখ্যা

১. এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, ... তুই, সুখের সদন!

২. দেখিলা রাজা নগর বাহিরে ..... নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশ মণ্ডলে।

৩. দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে– ..... শশাঙ্ক।

৪. উঠিলা রাক্ষপতি প্রাসাদ শিখরে, ... অংশুমালী।

উত্তর :

এ জগৎ যেন ..... তুই, সুখের সদন!

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। লঙ্কার ঐশ্বর্য ও বৈভবের কথা ভাবতে ভাবতে রাক্ষসরাজ রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

কৃষ্ণের বক্ষদেশে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভ-মণির মতোই সমুদ্রের শোভাবর্ধনকারী ছিল রাবণের মনোহর লঙ্কানগরী। পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণের পর রাবণের চোখে লঙ্কার এ ঐশ্বর্য ও বৈভব চোখে পড়ে। স্বর্ণময় কিরীট শোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী। সুদৃশ্য ফুলের বাগানে সারি সারি স্বর্ণময় হর্ম্য, কমল শোভিত সরোবর, রূপার মতো শুভ্র জলধারা ও ফোয়ারা, হীরক চূড়াশোভিত দেবমন্দির, সুসজ্জিত দোকানপাট ইত্যাদি লঙ্কানগরীকে মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ব যেন লঙ্কানগরীর পদমূলে সেরা ধন-রত্ন সব সমর্পণ করেছে। তাই পরিপূর্ণ সুখের আলয় লঙ্কানগরী বিশ্ববাসীর কাছে পরম আরাধ্য স্থান। এ কারণেই লঙ্কানগরীকে উদ্দেশ্য করে রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, ... নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশ মণ্ডলে।

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

দূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর খবর শোনার পর রাবণ পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রাসাদ শীর্ষে আরোহন করেন। প্রথমে তার চোখ পড়ে মনোহর লঙ্কানগরীর প্রতি। নগরীর সুউচ্চ ভবনসমূহ দেখার পর রাবণের দৃষ্টি নিপতিত হলো রামের সৈন্যবাহিনীর দিকে। নগরীর বহির্দেশে রামের সৈন্যবাহিনী লঙ্কাপুরীকে অবরোধ করে আছে। রাবণ দেখলেন যে, নগর রক্ষাকারী প্রাচীরের উপরে সৈনিকেরা সিংহের মতো বীরদর্পে পাহারা দিচ্ছে। নগরীর চারটি সিংহদ্বারই এখন বন্ধ। সিংহদ্বারের পাশে অগণিত রথ, রথী, হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক, সৈন্য নিয়োজিত আছে। এরপর রাবণের চোখ পড়ল নগরীর বাইরের অগণ্য শত্রুসৈন্যের প্রতি। রাবণের মনে হলো, সমুদ্রের তীরে যে অগণন বালুকারাশি আছে, কিংবা আকাশে যে অসংখ্য তারা আছে, রামের সৈন্যবাহিনীও তেমনি অগণন। রামের এ অগণন সৈন্যবাহিনী দেখে রাবণ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুত্রের মৃতদেহ দেখার পর রাবণের মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
হেরিলা – দেখিল। **শিবাকুল** – শৃগালের দল। **গৃধিনী** – শকুন জাতীয় পাখি। **পিশাচদল** – অশরীরী জীবসমূহ। **পাকশাট মারি** – পাখা ঝাপটিয়ে, ডানা ঝাপটা দিয়ে। **গরজি** – গর্জন করে। **নাশে** – দূর করে। **ক্ষুধা অগ্নি** – ক্ষুধারূপ অগ্নি, অত্যধিক ক্ষুধা। **শোষে** – শোষণ করে।	অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি রণক্ষেত্র শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে। কেহ উড়ে, কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে; পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী জীবে; কেহ গরজি উল্লাসে, নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে। পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ আকৃতি; ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে! চূর্ণ রথ অগণ্য নিষাদী, সাদী, শূলী,

কুঞ্জরপুঞ্জ – হাতির দল।
নিষাদী – গজারোহী সৈনিক।
সাদী – অশ্বারোহী সৈনিক।
শূলী – শূল হস্তে যুদ্ধ করে যে সৈন্য।
বর্ম – গায়ের আবরণ।
চর্ম – চামড়া। এখানে চামড়ার আবরণ।
ভিন্দিপাল – ক্ষেপণযোগ্য প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ।
তূণ – তীর রাখার পাত্র।
মুদগর – মুগুর।
পরশু – কুঠার।
শীর্ষক – শিরস্ত্রাণ। মাথার আবরণ।
মহাতেজস্কর – অত্যন্ত দীপ্তিময়।
যন্ত্রীদল – বাদকদল।
হৈমধ্বজ – স্বর্ণখচিত পতাকা।
যম-দণ্ডাঘাতে – যমের মতো আঘাতে।
ধ্বজবহ – পতাকা বহনকারী।
স্বর্ণচূড় – ধান পাকার পর তার শীর্ষদেশ স্বর্ণময় হয়, তাই।
রাক্ষসনিকর – রাক্ষসগণ।
রবিকুলরবি – সূর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, রামচন্দ্র।
শূর – বীর।
রাঘবের – রামচন্দ্রের। রঘু-বংশোদ্ভূত বলে রামচন্দ্রকে রাঘব বলা হয়।
রিপুচয় – শত্রুদল।
বলী – বীর, বলবান।
হিড়িম্বা – ভীমের স্ত্রী।
গরুড় – প্রচীনকালের বিশালাকায় পাখি, বিষ্ণুর বাহন।
ঘটোৎকচ – ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র।
কর্ণ – মহাভারতে বর্ণিত বীর যোদ্ধা।
কালপৃষ্ঠধারী – যিনি কাল-পৃষ্ঠ নামক বিখ্যাত ধনুক ধারণ করতেন।
এড়িলা – নিক্ষেপ করলেন।
একাঘ্নি বাণ – কর্ণের দেবদত্ত বাণ, যা নিশ্চিতভাবে মাত্র একজনকে বধ করতে পারতো।
কৌরবে – কুরুবংশীয়দের।
মহাশোকে – গভীর দুঃখে।
রিপুদলবলে – শত্রুপক্ষকে।

রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে। শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঃ
ভিন্দিপাল, তূণ; শর, মুদ্‌গর, পরশু,
স্থানে স্থানে, মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষেত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী
এড়িলা একাঘ্নি বাণ রক্ষিতে কৌরবে।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ; –
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে!
তবু বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ; –
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী–
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র। হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"

দলিয়া – দলন করে, নিষ্পেষিত করে। **মোহমদে** – মোহের নেশায়। **ফুলসম** – ফুলের মতো। **অন্তর্যামী** – যিনি অন্তরের কথা জানেন, ঈশ্বর। **ভবভূমি** – পৃথিবী। **লীলাস্থলী** – লীলার স্থল। **বীরেন্দ্র কেশরী** – বীরশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রতুল্য বীর ও সিংহের মতো শক্তিশালী। **বিহনে** – অবর্তমানে।	

ভাবসংক্ষেপ

লঙ্কানগরীর সুউচ্চ ভবন এবং সিংহদরজায় অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল রণক্ষেত্রের দিকে। রণক্ষেত্রে শিয়াল, শকুনি, কুকুর প্রভৃতি মাংসভূক প্রাণী ভীতিজনক ও বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাংসাশী প্রাণীসমূহ পরস্পর রেষারেষি করে সৈনিক ও জীবজন্তুর শবদেহ ভক্ষণ করছে। হাতি, ঘোড়া ও নানা শ্রেণীর সৈনিক, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। কৃষকদের কাস্তের টানে যেমন পাকা ফসল কর্তিত হয়ে শস্যক্ষেত্রে পড়ে থাকে, রামচন্দ্রের শরের আঘাতে তেমনি অগণিত রাক্ষসসৈন্য রণক্ষেত্রে পড়ে আছে। এসব সৈন্যের শবদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে যেন মরা মানুষের পাহাড় তৈরি করেছে। এ-সব সৈন্যের শবদেহের সঙ্গে রাবণের প্রিয়পুত্র বীরবাহুর শবদেহও যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত বীরবাহুর শবদেহ দেখতে পেয়ে রাবণ শোকে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রশোকে বিহ্বল রাবণ আর্তনাদ ও বিলাপ করলেন। চরম বেদনার মাঝেও রাবণের চিত্তলোকে আনন্দ দেখা দিল। জন্মভূমি রক্ষাহেতু প্রিয় পুত্রের আত্ম-বিসর্জনে রাবণ গর্ববোধ করলেন। বিধাতা কেন তাকে এ শোক দিলেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে রাবণ যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে পেয়েছেন তার বর্ণনা দিন।

২. সমরক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে রাবণের চিত্তলোকে কোন ভাবের উদয় হলো?

৩. যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহু কিভাবে পড়ে ছিলেন?

৪. জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে!
—কে, কখন এবং কাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করেছেন?

উত্তর

প্রশ্ন : প্রাসাদ শীর্ষ থেকে রাবণ যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে পেয়েছেন, তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করলেন। লঙ্কানগরীর সুউচ্চ ভবন এবং সিংহদরজায় অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল রণক্ষেত্রের দিকে। রণক্ষেত্রে শিয়াল, গৃধিনী, শকুন, কুকুর এবং পিশাচদল ভীতিজনক বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হাতি, ঘোড়া, নানা শ্রেণীর সৈনিক ও জীবজন্তুর শবদেহ ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মাংসাশী প্রাণীসমূহের মধ্যে কোলাহল ও রেষারেষি চলছে। মৃত হাতি ঘোড়া এবং সৈনিকের দেহে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের নানা সামগ্রী ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কৃষকদের

কাস্তের টানে যেমন পাকা ফসল কর্তিত হয়ে শস্যক্ষেত্রে পড়ে থাকে, রামচন্দ্রের শরের আঘাতে তেমনি অগণিত রাক্ষসসৈন্য রণক্ষেত্রে পড়ে আছে। সৈন্যের শবদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে যেন মরা মানুষের পাহাড় তৈরি করেছে। নানা শ্রেণীর সৈন্যের শবদেহের সঙ্গে রাবণের প্রিয়পুত্র বীরবাহুর শবদেহও যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে।

প্রশ্ন : ***জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?***
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে!
- কে, কখন এবং কাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তিটি করেছেন?

উত্তর : দূতমুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করেন। লঙ্কানগরীর সুউচ্চ ভবন, সিংহদরজা এবং অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিক, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির শবদেহ দেখার পর রাবণ তার প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখতে পান। পুত্রের শবদেহ দেখার পর রাবণ শোকে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রশোকে বিহ্বল রাবণ আর্তনাদ ও বিলাপ করলেন। চরম বেদনার মাঝেও হঠাৎ রাবণের চিত্তলোকে আনন্দ দেখা দিল। জন্মভূমি রক্ষার জন্য প্রিয় পুত্রের আত্মবিসর্জনে রাবণ গর্ববোধ করলেন। প্রকৃত বীরমাত্রই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জনে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন দেয়া প্রত্যেক বীরেরই পরম আরাধ্য। বীর হয়েও কেউ যদি জন্মভূমি রক্ষার আত্মবিসর্জনে অগ্রসর না হয়, তবে সে নিতান্তই কাপুরুষ এবং বীরকুলের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে রাবণের বুক তাই গর্বে ভরে গেল, কেননা বীরবাহু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. হায় রে যেমতি ..... রবিকুলরবি শূল রাঘবের শরে!
২. জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? ..... যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে!
৩. হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী! .....কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিহনে?

জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? .....যে ডরে ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরবাহুর আত্মবিসর্জনে রাবণের চিত্তলোকে যে গৌরববোধের জন্ম দিয়েছে, এখানে তা বলা হয়েছে।
দূতমুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করেন। লঙ্কানগরীর সুউচ্চ ভবন, সিংহদ্বার এবং অবরোধকারী শত্রুসৈন্য দেখার পর রাবণের চোখ পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিক, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির শবদেহ দেখার পর রাবণ তার প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখতে পান। পুত্রের শবদেহ দেখার পর রাবণ শোকে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রশোকে বিহ্বল রাবণ আর্তনাদ ও বিলাপ করলেন। চরম বেদনার মাঝেও হঠাৎ রাবণের চিত্তলোকে আনন্দ দেখা দিল। জন্মভূমি রক্ষার জন্য প্রিয়পুত্র বীরবাহুর আত্ম-বিসর্জনে রাবণ গর্ববোধ করলেন। প্রকৃত বীরমাত্রই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জনে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য আত্ম-বিসর্জন দেয়া প্রত্যেক বীরেরই পরম আরাধ্য। বীর হয়েও কেউ যদি জন্মভূমি রক্ষার আত্মবিসর্জনে অগ্রসর না হয়, তবে সে নিতান্তই কাপুরষ এবং বীরকুলের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সমুদ্রের প্রতি রাবণের ক্ষোভ ও অভিমানের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
আক্ষেপিয়া – আক্ষেপ করে। **রাক্ষর ঈশ্বর** – রাক্ষসদের অধিপতি, রাজা রাবণ। **মকরালয়** – সাগর। **শিলাকুল** – প্রস্তরসমূহ। **তরঙ্গ নিচয়** – তরঙ্গমালা, ঢেউরাশি। **ফণামর** – ফণাবিশিষ্ট। **ফণিবর** – বিশাল বা শ্রেষ্ঠ সর্প। **উথলিছে** – উপচে পড়ছে। **নিরন্তর** – সর্বদা। **বীরকুলর্ষভ** – বীরকুলের শ্রেষ্ঠ। **প্রচেত :** – বরুণ, সমুদ্র। **জলদলপতি** – সমুদ্র। **প্রভঞ্জনবৈরী** – সমুদ্রকে ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **নিগড়** – শৃঙ্খল। **কেশরীর** – সিংহের। **বীতংসে** – ফাঁদ দ্বারা। **হৈমবতীপুরী** – স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী। **শোভে** – শোভা পায়। **নীলাম্বুস্বামী** – নীল জলরাশির যিনি প্রভু, সাগর। **কৌস্তুভ রতন** – পুরাণে বর্ণিত মহামূল্য মণিবিশেষ, কৃষ্ণের ভূষণ। **মাধব** – কৃষ্ণ। **বলী** – শক্তিশালী। **জাঙাল** – অবরোধ, প্রতিবন্ধকতা। **রিপু** – শত্রু। **বারীন্দ্র** – জলের অধিপতি, সমুদ্র।	এরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে সাগর-মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল বাঁধা দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়, ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে। অপূর্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে, স্রোত-পথে জল যথা বরিষার কালে। অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি; “কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জলদলপতি! এ কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয় তুমি? হায়, এ কি হে তোমার ভূষণ, রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব শুনি, কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে? প্রভঞ্জনবৈরী তুমি! প্রভঞ্জন সম ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে? এ যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী, কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি? উঠ বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি, দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা, ডুবিয়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা, হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”

ভাবসংক্ষেপ

পুত্রের মৃতদেহ দেখার পর রাবণের চোখ পড়ল লঙ্কার অদূরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের প্রতি। তিনি সমুদ্রের বুকে রামচন্দ্রের শিলা নির্মিত সুদৃশ্য সেতু দেখতে পেলেন। সেই সেতু দিয়ে অগণন বানর সৈন্য লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করেছে। সমুদ্রের শৃঙ্খলদশা দেখে তিনি ব্যথিত চিত্তে সমুদ্রকে ধিক্কার জানালেন। সমুদ্র চির অজেয় ও চির অলঙ্ঘ্য। সেই সমুদ্র কি করে রামের বশ্যতা স্বীকার করলো, রাবণ তা ভেবে পাননি। তাই তিনি সমুদ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন, সমুদ্র যেন তার বন্ধন দশা অতিক্রম করে আবার স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার জানিয়েছেন কিভাবে?

২. 'কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে'- কে কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন।

৩. 'রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা'- কে, কাকে কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে?

উত্তর

প্রশ্ন : রাবণ সমুদ্রকে ধিক্কার জানিয়েছেন কিভাবে?

উত্তর : মাধবের বুকে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভ রত্নের মতো সমুদ্রবক্ষে শোভা পায় স্বর্ণলঙ্কাপুরী। অথচ সেই স্বর্ণলঙ্কা আজ শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত। শত্রুদের লঙ্কানগরীতে আসতে সাহায্য করেছে অজেয় সমুদ্র। রামচন্দ্র সমুদ্রের বুকে শিলাময় যে সেতু নির্মাণ করেছে, ক্রমে রাবণ তা দেখতে পেলেন এ সেতু দিয়ে অগণন বানর-সৈন্য লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করছে। সমুদ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত চিত্তে সমুদ্রকে ধিক্কার জানালেন। সমুদ্র অজেয় ও অলঙ্ঘ্য। সেই সমুদ্র কী করে রামের বশ্যতা স্বীকার করলো, রাবণ তা ভেবেই পেলেন না।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেত : !

২. রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি!

উত্তর :

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেত : !

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' শীর্ষক কবিতাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সমুদ্রের প্রতি রাবণ তীব্র শ্লেষ ও ধিক্কার প্রকাশ করেছেন।

মাধবের বুকে রক্ষিত মহামূল্যবান কৌস্তুভ রত্নের মতো সমুদ্রবক্ষে শোভা পায় স্বর্ণলঙ্কাপুরী। অথচ সেই স্বর্ণলঙ্কা আজ শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত। শত্রুদের লঙ্কানগরীতে আসতে সাহায্য করেছে অজেয় সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে শিলা নির্মিত ভাসমান সেতু দেখতে পেলেন রামচন্দ্র। সেই সেতু দিয়ে অগণন বানর সৈন্য লঙ্কনগরীতে প্রবেশ করছে। সমুদ্রের এ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেখে রাবণ ব্যথিত চিত্তে সমুদ্রকে ধিক্কার জানালেন। ব্যঙ্গচ্ছলে রাবণ বললেন, 'হে সমুদ্র, তুমি আজ সুন্দর একটা মালা পরেছো তোমার গলায়!' এভাবে সমুদ্রের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- রাবণের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা দেবীর পুত্রশোকে বিহ্বল অবস্থার পরিচয় দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
এতেক কহিয়া – একথা বলে। **রাজরাজেন্দ্র** – রাজাধিরাজ, রাজার রাজা। **কনক-আসনে** – স্বর্ণনির্মিত আসনে। **মহামতি** – মহৎ স্বভাব সম্পন্ন। **চৌদিকে** – চতুর্দিকে। **কিঙ্কিনীর বোল** – অলঙ্কারের শব্দ। **ঘোর রোলে** – প্রবল শব্দে। **হেমাঙ্গী** – গৌরবর্ণা, ফর্সা। **আলুথালু** – এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। **আভরণহীন** – অলঙ্কার শূন্য। **হিমানী** – শীত। **কবরীবন্ধন** – খোঁপার বাঁধন। **পদ্মপর্ণ** – পদ্মের পাতা। **বিবশা** – বিহ্বলা, বাহ্যজ্ঞান রহিতা। **বিহঙ্গিনী** – নারী পক্ষী। **কালফণি** – যমসদৃশ সাপ। **কুলায়ে** – নীড়ে, পাখির বাসায়। **পশিয়া** – প্রবেশ করে। **সুর সুন্দরী** – স্বর্গের অপ্সরী। **বামাকুল** – নারীরা। **আসার** – বৃষ্টিপাত। **জীমূত-মন্দ্র** – মেঘের গর্জন। **তিতি** – ভিজে। **নেত্রনীরে** – চোখের জল। **কিঙ্করী** – দাসী। **দৌবারিক** – দ্বাররক্ষক, পাহারাদার। **নিষ্কোষিলা** – খাপ থেকে তরবারি বের করে আনা। **ভীমরূপী** – ভয়ঙ্কর, ভীষণ।	এতেক কহিলা পুনঃ রাজরাজেন্দ্র রাবণ, আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে মহামতি; পাত্র মিত্র, সভাসদ্-আদি বসিয়া চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে। হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া বালি নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনীর বোল ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে, প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। আলুথালু, হায় এবে কবরী বন্ধন। আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির- পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা, যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে। সুর-সন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে বামাকুল;মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ুঃ অশ্রুবারি ধারা আসার;জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব। চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে। ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর! ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোশিলা অসি ভীমরূপ; পাত্র মিত্র, সভাসদ্ যত অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।

ভাবসংক্ষেপ

সমুদ্রকে ধিক্কার জানানোর পর রাবণ পুনরায় সভাস্থলে ফিরে এসে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। তিনি এবং অন্য সভাসদেরা গভীর শোকে মুহ্যমান। এমন সময় চারদিকে মৃদু ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। তার সঙ্গে ভেসে এল অলঙ্কার ও নূপুরের শব্দ। বীরবাহুর মাতা এবং রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী সহচরীদের সাথে নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন। চিত্রাঙ্গদা দেবীর শোকাকুল বিষণ্ন রূপ দেখে সভাস্থ সকলেই বিচলিত হলেন। সভায় শোকের ঝড় প্রবাহিত হলো। কান্নার রোলে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. পুত্রশোকে বিহ্বল চিত্রাঙ্গদা দেবীর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করুন।

২. 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে'। –কোথায়, কি কারণে শোকের ঝড় প্রবাহিত হলো?

৩. চিত্রাঙ্গদা দেবী কি অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করেছিলেন?

উত্তর :

প্রশ্ন : পুত্রশোকে বিহ্বল চিত্রাঙ্গদা দেবীর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করুন।

উত্তর : দূত মকরাক্ষের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানার পর রাবণ প্রাসাদশীর্ষ থেকে লঙ্কানগরী, যুদ্ধক্ষেত্র, সমুদ্র ইত্যাদি দেখার পর পুনরায় সভাস্থলে ফিরে এসে সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। এমন সময় চারদিকে কান্নার মৃদুরোল শোনা গেল। নূপুর এবং কঙ্কণের শব্দ শোনা গেল। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জেনে রাণী চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী সহচরী পরিবেষ্টিতা হয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। রাবণ মহিষী এবং বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা দেবী শোকে মুহ্যমান। চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজসভায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন তার খোঁপা ছিল বন্ধনমুক্ত, কেশরাশি ছিল অবিন্যস্ত ও আলুথালু। চিত্রাঙ্গদার দেহ ছিল নিরাভরণ। তাকে দেখতে শিশির সিক্ত পুষ্পহীন লতার মতোই দেখাচ্ছিল। তার দুই চোখ ছিল শিশিরসিক্ত পদ্মপাতার ন্যায়। পুত্রশোকে চিত্রাঙ্গদা দেবী ছিলেন রীতিমতো উন্মাদিনী। বিষধর সাপ সন্তর্পণে পাখির বাসায় ঢুকে পক্ষিশাবক গ্রাস করলে পক্ষিমাতা যেমন মর্মবেদনায় ছটফট করে, পুত্রশোকাতুরা রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবীও তেমনি গভীর মর্মযাতনায় বুক চাপড়ে মরছিলেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. শোকের ঝড় বহিল সভাতে

২. পাত্র মিত্র, সভাসদ যত
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।

উত্তর :

শোকের ঝড় বহিল সভাতে

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজসভায় প্রবেশ করার পর সকলের মাঝে শোক কিভাবে সঞ্চারিত হলো, তা-ই আলোচ্য অংশে বলা হয়েছে।

দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানার পর রাবণ প্রাসাদশীর্ষ থেকে লঙ্কানগরী, যুদ্ধক্ষেত্র, বীরবাহুর মৃতদেহ, সেতুতে আবদ্ধ সমুদ্র ইত্যাদি দেখার পর পুনরায় সভাস্থলে ফিরে এসে সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। এমন সময় চারদিকে কান্নার মৃদুরোল শোনা গেল। নূপুর এবং কঙ্কণের শব্দ শোনা গেল। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জেনে চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী সহচরী পরিবেষ্টিতা হয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। রাবণ মহিষী এবং বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা দেবী শোকে মুহ্যমান। চিত্রাঙ্গদা দেবী রাজসভায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন তার খোঁপা ছিল বন্ধনমুক্ত, কেশরাশি ছিল অবিন্যস্ত ও আলুথালু। চিত্রাঙ্গদার দেহ ছিল নিরাভরণ। তাকে দেখতে শিশির সিক্ত পুষ্পহীন লতার মতোই দেখাচ্ছিল। তার দুই চোখ ছিল শিশিরসিক্ত পদ্মপাতার ন্যায়। পুত্রশোকে চিত্রাঙ্গদা দেবী ছিলেন রীতিমতো উন্মাদিনী। বিষধর সাপ সন্তর্পণে পাখির বাসায় ঢুকে পক্ষিশাবক গ্রাস করলে পক্ষিমাতা যেমন মর্মবেদনায় ছটফট করে, পুত্রশোকাতুরা রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবীও তেমনি গভীর মর্মযাতনায় বুক চাপড়ে মরছিলেন। চিত্রাঙ্গদা দেবীর এ অবস্থা দেখে রাজসভার সকলে কান্নায়

ভেঙ্গে পড়লো। মনে হলো যেন শোকের ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে। এ ঝড়ে সুন্দরী মেয়েদের মনে হলো যেন বিদ্যুৎ, তাদের খোলা চুল যেন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন প্রলয় বাতাস, তাদের অশ্রু যেন বৃষ্টিধারা, আর তাদের হাহাকার ধ্বনি যেন মেঘ গর্জন। কবি অসামান্য উপমার সাহায্যে রাজসভার শোকের ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন আলোচ্য অংশে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে লঙ্কাপুরীর বর্ণনা দিন।
৩. 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দিন।
৪. রাবণের রাজসভায় চিত্রাঙ্গদা দেবীর প্রবেশ ও সভাস্থলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন।
৫. সমুদ্রকে দেখে রাবণের মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন।

উত্তর :

প্রশ্ন : 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতায় লঙ্কাধিপতি রাবণের চরিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেম সন্তান-বাৎসল্য ইত্যাদি নানাগুণে রাবণের চরিত্র উজ্জ্বল।

রাবণ দেশপ্রেমিক রাজা। দেশের প্রতি তার ভালোবাসা প্রগাঢ়। তাই পুত্রশোকে প্রথমে বিষণ্ন হয়ে পড়লেও বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে ক্রমে তিনি গর্ববোধ করতে থাকেন। প্রকৃত বীর দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ-বিসর্জন করেন- বীরবাহুরও তা-ই করেছেন। তাই পিতা রাবণের অহঙ্কারের কোনো শেষ নেই। বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে তাই রাবণ বলছেন-

'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!'

রাবণ সন্তান-বৎসল পিতা। সন্তানের জন্য তার ভালোবাসার কোনো শেষ নেই। তাই বীরবাহুর মৃত্যু তাকে গভীরভাবে ব্যথিত ও বেদনাবিদ্ধ করেছে। রণক্ষেত্রে বীরবাহুকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখে রাবণের হৃদয়ে বেদনা এবং আনন্দের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

যে সমুদ্র ছিল লঙ্কার ঐশ্বর্যের মূল কারণ, সেই সমুদ্রই আজ রামের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। এ দৃশ্য দেখে রাবণ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাই সমুদ্রকে তিনি শত ভাষায় ধিক্কার দেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেশপ্রেমিক রাজা রাবণ সমুদ্রকে আবার সমহিমায় জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানান–

'উঠ, বলি, বীরবলে এ জাগল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবিয়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।'

রাবণ বীর যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করেও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছেন, কিভাবে রামের সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করা যায়। স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার আকুল কান্নায়ও তিনি ছিলেন স্থির। সভাস্থ সকলেই যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, রাবণ তখনও অটল এবং স্থির।

রাবণ মাইকেল মধুসূদন দত্তের এক অনবদ্য সৃষ্টি মূল মহাকাব্যে রাবণের যে সব গুণ প্রকাশিত, তা আলোচ্য কবিতাংশে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তবে, এখানে যে টুকু পরিচয় পাই, তাতেই রাবণকে মহাকাব্যের নায়কোচিত গুণাবলীতে আমরা ভূষিত দেখি।

প্রশ্ন : সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ যে আক্ষেপ করেছেন, তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতায় রামের হাতে শৃঙ্খলিত সমুদ্রের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা নিচে রাবণের ক্ষোভ ও আক্ষেপ উপস্থাপন করছি।

দূতের মুখে রাবণ সংবাদ জেনেছেন যে, রামের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রিয়পুত্র বীরবাহু নিহত হয়েছেন। বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করে বহু শত্রু-সৈন্য নিহত করে নিজে মারা গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃতদেহ পড়ে আছে শুনে রাবণ বিচলিত হয়ে পড়েন। পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করেন। সেখান থেকে লঙ্কানগরী, সিংহদরজা, যুদ্ধক্ষেত্র, বীরবাহুর মৃতদেহ দেখার পর রাবণের চোখ পড়ে লঙ্কার গৌরব সুনীল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের বুকে শিলার বাঁধ দেখেই রাবণ ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে যন্ত্রণায় আক্ষেপ করে ওঠেন এবং সমুদ্রকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

রাবণ প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে লক্ষ করেন, সমুদ্রের বুকে কৃষ্ণবর্ণের শিলার বাঁধ ভাসছে। বাঁধের দুই ধারে গম্ভীর শব্দ করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। রাজপথের মতো প্রশস্ত এ সেতু দেখে রাবণ বুঝতে পারেন যে, সমুদ্র অধম রামের বশ্যতা স্বীকার করেছে। শৃঙ্খলিত সমুদ্রকে দেখে রাবণ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে শ্লেষ ও ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছে। রাবণের ধিক্কারের মূল কথাই হলো, অজেয় সমুদ্রের এ শৃঙ্খলিত অবস্থা কিছুতেই সমুদ্রের শোভা হতে পারে না। রাবণের এ মনোভাব কবি তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে-

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ হা ধিক্ ওহে জলদলপতি!
এ কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এ কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?

সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ বলছেন যে, কৃষ্ণের বুকে যেমন কৌস্তুভরতন শোভা পায়, তেমনি নীল সমুদ্রের বুকে শোভা পায় লঙ্কানগরী। কাজেই সমুদ্র এবং লঙ্কানগরী একে অপরের গৌরবস্বরূপ। কিন্তু আজ সেই সমুদ্রই রামের বশ্যতা স্বীকার করেছে, নিজের অপরাজেয় সত্তাকে নিজেই বিনষ্ট করেছে। রাবণ বলছেন যে, সমুদ্র ছিল প্রচণ্ড ঝড়ের মতো শক্তিমান। তাই তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে লঙ্কার অজেয় সমুদ্র কখনো শিলার শৃঙ্খল পরতে পারে। তিনি বলছেন, অধম ভালুককে যাদুকর শৃঙ্খল পরিয়ে খেলা দেখায়। কিন্তু সিংহকে কি কেউ শৃঙ্খল পরাতে পারে? সমুদ্র তো রাবণের কাছে সিংহের মতো শক্তিমান। তাই কি করে রাম তাকে শৃঙ্খলিত করলো, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না রাবণ। তাই তিনি বলছেন—

কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে?

সমুদ্রের জন্য রাবণের গর্ব ও গৌরবের কোনো শেষ নেই। সমুদ্রকে, চরম বিপর্যস্ত অবস্থাতেও, রাবণ তাই একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছে না। তার প্রবল বিশ্বাস, সমুদ্র লঙ্কার সঙ্গে এ শত্রুতা করতে পারে না। সমুদ্র আবার স্বরূপে আবির্ভূত হবে, ভাসিয়ে দেবে রামের শিলা সেতু, ভেসে যাবে রামের সৈন্যবাহিনী, লঙ্কানগরী ফিরে পাবে তার হৃত গৌরব- এমনি আশা করছেন রাবণ। রাবণ জানেন, একমাত্র সমুদ্রই পারে তার এ আশার বাস্তবরূপ দিতে। তাই তিনি

সমুদ্রকে এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন, সমুদ্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার অসীম শক্তির কথা। রাবণের ভাষায়-

উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবিয়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

সমুদ্র লঙ্কার গৌরব ও ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ উৎস। সেই সমুদ্রকে শৃঙ্খলিত দেখে রাবণ ক্ষোভে ও দুঃখে ফেটে পড়েছেন, জানিয়েছেন ধিক্কার বাণী। তবে বিপর্যস্ত মুহূর্তেও সমুদ্রকে স্বরূপে জাগ্রত হবার আহ্বান জানাতে রাবণ ভোলেননি। এখানেই সমুদ্রের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা ও বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. নীচের অংশগুলোর গদ্যরূপ লিখুন–

ক. এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ বাসনা তুই, সুখের সদন।

খ. দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্দুতীরে যথা,
নক্ষত্রমন্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।

গ. দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে–
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক।

ঘ. কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে?

ঙ. শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার; জীমূত-মন্ত্র হাহাকার রব।

২. পৌরাণিক প্রসঙ্গ নির্দেশ করুন
গরুড়, ঘটোৎকচ, কর্ণ, জানকী, চিত্রাঙ্গদা

৩. উপমা কাকে বলে? 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা থেকে তিনটি উপমা শনাক্ত করুন।

উত্তর

প্রশ্ন : পৌরানিক প্রসঙ্গ নির্দেশ করুন–

গরুড় – পুরাণবর্ণিত বিশালাকায় পাখি। বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ের সঙ্গে রাজা দশরথের বন্ধুত্ব ছিল বলে জানা যায়।

ঘটোৎকচ – ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন।

কর্ণ – মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডবের মাতা কুন্তী দেবীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র। কথিত আছে যে, সূর্যের ঔরসে তার জন্ম। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যায়ভাবে অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হন।

জানকী – সীতা। জনক রাজার কন্যা বলে সীতাকে জানকী বলা হয়।

চিত্রাঙ্গদা – রাবণের মহিষী। বীরবাহুর মাতা।

প্রশ্ন : উপমা কাকে বলে? 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা অবলম্বনে তিনটি উপমা শনাক্ত করুন।

উত্তর : যখন সমধর্মী দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন তাকে উপমা বলে। 'সমুদ্রের প্রতি রাবণ' কবিতা থেকে তিনটি উপমা নীচে প্রদত্ত হলো–

ক. বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে।

খ. এ যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে।

গ. বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোত-পথে জল যথা বরিষার কালে।

আরও যা পড়তে পারেন

সম্ভব হলে পড়ুন- 'মেঘনাদ বধ' কাব্য। মধুসূদনের যে কোন রচনা। মধুসূদন রচনাবলীতে সব রচনাই পাওয়া যাবে। মধুসূদনের জীবনী সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

মানব-বন্দনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি পরিচিতি

১৮৬০ সালে কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলের ১৬ শ্রীনাথ রায় লেনের এক সুবর্ণবণিক পরিবারে অক্ষয়কুমার বড়াল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কালীচরণ বড়াল আর জননী রাণীবালা। অক্ষয়কুমারের পিতামহ অদ্বৈতচরণ বড়ালের আদি নিবাস ছিল চন্দননগর।

কলকাতার বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে পাঠাভ্যাস শুরু হলেও অক্ষয়কুমারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। স্কুল শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর না হলেও, আমৃত্যু তাঁর পাঠানুরাগ ছিল অব্যাহত। নিজ প্রচেষ্টায় তিনি অনেক বিষয় আত্মস্থ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় তিনি যথার্থ অর্থেই একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি।

পেশা হিসেবে অক্ষয়কুমার চাকুরিকে বেছে নিয়েছিলেন। স্কুল ত্যাগের কিছুকাল পরে অক্ষয়কুমার প্রথমে 'দিল্লী এ্যান্ড লন্ডন ব্যাঙ্ক' এর হিসাব বিভাগে কর্মচারিরূপে যোগ দেন। বেশ কয়েক বছর তিনি এ ব্যাঙ্কে চাকুরি করেন। কিন্তু কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি 'নর্থ ব্রিটিশ লাইফ-ইনস্যুরান্স কোম্পানি'র অফিসে হিসাব সচিব পদে যোগ দেন। এ পদে চাকুরি থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

হেয়ার স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি বাংলা গীতি কবিতার প্রবর্তক বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিহারীলালের কাব্য প্রেরণাতেই তিনি কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো অক্ষয়কুমার বড়ালকেও বলা হয় 'বিহারীলালের সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য'। বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে মানবতাবাদী ধারার প্রবর্তক হিসেবে অক্ষয়কুমার বড়াল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনি 'বড়াল কবি' নামে সুপরিচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রবর্তিত নব্য রোম্যান্টিক গীতিকবিতার ধারাটি যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁদের অন্যতম। নিসর্গ, প্রেম, শোক এবং মানববন্দনা বিষয়ক কবিতা রচনায় অক্ষয়কুমার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারা ছিল মার্জিত ও বিজ্ঞানমনস্ক।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন যক্ষা রোগ আক্রান্ত হয়ে অক্ষয়কুমার বড়াল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রধান প্রধান রচনা

কাব্য : প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ(১৯১০), এষা (১৯১২)।

নাটক : চণ্ডীদাস (অসম্পূর্ণ, ১৯১৬-১৭)।

সম্পাদিত গ্রন্থ : রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কবিতা' (১৮৮৭), গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭)।

ভূমিকা

"মানব-বন্দনা" অক্ষয় কুমার বড়ালের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। তাঁর 'প্রদীপ' কাব্য থেকে কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে।

"মানব-বন্দনা" কবিতায় কবি মানবজাতির আদিম অসহায় অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে সভ্যতার উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হবার বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। মানবজাতির অন্তহীন উচ্চাশা, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিচয় অনুধাবন করে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। তাই তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে একক মানুষের সামান্য কর্মপ্রয়াস থেকে শুরু করে ঐক্যবদ্ধ মানুষের বিপুল কর্মকাণ্ডের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আদিম অরণ্যচারী গুহাবাসী মানুষ কোনো অলৌকিক বা দৈবশক্তির সহায়তায় উন্নতির শিখরে উপনীত হয়নি। আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের স্বার্থেই

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ তা অর্জন করেছে। এ সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ মানুষের বন্দনাগীতিই হচ্ছে অক্ষয়কুমারের 'মানব বন্দনা' কবিতা। তাই বিষয়বস্তুর বিচারে আলোচ্য কবিতাটির নাম যথোপযুক্ত হয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ ১

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মানুষের আদিম অবস্থার পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- মানবজাতির বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
সেই আদি যুগে – সৃষ্টির সূচনালগ্নে। **দেবে না মানবে** – দেবতা না মানুষকে। **লুটি** – লুট করে। **ধরায়** – পৃথিবীতে। **মরুত গর্জনে** – প্রবল বাতাসের গর্জনের মধ্যে। **অন্বেষণ** – খোঁজ করা। **আরক্ত** – ঈষৎ লাল বর্ণ, রক্তিম আভা। **ভেদিয়া তিমিরে** – অন্ধকার ভেদ করে। **কর্দমে পিচ্ছিল** – পিচ্ছিল মাটি। **সলিল** – জল। **গরুড়** – পক্ষিরাজ, গরুড় হচ্ছে বিষ্ণুর বাহন। **সর্পকুল** – বহু ধরনের সাপ। **শ্বাপদ** – মাংসাশী হিংস্র জন্তু। **ব্যাদানি** – উদঘাটন করে, বিস্তার করে। **লাঙ্গুল** – লেজ। **দংশিছে** – দংশন করছে। **শ্যেন** – বাজপাখি। **লগুড়** – লাঠি বা গদা।	১ সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর নেত্র মেলি ভবে, চাহিয়া আকাশ পানে—কারে ডেকেছিল, দেবে না মানবে? কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি, লুটি গ্রহে গ্রহে, ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর, ধরায় আগ্রহে? সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জনে, কার অন্বেষণ? সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত খুঁজিছে স্বজন! ২ আরক্ত প্রভাত সূর্য উদিল যখন ভেদিয়া তিমিরে, ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল সলিলে শিশিরে! শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চিৎকারে কাণ্ডে সর্পকুল, সম্মুখে শ্বাপদ-সংঘ বদন ব্যাদানি আছাড়ে লাঙ্গুল; দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ শুন্যে শ্যেন উড়ে; – কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মানব- প্রস্তরে লগুড়ে?

শীর্ণ – কৃশকায়, ক্ষীর্ণ। **পত্রপুট** – গাছের পাতার ঠোংগা।	৩ শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তিহীন, ক্ষুধায় অস্থির; কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ব ফল, পত্রপুটে নীর? কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর সর্বাঙ্গে আদরে? কে নব্ পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন আপন গহ্বরে? দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা, অতিথি সৎকার! নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায় স্বপন সম্ভার!

ভাবসংক্ষেপ

সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষ ছিল চরমভাবে অসহায়। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষ বিপদের সময় কাতর ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করলেও, তার কান্না সেদিন দেবতার মন টলাতে পারেনি। দেবতা বা অন্য কোনো অতিলৌকিক শক্তি নয়, অসহায় ভয়ার্ত মানুষ সেদিন সাহায্যের প্রত্যাশায় তার স্বজাতিকেই খুঁজে বেড়িয়েছে, ক্ষুধার অন্ত্রের জন্য সে অন্য মানুষের কাছেই হাত পেতেছে।

সৃষ্টির আদি লগ্নে পৃথিবী অরণ্য, জলাভূমি ও কাদায় পূর্ণ ছিল। আদিকালে মানুষের সামনে সব সময় বিপদ এসে দেখা দিত। হিংস্র পাখি ও জীব-জন্তু এবং বিষধর সাপ সানুষকে আক্রমণ করতো। ওইসব হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ দেবতার সাহায্য চায়নি, দেবতারাও নিজে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। সেই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে লাঠি ও প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে এক মানুষই অন্য মানুষকে রক্ষা করেছে।

ক্ষুধার সময় মানুষ যখন অস্থির তখন দেবতা নয় বরং এক মানুষই অন্য মানুষকে খাবার দিয়েছে, নিবারণ করেছে তার ক্ষুৎপিপাসা। আদিকালে শোকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ মানুষকে সান্ত্বনা আর শুশ্রূষা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষই, অন্য কেউ নয়। আদি মানুষের আরাম আয়েশের উপকরণও যুগিয়েছে আদি মানুষ। মানুষ মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। মানুষ পত্র পুষ্পে নিজেদের সুশোভিত করেছে এবং বিচিত্র ভাষায় ও গানে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন রচনা করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. আদি যুগে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল?
২. আদি যুগে অসহায় মানুষ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল?
৩. আদি যুগে মানুষ কার আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং কেন?
৪. 'সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত/খুঁজিছে স্বজন' এখানে ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? কে কোন স্বজনকে খুঁজেছে?
৫. আদি মানুষ একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করেছে?
৬. আদি মানুষ কীভাবে স্বপ্নের বীজ বপন করেছে?

প্রশ্ন : আদি যুগে অসহায় মানুষ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল?

উত্তর : আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। মানুষের চারধারে ছিল নানা ধরনের বিপদের উপাদান। ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর মেঘগর্জনের প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল মানুষের প্রথম লগ্ন। পৃথিবীর চারদিকেই ছিল বিশাল অরণ্য, বিস্তৃত জলাভূমি আর থৈ-থৈ কাদা। হিংস্র পাখি আর সাপ ছিল মানুষের নিত্য দিনের বিপদের উৎস। হিংস্র শ্বাপদরা লেজ আছড়িয়ে আক্রমণে উদ্যত। হিংস্র বাজপাখি আর সরীসৃপের ভীতিও মানুষকে প্রতি পদে শঙ্কিত রাখতো। এ সব বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো পথ সেদিনের মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে অতি সহজেই মানুষ এ-সব বিপদ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছে।

প্রশ্ন : আদি যুগে মানুষ কার আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং কেন?

উত্তর : সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষ ছিল চরমভাবে অসহায়। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। প্রকৃতির নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্যে আদি মানুষ গগনবিদারী আর্তনাদ করেছে। মানুষের সে আর্তনাদ মেঘ বেয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠেছিল এবং অসীম শূন্যতার মাঝে মাথা ঠুকে মরেছিল। সেদিন মানুষের আর্ত-আহাজারি দেবতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। দেবতার সাহায্য বঞ্চিত মানুষ তখন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, একের বিপদে অন্যকে আহ্বান করেছে। মানুষের সাহায্যে সেদিন মানুষই এগিয়ে এসেছিল– পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে তারা বিপদ মোকাবিলা করেছে, প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। এভাবে দেখা যায়, আদি যুগের মানুষ মানুষেরই সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করেছে।

প্রশ্ন : আদি মানুষ একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করেছে?

উত্তর : আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। প্রকৃতির নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্যে আদি মানুষ গগনবিদারী আর্তনাদ করেছে। মানুষের সে আর্তনাদ মেঘ বেয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠেছিল। কিন্তু তার সাহায্যের জন্য সেদিন কোন দেবতা এগিয়ে আসেনি। বরং মানুষই সেদিন মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। দেবতার সাহায্য বঞ্চিত মানুষ সেদিন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানর চেষ্টা করেছে, একের বিপদে অন্যকে আহ্বান করেছে। হিংস্র পাখি ও পশুর আক্রমণের সময় এক মানুষ অন্যকে সাহায্য করেছে। ক্ষুধার সময় মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে মানুষ, শোক ও বেদনায় এক মানুষ অন্যকে শুশ্রূষা দিয়েছে, কখনো বা নিজের ঘরে অন্যের আশ্রয়ের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে পাতার শয্যা। এভাবে মানুষের সাহায্যের জন্য সেদিন মানুষই এগিয়ে এসেছিল পরস্পর-সহযোগিতার মাধ্যমে তারা বিপদ মোকাবিলা করেছে, প্রতিকূলতাকে জয় করেছে।

প্রশ্ন : 'সে নহে বন্দনা গীত, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত/খুঁজিছে স্বজন' - এখানে ভয়ার্ত,ক্ষুধার্ত বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? সে কোন স্বজনকে খুঁজেছে?

উত্তর : আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। মানুষের চারদিকে ছিল নানা ধরনের বিপদের উৎস। ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর মেঘ গর্জনের প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল মানুষের প্রথম যাত্রা। আলোচ্য চরণে এ আদি মানুষকেই বলা হয়েছে ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত জন। আদি মানুষ বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দেবতার সাহায্য কামনা করেনি বরং তারা স্বজনকেই খুঁজেছে। এক মানুষ অন্য মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে, একের বিপদে অন্যজন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃত কবিতাংশে সে কথাই বলতে চেয়েছেন কবি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর

নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে– কারে ডেকেছিল,
দেবে না মানবে?

২. সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জনে
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

৩. দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ
শূন্যে শ্যেন উড়ে; –
কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মানব
প্রস্তরে লগুড়ে?

৪. কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর
সর্বাঙ্গে আদরে?
কে নব পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে?

৫. দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা
অতিথি সৎকার!
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন সম্ভার!!

উত্তর :

২। সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জনে
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে। এখানে আদি যুগের মানুষের চরম অসহায়তা এবং পরস্পর সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

আদি-যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। প্রকৃতির নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্যে আদি মানুষ গগনবিদারী আর্তনাদ করেছে। মানুষের সে আর্তনাদ মেঘ বেয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠেছিল। কিন্তু তার সাহায্যের জন্য সেদিন কোনো দেবতা এগিয়ে আসেনি। বরং মানুষই সেদিন মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। দেবতার সাহায্য বঞ্চিত মানুষ সেদিন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, একের বিপদের অন্যকে আহ্বান করেছে। ভয়ঙ্কর বিপদের সময়, গভীর অন্ধকার আর কর্ণবিদারী মেঘ গর্জনের সময় মানুষ দেবতার অন্বেষণ করেনি, বরং সে খুঁজেছে তার পরম স্বজন মানুষকেই। আলোচ্য অংশে মানুষের সে পরস্পর সহযোগিতার কথাই বলা হয়েছে।

৩। দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ
শূন্যে শ্যেন উড়ে; –
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব না মানব
প্রস্তরে লগুড়ে?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে আদি মানুষের চরম অসহায়তা এবং ভয়ঙ্কর বিপদের কথা বলা হয়েছে।

আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। সমস্ত পৃথিবী ছিল ঘন বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। চারদিকে জলাভূমি আর থৈ থৈ কাদা। মানুষের জীবন নানা হিংস্র পাখি ও জীবজন্তুতে বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছিল। মাটিতে হিংস্র জন্তুর হুঙ্কার, বৃক্ষশাখায় বিষধর সাপের উদ্যত ফণা এবং পায়ের তলায় ভয়ঙ্কর সরীসৃপের চলাফেরা মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত করে তুলেছিল। এ বিপদের দিনে বিষাক্ত দংশকগুলো মানুষের শরীরে হুল ফোটাতো, সরীসৃপগুলো মানুষের পায়ে কামড় দিতো, মানুষের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেত হিংস্র পাখিরা – মানুষকে হত্যা করাই যেন অন্য সব জীবজন্তুর একমাত্র লক্ষ্য। এ বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সেদিন কোনো দেবতা বা অদৃশ্য শক্তি এগিয়ে আসেনি। বরং মানুষই সেদিন এগিয়ে এসেছিল মানুষকে সাহায্য করার জন্য। সেদিন মানুষই পাথর ও লাঠির সাহায্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারকে পরাস্ত করে নিজেদের রক্ষা করেছে, এগিয়ে গেছে উন্নতির দিকে।

দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা
অতিথি সৎকার!
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন সম্ভার!!

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে। এখানে আদি মানুষের চরম বিপদের দিনেও জীবনের আনন্দের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

আদি যুগের মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। তার কোনো বন্ধু বা স্বজন ছিল না। চরম অসহায়তার দিনে সাহায্যের জন্য মানুষ তীব্র আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সেদিন তাদের সাহায্য করার জন্য কোনো দেবতা বা অদৃশ্য শক্তি মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। মানুষই মানুষকে সাহায্য করেছে। পাথর ও লাঠির সাহায্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারকে পরাভূত করে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। এক মানুষ অন্য মানুষকে খাবার দিয়েছে, বিশ্রামের জন্য পাতার শয্যা রচনা করে দিয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব যখন সামান্য সময়ের জন্য বিপদমুক্ত হয়েছে, তখনই তারা আনন্দে মেতে উঠেছে। এক মানুষ অন্য মানুষের হাতে দিয়েছে ফুলের গুচ্ছ, মাথায় দিয়েছে ফুলের লতা, রাত্রিবেলা বিচিত্র সুরে গান গেয়েছে । এভাবেই তারা বিপদের দিনেও আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করেছে। এ আনন্দ উদযাপনের মাঝে আদি মানুষ নানা স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নই তাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের শক্তি সঞ্চার করেছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- মানব সভ্যতা বিকাশের স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শৈশবে বা প্রথম অবস্থায় মানবসভ্যতা কিরূপ বিকাশলাভ করেছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৈশোরে মানব সভ্যতা বিকাশের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- যৌবনে মানবের বিকাশধারা উল্লেখ করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
শিকার-সন্ধান – আদি মানুষ খাবার হিসেবে পশু পাখি শিকার করতো। পশু-পাখির কাঁচা মাংসই ছিল আদি মানুষের খাবার। **ধনুর্বেদ** – যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক প্রাচীন শাস্ত্র। **বহিত্র** – নৌকা, জলযান।	৪ শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি শিকার-সন্ধান? কে শিখাল ধনুর্বেদ, বহিত্র চালনা, চর্ম পরিধান? অর্ধদগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'

কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি – প্রাচীন কালে কাঠে কাঠ ঘষে বা পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো হতো।

কুর্দন-নর্তন – লাফালাফি।

চন্দ্র-সূর্য মেঘে দেব-দেবী নাম – আদিম মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে দৈবত্ব আরোপ করে তাদের পূজা করতো। আদি মানুষের কাছে এ-কারণে চন্দ্র সূর্য মেঘ বাতাস অগ্নি বৃক্ষ পূজিত ও নন্দিত হয়েছিল।

মৃত্তিকা কর্ষণে হইনু বাহির – মানবসভ্যতার কৈশোর কালে মানুষ চাষ করতে শিখেছিল।

সায়াহ্নে – সন্ধ্যাবেলা।

অগ্নি সাক্ষী করি – প্রাচীন বৈদিক বিয়ের সময় অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী মানা হতো। বিয়ের মাধ্যমেই পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে।

প্রলেপন – প্রলেপ বা মলম।

সোম – বেদে উল্লেখিত লতা বিশেষ। এ লতার রস উত্তেজক পানীয়।

প্রাসাদ – ভবন, দালান।

ঋক্ – বেদমন্ত্র, ঋগ্বেদ।

সাম – পদ্যময় দ্বিতীয় বেদ।

যজুঃ – যজু নামের বেদ।

চরক – প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত ঋষি।

সুশ্রুত – সুশ্রু প্রণীত বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ।

সংহিতা – ধর্মশাস্ত্র।

পঞ্চভূত – ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

হরি – ঈশ্বর।

ভুঞ্জিতে – ভোগ করতে।

মথুরা – কৃষ্ণের লীলাভূমি।

কৌশলে – কুশল বা অযোধ্যা।

করিনু ভক্ষণ?
কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি কার হস্ত ধরি
কুর্দন নর্তন?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য মেঘে
দেব-দেবী নাম?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর?
সায়াহ্নে কুটিরদ্বারে কার কণ্ঠ সাথে
নির্বিদ উচ্চারি?
কার আশীর্বাদ লয়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী?
কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন-
স্নেহে অনুরাগে?
কার ছন্দে-সোম গন্ধে-ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
দিল যজ্ঞ ভাগে?

৬

যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ
কে গঠিল দুর্গ, সেতু পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ?
কে আজ পৃথিবীরাজ- জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্য পাঠ?
পঞ্চভুত প্রকৃতি উন্নীত
কার জ্ঞান বলে?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য–জন্মিলেন হরি
মথুরা কৌশলে?

ভাবসংক্ষেপ

মানবসভ্যতার শৈশবকালে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে শিকারের সন্ধানে বের হতো। মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ধনুক চালনা, নৌকা চালনা, চামড়ার পোশাক পরিধান এবং কাঠে-কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানর কৌশল আবিষ্কার করেছে। কোনো দেবতা বা অদৃশ্য কোনো শক্তি মানুষকে এ সব কৌশল আবিষ্কারে কোনো সহায়তা করেনি। বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে এসব শিখে নিয়েছে। আগুনে পশুর মাংস অর্ধ-দগ্ধ করে খাওয়ার কৌশলও মানুষ আবিষ্কার করেছে। অস্তিত্বের ভীতি যখন সামান্য দূর হয়েছে তখন মানুষ সম্মিলিতভাবে আনন্দ উৎসব ও নাচ গানে

মেতে উঠেছে। এ সময়ই মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে যখন বিশাল পাথর, কখনো অশ্বত্থ মূলে পূজা দেয়া আরম্ভ করেছে। ক্রমে মানুষ ঋতুভেদ শিখল, চন্দ্র সূর্যের পার্থক্য বুঝলো এবং বিভিন্ন জিনিসের নাম দেয়া আরম্ভ করলো।
সভ্যতার কৈশোরকালে মানুষ কৃষিকাজ আয়ত্ত করেছে। মানুষ সম্মিলিত ভাবে কৃষিকাজে বের হতো, মধ্যাহ্নে একসঙ্গে বসে আহার করতো। সন্ধ্যা বেলা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। এরপর শুরু হলো মানুষের পরিবার জীবন, মানবসভ্যতায় আসলো নতুন মাত্রা। অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে মানুষ রচনা করেছে পরিরার জীবন। এরপর মানুষ নিজেরাই রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেছে, স্নেহ ও শুশ্রূষা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সুস্থ করে তুলেছে আর সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় পূজা ও যজ্ঞে মেতে উঠেছে।
সভ্যতার যৌবন পর্যায়ে মানুষ নগর প্রতিষ্ঠা করেছে। দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী, পথ, ঘাট তৈরি করে মানুষ তার সভ্যতাকে ক্রমেই উন্নত করে তুলেছে। দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার এবং প্রকৃতি ও পঞ্চভূতকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ আস্তে-আস্তে উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. মানবসভ্যতা বিকাশের প্রথম তিনটি স্তর কীকি?
২. শৈশবে বা প্রথম অবস্থায় মানবসভ্যতা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল?
৩. কৈশোরে মানবসভ্যতা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল
৪. যৌবনে মানবের বিকাশধারার পরিচয় দিন।
৫. মানুষের পরিবারপ্রথা কখন ও কীভাবে আরম্ভ হয়?
৬. আদিম মানুষ কীভাবে ধর্মীয় বিধান পালন করতো?

প্রশ্ন : শৈশবে বা প্রথম অবস্থায় মানবসভ্যতা কীভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের প্রথম স্তরকে কবি শৈশবকাল বলে অভিহিত করেছেন। শৈশবকালে আহারের উদ্দেশ্যে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিকারের সন্ধানে বের হতো। মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ধনুক চালনা, নৌকা চালনা, চামড়ার পোশাক পরিধান এবং কাঠে-কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার করেছে। কোনো দেবতা বা অদৃশ্য শক্তি মানুষকে এসব কৌশল আবিষ্কারে কোনো সহায়তা করেনি। বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে এসব শিখে নিয়েছে। সভ্যতার এ শৈশব লগ্নেই আগুনে পশুর মাংস অর্ধ দগ্ধ করে খাওয়ার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে। সভ্যতার প্রথম লগ্নে অস্তিত্বের ভীতি যখন সামান্য দূর হয়েছে, তখন মানুষ সম্মিলিত ভাবে আনন্দ উৎসব ও নাচে গানে মেতে উঠেছে। সভ্যতার শৈশব পর্যায়ে মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে কখনো বিশাল পাথর, কখনো বা অশ্বত্থ মূলে পূজা দেয়া আরম্ভ করেছে। এ সময়ই মানুষ ঋতুভেদ শিখল, চন্দ্র সূর্যের পার্থক্য বুঝলো এবং বিভিন্ন জিনিস ও জীব জন্তুর নাম দেয়া আরম্ভ করলো।

প্রশ্ন : কৈশোরে মানবসভ্যতা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল?

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরকে কবি কৈশোর কাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। সভ্যতার এ পর্যায়ে মানুষ কৃষিকাজ আরম্ভ করে। মানুষ সম্মিলিতভাবে কৃষিকাজে বের হতো, মধ্যাহ্নে এক সঙ্গে বসে আহার করতো। ক্রমে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা জাগ্রত হয়েছে। সন্ধ্যাকালে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। সভ্যতার দ্বিতীয় তথা কৈশোর স্তরেই শুরু হয় মানুষের পরিবার জীবন তথা সংসার জীবন। পরিবার জীবন বিকাশের ফলে মানবসভ্যতায় আসলো নতুন মাত্রা। এ পর্যায়ে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে মানুষ বিয়ে তথা পরিবার জীবনে প্রবেশ করেছে। সভ্যতার এ পর্যায়েই মানুষ শিখে নেয়

প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি, নিজেরাই আবিষ্কার করে নেয় রোগের ঔষধ। সুস্থ আর সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় এ সময় মানুষ পূজা ও যজ্ঞে মেতে উঠেছে।

প্রশ্ন : যৌবনে মানবের বিকাশধারার পরিচয় দিন।

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের তৃতীয় স্তরকে কবি যৌবন কাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে মানুষ নগর প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দালান কোঠা নির্মাণ করেছে। মানুষ দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী, পথ, ঘাট ইত্যাদি তৈরি করে সভ্যতাকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে গেছে। এ পর্যায়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির জগতেও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার এবং প্রকৃতি ও পঞ্চভূতকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ আস্তে আস্তে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে। এ-সময় মানুষ ঋক, সাম, যজুঃ, চরক, সুশ্রুত, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বই রচনা করতে আরম্ভ করে। এভাবে মানুষের জ্ঞানলোকের অসীমতা প্রকাশ পেতে থাকে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। এভাবেই, সভ্যতার যৌবন পর্যায়ে মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন মাত্রা সঞ্চারিত হতে থাকে।

প্রশ্ন : আদি মানুষ কীভাবে ধর্মীয় বিধান পালন করতো?

উত্তর : আদি মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে আস্তে আস্তে তৃতীয় শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে থাকে। প্রকৃতির নানা উপাদানকে পূজা দেয়ার মাধ্যএে শুরু হয় আদি মানুষের ধর্ম পালন। বড় বড় শিলাখণ্ড, বিশাল বৃক্ষ বা অনুরূপ কোনো পদার্থ বা বস্তুকে পূজা দিতে আরম্ভ করে। এ সময় মানুষ বিভিন্ন দেব-দেবী ও অন্যান্য জিনিসের নাম দিতে আরম্ভ করে। সভ্যতার কৈশোরকালে সন্ধ্যাবেলা কুটির দ্বারে এসে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, অগ্নি বা ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে সংসার জীবন রচনা করেছে। সভ্যতার যৌবন পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও প্রয়োজনীয় বই রচনা করতে আরম্ভ করে। এভাবেই রচিত হয় ঋক, সাম, যজুঃ, চরক, সুশ্রুত, সংহিতা, পুরাণ – প্রভৃতি গ্রন্থ। এ সময় থেকেই মর্ত্যলোকে বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাব বিষয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবেই আদি মানুষ বিকাশের নানা স্তরে ধর্মীয় নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠা ও তা পালনের চেষ্টা করেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে?
করিতে প্রণাম?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য মেঘে
দেব-দেবী নাম?

২. কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ ক্ষীর?

৩. কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন
স্নেহে অনুরাগে?
কার ছন্দে-সোম গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
দিল যজ্ঞ ভাগে?

৪. যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ।

৫. পঞ্চভূত প্রকৃতি উন্নীত
কার জ্ঞান বলে
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য – জন্মিলেন হরি
মথুরা কৌশলে?

উত্তর

২। কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ ক্ষীর?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সভ্যতার দ্বিতীয় স্তর তথা কৈশোরে কীভাবে কৃষি সভ্যতা বিকাশ লাভ করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
আদি মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই একটার পর একটা আবিষ্কার দিয়ে সভ্যতার উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তাকে কেউ সাহায্য করেনি– না দেবতা, না অদৃশ্য কোনো শক্তি। আদি মানুষ যেমন শিকারের কৌশল নিজেরা আবিষ্কার করেছে, যেমন আগুন জ্বালানর কৌশল নিজেরা বের করেছে, তেমনি কৃষিকাজের কৌশলও তারা নিজেরা শিখেছে। শৈশবে অর্থাৎ সভ্যতা বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ সম্মিলিতভাবে চাষ উপযোগী অঞ্চলে সকালে চলে যেত, সকলে মিলে মাটি কর্ষণ করতো। মধ্যাহ্নে চাষ শেষ করে তারা ঘরে ফিরতো। তখন সকলে মিলে দুপুরের খাবার খেত। উদ্ধৃত অংশে কবি এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

৪। *যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,*
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ।

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে সভ্যতার তৃতীয় স্তর তথা যৌবন পর্যায়ে কীভাবে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তা বর্ণিত হয়েছে।
আদি মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে একটার পর একটা আবিষ্কার দিয়ে সভ্যতার উৎকর্ষের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তাকে কেউ সাহায্য করেনি– না দেবতা, না অদৃশ্য কোনো শক্তি। পশু শিকার, আগুন জ্বালান, কৃষিকাজের কৌশল – প্রভৃতি বিষয় আদি মানুষ যেমন নিজেরাই আবিষ্কার করেছে, তেমনি তারাই নগর প্রতিষ্ঠা করেছে, নির্মাণ করেছে বিশাল বিমাল প্রাসাদ। নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এ সময় তারা ঋক, সাম, যজুঃ, চরক, সুশ্রুত, সংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মীয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বই রচনা করেছে। নগর প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে আদি সভ্যতায় সঞ্চারিত হয় নবতর মাত্রা।

৫। *পঞ্চভূত প্রকৃতি উন্নীত*
কার জ্ঞান বলে?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য - জন্মিলে হরি
মথুরা কৌশলে?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মানুষ নিজ জ্ঞানবুদ্ধির ফলে কীভাবে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, ব্যাখ্যেয় অংশে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

ভারতীয় পুরাণের মতে পৃথিবীর পঞ্চভূত অর্থাৎ পানি মাটি আগুন বায়ু এবং আকাশ এ পঞ্চ উপাদানে গঠিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে এসব উপাদান মানুষের সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে। মানুষ আপন বুদ্ধি ও কর্ম প্রচেষ্টার সাহায্যে এসব উপাদানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং নিজেদের কল্যাণে লাগিয়েছে। বিরুদ্ধ প্রকৃতির যাবতীয় উপাদানকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে মানুষ অভাবনীয় কল্যাণ সাধন করেছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এ সময় মানুষ অধ্যাত্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে অপশক্তিকে বিনাশ করার জন্য অবতারদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এভাবেই মথুরা ও কৌশলে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে। অসুর শক্তিকে বিনাশ করে অবতারনা মানুষের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য অংশে কবি মানব সভ্যতার এ বিশেষ বিকাশ সূত্রের কথা উপস্থাপন করেছেন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- মানবসভ্যতা বিকাশে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সাফল্যের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র রূপ ও তার মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তার পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের অন্তহীন সাধনার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
বিবর্তন বুদ্ধি – যার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।	৭ প্রবীণ সমাজ পদে, প্রৌঢ় আমি জুড়ি দুই কর, নমি, হে বিবর্ত বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন, বজ্র মুষ্টিধর!
বিদ্যুৎ মোহন – যা বিদ্যুৎকেও মোহিত করে, অতিশয় রূপবান।	চরণে ঝটিকাগতি–ছুটিছ উধাও দলি নীহারিকা।
বজ্রমুষ্টিধর – বজ্রকে যে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখে।	উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র-হেরিছ নির্ভয়ে সপ্তসূর্য শিখা।
নীহারিকা – আকাশে দৃষ্ট বহু দূরের নক্ষত্র সমষ্টি।	গ্রহে গ্রহে আবর্তন–গভীর নিনাদ শুনিছ শ্রবণে?
উদ্দীপ্ত – যা জ্বলে উঠেছে।	দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু বুঝিছ স্পর্শনে?
তেজস – দীপ্তিমান, উজ্জ্বল।	
সলাঙ্গুল দেহ – লেজসহ দেহ। সলেজ অবয়ব।	
সার্থক কাম – যার আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়েছে, যার কামনা ফলপ্রসূ হয়েছে।	৮
দেবতালাঞ্ছন – দেবতার রূপকেও যা হার মানায়, দেবতাকে লাঞ্ছিত করে এমন কোনো অপূর্ব সুন্দর।	নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার নিত্য অভিনব! মরদেহে নহ মর, অমর অধিক স্থৈর্য ধৈর্য তব?
কালের পৃষ্ঠায় – সময়ের বুকে।	লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
দর্শনে – দর্শনশাস্ত্রে।	

নমি – নমস্কার করি। **বিশ্বগ ভাব** – বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত ভাবনা। **আজন্ম** – জন্ম থেকে, শুরু থেকে। **হেলিছ-দুলিছ ... সীমা-কূল** – মানুষের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রয়াস সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো দুর্বার হয়ে উঠেছে। **মহামার** – প্রবল হৈ-চৈ, গণ্ডগোল, হুলস্থুল। **নিস্তার** – মুক্তি বা পরিত্রাণ।	জন্মিলে জগতে! শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু উড়ালে পর্বতে! গড়িলে আপন মূর্তি–দেবতালাঞ্ছন কালের পৃষ্ঠায়! গড়িছ ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে বিজ্ঞানে আপন স্রষ্টায়। ৯ নমি, হে বিশ্বগ ভাব! আজন্ম চঞ্চল, বিচিত্র, বিপুল! হেলিছ-দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি; ভাঙ্গি সীমা-কূল! কীঘর্ষণ– কি বর্ষণ, লম্ফন-গর্জন, দ্বন্দ্ব মহামার! কে ডুবিল–কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া, নাহিক নিস্তার! নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়! কোথায়-কোথায়! চিরদিন এক লক্ষ্য–জীবন বিকাশ পরিপূর্ণ তায়!

ভাবসংক্ষেপ

কবি বিবর্তনশীল মানব-প্রজ্ঞার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নানা অভিযান চালিয়ে মানুষ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। মহাকালের আহ্বানে দিয়েছে সাড়া। মানুষের এ অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে, করেছে অভিভূত।

উদ্যমী মানুষের প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন। মানুষ মরণশীল হয়েও বিপুল কর্ম ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কালের পৃষ্ঠায় মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছে তার অক্ষয়-অমর কীর্তি। মানুষ তার আপন বুদ্ধিবলে সাগর সেঁচে সমুদ্রের তলদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করেছে, মরুভূমিকে পরিণত করেছে মরূদ্যানে, পর্বতের শীর্ষদেশে উড়িয়ে দিয়েছে মানবের বিজয়-পতকা। মানুষ তর্ক-দর্শন-বিজ্ঞান বিকশিত করেছে এবং আপন স্রষ্টাকে কখনও গড়েছে কখনও ভেঙেছে।

মানুষের অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য পরিপূর্ণতা অর্জন। অগ্রযাত্রার পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষ সীমাহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণ সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বার বার নানা ভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কখনো আটকা পড়েনি এবং চলার গতিও কখনও থেমে যায়নি। জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের এ অগ্রযাত্রার কোনো বিরাম নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রবীণ সমাজপদে কবি কেন প্রণাম নিবেদন করেছেন?
২. 'মর দেহে নহ মর' এবং 'লয়ে সলাঙ্গুল দেহ' কথা-দুটির অর্থ কী?
৩. 'গড়িছ আপন মূর্তি – দেবতালাঞ্ছন কালের পৃষ্ঠায়! – চরণদ্বয় দ্বারা কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন?
৪. মানুষ কিভাবে তার অগ্রযাত্রার পথে ধাবিত হয়েছে?
৫. কবির মতে, মানুসের অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর

প্রশ্ন : প্রবীণ সমাজপদে কবি কেন প্রণাম নিবেদন করেছেন?

উত্তর : কবি বিবর্তনশীল মানবসমাজের প্রতি প্রণাম নিবেদন করেছেন। গতির আবেগে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে মানুষ। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অভিযান চালিয়ে মানুষ নির্ভয়ে আকাশ-অভিযানে অগ্রসর হয়েছে, মহাকালের আহ্বানে দিয়েছে সাড়া। মানুষের এ অন্তহীন অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে, করেছে অভিভূত। মানুষের এ বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্যই তিনি প্রবীণ সমাজপদে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

প্রশ্ন : 'মর দেহে নহ মর' এবং ''লয়ে সলাঙ্গুল দেহ' কথাদ্বয়ের অর্থ কী?

উত্তর : জাগতিক নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মতো মানুষও মরণশীল। মানুষ মরণশীল হলেও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহের মতো, তার কীর্তি বিলীন হয়ে যায় না। কেননা, মানুষ মরণশীল মানুষের অমরত্বের প্রতিই আলোকপাত করেছেন। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকের এ দৈহিক-অবয়ব লাভ করেছে। এককালের লেজওয়ালা বানর থেকেই ক্রমবির্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্ম। ক্রমবিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে মানুষের দেহ থেকে লেজ খসে পড়েছে। তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ বর্তমান কালের অবয়ব লাভ করেছে। 'লঢে সলাঙ্গুল দেহ' চরণাংশের মাধ্যমে কবি এ-কথাই বলতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন : কবির মতে মানুষের অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর : কবির মতে, আবির্ভাবের পর থেকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে। মানুষের এ অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পরিপূর্ণতা অর্জন। অগ্রযাত্রার পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষ সীমাহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণ সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বার বার নানা ভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কখনো আটকা পড়েনি এবং চলার গতিও কখনও থেমে যায়নি। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের এ অগ্রযাত্রার কোনো বিরাম নেই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. প্রবীণ সমাজ পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি দুই কর,
নমি হে বিবর্ত বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্র মুষ্টিধর!

২. নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!

মর দেহে নহ মর, অমর অধিক
স্থৈর্য ধৈর্য তব?

৩. গড়িছ ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায়।

৪. নমি, হে বিশ্বগ ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ-দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি
ভাঙ্গি সীমা কূল!

৫. নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়
কোথায়-কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য – জীবন বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

উত্তর :

১। *প্রবীণ সমাজ পদে, আজি প্রৌঢ় আমি*
জুড়ি দুই কর,
নমি হে বিবর্ত বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্র মুষ্টিধর!

আলোচ্য অংশটুকু অক্ষয়কুমার বড়াল-বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি তার পূর্বসূরী মানব প্রজন্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বিবর্তনের নানা পথ পরিক্রমা শেষে মানুষ আজ এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কবি এ বির্তনশীল মানবপ্রজ্ঞার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মানুষ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে, গতির আবেগে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে মহাশূন্যে অভিযান পরিচালনা করেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নানা অভিযান চালিয়ে মানুষ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। মানুষ নির্ভয়ে আকাশ অভিযানে অগ্রসর হয়েছে, মহাকালের আহ্বানে দিয়েছে সাড়া। মানুষের এ অন্তহীন অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে, করেছে অভিভূত। মানুষের এ বিপুল কর্মকান্ডের জন্যই তিনি প্রবীণ সমাজপদে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

২। *নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার*
নিত্য অভিনব!
মর দেহে নহ মর, অমর অধিক
স্থৈর্য ধৈর্য তব?

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কার বড়াল রচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। কবি এখানে মরণশীল মানুষের কীর্তিময় অমরত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন।

জগতের শাশ্বত নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মতো মানুষও মরণশীল। মানুষ মরণশীল হলেও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো তার কীর্তি বিলীন হয়ে যায় না। কেননা, মানুষ মরণশীল হলেও মানুষের আত্মা অমর এবং তার সৃষ্টিসম্ভার অক্ষয় ও অবিনশ্বর। আলোচ্য অংশে কবি মরণশীল মানুষের এ কর্তিময় অমরত্বের কথাই প্রকাশ করেছেন। এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকের এ দৈহিক অবয়ব লাভ করেছে। কবি তাই বিবর্তন চঞ্চল এবং কীর্তিময় এ মানব প্রজাতির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন।

৫। *নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়!*
কোথায়-কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য - জীবন বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ অংশে মানুষের অগ্রযাত্রার পরম লক্ষ্য সম্পর্কে কবির ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

আবির্ভাবের পর থেকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে। মানুষের এ অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ সীমাহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মরণ সংগ্রাম চালিয়েছে এবং বার বার নানা ভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা কখনো আটকা পড়েনি এবং চলার গতিও কখনও থেমে যায়নি। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের এ অগ্রযাত্রার কোনো বিরাম নেই। আলোচ্য অংশে মানুষের এ পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যের কথাই কবি বলতে চেয়েছেন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মানুষের একক ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছে, তার পরিচয় দিতে পারবেন।
- মানুষকে কবি কেন বন্দনা করেছেন, তা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নরদেব – নরদেবতা, মানুষরূপী দেবতা। **শষ্পভূমি** – সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ বা প্রান্তর। **সুবর্ণ কলস** – সোনার কলসি। কিরণে রশ্মিতে, আলোতে। **নবীন উদগীথ** – নতুন মন্ত্র। **পবনে** – বাতাসে। **সনে** – সঙ্গে। **ক্রমব্যতিক্রম** – ক্রম-বিবর্তন। **উদয়-বিলয়** – আবির্ভাব ও বিনাশ। **দ্বিজ** – ব্রাহ্মণ। **চণ্ডাল** – চাঁড়াল, নীচু জাত। **আদ্বিজ চণ্ডাল** – ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত। **তক্ষক** – ছুতোর অর্থে ব্যবহৃত। **অদ্রিতলে** – পর্বতের নীচে। **বরেণ্য** – বরণীয়। **শরণ্য** – রক্ষাকারী।	**১০** নমি তোমা নরদেব! গর্বে গৌরবে দাঁড়িয়েছ তুমি! সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, পদে শষ্প ভূমি। পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুর্বণ, কলস, ঝলসে কিরণে; কলকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ গগনে পবনে। হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ চলিছে সময়; ভ্রুভঙ্গে–ফিরিছ সঙ্গে–ক্রমব্যতিক্রম উদয়-বিলয়। **১১** নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চণ্ডাল, প্রভু, ক্রীতদাস! সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু; সমগ্রে প্রকাশ! নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,

	কর্ম, চর্মকার! অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি অগোচরে, বহ অদ্রি-ভার! কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে হে পূজ্য, হে প্রিয়! একত্বে বরণ্যে তুমি, শরণ্য এককে, — আত্মার আত্মীয়।

ভাবসংক্ষেপ

কবি বিপুল গর্ব আর গৌরবের অধিকারী মানুষ দেবতার প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। মানুষের চারদিকেই আজ নানা কীর্তিময় গৌরবগাথার ছড়াছড়ি। বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে মানুষ ধর্মীয় উপাসনালয় তৈরি করেছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন নতুন কৃৎ-কৌশল আবিষ্কার করেছে এবং এভাবে সে আকাশ ও বাতাসকে জয় করেছে।

জাতি ধর্ম বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে অসহায় আদি মানুষ ক্রমবির্তনের প্রক্রিয়ায় আজ উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়েছে। মানবসমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় সকল মানুষেরই রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা – এক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের চন্ডালের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত কর্ম প্রয়াসের ভিত্তিতেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ কারণেই কবি সকল মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. মানুষের একক ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছে?
২. কবি মানুষকে কেন বন্দনা করেছেন?
৩. আকাশে এবং বাতাসে মানুষ কিভাবে তার জয়বার্তা ঘোষণা করেছে?
৪. আদ্বিজ-চণ্ডাল বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
৫. 'একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে' –কথাটির তাৎপর্য কী?

প্রশ্ন : কবি মানুষকে কেন বন্দনা করেছেন?

উত্তর : ধর্ম-বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে অসহায় আদি মানুষ ক্রমবির্তনের প্রক্রিয়ায় আজ উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে উপনীত হয়েছে। মানব সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় সকল মানুষেরই রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের চণ্ডালের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ভিত্তিতেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ কারণেই কবি মানুষকে বন্দনা করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মানবের বিরামহীন কর্মপ্রয়াসকে।

প্রশ্ন : আদ্বিজ-চণ্ডাল বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' শব্দগুচ্ছ দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে চাঁড়াল, অর্থাৎ অভিজাত অনভিজাত, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতেই কবি ব্যবহার করেছেন 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' শব্দগুলো। মানব সভ্যতা বিকাশে আদিকাল থেকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং

বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে বৈরী প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সভ্যতা বিকাশে এ সকল শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতেই কবি 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন : 'একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য, এককে'- কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর : বিবর্তনের নানা পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ সভ্যতার চরম স্তরে উপনীত হয়েছে। জাতি-বর্ণ এবং গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসের ফলেই মানবসভ্যতা আজ উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশি ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সুবিশাল সমুদ্র, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনু পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। একইভাবে অগণিত মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ফলেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের অতুলনীয় মানবসভ্যতা। এ কারণে কবি সকল মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন গভীর একাত্মতা।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নমি তোমা নরদেব! কি গর্বে গৌরবে
দাঁড়িয়েছ তুমি!
সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্প ভূমি।

২. হৃদয় স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
চলিছে সময়;
ভ্রুভঙ্গে- ফিরিছ সঙ্গে-ক্রমব্যতিক্রম
উদয়-বিলয়।

৩. নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ।

৪. একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে–
আত্মার আত্মীয়।

উত্তর :

৩। *নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চণ্ডাল,*
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ।

আলোচ্য অংশটুকু অক্ষয়কুমার বড়াল– বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। মানবসভ্যতা বিকাশে সকল শ্রেণীর মানুষ কিভাবে ভূমিকা পালন করেছে, সে কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

মানবসভ্যতা বিকাশে আদিকাল থেকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে বৈরী প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশি ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সুবিশাল সমুদ্র, সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একইভাবে অগণিত মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের

ফলেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের অতুলনীয় মানবসভ্যতা। মানবসভ্যতার স্রষ্টা বলে কবি আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত সকল মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

৪। *একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে, -*
আত্মার আত্মীয়।

আলোচ্য অংশটুকু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল-বিরচিত 'মানব-বন্দনা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে। বর্তমান অংশে কবি মানবসভ্যতা সৃষ্টিকারী সকল মানুষের সঙ্গে গভীর একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

মানবসভ্যতা বিকাশে আদিকাল থেকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে বৈরী প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র জলবিন্দুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সুবিশাল সমুদ্র, সূক্ষ্ম অনু পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে। একইভাবে অগণিত মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের ফলেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের অতুলনীয় মানবসভ্যতা। মানবসভ্যতার স্রষ্টা বলে কবি আদিকাল থেকে এ-পর্যন্ত সকল মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ঐক্যবদ্ধ মানব-শক্তির উৎস হিসেবে কিংবা একক মানুষের কর্মপ্রয়াস হিসেবে কবি পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে গভীর একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. 'মানব-বন্দনা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
২. 'মানব-বন্দনা' কবিতায় মানবজাতির ক্রম-বিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বর্ণনা করুন।
৩. 'মানব-বন্দনা' কবিতা অবলম্বনে মানব ইতিহাসের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের বর্ণনা দিন।
৪. কবি কেন মানবকে বন্দনা করেছেন? 'মানববন্দনা' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।
৫. 'মানব-বন্দনা' কবিতার অবলম্বনে মানুষের আদিকাল অবস্থার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন : 'মানব-বন্দনা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : কবিতার নামকরণের সার্থকতা প্রধানত মূল ভাবের ওপর নির্ভরশীল। ছোটগল্প, উপন্যাস বা নাটকে চরিত্রনাম কিংবা স্থাননামকে কেন্দ্র করে নামকরণ হলেও কবিতার ক্ষেত্রে তা সাধারণত হয় না। কবিতার ক্ষেত্রে প্রধানত মূল ভাব বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই নামকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত মূল ভাব বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই নামকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। আলোচ্য 'মানব বন্দনা' কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রেও কবি অক্ষয়কুমার বড়াল কবিতার মূলভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচ্য কবিতার নাম 'মানববন্দনা' কতটা সার্থক হয়েছে, তা-ই বিবেচ্য বিষয়।

সৃষ্টির আদি-লগ্নে মানুষ ছিল নিঃসঙ্গ ও অসহায়। সাহায্যের জন্য মানুষ করুণ কান্নায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করলেও, সেদিন তাদের সাহায্যের জন্য দেবতা বা অলৌকিক কোনো শক্তি এগিয়ে আসেননি। নিরুপায় মানুষ বাঁচার প্রত্যাশায় সেদিন তার স্বজাতিকেই আহ্বান করেছে। হিংস্র জীব-জন্তু, ভয়ঙ্কর পাখি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষই সেদিন মানুষকে রক্ষা করেছে। তারা একে অন্যকে সাহায্য করেছে, শোকে যুগিয়েছে সান্ত্বনা, সরবরাহ করেছে আরাম আয়েশের উপকরণ। এভাবেই প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মানুষ ভবিষ্যত উন্নতির পথে পা বাড়িয়েছে।

সভ্যতার শৈশবকালে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিকার করতে শিখেছে। তীর ধনুকের ব্যবহার, নৌকা চালনা, চামড়ার পোশাক পরিধান এবং আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ ক্রমেই সভ্যতার শীর্ষচূড়ায় যাত্রা করেছে। এরপর তারা কৃষিকাজ করেছে। ফলে তাদের জীবনের সূচিত হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। এরপর মানুষ নগর ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, জল-

স্থল অন্তরীক্ষে ঘোষণা করেছে মানবের বিজয় বার্তা। প্রকৃতি ও পঞ্চভূতকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সভ্যতা ক্রমেই উন্নতির পথে ধাবিত হয়েছে।

কবি বিবর্তনশীল মানব প্রজ্ঞার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নানা অভিযান চালিয়ে মানুষ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। মানুষের এই অন্তহীন অভিযানের সাফল্য কবিকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে।

অভিযানপ্রিয় উদ্যমী মানুষের প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন। মানুষ মরণশীল হয়েও বিপুল কর্ম ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কালের পৃষ্ঠায় মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছে তার অক্ষয় অমর কীর্তি। কবির মতে, মানুষের এ অগ্রযাত্রার মুল লক্ষ্যই হচ্ছে পরিপূর্ণতা অর্জন।

কবি বিপুল গর্ব আর গৌরবের অধিকারী মানুষ দেবতার প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। মানুষের চারদিকেই আজ নানা কীর্তিময় গৌরবগাথার ছড়াছড়ি। জাতি ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে অসহায় আদি মানুষ ক্রম বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আজ উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়েছে। মানব সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় সকল মানুষেরই রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা – এ ক্ষেত্রে উচ্চ-বর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের চণ্ডালের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রভু-ভৃত্য, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশি ভূমিকা রয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত কর্ম-প্রয়াসের ভিত্তিতেই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ-কারণেই কবি সকল মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, 'মানব-বন্দনা' কবিতায় কবি মানবসভ্যতা বিকাশের ক্রমিক স্তরসমূহ উল্লেখ করে সভ্যতা বিকাশে মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের কথা বলেছেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। এদিক থেকে আলোচ্য কবিতার নাম 'মানব-বন্দনা' খুবই যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন : 'মানব-বন্দনা' কবিতায় মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' কবিতায় মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কবি বৈজ্ঞানিকের মতই মানব সভ্যতা বিকাশের ক্রমিক পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। আমরা নীচে অক্ষয়কুমার বড়ালের অনুসরণে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের চিত্র উপস্থাপন করছি।

সৃষ্টির প্রথম লগ্নে মানুষ ছিল ভয়াবহভাবে নিঃসঙ্গ ও অসহায়। হিংস্র পশু পাখি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সেদিন কাতর আর্তনাদ করেছে। কিন্তু মানুষকে সাহায্যের জন্য সেদিন স্বর্গের দেবতা বা অলৌকিক কোন শক্তি এগিয়ে আসেনি। মানুষই মানুষকে সাহায্য করেছে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

সৃষ্টির ঊষাকালে বৃক্ষলতা এবং জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবী ছিল মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। জলে-স্থলে-আকাশে সর্বত্রই ছিল মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর সব বিপদের হাতছানি। কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে এসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে, এবং বৈরী প্রকৃতির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কারো সাহায্য নয়, নিজেদের কর্মপ্রয়াস এবং আপন বুদ্ধি দিয়েই মানুষ এভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

জলাশয় ও কর্দমাক্ত পৃথিবীতে মানুষ নিত্য-নতুন সভ্যতা নির্মাণ করেছে। সভ্যতার এ বিকাশ যাত্রাকে কবি তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এ স্তর তিনটি হলো- মানবসভ্যতার শৈশবকাল, মানব-সভ্যতার কৈশোরকাল এবং মানবসভ্যতার যৌবনকাল। সভ্যতার শৈশবকালে মানুষ ছিল গুহাবাসী, শিকারই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ-পর্বেই মানুষ ক্রমে আগুনের ব্যবহার শিখে নেয়। আগে যেখানে পশু-পাখির কাঁচা মাংস খেত মানুষ, এখন তা আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার কথা শিখলো তারা। এ-সময়েই মানুষ বড় বড় গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজো দিতে আরম্ভ করে। সভ্যতার শৈশব লগ্নেই মানুষ ঋতুভেদ প্রথা শিখে নেয় এবং চন্দ্র-সূর্যের বন্দনা করতে আরম্ভ করে।

মানবসভ্যতার কৈশোর কালে মানুষ ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রমে তারা সমাজ ও সংসারজীবন গড়ে তোলে। সমাজবদ্ধ মানুষ আস্তে আস্তে সামাজিক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে। সভ্যতার কৈশোর লগ্নেই মানুষ কৃষিকাজ আয়ত্ত করে। কবির ভাষায়-

'কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি'
দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর?'

শৈশব পর্বে মানুষ গৃহনির্মাণ করতে শিখলো। এ-সময় থেকেই মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের বাকল এবং পশুর চামড়া ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

সভ্যতার যৌবন-লগ্নে মানুষ খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। এ সময়ই মানুষ প্রথম বারের মতো নগর প্রতিষ্ঠা করে। রাস্তা-ঘাট, সাঁকো, দুর্গ, পরিখা ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে মানুষ ক্রমেই উন্নতির শীর্ষদেশে উঠতে থাকে। তীর ধনুকের পরিবর্তে মানুষ উন্নতমানের শিকারের উপকরণ তৈরী করলো। যৌবন-পর্বে মানুষের এ উন্নতির কথা কবির ভাষায়-

'যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ।'

অর্থাৎ মানবসভ্যতার যৌবন-লগ্নে বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিগতও নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-পর্বেই মানুষ বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ও শিল্পচর্চায় ব্রতী হয় এবং জলে-স্থলে আকাশে নানা অভিযান পরিচালনা করে। সভ্যতার যৌবন পর্যায়েই মানুষ প্রকৃতির ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সময় যতই অগ্রসর হয়েছে, মানুষের চিন্তা, চেতনাও হয়েছে তত বেশি সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে প্রখর। নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে।

মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় ক্রমে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। সভ্যতার আদি, শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন স্তর পেরিয়ে মানুষ এখন উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছবার চেষ্টা করছে। সকল শ্রেণীর মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবসমাজ ক্রমবিবর্তনের ধাপসমূহ অতিক্রম করে কীভাবে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, তা-ই আলোচ্য কবিতার মৌল বিষয়।

প্রশ্ন : কবি মানবকে বন্দনা করেছেন কেন?

উত্তর : অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' কবিতায় কবি মানব সমাজের প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ছিল ভয়াবহভাবে নিঃসঙ্গ ও অসহায়। হিংস্র জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সেদিন কাতর আর্তনাদ করেছে। কিন্তু মানুষকে সাহায্যের জন্য সেদিন দেবতা বা অলৌকিক কোনো শক্তি এগিয়ে আসেন নি। প্রকৃতির নির্মমতার শিকার অসহায় মানুষ সেদিন মানুষের কাছেই সাহায্য কামনা করেছে। মানুষ মানুষকে সাহায্য করে প্রাথমিক অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। অতঃপর কালক্রমে মানুষ গড়ে তুলেছে আজকের এ সমৃদ্ধ সভ্যতা। মানুষের এ অন্তহীন কর্মপ্রয়াসকেই কবি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, প্রণাম জানিয়েছেন সম্মিলিত মানবসমাজের প্রতি।

সৃষ্টির ঊষাকালে বৃক্ষলতা এবং জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবী ছিল মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। জলে-স্থলে আকাশে সর্বত্রই ছিল মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর সব বিপদের হাতছানি। কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে এসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে, এবং বৈরী প্রকৃতির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কারো সাহায্য নয়, নিজেদের কর্মপ্রয়াস এবং আপন বুদ্ধি-বলেই মানুষ এভাবেই সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

প্রাথমিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করে কালক্রমে মানুষ সভ্যতা বিকাশের পথে দুর্জয় অভিযানে ব্রতী হয়েছে। গুহাবাসী মানুষ ক্ষুধার অন্ন যোগাতে শিকার পদ্ধতি শিখে নেয়, শিখে নেয় আগুনের ব্যবহার। আগুন আবিষ্কার ও তার ব্যবহার মানুষকে সভ্যতার দিকে অনেক দূর এগিয়ে দিল। আগে যেখানে পশু-পাখির কাঁচা মাংস খেত মানুষ, এখন তারা তা আগুনে খাওয়ার কৌশল রপ্ত করলো, আগুনের সাহায্যে অনেক সূক্ষ্ম ও ধারাল অস্ত্র তৈরি করলো। ক্রমে মানুষ কৃষিকাজ শিখে নিল, শিখে নিল নৌকাচালনা, গাছের বাকল এবং পশুচর্ম পরিধান পদ্ধতি। এক সময় মানুষ পরিবারজীবন গড়ে তুললো, গড়ে তুললো সংসার জীবন।

মানুষ তার জাগতিক প্রয়োজনে প্রবর্তন করলো সামাজিক নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধান। ক্রমে মানুষ নানাবিধ সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা শুরু করল। মানুষের ভবঘুরে জীবনযাত্রার অবসান হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের সভ্যতা অনেক দূর অগ্রসর হলো। এ-সময়ই মানুষ প্রতিষ্ঠা করলো নগর। নগর প্রতিষ্ঠা মানব সভ্যতা বিকাশে পালন করে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা। রাস্তা-ঘাট, সাঁকো-পরিখা, বাজার-গঞ্জ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রমেই মানব সভ্যতা উন্নতির শীর্ষদেশে উপনীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

'যৌবনে সাহায্য কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত
সংহিতা পুরাণ।
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা প্রণালী
পথ, ঘাট, মাঠ?
কে আজ পৃথিবীরাজ- জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্য পাট?'

অর্থাৎ মানব সভ্যতার পরম বিকাশলগ্নে বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিগত নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-সময়ই পঞ্চভূত ও প্রকৃতিকে জয় করে মানুষ ক্রমেই নতুন-নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে। মানুষের এ বিপুল কর্মপ্রয়াস ও অসাধারণ কর্মকাণ্ডকে কবি বিমুগ্ধ ও অভিভূত চিত্তে লক্ষ করেছেন।
মানুবসভ্যতার এ বিপুল উন্নতি কারো একক সাধনায় বা একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলিত সাধনায় গড়ে উঠেছে আজকের এ বিপুল সভ্যতা। মানবসভ্যতার ভিত গড়ে তুলতে সকল শ্রেণীর মানুষেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাই কবি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ চন্ডাল সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিই তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

সৃষ্টির আদি-লগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবসভ্যতা বিকাশে মানুষের এ বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড দেখে কবি বিমুগ্ধ ও অভিভূত। তাই সকল মানুষের প্রতি তিনি তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. নীচের কবিতাংশ-দুটি গদ্যভাষায় রূপান্তর করুন।

ক) সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত, গর্জনে,
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীত, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

খ) নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চন্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!

২. নীচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখুন-
ধরিত্রী, সর্প, পুষ্প, সাগর, বহিত্র

৩. নীচের তৎসম শব্দগুলোর তদ্ভব রূপ লিখুন-
সম্মুখ, লাঙ্গুল, অবসন্ন, কাষ্ঠ, চণ্ডাল।

উত্তর :

প্রশ্ন : নীচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখুন-

ধরিত্রী – পৃথিবী, বিশ্ব, বসুমতী, ভুবন, নিখিল।
সর্প – সাপ, অহি, ভুজঙ্গ, ফণী, নাগ।
সাগর – সমুদ্র, দরিয়া, অর্ণব, জলধি, রত্নাকর।
পুষ্প – ফুল, প্রসূন, কুসুম, মঞ্জরি, সুমন।
বহিত্র – নৌকা, তরী, তরণী, কিস্তি, বুহিত।

আরও যা পড়তে পারেন

১. মানবসমাজ বিকাশের ধারা ভালোভাবে বুঝবার জন্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' গ্রন্থটি পাঠ করুন।
২. 'নৃতত্ত্ব' বিষয়ক যে কোনো বই।

ওরা কাজ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

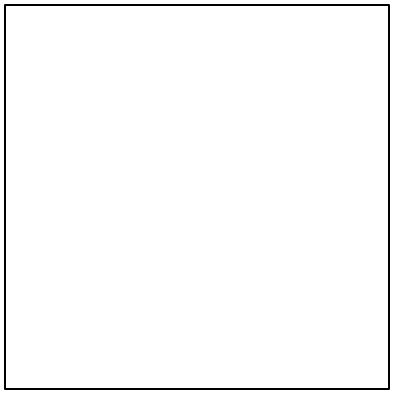

কবি পরিচিতি

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জননী সারদা দেবী, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সন্তান রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই এক অভিজাত পরিমণ্ডলের মাঝে বড় হয়ে ওঠেন। শৈশব-কৈশোরে বিদ্যালয়ে পড়ালেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমন মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনের, তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনফুল। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর।

কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং সাজাদপুরে জমিদারী তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি কৃষি উন্নয়ন কল্পে এবং কৃষকের জন্য বহু কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখরভাবে রাজনীতি সচেতন মানুষ। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ প্রশাসনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রবলভাবে প্রতিবাদ মুখর।

কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, এজন চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামটিকে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিত্য নতুন পরীক্ষা বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতা আনয়নে পালন করেছে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৩), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ (১৯১১), বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), আরোগ্য (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১) ইত্যাদি।

উপন্যাস : রাজর্ষি (১৮৮৯), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ(১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯) ইত্যাদি।

ছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড ১৯২৬, ২য় খণ্ড - ১৯২৬, ৩য় খণ্ড ১৯২৭), সে (১৯৩৭), তিন সঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১)।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কবির ইতিহাস চেতনা ও দার্শনিক বোধ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করতে পারবেন।

ভূমিকা

জীবনের অন্তিম পর্বে রচিত 'আরোগ্য' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। 'আরোগ্য'র ১০ সংখ্যক কবিতারই নতুন নামকরণ "ওরা কাজ করে"। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আরোগ্য লাভের পর কবিতাগুলি রচিত। চিকিৎসা নিয়ে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পর কবি গ্রন্থভুক্ত সমস্ত কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন।

"ওরা কাজ করে" কবিতায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যলোভী রাজশক্তিসমূহের প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তির পটভূমিকায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চিরায়ত অস্তিত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের অন্তর্গত। আশৈশব ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিই ভারতবর্ষকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটিয়েছে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিলো রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু জীবনের শেষবেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সাম্রাজ্যলোভী শক্তিতে রূপান্তর কবির বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাঁর চিত্ত। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' এ আত্মবিশ্বাসে দীক্ষিত কবির বিশ্বাসের ভিত্তিতে চিড় ধরিয়ে দেয় ব্রিটিশদের প্রতাপ ও লোভী আচরণ। এ আত্মবিক্ষোভই কবিকে টেনে নিয়ে যায় ইতিহাসের জগতে। ইতিহাসের শিক্ষা কবিকে এ বিশ্বাসে উজ্জীবিত করে যে কালস্রোতে সামাজ্যবাদী রাজশক্তির প্রতাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঐ রাজশক্তির শোষণে স্বাধীনতাবঞ্চিত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা অক্ষুণ্ন থাকে। "ওরা কাজ করে" কবিতায় মানুষের মধ্যকার এ অমিত সম্ভাবনার কথাই রূপায়িত হয়েছে।

"ওরা কাজ করে" কবিতাটি সমিল অক্ষরমাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটি প্রধানত ছয় ও আট মাত্রার পর্বে বিন্যস্ত। এতে দশ মাত্রার পর্বও রয়েছে। এ বিন্যাস 'কবিতাটির সংযত গতি ও বিস্ময় মিশ্রিত ভাব ব্যঞ্জিত করতে সহায়তা করেছে'। কবিতাটিতে অলঙ্কারের প্রয়োগ বেশি নেই। তবে তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য কবিতার গাম্ভীর্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। "ওরা' সর্বনাম পদের বহুমাত্রিক প্রয়োগ এ কবিতার একটি বিশিষ্ট দিক।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান পতনের ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইংরেজ রাজশক্তির আগমন ও পরাক্রমের বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশাল মহাবিশ্বে প্রবহমান কাল বা সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে কবির মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
অলস – মন্থর, এখানে আসক্তিহীন অর্থে। **সময়ধারা** – সময়ের ধারা, সময়স্রোত। **শূন্যপানে** – মহাশূন্যে, আকাশে।	অলস সময়-ধারা বেয়ে মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে। সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা পড়ে চোখে। কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে সুদীর্ঘ অতীতে জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে

ছায়া-আঁকা ছবি – ছায়াজাত ছবি, অন্ধকারে আঁকা ছবি, অস্পষ্ট ছবি।	এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল এসেছে মোগল; বিজয়রথের চাকা উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা। শূন্যপথে চাই, আজ তার কোনো চিহ্ন নাই। নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো। আরবার সেই শূন্যতলে আসিয়াছে দলে দলে লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ, বিকীর্ণ করেছে তার তেজ। জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল; জানি তার পণ্যবাহী সেনা জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।
জয়োদ্ধত (জয়+উদ্ধত) – বিজয় গর্বে গর্বিত, জয়ের আনন্দে স্পর্ধিত।	
সাম্রাজ্যলোভী – পররাজ্যে কর্তৃত্ব বিস্তারে লোভ পোষণকারী।	
পাঠান – (পশ্তু>পখতুন>পটঠোন) **হি.পঠান>বা. পাঠান)** – বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের মুসলিম গোত্রবিশেষ।	
মোগল – ভারত ইতিহাসে সম্রাট বাবর ও তাঁর বংশধর।	
শূন্যপথে – মহাশূন্যে, আকাশরূপ পথে।	
লৌহবাঁধা – লোহা দ্বারা বাঁধানো, ইস্পাত দৃঢ়।	
অনলনিশ্বাসী রথে – যে রথ আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে চলে।	
প্রবল ইংরেজ – সাম্রাজ্যলোভী প্রতাপশালী ইংরাজ জাতি।	
বিকীর্ণ – বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো।	
কাল – সময়, মহাকাল।	
সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল – সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের শৃঙ্খল অর্থে প্রযুক্ত।	
পণ্যবাহী সেনা – ভাড়া করা সেনা, ব্যবসায় সূত্রে আগত সেনা।	
জ্যোতিষ্কলোক – নক্ষত্রলোক, নক্ষত্রমণ্ডল, জ্যোতির্মণ্ডল।	

ভাবসংক্ষেপ

আকাশ বা মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে আসক্তিহীন সময়স্রোত ধরে কবিমন পরিভ্রমণ করে। মহাশূন্যে অন্ধকারে আঁকা অস্পষ্ট ছবিগুলি চোখে পড়ে তাঁর। যুগে যুগে ঐ সময়স্রোত ধরে বিজয়পর্বে উদ্ধত কত লোক প্রবল গতি বিস্তার করে চলে গেছে। সুদীর্ঘ অতীতের সময়স্রোতে এসেছে পাঠান, বিজয়রথের চাকার ধূলি উড়িয়ে এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করে সদম্ভে এসেছে প্রবল প্রতাপশালী মোগল। কিন্তু মহাশূন্যের সে পথরেখায় আজ আর তাদের কোনো পদচিহ্ন নেই। প্রভাত ও সন্ধ্যায় স্বচ্ছ নীলাকাশ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙে রঙিন হয়েছে। প্রকৃতির এ বর্ণবৈভব যুগ যুগ ধরে পৃথিবীকে সাজিয়েছে। পুনরায় সেই সময়স্রোত ধরে লোহা বাঁধানো পথে, আগুনের উত্তাপ ছড়ানো রথ চালিয়ে এসেছে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ। তারা তাদের প্রতাপরশ্মি বিস্তার করেছে সমগ্র দেশে। কবি জানেন বিশাল মহাবিশ্ব বা মহাকালের গর্ভে সময়স্রোত প্রবাহিত হয়ে যাবে। এ অনন্ত সময়স্রোতে সমগ্র দেশকে আবৃত করে ইংরেজ শাসনের যে জাল বিস্তৃত করা হয়েছে তা ভেসে যাবে। কোন রাজশক্তিই জ্যোতির্মণ্ডলে স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি, ইংরেজ ও তার অনুগত সেনাদলও নিশ্চিতভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান পতনের পরিচয় দিন।
২. ভারতবর্ষে ইংরাজ আগমনের চিত্র অঙ্কন করুন।
৩. অনলনিশ্বাসী রথে' কথাটির মর্মার্থ কী?
৪. 'সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল' চরণাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে ইংরাজ আগমনের চিত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : যুগে যুগে আগত বিভিন্ন রাজশক্তির মতোই মহাকালের সময়স্রোত ধরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে ইংরেজ। আগুনের উত্তাপ ছড়ানো রথে চড়ে লোহা-বাঁধানো পথে তেজ আর ভীতি ছড়িয়ে ভারতবর্ষে তারা শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের প্রতি পদক্ষেপে বিকীর্ণ হয় আগুন ছড়ানো ভীতি, তাদের সশস্ত্র ও সদম্ভ চাহনিতে প্রকাশিত হয় ক্ষমতাদর্পীর তেজ ও পররাজ্যলোভীর ক্ষুধা।

প্রশ্ন : 'সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল' চরণাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পররাজ্যলোভী ইংরেজ আগুনের উত্তাপ ছড়ানো রথে চড়ে দলে দলে প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষে। দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, তারা এসেছে পররাজ্য শাসন করতে। অস্ত্রশক্তিতে তারা বলীয়ান। সমগ্র দেশকে আবৃত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জাল পেতেছে তারা। কিন্তু কাল ও সময়স্রোতে সবকিছু হারিয়ে যায়, কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না। কবির বিশ্বাস সমগ্র দেশকে আবেষ্টন করে ইংরেজরা যে জাল বিস্তার করেছে, কালস্রোতে তা ভেসে যাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে

২। শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।

৩। জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।

৪। জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে

আলোচ্য কবিতাংশটুকু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ' আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সুদীর্ঘ অতীতে ভারতবর্ষের মাটিতে বিজয়গর্বে উদ্ধত সাম্রাজ্যলোভী বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশের কথা ব্যক্ত করেছেন কবি।

মহাবিশ্বের প্রবহমান সময়স্রোতে কেউ স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারে না। কবি মহাশুন্যের দিকে তাকিয়ে অলস সময়ধারা বেয়ে অতীত ইতিহাসের জগতে মানস পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইতিহাস চেতনায় উদ্দীপিত কবি মহাশূন্যের দিকে চেয়ে এ সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে দলে দলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যলোভী জাতির আগমন ঘটেছে। জয়ের গর্বে উদ্ধত ঐ সব জাতি মহাকালের বিশালতার তুলনায় সাময়িক স্থায়িত্বও লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে রাজবংশ, প্রয়াসী হয়েছে শোষণ ও শাসনের বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতার রূপকে চিরস্থায়ী করতে। কিন্তু কালস্রোতে সবই ভেসে যায়, মহাশূন্যের শূন্যতায় কোনো স্মরণচিহ্ন আঁকা থাকে না।
মহাকালের অনন্ত সময়স্রোতে সব কিছুই প্রবহমান। জয়ের গর্বে গর্বিত প্রতাপশালী তার বিজয়পতাকা চিরকালের জন্য উড্ডীন রাখতে পারে না।

জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

উদ্ধৃত চরণদুটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরোগ্য' কাব্যের "ওরা কাজ করে" কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যেবিস্তারী শক্তিরূপে ক্ষমতার নেশায় মত্ত ইংরেজদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন।
মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভেতরকার সম্ভাবনাকে অনেক বড় করে দেখেছেন। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' – তাঁর রচিত এ প্রত্যয়বাণীতে কবির মানুষের প্রতি বিশ্বাসের কথা মূর্ত হয়ে আছে। কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সুসভ্য ইংরেজ রাজশক্তির ভয়ংকর মানববিধ্বংসী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশে বিচলিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আশৈশব লালিত বিশ্বাসে চিড় ধরে। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত এ ঔপনিবেশিক শক্তির সাম্রাজ্যবাদী আচরণ বিক্ষুব্ধ করে তোলে রবীন্দ্রনাথকে। ইতিহাসের জগতে মানস পরিভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যজ্ঞান লাভ করেন যে ক্ষমতাগর্বী কোনো জাতিই চিরস্থায়ী অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে না। সমগ্র দেশ জুড়ে শাসন ও শোষণের জাল বিস্তার করেও ইংরেজকে এ-দেশ থেকে হটতে হবে। মহাবিশ্বের সময়ধারায় বহু ক্ষমতাগর্বী শাসকগোষ্ঠী আসা-যাওয়া করেছে, কিন্তু কেউই স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। ক্ষমতালোভী ইংরেজরাও জ্যোতির্মণ্ডলের পথে কোন রেখা-চিহ্ন রেখে যাবে না।
কালস্রোতে সবকিছুই ভেসে যায়। বলদর্পী যতই প্রবল হোক, জ্যোতিষ্কলোকের পথে তার চিহ্নমাত্র আঁকা থাকবে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মাটির পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মধারার পরিচয় দিতে পারবেন।
- সাম্রাজ্যলোভী অতীত রাজবংশসমূহের মূল্যহীন স্মারক চিহ্নগুলির অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবির অনুভূতির আলোকে শ্রমজীবী মানুষের শাশ্বত জীবনধারার মূল্যায়ন করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে – জ্যোতিষ্কলোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কবি বর্তমানের ধূলি মাটি মাখা পৃথিবীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। **জলকলরব** – জলপ্রবাহ জনিত মৃদু মধুর ধ্বনি। এখানে জলপ্রবাহের	মাটির পৃথিবীর-পানে আঁখি মেলি যবে দেখি সেথা কলকলরবে বিপুল জনতা চলে নানা পথে নানা দলে দলে যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে জীবনে মরণে। ওরা চিরকাল

জনতার চলমানতাকে এক করে দেখানো হয়েছে।

যুগযুগান্তর – এক যুগ থেকে অন্য যুগে।

জীবনে মরণে – এখানে জীবন ও মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনের অনিঃশেষ চলমানতাকে বোঝানো হয়েছে।

দাঁড় – এক ধরনের বৈঠা।

হাল – নৌকা চালাবার বা ঘোরাবার কাঠের তৈরি যন্ত্র।

নগরে – শহরে, এখানে শহরের কারখানা অর্থেও প্রযোজ্য।

প্রান্তরে – ভূমি, মাঠ, এখানে বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্র অর্থে।

রাজছত্র – পূর্বকালে রাজার মাথার ওপর যে ছাতা ধরা হতো। যে ছাতা রাজার মর্যাদার স্মারক।

রণডঙ্কা – যুদ্ধের জয়ঢাক। যুদ্ধের দুন্দুভি।

জয়স্তম্ভ – বিজয় লাভের চিহ্নস্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ বা থাম।

মূঢ়সম – নির্বোধের মতো।

শিশুপাঠ্য কাহিনী – কেবল শিশুদের জন্য পাঠ্য গল্প বা কাহিনী। এখানে শেষার্থে প্রযুক্ত।

দেশে দেশান্তরে – এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

অঙ্গ – গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় দেশ।

বঙ্গ – প্রাচীন ভারতের উত্তর পূর্বস্থ একটি জনপদের নাম। বাংলাদেশের প্রাচীন নাম।

কলিঙ্গ – উড়িষ্যা ও তার দক্ষিণে দ্রাবিড় অঞ্চল সমেত প্রাচীন ভারতের প্রদেশবিশেষ।

পঞ্জাব – উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রদেশ বা রাজ্য বিশেষ।

বোম্বাই – ভারতের অন্যতম রাজ্য বা ঐ রাজ্যের প্রধান নগর।

গুজরাট – প্রাচীন ভারতের গুর্জর রাষ্ট্র; বোম্বাই রাজ্যের কাছে এবং সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত দেশবিশেষ।

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্রে নদীর মাঠে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে
গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন্‌ স্বর
দিনরাত্রে গাথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে
ওরা কাজ করে।

গুরু গুরু (অব্যয়) – মৃদুগম্ভীর মেঘগর্জন ধ্বনি। **গুন্‌গুন্‌ (অব্যয়)** – মৃদু মধুর ধ্বনি। **মন্দ্রিত** – গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি – অনিঃশেষ জীবন ধারার জয়ধ্বনি অর্থে প্রযুক্ত।	

ভাবসংক্ষেপ

জ্যোতির্মণ্ডল থেকে চোখ সরিয়ে কবি এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ধূলিমাটি মাখা পৃথিবীতে। তাঁর চোখে পড়ে নদীর জলস্রোতের মতো যুগ যুগান্তর ধরে চলমান জনতার স্রোত। জীবনের প্রয়োজনে জন্ম-মৃত্যুর নিয়ম মেনে নিয়েই এ মানবজীবন-স্রোত চিরকাল ধরে প্রবহমান। সাধারণ শ্রমজীবী এ মানুষের চিরকাল ধরে দাঁড় টানে, হাল ধরে থাকে। ওরা কঠিন পরিশ্রমে জমি কর্ষণ করে বীজ বোনে, পাকা ফসল কাটে। শহরের কারখানায় আর গ্রামের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে ওরা কাজ করে। ভূষণ হিসেবে রাজার মাথায় ছায়া বিস্তার করে থাকে যে ছাতা, মর্যাদার স্মারক সেই 'রাজছত্র' ভেঙে পড়ে, স্তব্ধ হয়ে যায় যুদ্ধের জয়ঢাক, বিজয়ের স্মারকস্তম্ভ নিজের অর্থ হারিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাজবংশের বলদর্পী সশস্ত্র রাজাদের ভীতিসঞ্চারী আরক্ত চোখ শিশুপাঠ্য কাহিনীতে আত্মগোপন করে থাকে। তাদের বিজয়গাথা রূপকথার মতোই শিশুদের মনোরঞ্জনের খোরাক যোগায় মাত্র। কিন্তু এর বিপরীতে কর্মমুখর জনতার স্রোত যুগ যুগ ধরে জীবন্ত হয়ে আছে। মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিতে মুখরিত জনতার এ অবিশ্রাম স্রোতোধারা মানুষের অগ্রযাত্রার, তাদের বেঁচে থাকার মহামন্ত্রকে মন্ত্রিত করে তোলে। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপরে শাশ্বত শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা অটুট থাকে। মরণকে জয় করে ওরা, শ্রমজীবী মানুষেরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মাটির পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবি কী দেখেন?
২. বলদর্পী রাজাদের বিজয় কাহিনীর কী পরিণতি হয়েছে?
৩. 'জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে' - কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৪. অতীত রাজবংশসমূহের বিজয়ের স্মরণ চিহ্নগুলির বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।
৫. শ্রমজীবী মানুষ যুগ যুগ ধরে কীভাবে বেঁচে থাকে?

প্রশ্ন : বলদর্পী রাজাদের বিজয় কাহিনীর কী পরিণতি হয়েছে?

উত্তর : বিভিন্ন যুগে বলদর্পী রাজবংশগুলি ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিছু বস্তুগত কীর্তি স্থাপন করে অনাগত ভবিষ্যতেও যাতে তাদের বিজয়গাথা মানুষ স্মরণ রাখে তার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তারা। কিন্তু তারা জানতো না সময়স্রোতে পররাজ্যলোভীর প্রতাপ হারিয়ে যায়। শাশ্বত মানবাত্মা প্রচণ্ড ঘৃণাভরে তাদের প্রত্যাখ্যান করে। কবি এ মনোভাবকেই তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায় সময়স্রোতে রাজার মর্যাদা ও প্রতাপের চিহ্ন যে 'রাজছত্র' তা ভেঙে পড়ে, যুদ্ধের বিজয় দুন্দুভি স্তব্ধ হয়ে যায়, বিজয়কে চিরস্থায়ী করে তোলার মানসে তৈরি করা হয় যে 'জয়স্তম্ভ' তা নিজের অর্থ হারিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দর্পের প্রতাপের ও অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী, তাদের সশস্ত্র রক্তচক্ষু রূপ আত্মগোপন করে থাকে শিশুপাঠ্য বইয়ে। তাদের বিজয়গাথা রূপকথার মতো শিশুদের মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে থাকে মাত্র।

প্রশ্ন : 'জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে' - কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিজয়গর্বে গর্বিত মানুষ মনে করে তার কীর্তি বুঝি চিরস্থায়ী হবে। বলদর্পী ও পররাজ্যলোভী রাজবংশের রাজারা এ-ধারণা থেকেই ভবিষ্যতের মানুষের কাছে তাদের প্রতাপ ও বিজয়ের গাথা পৌঁছে দেয়ার বাসনায় প্রতিষ্ঠা করে

জয়স্তম্ভ। রাজহুমকির প্রতীক হয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে তাদের বল প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের কথা 'জয়স্তম্ভ' ঘোষণা করবে প্রতিনিয়ত, এ বিশ্বাস তাদের। কিন্তু তারা জানতো না যে, সময়স্রোতে অনেককিছুই ভেসে যায়। অক্ষুণ্ন থাকে যে শ্রমজীবনধারা সে ধারার মানুষ অত্যাচারের কাহিনীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। উত্তরকালে তাই বলদর্পীর বিজয়স্তম্ভ অর্থ বা মহিমা হারিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

২। রক্তমাথা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

৩। ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্রনদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবেবোম্বাই-গুজরাটে।

৪। গুর গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখসুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।

৫। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

নমুনা উত্তর

গুর গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখসুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।

উদ্ধৃত স্তবকটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে সংগৃহীত। আলোচ্য অংশে কবি মাটির পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে শ্রমজীবী জনতার স্রোতধারার মধ্যে মানবজীবনের 'মহামন্ত্রধ্বনি' শুনতে পেয়েছেন।

জ্যোতির্লোকে কোনো স্মরণচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি বলদর্পী রাজবংশগুলো। মাটির পৃথিবীতে যে সব জয়স্তম্ভ' প্রতিষ্ঠা করেছিলো তারা, সেগুলিও আজ নিজের অর্থ বিস্মৃত হয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে ধূলিমাটি মাখা পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে শ্রমজীবী জনতার কোলাহলময় স্রোত। কর্মমুখর চলায় শোনা যায় গম্ভীর মধুর গর্জন ও স্বর। তাদের চলার শব্দের এ গাম্ভীর্য ও মাধুর্য একসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দিনরাত্রির পরিক্রমাকে করে তুলেছে মুখরিত। দুঃখ ও সুখ মিশ্রিত দিবারাত্রির এ পরিক্রমায় ধ্বনিত বা মন্দ্রিত হয়ে উঠছে 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি'। মাটির পৃথিবীতে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু ঘটে কিন্তু জীবনধারা বা জীবনের বিস্তার কখনো স্তব্ধ হয় না- এ 'মহামন্ত্রধ্বনি শ্রমজীবী জনতার চলমানতায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়।

মাটির পৃথিবীতে শ্রমজীবী জনতার সচল যে স্রোত, তাতে ধ্বনিত হয় মানবাত্মার শাশ্বত অস্তিত্বের মহামন্ত্র।

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

আলোচ্য চরণদুটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতার অন্তর্গত। যুগ যুগ ধরে শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ-এর উপরে শাশ্বত অস্তিত্ব নিয়ে শ্রমজীবী মানুষ যে চির বর্তমান, কবির এ মনোভাবই আলোচ্য কবিতাংশে ব্যক্ত হয়েছে।

যুগে যুগে ভারতবর্ষের মাটিতে পররাজ্যলোভীরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বলদর্পী ঐ সব রাজবংশ কালের বুকে স্থায়ী কোনো স্মরণ চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। সময়ের স্রোতধারায় ভারতবর্ষের মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছে সাতসমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আসা ইংরেজ, স্মরণীয় ইতিহাস চেতনাই কবিকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, সারা দেশে সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করে দাঁড়ানো প্রতাপশালী ইংরাজরাও ভেসে যাবে অকালস্রোতে। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে যায় সম্রাটের স্মৃতিচিহ্নও। কালকে জয় করতে পারে কেবল শ্রমজীবী মানুষের অনিঃশেষ স্রোতধারা কবি তাঁর ইতিহাস অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্যে উন্নীত হয়েছেন যে, শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ এর উপরে বেঁচে আছে চিরকালীন শ্রমজীবী মানুষ; যারা দাঁড়টানে, হাল ধরে, বীজ বোনে, ফসল ফলায়। নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালবাচক পদ ব্যবহার করে তাদের এ চিরায়ত অস্তিত্বকেই মূর্ত করে কবি লিখেছেন "ওরা কাজ করে"।

বলদর্পী সাম্রাজ্যলোভীর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ ঐ ধ্বংসাবশেষ-এর উপরে দাঁড়িয়েই নিজের কর্মমুখর চিরায়ত অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'ওরা কাজ করে' কবিতার মূলভাব বিশ্লেষণ করুন।
২. 'ওরা কাজ করে' কবিতা অবলম্বনে কবির ইতিহাস চেতনা ব্যাখ্যা করুন।
৩. মানব অস্তিত্ব এবং মানুষের মধ্যকার সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।
৪. ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজশক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : 'ওরা কাজ করে' কবিতা অবলম্বনে কবির ইতিহাস চেতনা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বকীয় ইতিহাস চেতনা "ওরা কাজ করে" কবিতার এক বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজশক্তির হিংস্র মূর্তিতে পুনরুত্থানে শঙ্কিত হয়ে পড়েন মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ। মানুষের প্রতি অগাধ আস্থা যাঁর সাহিত্যসাধনার মূল প্রেরণা, সেই কবি ব্রিটিশ রাজশক্তির সাম্প্রতিক মানবতাবিরোধী আচরণে ক্ষুব্ধ হন। মানুষের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে চিড় ধরে। কিন্তু ইতিহাস চেতনাই কবিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে তাঁর বিশ্বাসের জগতে।

কবি ইতিহাস অধ্যয়ন করে জেনেছেন যে, যুগে যুগে দেশে-দেশে পররাজ্য লোভীরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু কোনো সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী রূপ লাভ করেনি। বিশাল মহাবিশ্বের বক্ষে প্রবহমান সময়স্রোতে সুকঠিন সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যশক্তি ভেসে গেছে। কবির এ অধীত জ্ঞানই তাঁকে এ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছে যে, বলদর্পী ইংরেজদের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত শাসন শৃঙ্খলও টুটে যাবে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, "কবি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টি দিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অতীতে কত রাজা ভারতে রাজত্ব করিতে আসিয়াছে, আসিয়াছে পাঠান, আসিয়াছে মোগল, তারপর ইংরেজ আসিয়া তাহার শক্তির তীব্র আলোকে সকলের চোখ বাঁধিয়া দিতেছে। কবি জানেন, পূর্বের বিজয়ী রাজা-বাদশাদের সাম্রাজ্যের মত তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, লোকের দৈনন্দিন জীবনে তাহাদের স্মৃতির অস্তিত্ব থাকিবে না। কালের নির্মম হাত হইতে কোন শক্তিমদমও সাম্রাজ্যলোভীর নিস্তার নাই – এক যুগের বহুজন শোষিত ঐশ্বর্য পরবর্তী যুগে ধ্বংস হইয়া যায়।" কবির এ বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দিয়েছে ধূলিমাটিমাথা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা। তিনি লক্ষ

করেছেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, তারা নগরে ও গ্রামে, মাঠে ও প্রান্তরে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবীকা নির্বাহ করছে, তারা চিরকাল ধরেই একইভাবে মানবজীবনধারাকে সচল রেখেছে। কবির ভাষায়

মাটির পৃথিবীপানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেখা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

মাটির পৃথিবীর এ তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সচল জীবন প্রত্যক্ষ করেই কবির ইতিহাসচেতনা পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। কবি লক্ষ করেছেন বলদর্পী সাম্রাজ্যলোভীর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ভেসে গেছে, ভেঙে পড়েছে রাজার প্রতাপের প্রতীক 'রাজছত্র' যুদ্ধের দুন্দুভি রাজার প্রতাপকে ধ্বনিত করে আর শঙ্কিত করে তোলে না সাধারণ মানুষকে। অথচ এরই বিপরীতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে যুগযুগ ধরে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের সহজ মানবপ্রীতিই তাঁকে করেছে আন্তরিক ও সংবেদনশীল। তিনি জনতার অবিশ্রাম স্রোতোধারায় তাই শুনতে পেয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের জীবনের মৃদু-গম্ভীর 'মহামন্ত্রধ্বনি'।
শত শত সাম্রাজ্যের 'ভগ্নশেষ'-এর উপরে বেঁচে আছে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ঐ মহামন্ত্রধ্বনি। কবির মানবপ্রীতি জাত এ ইতিহাস চেতনাই "ওরা কাজ করে" কবিতার ভাবজগৎ প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজশক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করুন।
উত্তর : "আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের "ওরা কাজ করে" কবিতায় জীবনের অন্তিম পর্বে অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মানবতাবিরোধী সংঘাতে বিচলিত কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত। বিশেষত ভারতবর্ষের মাটিতে উপনিবেশের জাল বিস্তার করে প্রবল প্রতাপ নিয়ে অবস্থান করছে যে ইংরেজরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ কবি চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। " ওরা কাজ করে" কবিতায় ভারতবর্ষে বলদর্পী ইংরেজদের অনুপ্রবেশ পর্বকে এভাবে চিত্রময় করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ :

আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

'ওরা কাজ করে' কবিতা রচনার প্রায় সমসময়ে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদী রূপ প্রত্যক্ষ করে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আশি বছরের দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথের মনে সুসভ্য ইংরেজদের জন্য সঞ্চিত ছিলো শ্রদ্ধা ও সম্মান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তাদের মানবতাধ্বংসী আচরণ তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থানটিতে ফাটল ধরায়। প্রথম জীবনে তাঁর ধারণা ছিলো এ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যেই বিজিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এ প্রত্যয় কবিকে হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে না। আশাবাদী কবি মানবীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। "ওরা কাজ করে" কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনাজাত ঐ আশাবাদী প্রত্যয়ই মূর্ত হয়েছে। কবি লিখেছেন—

'জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেভে সামাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।'

রবীন্দ্রনাথ "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে" 'অপরাধ' বলে মনে করেন বলেই দৃঢ়বিশ্বাসে বলতে পেয়েছেন, যে, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এ ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।" কবির এ দৃঢ়প্রত্যয়ই কাব্যরূপ পেয়েছে 'ওরা কাজ করে' কবিতায়। কবি বলেছেন অনন্ত মহাবিশ্বের প্রবহমান স্রোতে ভেসে যাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'দেশ বেড়া জাল'। অন্যান্য পররাজ্যলোভী' শক্তি যেমন চলমান সময়স্রোতে কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি, তেমনি ইংরেজদের প্রতাপের চিহ্নও 'জ্যোতিষ্কলোকের পথে' আঁকা থাকবেনা। বেঁচে থাকবে কেবল শাশ্বত মানবজীবন ধারা – শ্রমজীবী মানুসের প্রাণ-কোলাহলে যুগ যুগ ধরে এ জীবনধারা চিরবর্তমান। কারণ শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর সচল রয়েছে কেবল শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ যারা নগরে প্রান্তরে, দেশে দেশান্তরে, শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কাজ করে।

ভাষা বিষয়ক প্রশ্ন

সর্বনাম পদ : বিশেষ্য অথবা বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যাংশের পরিবর্তে বসানো চলে, এমন পদকে বলা হয় **সর্বনাম** বা প্রতিনাম। বাংলা সর্বনামের মধ্যে কিছু সর্বনাম কেবল প্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তেই বসে। তাদের প্রাণীবাচক সর্বনাম বলা হয়। যেমন : **ওরা কাজ করে** বাক্যের "ওরা" প্রাণীবাচক সর্বনাম পদ। বর্তমান কবিতায় "ওরা" এ সর্বনাম সহায় নির্দেশের ভঙ্গিতে নির্মম শ্রেণী পার্থক্য ব্যঞ্জিত করা হয়েছে।

নিত্যবৃত্ত বর্তমানকাল : নিয়মিত অথবা সাধারণত ঘটে, ক্রিয়ার এ-অবস্থা বোঝানোর জন্য কালের যে রূপ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় **নিত্যবৃত্ত বর্তমান** বা **সাধারণ বর্তমানকাল**। দৃষ্টান্ত **ওরা কাজ করে**। এখানে শ্রমজীবীদের নিয়মিত কাজ করা কেবল বর্তমানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলিয়ে কর্মের সঙ্গে তাদের নিত্য সংযোগের অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে।

সমাস : একাধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ তৈরির প্রসঙ্গকে বলা হয় সমাস। সমাসের শ্রেণীবিভাগ রযেছে। আলোচ্য "ওরা কাজ করে" কবিতায় রয়েছে সমাসবদ্ধপদের প্রাচুর্য। নিম্নে ব্যাসবাক্য এবং সমাসের নামসহ কবিতাটিতে ব্যবহৃত কিছু সমাসবদ্ধ পদ উল্লেখ করা হলো :

সময়ধারা	–	সময়ের ধারা	–	ষষ্ঠ তৎপুরুষ সমাস
ছায়া আঁকা	–	ছায়া দ্বারা আঁকা	–	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
লৌহবাঁধা	–	লৌহ দ্বারা বাঁধা	–	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
অনলনিশ্বাসী	–	অনল নিশ্বাস ছাড়ে যে	–	কর্মধারয় সমাস
রক্ত আঁখি	–	রক্ত রঞ্জিত আঁখি	–	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

সন্ধি : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি থাকা দুটি ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা লোপ হতে পারে। 'এরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে **সন্ধি** বলে'। যেমন আলোচ্য কবিতার 'জয়োদ্ধত' শব্দটি সন্ধির দৃষ্টান্ত – জয়+উদ্ধত = জয়োদ্ধত।

বিপরীতার্থক শব্দ : 'একটি শব্দ যে ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, অন্য একটি শব্দ, তার বিপরীত ভাব বা অর্থবোধক হলে, শব্দ দুটিকে পরস্পরের **বিপরীতার্থক শব্দ** বা **বিপরীত শব্দ** বলা হয়'। "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে কিছু শব্দ সংকলন করে এর উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো :

শব্দ	**বিপরীতার্থক শব্দ**

অলস – কর্মঠ
নির্মল – সমল
বিকীর্ণ – সংকীর্ণ
মূঢ় – বুদ্ধিমান
মুখর – নিথর

বিরাম চিহ্ন : লিখিত বাক্যে বিরাম বা ছেদ নির্দেশ করা যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম **বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন**। "ওরা কাজ করে" কবিতা থেকে দু'ধরনের বিরাম চিহ্ন ব্যাখ্যা করা হল।

ক) সূর্যোদয় – সূর্যাস্তের

'সূর্যোদয়' ও 'সূর্যাস্তের' মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সংযোগ রেখাটির নাম **হাইফেন**। হাইফেন ছেদচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। দুটি পদের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে বলে একে সংযোগ চিহ্নও বলা হয়।

খ) 'এসেছে মোগল'–
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা

'এসেছে মোগল'-এর পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রেখাচিহ্নটির (–) নাম ড্যাশ। এটি বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন। 'বক্তব্যকে ব্যাঘাত করা, উদাহরণের আগে, বক্তার সঙ্গে বক্তব্যকে যোগ করা প্রভৃতি বহুরকম ব্যবহার আছে এ চিহ্নের। উল্লিখিত তিনটি চরণে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়-র যোগ স্থাপনের কাজ রেখেছে 'ড্যাশ' চিহ্নটি।

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

- "ওরা কাজ করে" কবিতায় ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ পদগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
- কবিতা থেকে পাঁচটি শব্দ বাছাই করে প্রতিটি শব্দের তিনটি করে সমার্থ শব্দ উপস্থাপন করুন।
- 'ওরা মাঠে মাঠে
  বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।'
  এ চরণদুটির ক্রিয়াপদের 'কাল' নির্ণয় করুন।
- 'কৃষকের ধান কাটা' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ।

ছন্দ হিন্দোল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি পরিচিতি

কলকাতার কাছেই নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন কলকাতা শহরেই অতিবাহিত হয়।

অনেক বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যুৎপত্তি ছিল। পাণ্ডিত্যের একটি প্রবল ঝোঁক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের ছাপ অনেক কবিতার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে, তাঁর অনেক কবিতাই রস সঞ্চারের পরিবর্তে তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তখন আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয়ের বাইরেও একটি স্বতন্ত্র কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন; যে কারণে, তিনি বাংলা কাব্য জগতে সমাদৃত হয়ে আছেন। তাঁর কবিতা শব্দ নির্মাণ কৌশল, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

কবি তাঁর কবিতায় ইন্দ্রিয় লব্ধ যে সুন্দর, সুকুমার ও সূক্ষ্ম অনভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে কবিতাকে পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহ্য করে তোলেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে প্রায়ই তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। হৃদয়াবেগের চাইতে তিনি মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও চিন্তার প্রাধান্য বিস্তার করে কবিতা রচনা করতেন। ফলে, তার কবিতা অনেক ক্ষেত্রে তথ্য ও বুদ্ধির খেলায় ভারাক্রান্ত। কবিতায় তিনি চোখের দেখা ও কানের শোনা এ দুটির প্রতি অত্যধিক মাত্রায় খেয়াল রাখতেন। ফলে, তাঁর দেখার বস্তু ও শোনার বিষয়কে শব্দের অলংকারে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির ও জীবনের নানান রূপ তিনি যেমনটি দেখেন; ঠিক তেমনিভাবে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা গেঁথে কবিতার মালা নির্মাণ করেছেন। তার কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত গভীর অনুভূতি প্রকাশের অভাব থাকলেও রূপ ও ছন্দের অপূর্ব প্রকাশে তিনি প্রায় অদ্বিতীয়। তাঁর এ অসাধারণ নৈপূণ্যের জন্য তিনি ছান্দসিক কবি হিসাবে বাংলার কাব্য জগতে পরিচিত।

সাধারণ মানুষকে নানাভাবে তিনি তাঁর কবিতার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মমতা তৎকালীন বাংলা কাব্য জগতের একটি বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সাধারণ মানুষ যেমন তাঁর কাব্যের উপজীব্য; তেমনি আবার অতি সাধারণ দেশজ শব্দ, বিলুপ্ত প্রায় শব্দ ব্যবহার করে তিনি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বহু আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের প্রাণশক্তি আবিস্কারের অন্যতম কীর্তিমান কবি হিসাবে পরিচিতির স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য। শব্দের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দুর্বলতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করেছে। শুধু ছন্দ ও শব্দের আকর্ষণের কারণে অনাবশ্যক ও অযথা শব্দ প্রয়োগে কবিতাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনুবাদের পথিকৃৎ হিসাবে তিনি স্বীকৃত। তিনি আরবি, ফার্সি, চিনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি ও উপমহাদেশের বহুভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন। তীর্থরেণু, তীর্থ সলিল, ভুলের ফসল তার অন্যতম অনূদিত কাব্য গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে, সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, তীর্থ সলিল, তীর্থরেণু, ভুলের ফসল, কুহু ও কেকা, মণি -মঞ্জুষা, অভ্র আবীর, বেলা শেষের গান বিদায় আরতী প্রধান। তাঁর 'কাব্য সঞ্চয়ন' নামে একটি কবিতা সংগ্রহ আছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. বাংলা কাব্যসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান সম্পর্কে জানবেন।
২. কবির ভাষারীতি, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিতার বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ষার কলহাস্যময় পরিবেশকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দের তালে তালে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং দিগন্ত বিস্তারী সমুদ্র যেন অস্থির হয়ে ওঠে। বৃক্ষে, পুষ্পে, ঘাসে ঘাসে জলকণার বিন্দুর মাঝে বুঝি আনন্দ অশ্রুর খেলা। তাপদগ্ধ পৃথিবীর শুষ্কতা থেকে জলসিক্ত ধরনী যেন নবপ্রাণের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে। পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে যেন হাসির জোয়ার। খাল-বিল, নদী-নালা জল প্রবাহের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে থৈ থৈ ভাসমান মাঠ-ঘাট। বর্ষার রিম-ঝিম অবিরাম বর্ষণের মধ্যে যেন সুমধুর সুরের মুর্ছনা। সমগ্র বর্ষার রূপটিকেই কবি ছন্দোময় আনন্দের স্নিগ্ধ প্রকাশ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। আবছা আলোয় বর্ষার প্রাকৃতিক পরিবেশকে কবির কাছে মনে হয় যেন, প্রিয়ার কাজল কালো আঁখির মুগ্ধ চাহনি।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- এ পাঠটি পড়ে বর্ষার পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ পাঠে বর্ণিত বর্ষার চঞ্চল পরিবেশের কথা লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মুলপাঠ
মেঘ্‌লা – মেঘে ঢাকা, মেঘময় **ইন্দু** – চাঁদ **সিন্ধু** – সমুদ্র **হেম-কদম্ব** – সোনালী রং এর কদম ফুল **তৃণ-স্তম্ভে** – তৃণ বা ঘাসের ডাঁটা **হর্ষের** – আনন্দের, উৎফুল্লের **মৌন** – নীরব, নিঃশব্দ **মগ্ন** – বিভোর, তন্ময় **খঞ্জন** – চঞ্চল স্বভাবের এক প্রকার ছোট পাখি **মন্থন** – আলোড়ন, মথিত করা **অঞ্জন** – চোখের কাজল, সুর্মা **নেত্র** – চোখ **টিকা** *স্নিগ্ধ-অঞ্জন* – মসৃণ, মধুর কাজল যেন পৃথিবীর চোখে একে দেয়া হয়েছে বর্ষার রূপের মাধুর্য বোঝানোর জন্য।	মেঘ্‌লা থম্ থম্ সূর্য-ইন্দু ডুব্‌ল বাদ্‌লায় দুল্‌ল সিন্ধু! হেম্-কদম্বে তৃণ-স্তম্ভে ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রু বিন্দু! মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন, মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন! দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন!

ভাবসংক্ষেপ

মেঘ মেদুর আকাশে চন্দ্র-সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। তৃণ, পুষ্প, কদম্বের পাপড়িতে বর্ষার জল কণা যেন আনন্দের অশ্রুবিন্দু। সমুদ্র ও মেঘমালা নিয়ত আলোড়িত হচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা খঞ্জন পাখি নৃত্যরত। বর্ষার অনাবিল রূপে যেন মুগ্ধতার কাজল পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বর্ষার সমুদ্রের অবস্থা কী রূপ ধারণ করে?
২. বৃক্ষ ও পুষ্পে কী অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে?
৩. বর্ষার রূপ সম্বন্ধে এ দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলি নিজের কথায় লিখুন।
৪. বর্ষার আকাশের রূপ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : বর্ষার সমুদ্রের অবস্থা কী রূপ ধারণ করে?

উত্তর : বর্ষার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। মেঘ-তাড়িত বায়ুর আঘাতে সমুদ্র গর্জন করতে থাকে। উত্তাল সমুদ্রকে যেন বায়ু নিরন্তর মন্থনে অস্থির করে রাখে।

প্রশ্ন : বৃক্ষ ও পুষ্পে কী অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে?

উত্তর : ঘনঘোর বর্ষার বর্ষণে বৃক্ষের পাতা সিক্ত থাকে। বর্ষার বৃক্ষ যেন গাঢ় সবুজের ছোঁয়ায় অপরূপ রূপ ধারণ করে। ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা জল কণাকে যেন মনে হয় আনন্দের অশ্রু বিন্দু।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

মৌন নৃত্যে .....
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঙ্গন।

আলোচ্য অংশটি ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ছন্দ হিন্দোল" কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে।
বর্ষার প্রাকৃতিক রূপ পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তনের রূপ মাধুরীর বর্ণনা কবি এ প্রসঙ্গে প্রদান করেছেন। গ্রীষ্মের তাপ-শুষ্ক ভয়াল পরিবেশের পর বর্ষা তার সিগ্ধ বর্ষণের সিক্ততা নিয়ে আসে। প্রকৃতির সব কিছু যেন নিমেষে ছেয়ে ওঠে। আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। অবিরাম রিমঝিম সুরের মূর্চ্ছনায় অঝোরে বৃষ্টি নামে। চন্দ্র-সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যায়। নদী সমুদ্র ফুলে ওঠে। সমুদ্র বাতাসের তাড়নায় উত্তাল রূপ ধারণ করে। ফুলে, তৃণে বৃষ্টি বিন্দু ঝলমল করে। জলসিক্ত বৃষ্টি বিন্দুকে যেন আনন্দের অশ্রু বলে মনে হয়। খঞ্জন পাখি আনন্দ নৃত্যে মেতে ওঠে। প্রকৃতির বিচিত্র নয়ন জড়ানো রূপে যেন মুগ্ধ দৃষ্টির স্নিগ্ধ কাজল পরিয়ে দেয়া হয়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- গ্রীষ্মের পর বর্ষার আগমনের চিত্রটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ষার আনন্দের রূপটি আপনি কবিতার অনুসরণে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্ষার প্রাকৃতিক রূপের কথা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
চিত্তের-নন্দন – মনের আনন্দ **গৈরী** – পর্বত সম্ভূত (গৈরী নি:শ্বাস) **চন্দন** – বৃক্ষ বিশেষ, এ বৃক্ষের কাঠ সুগন্ধীযুক্ত **সান্দ্র** – অবিচ্ছিন্ন, ঘন **হর্ষ** – আনন্দ, পুলক **কল্লোল** – শব্দকারী তরঙ্গ, কলরব **হিল্লোল** – তরঙ্গ, দোলন **মঞ্জু** – সুন্দর, মনোহর	গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস। লাগছে গায়-কার গৈরী নিঃশ্বাস! চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিগ্‌পাশ। ভাসছে বিল খাল ভাস্‌ছে বিলকুল্‌! ঝাপসা ঝাপ্‌টায় হাস্‌ছে জুঁই ফুল! ধান্য শীষ্‌ তার কর্‌ছে বিস্তার– তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল! সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল! ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল! মূর্চ্ছে বীণ্‌ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার- মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিল্লোল!

ভাবসংক্ষেপ

গ্রীষ্মের দুঃসহ গরমের পর, প্রকৃতি শান্ত , শীতল, জলপ্রবাহের স্নিগ্ধতা নিয়ে উপস্থিত হয়। তাপদগ্ধ ধরনী যেন মেঘ মেদুর আকাশের সুশীতল বর্ষণে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। থৈ থৈ জলে খাল-বিল ভাসতে থাকে। ধানের শীষ জলের ওপর মাথা উঁচু করে অবিরাম দোল খায়।

প্রকৃতির চারিদিকে আনন্দের বান ডেকে যায়। বর্ষণের সুমধুর ধ্বনি যেন বীণার তারের ঝঙ্কার। ঝিল্লির অবিরাম গুঞ্জনে বুঝি সুরের সুষমায় ভরা মধুর ধ্বনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রীষ্মের পর বর্ষার আগমনে প্রকৃতি কী রূপ ধারণ করে?
২. বর্ষার আকাশ কেমন থাকে?
৩. 'মুর্চ্ছে বর্ষারছন্দ হিল্লোল' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৪. নিশ্বাস ও 'জুল্‌জুল' শব্দ দুইটির বিভিন্ন প্রয়োগে বাক্য লিখুন।
৫. নিম্ন লিখিত শব্দগুলি থেকে তদভব ও তৎসম শব্দসমূহ বাছাই করে লিখুন ঃ শাপলা, নিঃশেষ, ঝাপটা, ধান্য, বর্ষা, বন্যা, হর্ষ।

***প্রশ্ন :* গ্রীষ্মের পর বর্ষার আগমনে প্রকৃতি কী রূপ ধারণ করে?**

উত্তর : বর্ষা কালের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে। প্রকৃতি জুড়ে আসে আবছা আলো-আঁধারের খেলা। চন্দ্র-সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। চারিদিকে থমথমে ভাব ও মেঘের অবিরাম আনাগোনা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামে।

প্রশ্ন : বর্ষার আকাশ কেমন থাকে?

উত্তর : বর্ষার বর্ষণে একটি ছন্দোময় সুর আছে। ধরণীর পৃষ্ঠে, জলাধারে, ঘরের চালে, গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টি ফোটা অপরূপ ছন্দের মায়াজাল সৃষ্টি করে। একটানা বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের মাধুর্য মনোমুগ্ধকর। বর্ষার এ নিজস্ব সুরের ঝর্ণ ধারা প্রকৃতির বুকে ও দোলা লাগে। ঝিল্লির রব বর্ষার সুরধ্বনির সংগে মিশে একটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এমনি পরিবেশে বীণাকার ও বীণার তালে ঝংকার তোলেন; মনে হয় যেন যন্ত্র আর প্রকৃতি একই সুরে কথা কয়। বর্ষার প্রকৃতির মধ্যেই যেন ছন্দের এক সঙ্গীতময় দোলার লয় বিদ্যমান।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'ছন্দ-হিন্দোল' কবিতায় অংকিত বর্ষার রূপ নিজের ভাষায় লিখুন।
২. 'ছন্দ-হিন্দোল' কবিতার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

প্রশ্ন : ছন্দ-হিন্দোল' কবিতায় অংকিত বর্ষার রূপ নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে বর্ষা একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। ফলে এদেশের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকের রচনায় বর্ষা ঋতুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আলোচ্য কবিতায় শব্দ ও ধ্বনির বিচিত্র প্রকাশে বর্ষার এক মায়াময় চিত্র অংকন করেছেন।

বর্ষার এদেশের মানুষের কাছে বহু প্রত্যাশিত ঋতু। প্রকৃতি তার চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আসে। সে পরিবর্তনের আকাশ মানুষের মনে ও সাড়া জাগায় - আনন্দ বিলায়।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদগ্ধ মেঘহীন আকাশ বর্ষার আগমনে উধাও হয়ে যায়। ঘন আঁধার করে আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। জলশূন্য উত্তপ্ত ধরনী বৃষ্টির স্পর্শে সিক্ত হয়ে ওঠে। খাল-বিল, নদী-নালা জলের তোড়ে ভাসতে থাকে। মেঘে ঘেষে চন্দ্র সূর্য ঢাকা পড়ে। চারিদিকে থম থমে ভাব। গুরু গুরু মেঘের গুঞ্জন। মেঘেরা উড়ে যায় পাহাড়ী বাতাসের হালকা আমেজে। দুগ্ধ ধবল সৃষ্টির ধারা চন্দনের মত স্নিগ্ধ।

বর্ষার সমস্ত প্রকৃতির গায়ে সজীবতার আভাস লাগে। সবুজ, সতেজ তৃণ, বৃক্ষ, পাতা, মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কদম ফুলের সোনালি পাপড়িতে জমে থাকা জলকণা যেন সদাহাস্য ময়। অবিরাম বৃষ্টির ধারায় প্রকৃতি মধুর রূপ ধারণ করে। বৃষ্টির মধুর স্পন্দনে হৃদয় পুলকিত হয়; স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে জুঁইফুল হেসে ওঠে।

বর্ষার আগমনে খাল-বিল জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন পৃথিবীর জলের ওপরে ভাসমান। মাঠ-ঘাট বন্যার জলে একাকার হয়ে যায়; ধানের শীষগুলো কখনো ভাসে, কখনো বা ডুবে যায়।

বর্ষার ঘন ঘোর অবিরাম বর্ষণে মানুষের মনে ও প্রভাব বিস্তার করে। অঝোরে বর্ষার নিবিড়তায় প্রকৃতি যেন একাকার হয়ে যায়। ঝিল্লির মধুর গুঞ্জনে পরিবেশ যেন মুখর হয়ে ওঠে। বীণাকার তার বীনায় ঝংকার তোলে - সেই সুর লহরীর মাধুর্য যেন বর্ষার প্রকৃতির সংগে একাকার হয়ে এক মোহময় আবেশ সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক. গ্রীষ্ম নিঃশেষ ..... ভাসছে দিগ্‌পাশ।

আলোচ্য কবিতাংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ হিন্দোল' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
গ্রীষ্মের অবসানে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের চিত্র এখানে বিধৃত হয়েছে।
শুষ্ক, শূন্যতা আর দাবদাহের ঋতু গ্রীষ্ম। জলশূন্য খাল-বিল যেন এক রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। চারিদিকে উদাস করা হাহাকার। এমন সময়ে বর্ষা আসে জলভরা মেঘের শীতল ছায়া নিয়ে। জলশূন্য মাঠ-ঘাট, খাল-বিল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্ষণসিক্ত প্রকৃতি স্নিগ্ধতায় শিহরণে আনন্দে উদ্বেল হয়। চন্দন চর্চিত স্নিগ্ধ মাধুর্যের ছোঁয়া লাগে বাদলের ধারায়। মানুষের মনেও বর্ষণ মুখর প্রকৃতির দোলায় আবেশ সৃষ্টি করে।

খ. সান্দ্র বর্ষণ ..... ছন্দ হিল্লোল।

সৃজনশীল কাজ

১. আপনার দেখা বর্ষা ঋতুর বর্ণনা লিখুন।
২. একটি বৃষ্টি মুখর দিন সম্বন্ধে নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. বর্ষায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওপর একটি রচনা লিখুন।
৪. বর্ষা আমাদের জীবনে যেন আশীর্বাদ স্বরূপ; তেমনি আবার অভিশাপ বয়ে আনে। - এ সম্বন্ধে আপনার মতামতসহ একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের "আষাঢ়" কবিতাটি পাঠ করুন। কবিতাটি ক্ষণিকা কাব্যের অন্তর্গত।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্য কবিতা সংগ্রহ করে পড়ুন।

খেয়া-পারের তরণী

কাজী নজরুল ইসলাম

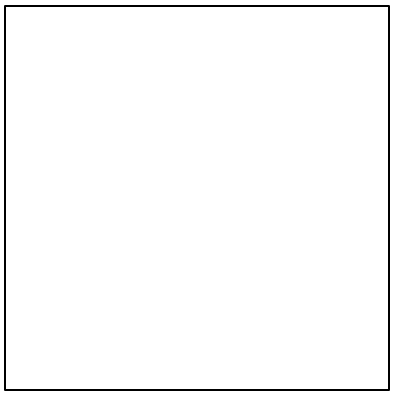

কবি পরিচিতি

কাজী নজুরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন।

নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দু'জনকেই হারান। শৈশব থেকে দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে তিনি আকৃষ্ট হননি। স্কুল পালিয়ে কিছুকাল গ্রাম্য 'লেটো' গানের দলে কবিয়ালী করেছেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কাউকে কিছু না বলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে করাচীতে চলে যান।

যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এ সময় তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিখ্যাতি তখন থেকেই বিস্তৃত হতে থাকে। পরাধীনতার গ্লানি এবং শাসক শোষকদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদের কারণে কারাবরণ করেন। এ কারণেই বিদ্রোহী কবি হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হন।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ মূলত কবি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি যখন মধ্যগগণে তখনই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে আপন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়েছেন। তিনি সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। সেই সঙ্গে রাজনীতিকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক অত্যাচারী ইংরেজদের শাসন এবং শোষণকে কাব্যরূপ দিয়ে নিজেকে বিদ্রোহী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। তাঁর প্রধান প্রধান রচনাবলীর কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, দোলন চাঁপা, চক্রবাক, ছায়ানট প্রভৃতি।

গল্প ও উপন্যাস : ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলী মালা, বাঁধনহারা, কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধা।

প্রবন্ধ : যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, কাব্যে আমপারা।

গান ও স্বরলিপি : বুলবুল ১ম ও ২য় খণ্ড, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, সুরসাকী, জুলফিকার, বনগীতি, গুলবাগিচা, গানের মালা, গীতি শতদল, নজরুল গীতিকা, নজরুল স্বরলিপি, স্বরলিপি প্রভৃতি।

পত্রিকা সম্পাদন : দৈনিক নবযুগ, ধুমকেতু, লাঙ্গল প্রভৃতি।

নজুরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ভূমিকা

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২৩) থেকে 'খেয়া পারের তরণী' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি রচনার পেছনে একটি প্রেরণা কাজ করেছে। ঢাকার নবাব পরিবারের একজন মহিলা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় একটি ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ছবির বিষয়বস্তু ছিল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে একটি নৌকা এগিয়ে চলেছে, যার চারটি দাঁড়ের মাথায় ইসলামের চার খলীফার নাম এবং হালের মাথায় ও পালে হযরত মুহম্মদ (স) এর নামসহ 'শাফায়াৎ' শব্দটি লেখা ছিল। এ ছবিটিই কবিকে কবিতাটি লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।
কবিতাটিতে একই সঙ্গে তৎসম এবং আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর লেখায় হিন্দু পুরাণ ও মুসলিম ঐতিহ্য পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. ধর্মীয় আদর্শকে বাংলা কবিতায় ব্যবহারের নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন।
৩. নজরুলের কবিতায় শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দুর্যোগপূর্ণ রাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- খেয়াপারাপার এবং কেয়ামত রাতের প্রকৃত অর্থ এবং রূপক অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খেয়াপারের পাপী যাত্রীদের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
খেয়াপারের তরণী – নদী পারাপারের নৌকা **রাত্তিরে** – রাত্রে। ছন্দের কারণে রাত্তিরে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। **বজ্রেরি** – বজ্রপাতের। সংস্কৃত শব্দ। **তূর্যে** – ভারতের প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। এখানে বজ্রপাতের শব্দ। **গর্জিছে** – গর্জন করছে। সাধারণভাবে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়না কিন্তু কবিতায় করা যায়। **প্রলয়** – সৃষ্টির বিনাশ। সম্পূর্ণ ধ্বংস। **বিষাণ** – শিঙ্গা। সং **ঝঞ্ঝা** – প্রবল ঝড়বৃষ্টি। **ঘন দেয়া** – ঘন মেঘ। **স্বনিল** –শব্দ করল। (স্বন+ইল) সং **ঈশান** – উত্তর-পূর্বকোণ। **পাপ-সিন্ধু** – পাপের সমুদ্র। পাপ রূপ সিন্ধু রূপক কর্মধারয় সমাস।	যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার, বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার? প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে? ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে! নাচে পাপ-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গ! মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ! নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে! তমসাবৃতা ঘোর 'কিয়ামত' রাত্রি, খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী! দমকি' দমকি' দেয়া হাঁকে, কাঁপে দামিনী, শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী!

তুঙ্গ – উচু। সং

তরঙ্গ – ঢেউ। সং

মহানিশা – মহারাত্রি। অন্ধকারের গাঢ়তা বোঝাবার জন্য নিশার পূর্বে মহা বিশেষণটি যোগ করা হয়েছে।

সিন্ধু – সমুদ্র।

রুদ্র – প্রকৃত অর্থ শিবের ভয়াবহরূপ। এখানে ঝড়ের ভীষণ রূপ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

নিশাচর – রাতে যেসব প্রাণী বিচরণ করে।

গ্রাসে – গিলে ফেলে।

মহাবিশ্ব – বিশাল পৃথিবী।

ত্রাসে – ভয়ে।

নিঃস্বে – সম্বলহীন।

তমসাবৃত – (তমস+আবৃত) তমস শব্দের অর্থ অন্ধকার। আবৃত-আচ্ছন্ন।

দমকি্ দমকি – থেকে থেমে।

শিঙ্গা – ইসলাম ধর্মমতে ফেরেশ্তা ইস্রাফিল (আঃ) সৃষ্টির প্রথম দিন শিঙ্গা বাজিয়েছিলেন। শিঙ্গা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পেলেই আবার যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, সেদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে কেয়ামত রাত বোঝাবার জন্য শিঙ্গা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হুঙ্কার – গর্জন করা।

যামিনী – রাত।

কেয়ামত

ইসলাম ধর্মমতে পৃথিবী যেদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হবে, সেই দিনকেই কেয়ামত বলা হয়। এটি একটি আরবি শব্দ।

যাত্রী

সাধারণ অর্থে কোথাও যাবার জন্য যারা গমন করে তাদেরকে যাত্রী বলে।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র - ঝড়ে উত্তাল সমুদ্র।

খেয়া পারের তরণী

সাধারণ অর্থে যে নৌকা নদীর এপার থেকে ওপারে যাত্রী পারাপার করে। এখানে ইহকাল বা পৃথিবীর জীবন থেকে পরকালে যাবার মাধ্যম হিসেবে ইসলাম ধর্মকে খেয়া পারের তরণী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ পার্থিব জীবন যেন নানা বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ একটি মহাসমুদ্র। এ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেহেশতে যাবার রাস্তা তৈরি করাই মানব জীবনের লক্ষ্য। ধর্মরূপ তরণী হল সেই পারাপারের মাধ্যম।

ভাবসংক্ষেপ

অন্ধকার প্রলয়ের রাতে যাত্রীরা খেয়াপার হতে এসেছে। কিন্তু সমুদ্রের ভয়ঙ্কর উত্তাল অবস্থা দেখে পাপী যাত্রীরা ভীত হয়ে আশঙ্কা করছে। যে কোন সময় এ তরণীটি ডুবে যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। *যাত্রীরা কখন খেয়াপার হতে এসেছিল? সমুদ্রের অবস্থা তখন কেমন ছিল?*

২। কবি এখানে কেয়ামত রাত্রির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : খেয়াপারের তরণী কবি নজরুল ইসলামের একটি রূপক কবিতা। আমরা জানি রূপক কবিতা একই সাথে দু'টি অর্থ বহন করে। এখানে কবি মুসলিম জাতির বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কারণ খুঁজতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেই প্রধান রূপে চিহ্নিত করেছেন। কবি এখানে সাধারণ অর্থে ইসলাম ধর্মমতে কেয়ামত রাত্রি পাপীদের কাছে কেমন ভয়াবহ হবে সেই চিত্র বিষয় অনুসারে শব্দ ব্যবহার করে সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন।

যাত্রীরা রাত্রিবেলা খেয়াপারের জন্য উপকূল ভূমিতে সমবেত হয়েছে। কিন্তু তখন ঈশান কোণে প্রগাঢ় মেঘ জমেছে। প্রবল বেগে বাতাস বইছে এবং অবিরাম বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো সিংহের গর্জনের মত উপকূলে আছড়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন হিন্দুদের দেবতা শিব তার প্রলয় নৃত্য শুরু করেছেন। এ বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস করাই এখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইস্রাফিল অচিরেই যেন তাঁর মহাশিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জগতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছেন। পাপী তাপী যাত্রীরা সমুদ্রের এ ভয়াবহ রূপ দেখে শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়েছে।

বজ্রপাতের সঙ্গে বিদ্যুতের চমক, সমুদ্রের গর্জনে কম্পিত পৃথিবী, বাতাসের গর্জনে সমস্ত কিছু যেন কেয়ামত রাতকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। পাপীরাই কেয়ামতকে ভয়াবহরূপে প্রত্যক্ষ করবে। কারণ তাদের জীবনপথে পাথেয় যে ধর্মপথে থেকে পুণ্যসঞ্চয় তা তাদের নেই। তাই খেয়াপারের জন্য মনোবলের দরকার তাও তাদের নেই। লেখক এ পৃথিবীকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন। কবির ধারণা ইসলামের পথ থেকে আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণেই মুসলিম জাতি আজ দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছে। কেয়ামত রাত্রির রূপকের আড়ালে কবির এ বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে।

৩. দুর্যোগপূর্ণ রাত সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটিপড়ে আপনি-

- পুণ্য পথের যাত্রীরা কেন ভয়ঙ্কর ঝড়েও সমুদ্রকে ভয় পাচ্ছে না, তার কারণ লিখতে পারবেন।
- এ তরণীর মাঝি এবং দাঁড়ী কারা তাঁদের নাম লিখতে পারবেন।
- তরণীটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছালে কারা এবং কেমন করে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাবে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
লঙ্ঘি – পার হয়ে। **নির্ভীক চিত্তে** – ভয়হীন হৃদয়ে। **জলধি** – সমুদ্র। তৎসম শব্দ। **ভৈরব** – হিন্দুদের দেবতা। শিবের ভয়ঙ্কর মূর্তি। এখানে ভীষণ অর্থে ব্যবহৃত	লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে– অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!

হয়েছে। তৎসম (ভীরু+অ) = ভীরুদের আশঙ্কাস্থল।

ডঙ্কা – যুদ্ধে জয়ের ঢাক।, তৎসম।

ওঙ্কার – হিন্দুদের দেবতা ব্রহ্মার শব্দ-প্রতীক। হিন্দু ধর্মের লোকেরা এ মন্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরের আরাধনা করেন।

তর্জন – ক্রোধ।

পুণ্যপথ – পাপহীন, পবিত্র পথ।

বর্ম – অস্ত্রের আঘাত থেকে শরীর রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরার আবরণ বিশেষ।

দিল – হৃদয়। ফার্সি শব্দ।

সাফ – পরিষ্কার। ফার্সি শব্দ।

নিপাত – পতিত।

কাণ্ডারী – চালক, মাঝি, নেতা আহমদ – ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স)। আরবি শব্দ।

পাথেয় – পথের সম্বল।

সারিগান – নৌকার মাঝিরা সারি বেধে বসে বৈঠার তালে তালে যে গান করে আর নৌকা চালায়।

লা-শরীক আল্লাহ – আল্লাহর কোন শরীক বা অংশীদার নাই অর্থাৎ আল্লাহ এক।

শাফায়াত – সুপারিশ করা। এটি আরবি শব্দ।

মাস্তুল – পালের স্তম্ভ।

জান্নাত – স্বর্গ, বেহেশত; আরবি শব্দ।

হুরী – বেহেশত বাসিনী সুন্দরী, স্বর্গের অপ্সরী। আরবি।

শির – মস্তক, মাথা আরবি।

মঙ্গল-দাত্রী – কল্যাণ দায়িনী।

টীকা

আবু বকর

মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী। ইসলামের সেবায়, দান দাক্ষিণ্যে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

ওমর

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। ন্যায়বিচার, প্রজার বাৎসল্য, সুশাসন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য সকল মানুষের জন্য তিনি আদর্শ।

উসমান

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা।

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;
কাণ্ডারী আহ্মদ, তরী ভরা পাথেয়!

আবুবকর উসমান ওমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ্!

'শাফায়ত' -পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

আলী
মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জামাতা। শক্তিশালী সাহসী যোদ্ধা। তাঁর উপাধি ছিল হায়দার বা তরবারি।

দাঁড়ী যে এ তরণীর
এ খেয়া নৌকাটির দাঁড়ী হলেন ইসলামের প্রথম চার খলীফা। এ কারণেই নৌকার যাত্রীরা নির্ভীক। কবি এখানে ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাসকে কাব্যরূপ দিয়ে অভয় দিচ্ছেন– নব জাগরণের অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন।

কাণ্ডারী
মাঝি, নেতা। এ পুণ্য তরীর নেতা আহ্মদ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (স) এর মাঝি।

ভাবসংক্ষেপ

ঝড় এবং বজ্রপাতে মুখর উত্তাল সমুদ্রের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে একটি নৌকা দ্রুতবেগে পার হয়ে যাচ্ছে। এ নৌকার চালক স্বয়ং হয়রত মুহম্মদ (স) এবং দাঁড়িরা হলেন ইসলামের চার খলীফা। এ নৌকার মাস্তুলে লেখা আছে 'শাফায়ত' অর্থাৎ শেষনবী এ নৌকার যাত্রীদের জন্য সুপারিশ করছেন। বেহেশ্তবাসী কল্যাণকামী হুরীরা তাই এ নৌকার ওপর পুস্পবৃষ্টি করছেন। দাঁড়িরা আল্লাহর বাণী 'লা-শরিক আল্লাহ' সারিগানের মত গাইতে গাইতে অবশেষে নির্ভয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. একটি তরণী কেমন করে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে?
২. 'কাণ্ডারী আহমদ' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৩. এ তরণীর মাঝি এবং দাঁড়ী কারা?
৪. তরণীটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছুলে কারা এবং কেমন করে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাল?

২. পুণ্য পথের যাত্রীরা কেন প্রলয়ের রাতকে ভয় পাননি?

উত্তর : ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও একটি নৌকা তর তর করে এগিয়ে চলেছে। নৌকার যাত্রীরা শত বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকেরও ভীত নয়। কেননা তারা ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার একত্বে বিশ্বাসী মহানবী (স) প্রদর্শিত পথই তাদের পথ। ধর্মের বর্মে তারা তাদের আত্মাকে আবৃত রেখেছে, কলুষিত হতে দেয়নি। কবি মনে করেন উত্তাল সমুদ্রের রূপ পৃথিবীর সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তারাই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে যারা কোরআনের নির্দেশিত পথে চলেছে। এ পথের পথ প্রদর্শক স্বয়ং মহানবী (স) তাঁর সহযোগরা হলেন ইসলামের চার খলীফা হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী। পুণ্যপথের যাত্রীরা তাই প্রলয়ের রাতকে ভয় পাননি।

এখানে উত্তাল সমুদ্র হিসাবে ইহলৌকিক বা পার্থিব জীবনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইহজগতে চলার জন্য ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন পথ নেই। এ নিরাশাগ্রস্ত পথহারা মুসলিম জাতির চেতনায় কবি এ অভয় মন্ত্র সৃষ্টির প্রেরণায় পুণ্যাবানদের তরণীর রূপকটি চিত্রিত করেছেন।

৪. এ তরণীর মাঝি এবং দাঁড়ী কারা?

উত্তর : এ পুণ্য তরণীর মাঝি আহ্মদ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (স)। আর বই তরণীর দাঁড়ি হলেন ইসলামের চার খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী। এ কারণেই নৌকার যাত্রীরা নির্ভীক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "খেয়া পারের তরণী' কবিতার মূল ভাববস্তু লিখুন।
২. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় কবি রূপকের মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৩. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম এবং আরবি-ফার্সি শব্দগুলো চিহ্নিত করুন।
৪. সমুদ্র এবং রাত্রির প্রতিশব্দগুলো লিখুন।
৫. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন :
   ক) নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে
      ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।
   খ) তমসাবৃতা ঘোর কিয়ামত রাত্রি,
      খেয়াপারে আশা নাই ডুবিলরে যাত্রী।
   গ) পুণ্য পথের এযে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
      ধর্মেরি বর্মে সুরক্ষিত দিল্সাফ্।
   ঘ) কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা,
      দাঁড়ি মুখে সারি গান - লা শরীক আল্লাহ্।
   ঙ) 'শাফায়াত'- পাল বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
      'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।

প্রশ্ন : 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতার মূল ভাববস্তু লিখুন।

উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়া-পারের তরণী' ইসলামি উজ্জীবনের ধারায় লিখিত একটি রূপক কবিতা। কবি ইসলামপন্থী ও ইসলাম বিরোধীদের পরিণতি সম্পর্কে কবিতাটিতে আলোকপাত করেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে কবিতায় 'খেয়া-পারের নৌকা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে, উত্তাল সমুদ্র, ঈশানকোণে ঘনমেঘ জমেছে। ভয়াবহ এ ঝড়ের রাতে যাত্রীরা এসেছে খেয়া পারের আশায়। কিন্তু প্রকৃতির এ ভয়াবহ রূপ দেখে তারা ভীত। পাপাত্মাদের হাহাকারে বিশ্বচরাচর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। পাপীযাত্রীরা এ ভয়াবহ সমুদ্র পাড়ি দেবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে একটি তরণীর যাত্রীরা এ উত্তাল সমুদ্র, বজ্রপাত, বিদ্যুৎচমক এবং ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যদিয়ে দ্রুতবেগে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ পুণ্য বানযাত্রীদের পথ প্রদর্শক স্বয়ং মহানবী (স) এবং তাঁর সহযোগী ইসলামের চার খলীফা। তাই এ তরণী সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামের আলোয় যাদের জীবন দীপ্তিময়, যাদের মুখে রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর নাম, তারা কোনো কিছুকে ভয় পাননা। অপরপক্ষে ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে যারা বঞ্চিত তাদের ভয়াবহ পরিণতি কবিতায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

'খেয়া-পারের তরণী' একটি রূপক ধর্মী কবিতা। কবি এখানে উত্তাল সমুদ্র হিসেবে ইহলৌকিক জীবনকে চিহ্নিত করেছেন। এ সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য অর্থাৎ ইহজগতে চলার জন্য ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন পথ নেই। কবিতার মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ইসলাম প্রদর্শিত পথই মুসলমান জাতির অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফিরে পাবার একমাত্র পথ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নিঃশেষ নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।

আলোচ্য অংশটুকু কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে কবি মহাবিশ্বের সমগ্র পাপী সমাজের করুণ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন।
এ পৃথিবীতে যারা ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত তাদের কাছে কেয়ামত ভয়ঙ্কর রাত হিসেবে দেখা দেবে। মিথ্যা, অসত্য, অন্যায় ও অনাচার মানব জীবনকে শুধু আচ্ছন্নই করেনি, তাদের যাত্রাপথকে করেছে স্তব্ধ। চারদিকে পাপের আবেষ্টনী থেকে মানুষ মুক্তি চায়। পাপ সিন্ধুর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ রূপ রুদ্র কালরাত্রি মানুষকে মহা সঙ্কট ও ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কবি মনে করেন নিশাচর হিংস্র প্রাণীরা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। এ দুর্যোগপূর্ণ দুর্দিনে পাপীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। প্রলয় সমুদ্র অতিক্রম করে আত্মরক্ষার পথ পাপীরা খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ পাপ সমুদ্র পাড়ি দেয়া পাপীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পাপাত্মারূপ যাত্রী নৌকাটির ধ্বংস অনিবার্য।
দিক্‌দিগন্ত বজ্রণী বিদ্যুতের গর্জনে কম্পমান। নিশাচর প্রাণীরা যেন নিমেষেই সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। এমনই মুহূর্তে পাপীদের পারাপারের কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ শেষ পারাপারের জন্য কোন পুণ্য তারা সঞ্চয় করেনি। পাপী যাত্রীরা তাই মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কাঁপছে।

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান- লা শরীক আল্লাহ্।

আলোচ্য অংশটুকু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ যে ইসলাম সে কথাটিই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।
ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঘোর দুর্যোগময় রাত। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী এ পাপ-সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ। আকাশে বজ্রপাতের বিকট শব্দ। পাপীদের নৌকা সে সমুদ্রের ডোবার আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে যার ইসলাম প্রদর্শিত পথে জীবন কাটিয়েছে তারা নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে। কারণ এ খেয়াতরীর মাঝি হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স) স্বয়ং। এছাড়া এ তরীর দাঁড়িরা হলেন ইসলামের চারজন শ্রেষ্ঠ খলীফা। দাঁড়িদের মুখে আল্লাহর বাণী 'লা-শরিক আল্লাহ' সারী গানের মত উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে পাপ সমুদ্র, দাঁড়ি, মাঝিমাল্লা, কাণ্ডারী প্রভৃতি রূপকের মাধ্যমে কবি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল মানব জাতি যদি রসুলের নির্দেশ ও খলীফাগণের আদর্শকে নিজ জীবনে অনুসরণ করেন তবে ইহকাল ও পরকালে তাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার
একই ব্যঞ্জন ধ্বনি বার বার ব্যবহার করলে তাকে অনুপ্রাস বলে। এটি একটি শব্দালঙ্কার। এখানে 'ত' এবং 'র' একাধিক বার ব্যবহার করার ফলে ছন্দে একটি আলাদা দোলা সৃষ্টি হয়েছে।
আপনি দেখুন কবিতাটিতে এ অলঙ্কার আরও আছে কিনা। থাকলে তা চিহ্নিত করুন।
২। এ কবিতায় বহু তৎসম এবং বিদেশী শব্দের ব্যবহার রয়েছে। আপনি সেগুলো নিচের অংশে লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন কাব্য। এগুলো পাবেন নজরুল রচনাবলীতে।

কবর

জসীমউদ্‌দীন

কবি পরিচিতি

ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৩ সালের পয়লা জানুয়ারি কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্ম হয়। পিতার নাম মৌলভী আনসারউদ্‌দীন। ১৯২৩ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ এবং বি.এ পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন ১৯৩১ সালে। বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন 'কবর' কবিতা। আর এ কবিতাই তাঁকে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই 'কবর' ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বাঙলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই জন্য তাঁকে বলা হয় পল্লী কবি। নজরুল ইসলামের পর জসীম উদ্‌দীনই মুসলিম কবি হিসেবে ব্যাপক খ্যাতির সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি গান নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। কর্মজীবন শুরু করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক হিসেবে। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করেন। 'রাখালী' তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এতেই 'কবর' স্থান পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কবি জসীম উদ্‌দীনের কয়েকটি বিখ্যাত রচনার নাম :

কাব্যগ্রন্থ : নকসী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩), মাটির কান্না (১৯৫১)।

নাটক : পদ্মাপার (১৯৫০), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মায়া (১৯৫৯)।

গদ্যরচনা : বাঙালির হাসির গল্প (১৯৬০), জীবন কথা (১৯৬৪), জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫)।

ভূমিকা

জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' থেকে 'কবর' কবিতাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কবিতাটি কাহিনীধর্মী। বুড়ো দাদু তার একমাত্র পৌত্রের কাছে নিজের জীবনের গল্প বলছেন। এ গল্পের করুণ সজল বর্ণনা পাঠককে ব্যথিত করে। সহজ সরল ভাষায় দাদু প্রথমে স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, তাঁদের সুখের সংসার জীবনের কথা বলেছেন। তারপর একে একে বর্ণনা করেছেন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী এবং কনিষ্ঠ কন্যার মৃত্যুর ঘটনা। এক সময় ছিলো তাঁর সোনার সংসার। ছিলো মায়ার বন্ধনে সকলে বাঁধা। এখন সবই বুক ভেঙে যাওয়া স্মৃতি। মৃত্যুর শেষ চিহ্ন কবরগুলো দেখে বৃদ্ধের দিন কাটে। মনে পড়ে সুখের দিনের কতো কথা। মনে পড়ে প্রিয়জনদের শেষ কথাগুলো। কৃষক পরিবারের জোয়াল, লাঙল, বলদ, মাথালের নামগুলো কবিতায় এমন ভাবে উচ্চারিত হয়েছে যে মনে হয় ওগুলো পর্যন্ত চোখের পানিতে ভিজে আছে। কাহিনী বলতে গিয়ে সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করে যে চিত্র কবি এঁকেছেন তা পড়ার সময় করুণ বেদনায় পাঠকের চোখও হয়ে ওঠে অশ্রু সজল। এখানেই কবির সার্থকতা। পাঠককে খুব সহজেই তিনি বৃদ্ধের সমব্যথী করে তুলেছেন। মনে হয় ডালিম গাছের ছায়া-ঘেরা সাধারণ মাটির কবরের পাশে বসে শোকাতুর হচ্ছে শ্রোতারা। 'কবর' কবিতার হৃদয় ছোঁয়া আবেদন আজো তাই অম্লান হয়ে আছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কবি জসীমউদদীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।

২. সহজ-সরল কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দাদুর বেদনা ও কষ্টের কারণ জানতে এবং তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- দাদুর বর্ণনা থেকে দাদির চরিত্র বুঝতে ও লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
সোনালী ঊষা – সূর্য ওঠার আগে আকাশের পূর্বদিকে যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে তাকেই কবি সোনালী ঊষা বলছেন। ঊষাকাল হলো সূর্য ওঠার আগের সময়টুকু।	এখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে, তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক। এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা, সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা। সোনালী উষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি। যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত এ কথা লইয়া ভাবি সাব মোরে তামাশা করিত শত। এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
সোনারমুখ – সোনালী ঊষার মতো সুন্দর রঙভরা মুখ বা চেহারা।	
দেড়ী – দেড় সের।	
গাঁটে – কোমরে।	
বাটে – পথে।	
নথ – নাকের অলঙ্কার/গহনা।	
দোয়া মাঙ দাদু – দোয়া চাও দাদু।	বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা "আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ" শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী, পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরী। দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে, সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে! হেস না– হেস না– শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে, দাদী যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে! নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া "এতদিন পরে এলে,
তরেতে – জন্য।	
ভেস্ত – বেহেশত।	
নাজেল – নেমে আসা।	
কাফন – মৃতের পোশাক।	
গাড়িয়া – পুঁতে দেয়া।	
নাওয়ায়ে – ভিজিয়ে।	

	পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।” আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়, কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়! হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়, আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়। তারপর এই শূন্য জীবনের যত কাটিয়াছি পাড়ি যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি। শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি, গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি। এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে, গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে। মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক, আয়– আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

ভাবসংক্ষেপ

বুড়ো দাদু নাতির কাছে তার জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন। যে ডালিম গাছের নিচে বুড়োর স্ত্রীর কবর সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অতীত সুখের স্মৃতির কথা মনে করছেন। ছোট্ট পুতুলের মতো লাল টুকটুকে বউ এনেছিলেন ঘরে। তিনি তখন স্বামী সংসার কিছুই বুঝতেন না। পুতুল নিয়ে খেলতেন। পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে কেঁদে আকুল হয়ে যেতেন। এক সময় সেই ছোট্ট বউ স্বামী সংসার চিনতে শিখলেন। স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা ভরে গেলো সুখের সংসার। কোল আলো করে এলো ছেলে-মেয়ে। তখন তিনি বাপের বাড়িতে গিয়েও থাকতে চাইতেন না। বউকে বাপের বাড়ি পাঠালে দাদুও অস্থির হয়ে যেতে কদিন পরই। হাট থেকে ফেরার পথে পুঁতির মালা, তামাক, মাজন ইত্যাদি ছোটো খাটো জিনিস নিয়ে বউকে দেখে আসতেন। স্বামীকে কদিন পর দেখে তিনি অভিমান করে কেঁদে বলতেন, কেনো এতোদিন পর এলে? দাদু তাই নাতিকে দুঃখ করে বলেছেন দুচার দিন স্বামীকে না দেখে যে থাকতে পারতো না, সে কেমন করে এখন কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে? তাছাড়া শুধু তো একটা মৃত্যু নয়, আরো অনেক আপন জনের মৃত্যু দেখেছেন তিনি। সেই শোক বহন করছেন তিনি তিরিশ বছর ধরে। প্রতিদিনই তিনি হারানো প্রিয়জনদের কথা ভাবেন, কাঁদেন আর দোয়া চান পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে। নাতিকেও দোয়া করতে বলছেন তার দাদির জন্য, তাঁকে যেনো আল্লাহ বেহেশতবাসী করেন। দাদুর কথায় তাঁর জীবনের যে করুন চিত্র এ অংশে প্রকাশ পেয়েছে তাতে পাঠকের চোখও হয়ে ওঠে অশ্রুসজল। জীবনের বাস্তবতা যে কতো কঠিন, কতো কষ্টের, দাদুর কান্না জড়ানো কথায় তা যেনো ছবি হয়ে দেখা দেয় পাঠকের চোখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ডালিম গাছের তলে কার কবরের কথা বলেছেন দাদু? কেমন ছিলেন তিনি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. সন্ধ্যে বেলায় শ্বশুর বাড়িতে কেনো যেতেন দাদু? কী কী নিয়ে যেতেন দাদির জন্য, সংক্ষেপে লিখুন

৩. ‘পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে’ কে বলেছেন, কেন এ কথা বলেছেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৪. মাটিতে বুক মিশিয়ে কেনো দাদু কাঁদতে চেয়েছেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ডালিম গাছের তলে কার কবরের কথা বলেছেন দাদু? কেমন ছিলেন তিনি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

উত্তর : ডালিম গাছের তলে দাদু তাঁর স্ত্রীকে কবর দিয়েছেন, সেই কথা বলেছেন। নাতির কাছে দাদু তাঁর স্ত্রীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে বিয়ের সময় দাদির বয়স ছিলো খুব কম। সারাদিন পুতুল খেলা আর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। স্বামী সংসার কিছুই বুঝতেন না বরং পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে কেঁদে আকুল হতেন। সেই ছেলে মানুষির কথা দাদুর মনে পড়ে। অনুভব করেন সেই পুতুলের মতো বউ-এর সুখ-স্মৃতির কথা। কিছুতেই ভুলতে পারেন না দাদু সেই 'সোনা মুখের' সুখি-সুখি চেহারা। দুঃখে বেদনায় প্রিয়জনের জন্য তখন কান্নাই তাঁর সান্ত্বনা হয়। তিরিশ বছর এভাবেই কাটিয়েছেন দাদু। দাদুর এ নিখাদ ভালোবাসার কোনো তুলনা দেয়া কষ্টকর।

প্রশ্ন : মাটিতে বুক মিশিয়ে কেন দাদু কাঁদতে চেয়েছেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

উত্তর : দাদু পেশায় কৃষক। মাটি চাষ করে ফসল ফলান। মাটি থেকে তিনি পান ফসল। কৃষক পরিবারের লোকদের কাছে মাটি তাই বড়ো প্রিয় কিন্তু দাদুর বেলায় মাটিকে ভালোবাসার কথা মিশে আছে বুকভাঙা দুঃখের স্মৃতি। স্ত্রী এবং আপন জনেরা মরে গিয়ে এ মাটিতেই মিশে গেছে। নিজের হাতে প্রিয়জনদের তিনি মাটির তলে কবর দিয়েছেন। মাটি ছুঁলে তিনি যেনো তাদের স্পর্শ অনুভব করেন। তাই মাটিতে বুক ঠেকিয়ে প্রিয়জনদের স্পর্শ পেতে চেয়েছেন দাদু। নাতিকে তাই বলছেন, হয়তো তার সঙ্গে গলাগলি করে মাটিতে বুক দিয়ে কাঁদলে একটু শান্তি পাবেন তিনি। মাটিকে তাই এতো ভালোবাসেন দাদু। এ মাটিই যে তার সুখ ও দুঃখের সঙ্গী।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দাদুর প্রিয়জনদের আর কে কে তাঁকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে তাদের কথা লিখতে পারবেন।
- দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর মৃত্যুতে যে শোক পেয়েছিলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
বাপজি – বাবা, কোথাও কোথাও সম্বোধনের সঙ্গে 'জি' ব্যবহারের চলন আছে। যেমন, বুজি (বুবু+জি=বুজি)। **বা-জান** – বাবাজান বা বাপজান, 'জান' এখানে আদর ও সম্মান সূচক শব্দ। **পরান** – প্রাণ, এখানে 'মন' অর্থে ব্যবহৃত। **সপ** – বিশেষ ধরনের লম্বা ও মোটা ঘাস দিয়ে তৈরি মাদুর। **গোর** – কবর।	এখানে তোর বাপজি ঘুমায় এখানে তোর মা, কাঁদছিস তুই? কি করবি দাদু! পরাণ যে মানে না। সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি, "বা-জান, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।" ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম, "বাছা শোও" সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ? গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে, তুমি যে কহিলা, 'বা-জানরে মোর কোথা যাও, দাদু লয়ে? তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে, সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গা।

উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, 'বাছারে যাই,
বড় ব্যথা রোল দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।'
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন জলে
কি জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল— 'আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথাল খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।'
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো
ঝিঁ ঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, 'রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।'

ফাল্গুনী হাওয়া – ফালগুন মাস হলো বসন্ত কাল, সেই সময়ের হাওয়া।

গেঁয়ো – গ্রামের।

আথালে – গোহালে (আথাল আঞ্চলিক শব্দ, পল্লী কবিদের রচনায় পাওয়া যায়)।

নাহি – গোসল করে।

গহীন - গভীর সাগর।

আন্ধার – আঁধার।

মরণ-বিষের তাজ – মরণকে এখানে বিষ বলা হয়েছে। তাজ হলো মুকুট, যা মাথায় পরা হয়। মাথায় বিষের মুকুট পরলে তাকে নিশ্চয় মরতে হবে। কবিতায় শব্দ তিনটির ব্যবহারে মৃত্যুর মতো কঠিন সত্যও হয়ে উঠেছে কাব্যময়।

অভাগিনী – যে মহিলার ভাগ্য খারাপ।

মরিবার কালে – মরার সময়।

গন্ড – গাল।

আশিষ – আশীর্বাদ/দোয়া।

ক্ষণপরে – একটু পরে।

মাথাল – খড় বাঁশের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ছাতা বিশেষ। গ্রামের কৃষকেরা হাতে তৈরি ছোটো এ ছাতা মাথায় টুপির মতো করে পরে। রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচায়। এটি আঞ্চলিক শব্দ।

তরু-ছায় – গাছের ছায়ায়।

জোনাকী – ছোটো পোকা, যার গায়ের আলো রাতে স্পষ্ট দেখা যায়।

ঝিঁঝিঁ – এক ধরনের পোকা, তাদের ডাকে ঝিঁঝি শব্দ হয়।

নূপুর – পায়ের অলঙ্কার যা রুম ঝুম শব্দ সৃষ্টি করে।

ঘুমের নূপুর - বিশেষ অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যে গান গাওয়া হয়

তাকে বলে ঘুম পাড়ানী গান। ঝিঁঝি পোকার শব্দকে এখানে ঘুম পাড়ানী বাজনা বলা হয়েছে। যে বাজনা শুনলে হয়তো ঘুম আরও গাঢ় হয়। খুবই কাব্যিক প্রয়োগ হয়েছে শব্দ দুটির।	

ভাবসংক্ষেপ

নাতির কাছে দাদু নিজের ছেলে ও ছেলের বৌ অর্থাৎ নাতির বাবা ও মায়ের মৃত্যুর কথা বলছেন। হঠাৎ করেই ছেলে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। নাতি তখন ছোটো। কাফনে ঢাকা লাশ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে দাদু বোবা হয়ে যান। অবুঝ শিশুকে শব্দ উচ্চারণ করে মৃত্যুর ধারণা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃত্যু যে কত বেদনার এবং কত নিষ্ঠুর বাস্তব, তা বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাননি দাদু। স্বামীর শোক পুত্রবধূ সহ্য করতে পারলো না। স্বামীর লাঙল জোয়াল বুকে জড়িয়ে এবং বলদের গলা ধরে দিনরাত শুধু কাঁদতো। এমনই করুণ সে কান্না যে মনে হতো গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরে যায়। পথিকের চোখ ভিজে ওঠে। অবশেষে শিশু পুত্রকে রেখে অকালেই সে চিরবিদায় নিলো। মৃত্যুর সময় শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেছিলো স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সে মাথাল পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু দাদুর মনের ব্যথার মরণ নেই। নাতিকে তার বাবা মার জন্য দোয়া করতে বলেন দাদু। অসহায় মানুষ আর কিই বা করতে পারে। দোয়া করাই তার শেষ সান্ত্বনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দাদুর ছেলে কিভাবে মারা গেলো তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. স্বামীর মৃত্যুতে দাদুর পুত্রবধূর শোকের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন সংক্ষেপে লিখুন।

৩. পুত্রবধু মৃত্যুর সময় শিশুপুত্রকে কী বলেছিলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. টীকা লিখুন

মরণ-বিষের তাজ, ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর, চোখের জলের গহীন সায়র।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : স্বামীর মৃত্যুতে দাদুর পুত্র বধূর শোকের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়ে। কিছুতেই এ শোকে সে বহন করতে পারছিল না।

স্বামীর স্মৃতিমাখা লাঙল জোয়াল বুকে জড়িয়ে ধরে সারাক্ষণই সে কাঁদতো। কখনো গোহালের বলদ দুটোর গলা ধরে অঝোরে কাদতো। চোখের জলে সারা শরীর তার ভিজে যেতো। জীবন তার কাছে অসহ্য মনে হতো। তার করুণ কান্না শুনে পথিকেরাও চোখ মুছতো। গাছের পাতারাও যেনো ঝরে যেতো। মানুষের ব্যথাকে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অসাধারণ কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কবি। অবশেষে অকালেই পুত্রবধূ মৃত্যুবরণ করে। রোগে নয়, শোকেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যু যেন সে আদর করে মাথায় তুলে নিলো।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দাদুর নাতনির মৃত্যুর বিবরণ লিখতে পারবেন।
- শ্বশুর বাড়ির অনাদর নাতনিকে কেমন করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলো তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মতন – মতো। **বনিয়াদি ঘর** – ভালো বংশের পরিবার। **শত যে মারিত ঠোঁটে** – ঠোঁটে বলতে এখানে 'কথা' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কর্কশ, শক্ত এবং কষ্টদায়ক কথাকে কবি ঠোঁটের মার বলেছেন। **কসাই** – পশু হত্যা করে মাংস বিক্রি করা যাদের পেশা। **চামার** – চামড়ার কাজ করা বা জুতা সেলাই করা যাদের পেশা। **সোনা মুখ** – সুন্দর মুখ। **মরণ-বীণ** – মৃত্যুর সুর। **পচানো জ্বর** – লাগাতার জ্বর, কোনো সময় যে জ্বর ছেড়ে যায় না। **হতভাগিনী** – যার ভাগ্য খারাপ। **ব্যথাতুরা** – বেদনায় কাতর।	এখানে তোর বুজীর কবর, পরীর মতন মেয়ে, বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে। এত আদরের বুজীরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে। খবরের পর খবর পাঠাত, দাদু যেন কাল এসে দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে। শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে। সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি, কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি। বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন, কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ বীণ! কি জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে, এ খানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে। ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো, কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো। বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন, পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ। হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্, দাদু! আয় খোদা দয়াময়! আমার বুজীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।'

ভাবসংক্ষেপ

দাদু তার নাতির বড় বোন অর্থাৎ বু-জীর অসুখি জীবনের গল্প বলছেন। কাজী বংশের ভদ্র পরিবারে বিয়ে হলেও শ্বশুর বাড়িতে কেউ বু-জীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো না। কর্কশ কথা এবং কটু বাক্যে তার জীবন দুঃসহ করে তুলতো ওরা। সে তাই বার বার দাদুকে অনুরোধ জানাতো, বাপের বাড়িতে দুচার দিনের জন্য তাকে যেনো নিয়ে যায়। সহজে বু-জীকে কসাই শ্বশুর আসতে দেয়নি। অনেক বলা কওয়ার পর একবার দাদু তাকে আনতে পারলো। পরীর মতো সুন্দর চেহারা শোকে দুঃখে কষ্টে মলিন হয়েছে দেখে দাদু বড়ই কষ্ট পেলেন। বু-জী হাসতো না, সারাদিন বাপ-মার কবরের কাছে বসে শুধু কাঁদতো। হঠাৎ একদিন জ্বর এলো। সে জ্বর আর ভালো হল না। বু-জীও দাদুকে ছেড়ে মৃত্যুর দেশে চলে গেল একদিন। দুঃখিনী বু-জীর জন্যও দাদু নাতিকে দোয়া করতে বলছেন। এ পৃথিবীতে সে সুখি হয়নি, পরলোকে যেন সে বেহেশতবাসী হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বু-জীর শ্বশুর বাড়ির লোকজন কেমন ছিলো, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে তার বর্ণনা লিখুন।

২. বু-জীকে হতভাগিনী বলেছেন কেন দাদু, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

৩. টীকা লিখুন :

কসাই, চামার, শত যে মারিত ঠোঁটে, পচানো জ্বর, ব্যথাতুরা হতভাগিনী।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : বু-জীকে হতভাগিনী বলেছেন কেনো দাদু, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : দাদুর আদরের নাতনি মানে বু-জী ছিল পরীর মতো সুন্দর। বিয়েও হয়েছিলো ভালো বংশের পরিবারে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছিলো বড়ই নির্দয়। বু-জীর সঙ্গে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করতো। বাপের বাড়িতে আসতে দিতো না। সে জন্য বু-জী কতো যে কাঁদতো। একে তো বাবা মা মরা এতিম মেয়ে, তার ওপর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ভালোবাসেনা। দাদুর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মনটা তার আকুল হতো। অল্প বয়সেই পৃথিবীর কঠিন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বেঁচে থাকার সাধ ঘুচে যায়। অবশেষে জ্বরে ভুগে-ভুগে দয়ামায়াহীন পৃথিবী ছেড়ে সে চলে যায় মৃত্যুর দেশে। কোনো দিক দিয়েই তার ভাগ্যে সুখ হয়নি। তাই দাদু তাকে হতভাগিনী বলে মনের দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- দাদুর জীবনের চরম দুঃখের কথা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখতে পারবেন।
- প্রিয়জনদের হারানো কাহিনী বলতে গিয়ে দাদু শোকে কত কাতর হয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
হেথায় – এখানে। **রামধনু** – রঙধনু। **সদা** – সব সময়। **যবে** – যখন। **চেয়ে** – দেখে। **চোখের ধারা** – চোখের পানি। **গেনু** – গেলাম (আঞ্চলিক শব্দ)। **দংশন** – কামড়। **প্রতিমা** – মূর্তি, (এখানে মেয়েকে প্রতিমা বলা হয়েছে)। **ঘুম ভোলা** – সহজে যাদের ঘুম ভেঙে যায়। **দীন দুনিয়ার** – ইহ জগতের।	হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে, রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে। ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা, অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা! ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে, তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত চেয়ে। বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা, রঙিন সাঁজেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা। একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে, ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।

আবীরের রাগে – উৎসবের রঙে। **মজীদ** – মসজিদ (আঞ্চলিক শব্দ)। **জীবনের রোজ কেয়ামত** – জীবনের শেষ বিচারের দিন, এখানে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। **জোড়হাতে** – দুই হাতে। **মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ** – মৃত্যু যাদের প্রাণে ব্যথা দিয়ে হত্যা করেছে অর্থাৎ যারা এখন মৃত।	সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে। কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে। আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি, দাদু! ধর–ধর–বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি। এখানে এ কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু, কথা কস্ নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুমভোলা মোর যাদু। আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে, দীন দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে। ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে, অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে। মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর, মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর। জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান। ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।"

ভাবসংক্ষেপ

দাদুর করুণ গল্প এখানে চরম দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি ছোট মেয়ের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। সাত বছরের মেয়েটি ছিলো অবিকল মায়ের মতো দেখতে। তাকে বুকে ধরে দাদু স্ত্রীর শোক ভুলতে চাইতেন। সাপের কামড়ে সেও চলে গেলো মৃত্যুর দেশে। কবে আসবে তাঁর জীবনের শেষ দিন সে কথা ভাবছেন। এতো ব্যথা মনে থাকা সত্ত্বেও তিনি এবং নাতি দুজনে একসঙ্গে প্রার্থনা জানাচ্ছেন- আল্লাহ যেনো সবাইকে বেহেশত নাজেল করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দাদুর ছোটো মেয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন। প্রিয়জনদের হারিয়ে দাদুর মনের অবস্থা শেষে কেমন হয়েছে, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

২. দাদু 'দীন দুনিয়ার ভেস্ত' কাকে বলেছেন, সে কোথায়; সংক্ষেপে লিখুন।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : দাদুর ছোটো মেয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন। প্রিয়জনদের হারিয়ে দাদুর মনের অবস্থা শেষে কেমন হয়েছে, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : দাদুর ছোটো মেয়ে খুব সুন্দর। যেন সোনার প্রতিমা। গোল গাল হাত, ফুলের মতো মুখ, ঠিক মায়ের মতোই ছিলো তার চেহারা। দাদুর চোখে সে ছিলো আকাশের রঙধনুর মতো মন আলো করা চেহারার মেয়ে। সে যেন পৃথিবীর কেউ নয়। যেন 'ভেস্তের' দরজা দিয়ে নেমে এসেছিলো তাঁর ঘরে। অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে মেয়েটি বিষণ্ন হয়ে থাকতো। কি যেন ভাবত সর্বদা। মনের দুঃখের কথা প্রকাশ করার ভাষাও তার ছিলো না। কিন্তু দাদু বুঝতেন মাতৃহীন মেয়ের মনের ব্যথা। তাই তাকে বুকে নিয়ে খুব আদর করতেন। মায়ের অভাব দূর করতে চাইতেন মন উজাড় করা মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে। সোনার প্রতিমাকে তবু তিনি বেঁধে রাখতে পারলেন না।

প্রশ্ন : দাদু 'দীন দুনিয়ার ভেস্ত' কাকে বলেছেন, সে কোথায়; সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : 'কবর' কবিতার প্রধান চরিত্র দাদু। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ভরা ছিলো তাঁর সংসার। সুখের অন্ত ছিলো না। কিন্তু কপালে সুখ সইলো না। একে একে সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো অকালে। স্ত্রী মারা গেলো, সামান্য জ্বরে ভুগে হঠাৎ ছেলেও মারা গেলো। স্বামীর শোকে কাঁদতে কাঁদতেই পুত্রবধূ মারা গেলো কিছুদিনের মধ্যে। শিশুপুত্রের মায়াও তাকে ধরে রাখতে পারলো না। শ্বশুর বাড়ির যন্ত্রণা এবং অত্যাচারে নাতনিটাও জীবনের আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো। জ্বরে ভুগে ভুগে মায়া গেলো। দাদু ছোটো মেয়েকে বুকে নিয়ে সব ব্যথা ভুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাপের কামড়ে সেও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলো। বুক ভেঙে খান খান হয়ে গেলো দাদুর। প্রিয়জনদের কথা মনে করে কাঁদতেন আর মৃতদের জন্য দোয়া চাইতেন আল্লাহর কাছে– তারা সবাই যেনো বেহেশতবাসী হয়। জীবনের অবলম্বন একমাত্র নাতির কাছে তিনি বলেন, এবার মৃত্যু আসুক। আর সহ্য হয়না শোক। দাদুর এ অবস্থা পাঠককেও শোকাতুর করে তোলে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'কবর' কবিতার কাহিনী নিজের ভাষায় লিখুন। 'কবর' কবিতার নাম কতটুকু সার্থক হয়েছে?
২. 'আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু, উজান-তলীর গাঁ' –কথাটি কে বলেছেন, কাকে বলেছেন সংক্ষেপে ঘটনাটির বর্ণনা লিখুন।
৩. নাতির কাছে দাদু তার বাবা ও মায়ের মৃত্যুর যে কাহিনী বলেছেন, সংক্ষেপে তার বিবরণ লিখুন।
৪. ব্যাখ্যা লিখুন :
   ক. তারপর এ শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
   খ. তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেলো মুখে, সারা দুনিয়ার যতো ভাষা আছে কেঁদো ফিরে গেলো দুখে।
   গ. সেই যে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে, পরানের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
   ঘ. এতো আদরের বু-জীরে তারা ভালোবাসিত না মোটে, হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : 'কবর' কবিতার কাহিনী নিজের ভাষায় লিখুন। 'কবর' কবিতার নাম কতটুকু সার্থক হয়েছে?

উত্তর : কবি জসীমউদদীন রচিত 'কবর' একটি অসাধারণ কবিতা। গ্রামীণ পরিবেশে কোনো এক দাদু তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী শোনাচ্ছেন নাতিকে। দাদুর বর্ণনায় পুরো পরিবারের লোকজনের চরিত্র এবং তাদের চেহারা পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে। কবির ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগে চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন - বাপজি, বা-জান, সপ, আথাল, মাথাল, বু-জী, ভেস্ত, মজীদ, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে গ্রামীণ জীবন এবং আচার আচরণের সহজ সরল দিকগুলো ছবির মতো ফুটে ওঠে। পুরো কাহিনীর মধ্যে যে প্রকৃতির বর্ণনা কবি দিয়েছেন যেমন, ঘুঘুর ডাক, জোনাকীর আলো, ঝিঁঝি পোকার শব্দ, গাজনার হাট, উজানতলীর গাঁ, শাপলার হাট, ইত্যাদির সঙ্গে দাদুর চরিত্র চমৎকারভাবে মিশে গেছে।

কবিতার প্রধান চরিত্র দাদু। তাঁকে কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে উঠেছে। তাঁর সংসার ছিল সাজানো বাগানের মতো। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি, লাঙল, জোয়াল, বলদ সবই ছিল তাঁর। সুখের সংসারে পুতুলের মত সুন্দরী বউ-এর আন্তরিক ভালোবাসায় দাদুর জীবন কানায় কানায় ভরা ছিল। কেউ কাউকে ছেড়ে দু চারদিনও দূরে থাকতে পারতেন না। এমন গভীর এবং পবিত্র মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে দাদি চলে গেলেন মরণের দেশে। ডালিম গাছের নিচে সেই কবরের কাছে যখনই দাদু বসেন তখনই দুই চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে যায়। তিরিশ বছর ধরেই দাদুর চোখের পানি পড়ছে স্ত্রীর কবরে। নাতিকে তাই বলেছেন- 'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে'।

প্রিয়তম স্ত্রীর অভাবে জীবন তাঁর শূন্য হয়ে গেলে ছেলে মেয়ে নাতি নাতনিদের নিয়ে জীবনের দিনগুলো কাটাতে চেয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার বিধান ছিলো অন্যরকম। তাই জোয়ান ছেলে মাত্র কদিনের জ্বরে মারা গেলো। স্বামীর শোকে দাদুর পুত্রবধূ এতই কাতর হলো যে দিনরাত কাঁদতে কাঁদতেই জীবন ক্ষয় করলো। বিধবার জীবন সে আর সহ্য করতে পারলো না। শিশু পুত্রের মায়া ত্যাগ করে সেও চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। পুত্র এবং পুত্রবধূর কবর হল পাশাপাশি। দাদু তাদেরকে 'জোড়মানিক' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের ভালোবাসা এতই গভীর ছিলো, যে মরণের দেশেও তারা পাশাপাশি থাকার সুযোগ পেলো।

বাপ মা মরা নাতনিকে দাদু বড়ই আদর করতেন। ভাল বংশ দেখে বিয়েও দিলেন তার। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ছিলো নিষ্ঠুর। নাতনির সঙ্গে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করতো। নাতিকে বলছেন দাদু —'শ্বশুর তাহার কসাই চামার' মনের দুঃখে পরীর মতো মেয়েটি জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। হতাশায় তার জীবনী শক্তি এতোই কমে গিয়েছিলো যে জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। সেই জ্বরেই তার মৃত্যু হলো।

দাদুর ছোটো মেয়ের চেহারা ছিলো ঠিক তার মায়ের মতো। বড়ই আদর করতেন তাকে দাদু। জীবনের দুঃখ কষ্ট সব সহ্য করতেন 'সোনার প্রতিমা'-র দিকে চেয়ে। জগৎ আলো করা সেই চেহারা দেখে দাদুর মনে হতো - 'ভেস্তের দ্বার বেয়ে' সে কৃষকের সাধারণ ঘরে নেমে এসেছে। মা মারা যাওয়ার পর মনমরা হয়ে থাকতো মেয়েটি। কী কষ্ট হতো তার মনে, সে কথা বলারও বয়স ছিলো না তার। একদিন সাপের দংশনে সেও চলে গেল মায়ের কোলে— সেই মৃত্যুর অচিন দেশে।

বাকি রইলো শুধু নাতি। মাঝে মাঝে তার কাছে সবার কথা বলে এবং কেঁদে বুক হালকা করতেন দাদু। কিন্তু তিনিও আর শোকের বোঝা বইতে পারছেন না। কবে এ 'জীবনের রোজ কেয়ামত' আসবে সেই কথা ভাবেন। শূন্য জীবনের হাহাকার এবং বেদনায় তিনি মৃত্যু কামনা করছেন। স্নেহ মমতায় কোমল দাদুর মন। হারানো প্রিয়জনদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করেন আল্লাহর কাছে - তারা যেনো বেহেশতবাসী হয়। নাতিকেও তিনি এই প্রার্থনা করতে শেখান।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

খ. 'তোমার কথার উত্তর ---------- গেলো দুখে'।

কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'কবর' কবিতা থেকে লাইন দুটি নেয়া হয়েছে। দাদু যখন ছেলের কাফন পরানো লাশ কবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নাতি প্রশ্ন করেছিলো — 'বা-জানরে মোর কোথা যাও লয়ে দাদু'? দাদুর মুখে তখন কথা জোগায়নি। মৃত্যু কী, ছোটো শিশু তা বোঝেনা। সে বোঝেনা কেনো মানুষকে কাফন পরানো হয়। বোঝেনা, কাফন পরানোর পর মানুষকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু একথাও বোঝেনা যে একবার এ পোশাক পরিয়ে যে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়, সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না। চিরদিনের মতো সবাইকে ছেলে সে চলে যায় মরণের দেশে, অচিন ঠিকানায়। কোনো জীবিত মানুষ সেখানে যেতে পারে না।

পুত্রশোকে কাতর পিতার বুক ভেঙে যাচ্ছে এ সত্যগুলো মেনে নিতে। কিন্তু মৃত মানুষকে ধরে রাখারও তো কোনো উপায় নেই। তাকে বিদায় দিতেই হয়। পুত্র শোকে কোনো সান্ত্বনা নেই। আমৃত্যু এ শোকে পিতার হৃদয়ে আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে। কিন্তু এসব কথা নাতিকে কেমন করে বোঝাবেন দাদু? সব জেনে এবং বুঝেও তাই তিনি উত্তর

দিতে পারেন না অবুঝ শিশুকে পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই যা দিয়ে পুত্র শোকের করুন ব্যথা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায়। ঠিক তেমনি এমন কোনো ভাষা পৃথিবীতে নেই যা দিয়ে শিশু পুত্রকে পিতার মৃত্যু যে কতো মর্মান্তিক তা বোঝানো যায়। এটা এমনই দুঃখ যে বলতে গেলে ভাষাও দুঃখ পায়, ভাষাও কাঁদে। এ লাইনে কবির অসাধারণ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

গ. সেই যে মাথাল পরিয়া গলিয়া ..... ওঠে ক্ষণে ক্ষণে'।

কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'কবর' কবিতা থেকে লাইন দুটি নেয়া হয়েছে। পুত্রবধুর মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে দাদু মাথালের কথা বলছেন নাতিকে।

পুত্রবধূ কোনো রোগে মারা যায়নি। স্বামীর শোকই তার কাল হয়েছিলো। স্বামীর অভাব সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না। প্রিয় মানুষের লাঙল-জোয়াল এবং কখনও গোয়ালের বলদের গলা ধরে সে নিরন্তর কাঁদতো। এভাবে ক্রমে শরীর ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিলো। জীবন ধারণ তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। মৃত্যুর সময় শ্বশুরকে অনুরোধ করেছিলো, স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। দাদু তার অনুরোধ রেখেছিলেন।

তারপর কেটে গেছে দিন মাস বছর। রোদ বৃষ্টিতে খড়ের মাথাল গলে পচে মাটির সঙ্গে সঙ্গে মিশে গেছে। পুত্রবধুর কবরে মাথালের কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দাদুর মনে সব স্মৃতি আজো জ্বলজ্বল করছে। কিছুই মন থেকে মুছে যায়নি। মন তো দেখা যায় না, তাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না শোকের আগুনে কেমন করে বুক পুড়তে থাকে। শোকের স্মৃতি দিনরাত মনের ভেতর কি জ্বালা সৃষ্টি করে। দাদু নাতিকে তাই বলছেন যে শোকের প্রতীক মাথাল আর দেখা যায় যা বটে কিন্তু মনের শোক প্রতি ক্ষণে তিনি দেখতে পান। অনুভব করেন প্রিয়জনের ব্যথা। সে ব্যথার পচন নেই, মরণও নেই।

ভাষার বিষয়ক প্রশ্ন

১. 'কবর' কবিতায় অনেক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কবিতা থেকে দশটি শব্দ বের করে তার অর্থ লিখুন।

উত্তর

আথাল –	গোয়াল
মাথাল –	খড় বাঁশ দিয়ে তেরি ছাতার মতো জিনিস, রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মাথায় পরা হয়।
ভেস্ত –	বেহেশত।
বু-জী –	বড়ো বোনকে সম্বোধন করা হয়; 'জী' এখানে সম্মানসূচক প্রত্যয়।
বাপজি –	বাবাকে সম্বোধন করা হয়; 'জি' (বানান ভেদে 'জী') এখানে সম্মান সূচক প্রত্যয়।
বা-জান –	বাবাজান, সংক্ষেপে বা-জান, 'জান' আদর সূচক প্রত্যয়।
গেনু –	গেলাম।
মজীদ –	মসজিদ।
মোর –	আমার।
দিনমান –	দিন; 'মান' এখানে প্রতিশব্দ, অর্থ প্রকাশের জন্য নয় – ছন্দের জন্যই এমন অর্থশূন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কবিতা থেকে দশটি আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ বেছে নিয়ে তার চলিত রূপগুলো পাশাপাশি লিখুন।

উত্তর

আঞ্চলিক রূপ	চলিত রূপ
জড়ায়ে	জড়িয়ে
ঘুমায়ে	ঘুমিয়ে
নাওয়ায়ে	নাইয়ে

বিছায়ে	বিছিয়ে
সাজায়ে	সাজিয়ে
হারায়ে	হারিয়ে
ভিজায়ে	ভিজিয়ে
লুটায়ে	লুটিয়ে
দেখিতিস	দেখতি
মিশায়ে	মিশিয়ে

৩. ছন্দ মেলানোর জন্য মাঝে মাঝে চলিত ও সাধু রীতির যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে আঞ্চলিক ও সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে; কয়েকটি নমুনা লিখুন।

উত্তর :

কেঁদে ভাসাইত = চলিত + সাধুরীতি
ছুটে যাইতাম = চলিত + সাধুরীতি
দেখে লইতাম = চলিত + সাধুরীতি
এসে কহিল = চলিত + সাধুরীতি
ডেকে কহিল = চলিত + সাধুরীতি
কেদে হইতাম= চলিত + সাধুরীতি

খ)
জড়ায়ে ধরেছি = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
ঘুমায়ে রয়েছে = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
লুটায়ে পড়েছে = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
কাঁদিয়া কাটাত = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
ভিজায়ে রেখেছি = আঞ্চলিক + চলিত রীতি
জড়ায়ে রয়েছে = আঞ্চলিক + চলিত রীতি

৪. কবিতার প্রতি লাইনে বিশ অক্ষরের বাঁধন ঠিক রাখার জন্য কখনো চলিত রীতির যৌগিক ক্রিয়া এবং কখনো সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

উত্তর

ক) দেখে যাও = চলিত+চলিত রীতি
কেঁদে মরে = চলিত+চলিত রীতি
চলে গ্যাছে = চলিত+চলিত রীতি
নেমে এসেছিল = চলিত+চলিত রীতি
করে গেলো = চলিত+চলিত রীতি
ফেটে যায় = চলিত+চলিত রীতি

খ) ছাড়িয়া যাইতে = সাধু + সাধুরীতি
ডাকিয়া কহিল = সাধু + সাধুরীতি
কাঁদিয়া উঠিত = সাধু + সাধুরীতি
দেখিতে যাইও = সাধু + সাধুরীতি
ঘুরিয়া ফিরিতে = সাধু + সাধুরীতি
কহিত হাসিয়া = সাধু + সাধুরীতি

দ্রষ্টব্য : কবিতার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে কবির যতো স্বাধীনতা আছে, গদ্যে তা নেই। কবিতার ভাষায় মিশ্র ক্রিয়া ছন্দ ও মাত্রা ঠিক রাখার জন্যই ব্যবহার করা যায়। গদ্যের মিশ্র ক্রিয়ার ব্যবহার রীতি বিরোধী। মিশ্র ক্রিয়া ব্যবহার করলে গদ্যরচনার বাক্য ভুল বলে গণ্য করা হয়। কাব্যে যা ভাষায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, গদ্যে তা দুর্বলতার লক্ষণ। সুতরাং গদ্য লেখার সময় মিশ্র রীতির ক্রিয়ারূপ ব্যবহার না করার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

৫. 'কবর' কবিতার প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দে মিল আছে, একে অন্তমিল বলে। উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

[*কবিতার লাইন থেকে শেষ শব্দগুলো লিখে অন্তমিলের শব্দগুলো সাজান। তারপর লাইনগুলো জোরে জোরে পড়ে অন্তমিল লক্ষ্য করুন এবং মনে রাখুন। অন্তমিলের সৌন্দর্য বোঝার চেষ্টা করুন।]*

৬. গ্রামীণ জীবনের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্য 'কবর' কবিতার ভাষাকে কবি তৈরি করেছেন পরম যত্নে' এ প্রসঙ্গে আপনার মত লিখুন।

[*সূত্র আঞ্চলিক শব্দ, আঞ্চলিক সম্বোধন, কৃষক পরিবারের ব্যবহার্য জিনিসের নাম, মিশ্র ক্রিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহার, ইত্যাদির নমুনা দিয়ে উত্তর লিখুন।*]

সৃজনশীল কাজ

১. কাব্য দুটি পাঠের সময় আঞ্চলিক শব্দ, অন্তমিলের শব্দ এবং সাধু+চলিত রীতি কিংবা চলিত+ সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়ার শব্দগুলো খুঁজে খাতায় লিখুন। দেখুন তো আপনার অঞ্চলের কোনো শব্দ পান কি না?

২. কয়েকটি আঞ্চলিক গান সংগ্রহের চেষ্টা করুন। আপনার অঞ্চলের গানও সংগ্রহ করতে পারেন। গানের আঞ্চলিক শব্দগুলো বেছে বেছে খাতায় লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রাখালী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

পাঞ্জেরী

ফররুখ আহমদ

কবি পরিচিতি

বিশ শতকের শুরু থেকে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশের সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে। সাহিত্য সাধনায় এ পর্বের অনেক মুসলমান কবি সাহিত্যিক মুসলিম পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফররুখ আহমদ সেই কালপর্বের একজন খ্যাতনামা কবি হিসাবে পরিচিত। কাব্যচর্চার বৈচিত্র্য ও কবি ভাবনার মৌলিকত্বে কবি ফররুখ আহমদ সমধিক খ্যাত।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মাগুরা জেলায় ফররুখ আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে আরবি, ফার্সি ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর পরিচিত কাব্য গ্রন্থের নাম "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজুম মুনীরা", "মুহূর্তের কবিতা"। ''নৌফেল ও হাতেম" নামে তিনি একটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। এছাড়া, তিনি শিশুদের জন্য কবিতা রচনা করেছেন।

১৯৭৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান ভাবকল্পনা এক সূত্রে গ্রথিত করে 'পাঞ্জেরী' কবিতার রূপকল্প কবি অংকন করেছেন। কবি এখানে প্রতীকের মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণের আবেদন প্রকাশ করেছেন। মুসলমানরা উত্তাল সাগরের বুকে এক সময় দুঃসাহসী অভিযাত্রী হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু আজ তারা সেই ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত। গৌরবহীন দিনযাপন আজ তার নিত্য সঙ্গী। মুসলমানদের জীবন থেকে এ গ্লানিময় দিনযাপনের অবসানকল্পে কবি চিত্ত ব্যাকুল। দিগন্ত বিস্তারী সমুদ্র বক্ষে দিগভ্রান্ত নাবিক নব প্রভাতের আলোর প্রত্যাশায় কবি অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন। মুসলিম জাতি সত্যভ্রষ্ট, পথভ্রান্ত। জীবন সমুদ্রের অনির্দেশ্য পথের ঠিকানা আজ অজানা। সম্মুখে কুয়াশাচ্ছন্ন দিগভ্রান্ত গন্তব্য। কবির প্রত্যাশা মুসলিম জাতি মহাজাগরণের বীজ মন্ত্রে আবার জেগে উঠবে, পাঞ্জেরী যেন সেই নবজাগরণের প্রত্যাশায় দীপ্ত আলোর দিশারী।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. ফররুখ আহমদের কাব্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- পাঞ্জেরী শব্দের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত শব্দের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মর্মবেদনার কথা লিখতে পারবেন।

	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
পাঞ্জেরী – আলোকবর্তিকা। সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলের সংগে পথ চিনে চলার জন্য যে আলোক বর্তিকা ঝুলানো থাকে। **সেতারা** – তারকা হেলাল – চাঁদ **দীঘল** – দীর্ঘ **জয়ভেরী** – আনন্দ ডংকা **খাব** – স্বপ্ন **দরিয়া** – নদী।	রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে? তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে; অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি। রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী? দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে? এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব, অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী। তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

ভাবসংক্ষেপ

দুঃখের রজনী বড় দীর্ঘ। ক্লান্ত নাবিক দিগভ্রান্ত সমুদ্রের নিরন্তর দাঁড় বেয়ে চলেছে। অন্ধকার রাতে আলোর নিশানা নেই। অসীম তমসার মাঝে যেন অন্তহীন পথ চলা। জীবনের সকল আনন্দ মুছে গেছে। কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে আশার আলো নিভে গেছে। জীবনের এ অসীম অন্ধকার থেকে বুঝি মুক্তির পথ রুদ্ধ। শুধু অনির্দিষ্ট পথের খোঁজে দুঃখের রাতে সমুদ্র পাড়ি দেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী' ছত্রটির মর্মার্থ লিখুন।
২. সমুদ্রে দিগভ্রান্ত নাবিকদের দুর্দশার কথা নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. এ দুইটি স্তবকে কবির মর্ম বেদনা প্রকাশের কারণ কী?

প্রশ্ন : 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী' ছত্রটির মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : পাঞ্জেরী শব্দের অর্থ আলোকবর্তিকা। পরাধীন মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের মাধ্যমে স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য কবি অহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : সমুদ্রে দিগভ্রান্ত নাবিকদের দুর্দশার কথা নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : দুর্দশাগ্রস্ত, পরাধীন মুসলিম জাতির মর্মবেদনার কথা কবি এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সঠিক পথের অভাবে মুসলমানরা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। অতীত ঐতিহ্য আজ বিলুপ্ত। অন্ধকার পথ থেকে মুক্তির দিশারী হিসাবে পাঞ্জেরীকে কবি প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? ..... অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

আলোচ্য কবিতাংশটি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে কবি রূপকের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রামরত নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলমানদের ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অহ্বান জানিয়েছেন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মুসলিমগণ আজ দিগভ্রান্ত। মুক্তির চেতনায় মুসলমান সমাজ আজ উদ্‌গ্রীব। অস্তমিত স্বাধীনতা মনে হয় সুদূর পরাহত। তাই, পাঞ্জেরী অর্থাৎ জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরাধীনতার অনামিসা কাটিয়ে ওঠার জন্য কবি আবেদন জানিয়েছেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- পরাধীন জাতির দুঃসহ অপেক্ষার কথা লিখতে পারবেন।
- স্বাধীনতার চেতনায় উন্মুখ মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভ্রান্ত জাতির মাশুল পরাধীনতা কবি বর্ণিত এ কথাটি নিজের কথায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
পেরেশান – ক্লান্ত **সোঁতায়** – স্রোত **জুলমাত** – অত্যাচার **আহাজারী** – কান্না **মুসাফির** – পথিক **অথই** – যার কূল নেই **শশী** – চাঁদ **শর্বরী** – রাত **মজলুম** – অত্যাচারিত **অগনন** – অসংখ্য।	রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী? বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে, বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে, বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে। আহা, পেরেশান মুসাফির দল দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে নিরাশার ছবি এঁকে! পথহারা এ দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে চলেছি কোথায়? কোন্ সীমাহীন দূরে? তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি। রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী? শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে, দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে, আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি' দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী। মোদের খেলার ধূলায় লুটায়ে পড়ি' কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী। সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,

	ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুন্‌ছি তারি। ওকি বাতাসের হাহাকার, –ওকি রোনাজারি ক্ষুধিতের! ও কি দরিয়ার গর্জন, – ওকি বেদনা মজলুমের! ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী। পাঞ্জেরী! জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি :

ভাবসংক্ষেপ

স্বাধীনতাকামী জনগণ প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। কবে পরাধীনতার অন্ধকার দূর হয়ে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে। পরাধীন জাতি দিকভ্রান্ত। পরাধীনতার মর্মজ্বালা বড় বেশি পীড়াদায়ক। দুঃখ ভারাক্রান্ত, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত জাতি সংগ্রামরত নেতৃত্বের অগ্রনায়কদের আশার বাণী শোনার অপেক্ষায় থাকে। স্বাধীনতার প্রতীক পাঞ্জেরীর পথ চেয়ে উন্মুখ স্বাধীনতাকামী যাত্রীগণ বন্দরে প্রতীক্ষমান; কিন্তু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার জাহাজ কূলে ভেড়ে না। নৈরাশ্যের আঁধারে নিমজ্জমান যাত্রীদের নিকট পাঞ্জেরী বুঝি সহসা আসেনা। হতাশা আর ক্লান্তি প্রহর গুণে দিন বয়ে যায়।

এককালের ঐহিত্যময় ও সমৃদ্ধশালী জাতি আপনার ভুলে স্বাধীনতার যে গৌরব আজ হারিয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করা বড় সুদূর প্রসারী মনে হয়। অস্তমিত সেই সৌভাগ্যের দিন আজ অত্যাচারিতের আহাজারিতে ভরা। ক্ষুধিত মানুষের কান্নায় চারিদিকে শুধু হাহাকার। তবু ও দৃঢ়তার প্রত্যয়ে আগামীর স্বাধীনতা সূর্যের উদয়ে কবি নিশ্চিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২. দরিয়া অথই ভ্রান্তির অর্থ কী?
৩. 'চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী? সূর্য ওঠা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৪. 'পাঞ্জেরী' কবিতায় কোন যাত্রাপথের কথা বলা হয়েছে?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : বন্দর বলতে আমরা সমুদ্র বা নদী তীরবর্তী ব্যবসা কেন্দ্র বুঝি। কিন্তু এক্ষেত্রে, কবি বন্দর সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। স্বাধীনতার জন্য নেতৃবৃন্দ সংগ্রামরত। স্বাধীনতা প্রত্যাশী উন্মুখ জনগণ প্রতীক্ষা করছে। সারা দেশের প্রতীক্ষারত জনগণকে যাত্রী এবং দেশকে বন্দর হিসাবে প্রতীকের মাধ্যমে কবি প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন : দরিয়া অথই ভ্রান্তির অর্থ কী?

উত্তর : পাঞ্জেরী কবিতায় পরাধীনতাকে অন্ধকারের সংগে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পরাধীন জাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন তমসায় পতিত। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতাকে কবি আলো বা সুর্যের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পরাধীনতার অন্ধকার বিদূরিত করে স্বাধীনতার সূর্য জাতির জীবনকে কখন আলোকিত করবে সেই প্রশ্নই কবি এখানে করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক. শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে
..... গিয়াছে তাদের সেতারা শশী।

খ. পথ হারা এই
..... কোন সীমাহীন দূরে?

গ. মোদের খেলা ধূলায় ফুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ-শর্বরী।

খ. *পথ হারা এই*
..... কোন সীমাহীন দূরে?

আলোচ্য অংশটি কবি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।
পরাধীনতার শিকল পরা জাতীয় জীবনে সংকটের কথা কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন।

নিঃসীম সাগরের বুকে আঁধার রাতে চলমান জাহাজ পথ হারিয়ে ফেলেছে। দিগ্‌ভ্রান্ত জাহাজ হয়ত অপ্রত্যাশিত গন্তব্যে উপনীত হবে। মুসলমান জাতি ও আজ এমনিভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছে। পরিত্রাণের পথ জানা নাই গন্তব্যের নিশানা ও অজানা। এ দুঃসহ মর্মপীড়িত জাতিকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে কবি পাঞ্জেরীকে প্রতীক হিসাবে কল্পনা করেছেন। প্রকৃত নেতৃত্বের ভুলে জাতি আজ দিশাহারা দিগ্‌ভ্রান্ত। জাতীয় জীবনের এ দুর্ভোগ ও দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পথ তাদের অজানা। নিরাশার হতাশায় নিমজ্জমান মুসলমান জাতিকে বুঝি পথ দেখাবার কেউ নেই।

ক. *শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে,*
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে
..... গিয়াছে তাদের সেতারা শশী।

কবি ফররুখ আহমদ রচিত 'পাঞ্জেরী' কবিতা থেকে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। কবি এখানে সঠিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনার অভাবে স্বাধীনতার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারায় ব্যর্থতার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
মুসলমান সমাজ আজ হতলাঞ্ছিত, হতাশার গ্লানি ও পরাধীনতার দুঃসহ পীড়নে নিপতিত। জাতীয় জীবনে মুক্তি পাগল মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে প্রত্যাশিত লক্ষ্যের আশা সুদূর পরাহত। দুঃখ, কষ্ট এবং অত্যাচারের পীড়নে জাতি হতাশাগ্রস্থ। পরাধীনতার দিন-যাপনের গ্লানি নিয়ে মুসলমানরা কোন মতে টিকে আছে। নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এ সীমাহীন দুর্ভোগ আজ জাতির জীবনে নেমে এসেছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'পাঞ্জেরী' কবিতা অবলম্বনে মুসলিম পুনর্জাগরণের একটি চিত্র অঙ্কন করুন।

সৃজনশীল কাজ

১. এ কবিতাটিতে বহু আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দ আছে। সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তত করে নিজে নিজে বাক্যে প্রয়োগ করুন।
২. পরাধীনতার মর্মজ্বালা যে কোন জাতিকে পীড়িত করে। ১৯৭১ পূর্ববর্তী কালের বাংলাদেশের জন সমাজের মর্মজ্বালার কারণগুলি অনুসন্ধান করে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
৩. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অনেক কবিতায় আরবি, ফার্সী শব্দের ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ কবিতাগুলি সংগ্রহ করে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করুন।
৪. তুফান, শ্রান্ত খা'ব, দরিয়া, অথই ভ্রান্তি, বিস্বাদ শর্বরী ইত্যাদি শব্দ সমন্বিত বিশিষ্ট প্রয়োগের তাৎপর্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৩ সালে। কিশোর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। স্বল্প আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন সুকান্ত। তাঁর কাব্যচর্চার সময় মাত্র ৬/৭ বছর। ১৯৪০ সালে ১৪ বছরের কিশোর কবি কবিতা লিখে চমকে দেন সবাইকে। যে যুগে সুকান্তের আবির্ভাব, সে যুগে ব্রিটিশ ভারতের অবস্থা ছিলো বড়োই বেসামাল। স্বদেশী আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং শ্রেণী সংগ্রামের জোয়ার এসেছিলো দেশে। সুকান্ত ছিলেন খুব স্পর্শকাতর এবং সচেতন। দরিদ্র এবং বঞ্চিত জনতার সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেছেন। মনে মনে কৃষক-শ্রমিককে কাতারে দাঁড়িয়ে তাদেরই একজন হয়ে প্রতিবাদের ভাষায় কথা বলেছেন কবিতায়। তাঁর ভাষায় ছিলো আশ্চর্য শক্তি। বক্তব্য ছিলো স্পষ্ট এবং শানিত। এ ব্যাপারে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল ছিলো। শোষিত মানুষের জন্য তিনি কিছু গানও লিখেছেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুকান্তের স্থান শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সার্থক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'ছাড়পত্র' তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অকাল মৃত্যু এক শোকের ঘটনা হয়ে আছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৩৫৪ সালের ২৯ বৈশাখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুকান্তের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, হরতাল ইত্যাদি।

ভূমিকা

সুকান্ত ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর মধ্যে 'রানার' অন্যতম একটি কবিতা। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' থেকে কবিতাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। 'রানার' কাহিনীধর্মী কবিতা। রানার শব্দের আক্ষরিক অর্থ দ্রুতগামী ডাক বহনকারী বা ডাক-পিওন। খবরের বোঝা হাতে নিয়ে গ্রাম থেকে রাতের অন্ধকারে তাদের ছুটতে হয় শহরে। ভোর হওয়ার আগেই খবরের বোঝা 'মেল' গাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। মিটমিটে আলো এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলেই লোকে বুঝতো রানার ছুটছে। দায়িত্ব পালনে তারা এতোই একনিষ্ঠ যে ঘরের অভাব, ঘরের প্রিয়জনের কথা, এমন কি নিজের ঘুম বা ক্ষুধার কথাও মনে থাকতো না কাজের সময়। কবির প্রশ্ন, নিজের সুখ দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ভুলে এ যে নিরন্তর শ্রম দান করছে রানার, বিনিময়ে সে কী পাচ্ছে? তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করে শুধু অন্যের সেবায় তার কী লাভ? কবি আহ্বান জানাচ্ছেন রানারকে, এবার নতুন খবর আনতে হবে। যে খবরের বোঝায় থাকবে সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি। আর সেই খবর আরো দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে শোষিত বঞ্চিত জনসাধারণের কাছে। সমস্ত ভীরুতা ফেলে জেগে উঠতেই হবে সর্বহারাদের জীবনের দাবি নিয়ে। কবি মনে প্রাণে তা চাইতেন এবং সে জন্যই তাদের উদ্দেশ্যে জাগার গান শুনিয়েছেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

২. কবির রাজনীতি ও গণসচেতনা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- রানারের দায়িত্ব সম্বন্ধে জানতে এবং সংক্ষেপে তা লিখতে পারবেন।
- রানারের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনের কথা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
রানার – ডাক পিওন। **দিগন্ত** – দিকের সীমা, দূর থেকে দেখলে যেখানে আকাশ মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে মনে হয়। **দুর্বার** – বাধা দেয়া কঠিন এমন। **দুর্জয়** – জয় করা শক্ত এমন। **সবেগে** – বেগের সঙ্গে। **মাভৈঃ** – ভয় নেই (সাহস দেয়ার শব্দ)। **ক্ষুধিত** – পেটে খিদে থাকা। **'মেলে'** – ডাকের গাড়িতে। **অনুরাগে** – প্রেমের অনুভব। **বিনিদ্র** – ঘুমহীন।	রানার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে, রানার! রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার– কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার। রানার! রানার! জানা-অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে, বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে; রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়, আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার-দুর্জয়। তার জীবনের স্বপ্নের মত পিছে সরে যায় বন, আরো পথ, আরো পথ–বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ। অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্ করে চায় : কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মত ধায়! কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে; হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্, জোনাকিরা দেয় আলো মাভৈঃ, রানার! এখনো রাতের কালো। এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে, পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'। ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে। অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে, ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

ভাবসংক্ষেপ

খবরের বোঝা নিয়ে রানার ছুটে চলে 'মেল' অর্থাৎ ডাকের গাড়ি ধরার জন্য। প্রাচীন ডাক ব্যবস্থায় রানারদের দায়িত্ব ছিলো স্থানীয় চিঠি পত্র নিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে শহরের 'মেলে' তা তুলে দেয়া। ঝড় ঝঞ্ঝা অন্ধকার সব কিছুকে তুচ্ছ করে রানার অতি দ্রুত বেগে দৌড়ুতে থাকে তার গন্তব্যে পৌঁছুনোর লক্ষ্যে। তার পথ চলার সঙ্গী হলো লণ্ঠন আর ডাকের লাঠিতে বাঁধা ঘণ্টা। ঐ ঝুম ঝুম ঘণ্টা শুনলেই গ্রামের লোকে বুঝতো যে রানার ছুটছে। তার সবচেয়ে ভয়, কখন বুঝি সূর্য উঠে যায়। কবির দরদী মন ভাবে, রানারের এই কঠিন শ্রম যাদের জন্য, তারা তো এর মূল্য দেয় না। রাতের পর রাত বছরের পর বছর কতো গ্রাম মাঠ ঘাট পার হয়ে পেশাগত দায়িত্বের জন্য পরের বোঝা বইতে গিয়ে নিজের ঘরের দায়িত্বটুকুও পালন করা হয় না। হয়তো ঘরে প্রিয়জনেরা বহু বিনিদ্র রাত কাটায় রানারেরই চিন্তায়। ক্ষুধায় শ্রমে ঘামে ক্লান্ত রানার তবু ছোটে সামান্য অর্থের জন্য। এ অর্থই ওদের জীবনের সম্বল। স্নেহ মমতা ভালোবাসা প্রকাশের সময় নেই তাদের। এতোই হতভাগ্য ওরা!

পরের চিঠি-পত্রে বোঝা টানাই রানারের কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তারা যে অর্থ পায় সেটাই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। সুতরাং আঁধার বিপদ সব কিছুকে তুচ্ছ করে রাতের পর রাত রানার বহু পথ অতিক্রম করে। গ্রাম থেকে খবরের বোঝা এনে পৌঁছে দেয় শহরের ডাকের গাড়িতে। ঘরের প্রিয়জনদের কথা ভাবারও সময় নেই তার। তাদের শ্রমেই সচল থাকে ডাক ব্যবস্থা। উপকার হয় বহু লোকের। কিন্তু রানারের কষ্টের কথা কেউ ভাবে না। তার শ্রম ও ঘামের উপযুক্ত মূল্যও দেয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. রানার কেমন করে ছোটে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে' কার উদ্দেশ্যে কবি এ কথাগুলো বলেছেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. 'দিগন্ত থেকে দিগন্তে' কে ছোটে, কেনো ছোটে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. রানার কবিতার প্রথম স্তবক মুখস্ত লিখুন এবং প্রত্যেক চরনের শেষের শব্দের নিচে দাগ দিয়ে অন্ত্যমিল দেখুন।

১. রানার কেমন করে ..... লিখুন।

উত্তর : 'রানার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ডাক বহনকারী বা ডাক পিওন। তার কাজ হলো স্থানীয় চিঠিপত্র রাতারাতি বহন করে শহরে সকালের 'মেল' গাড়িতে পৌঁছে দেয়া।

যে যুগে রানার চিঠির বোঝা বহন করে নিয়ে যেতো তখন বৈদ্যুতিক আলো ছিলো না গ্রাম গঞ্জে এবং রাস্তায়। তাই অন্ধকারেই তাকে পথ চলতে হতো। সেজন্য তার হাতে থাকতো টিম টিমে আলোর লণ্ঠন। পিঠে চিঠির বোঝা। ডাক বহনের লাঠিতে ঘণ্টা। কখন সূর্য উঠে যায়, এ ভয়ে সে দ্রুত বেগে গ্রাম মাঠ ঘাট বন পথ পার হতো। আকাশে তারা জ্বলতো মিটমিট করে। জ্বলতো সহস্র জোনাকীর আলো। কোনোদিকে ফিরে তাকাবার সময় থাকেনা তার। শুধু ছোটা আর ছোটা। ঝুমঝুম শব্দ তুলে যতো জোরে সম্ভব গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ছোটাই তার একমাত্র কাজ।

২. 'জীবনের সব রাত্রিকে ..... লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতা থেকে এ লাইনটি গ্রহণ করা হয়েছে। দরিদ্র রানারের উদ্দেশ্যে কথাগুলো কবি বলেছেন। কথাগুলোর মধ্যে করুণ বেদনার সুর শোনা যায়। মনে হয় শ্রান্ত-ক্লান্ত রানারের জন্য কবি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন।

রাত্রি হলো মানুষের জীবনে বিশ্রামের সময়। প্রিয়জনকে সঙ্গ দেয়ার সময়। কিন্তু রানারের কাজটাই এমন যে সারারাত পিঠে বোঝা আর হাতে লণ্ঠন নিয়ে তাকে ছুটতে হয়। তাছাড়া আঁধার রাতে পথ চলতে কতো বিপদ আপদের ভয় থাকে। সে কথা ভাবারও সময় নেই রানারের। সামান্য অর্থের বিনিময়ে শ্রমে ঘামে ভিজে রানার অবিরাম ছোটে শহরে

ডাক পৌঁছে দেয়ার জন্য। দরিদ্র শ্রমিকের এ কষ্টের জীবন কবিকে ব্যথিত করে। তিনি ভাবেন, কতো অল্পদামে ওরা রাতের আরাম বিশ্রাম এবং নিদ্রাকে বিকিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে কিনেছে প্রিয়জনের অভিমান বেদনা আর রাত্রি জাগার দীর্ঘশ্বাস। কবির অনুভব পাঠকের মনকেও ছুঁয়ে যায় খুব সহজে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- রানারের দুঃখের জীবন সম্বন্ধে জানতে ও লিখতে পারবেন।
- রানারের উদ্দেশ্যে কবির বক্তব্য কি তা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
নির্জন – জন মানব শূন্য। **দস্যু** – ডাকাত। **তৃণ** – ঘাস। **সহানুভূতি** – দরদ। **স্পর্শ** – ছোঁয়া। **কালো রাত্রির ঘাম** – খামের মধ্যে চিঠি বন্ধ থাকে। কেউ তা দেখতে পায় না। কবি রাত্রিকে এখানে বন্ধ খামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাতের অন্ধকারে অনেক কিছুই ঢেকে যায়। চিঠির কথা মেযন বন্ধ খামে ঢাকা থাকে, মানুষের দুঃখ বেদনার অনেক ঘটনাই তেমনি রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। এমন শব্দ প্রয়োগে কবিতার ভাব গাঢ় হয়।	রানার! রানার! এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?: রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে? ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া, পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া, রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে, দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে কত চিঠি লেখে লোকে– কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও, এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ, এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে, এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে। দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি, – রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে? কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে? রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে– আকাশ হয়েছে লাল, আলো স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?

ভাবসংক্ষেপ

কবির দৃষ্টিতে রানার সর্বহারাদের প্রতিনিধি। বোঝা টেনেই ওদের জীবন একদিন শেষ হয়। সামান্য অর্থের জন্য ওরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ক্ষয় করে জীবনী শক্তি। ওদের পিঠেই থাকে টাকার বোঝা। কিন্তু সেই টাকা তার নয়। সে শুধু বাহক মাত্র। তার পিঠের বোঝায় থাকে কতো মানুষের সুখ দুঃখের কথা লেখা চিঠি। কিন্তু তার মনে যে কতো দুঃখ, তার যে কতো অভাব, সে কথা কেউ লেখে না। তাই কেউ জানতেও পারেনা। কবি কল্পনা করছেন, হয়তো যে ঘাসের উপর দিয়ে রানার দৌড়ায়, সেই ঘাসই তার মনের ব্যথা টের পায়। আকাশ যে এতো উদার, তারও যেনো রানারের জন্য কোনো দরদ নেই। তাই কবি রানারকে বলেন যে এ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বোঝা বয়ে জীবন ক্ষয় করে কি লাভ? ভোর

হয়ে এলে রাতের আঁধার যেমন কেটে যায়, তেমনি করে রানারের দুঃখও যদি কেটে যেতো। কিন্তু কবে আসবে সেই সুদিন? কবির এ প্রশ্নে আছে অধিকার আদায়ের কথা। আছে প্রতীক্ষার বেদনার কথা।

শত সহস্র চিঠি, সংবাদ আর টাকার বোঝা বয়ে বয়ে রানারের জীবনী শক্তি শেষ হয় অকালেই। সে পেশায় ডাক বাহক, তাই তাকে বোঝা বইতেই হয়। কিন্তু তারও আছে অভাব, দুঃখ, বেদনা এবং কষ্ট। সে কথা কেউ কোনোদিন লেখে না। তাই সর্বহারার কবি রানারকে বলছেন- কেনো পরের জন্য জীবন ক্ষয় করছে সে? ভোর হলে রাতের আঁধার যেমন কেটে যায়, তেমনি তারও দুঃখের শেষ যদি হতো? কিন্তু কবে আসবে সেই সুদিন? কবে শ্রমিক মজুর সর্বহারা শ্রেণী শেষকের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে? সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকবেন কবি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. রানারের সবচেয়ে বেশি ভয় কাকে, দস্যুকে না সূর্যকে, সংক্ষেপে লিখুন।

২. কেনো শহর কিংবা গ্রামের কেউ রানারের দুঃখের কথা জানবে না, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. কবি রানারের উদ্দেশ্যে কী বলেছেন, নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. 'আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল' – কাকে উদ্দেশ্য করে কে এ প্রশ্ন করেছেন, সংক্ষেপে লিখুন।

১. রানারের সবচেয়ে ভয় ..... লিখুন।

উত্তর : রানারের কাজ হলো স্থানীয় চিঠিপত্র সংবাদ ইত্যাদির বোঝা বয়ে শহরে নিয়ে যাওয়া এবং সকালের আগেই 'মেল' গাড়িতে সেগুলো পৌঁছে দেয়া। সেজন্য রানারকে রাতের অন্ধকারেই পথ চলতে হয়। সে যুগে গ্রাম-গঞ্জের পথে ঘাটে বনের রাস্তায় আলো থাকতো না। অন্ধকারে সুযোগ বুঝে দস্যুও কখনো কখনো আক্রমণ করতো রানারকে। টাকাগুলো লুট করে নিয়ে যেতো দস্যু। চিঠি এবং টাকা পরের ধন, রানার বাহক মাত্র। তার কাজ নিরাপদে সেগুলো জায়গামতো পৌঁছে দেয়া। রানার তার পেশার কারণেই সাহসী। রাতের নির্জনতা, রাতের আঁধার কিংবা দস্যুকে সে ভয় করে না। সবচেয়ে বেশি ভয় তার সূর্যকে। সূর্য ওঠার অর্থ হলো, সময়মতো কাজটা হলো না। এ ব্যর্থতা সে কিছুতেই চায় না। চমৎকার কাব্যিক ভাষায় কবি কথাগুলো বলেছেন। রানারের সৎ চরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

৩. কবি রানারের উদ্দেশ্যে ..... নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত ছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর দরদী কবি। শোষিত ও বঞ্চিত শ্রমিক কৃষকদের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি কাতর হতেন। ধনী শোষকদের প্রতি ক্ষোভ জাগতো মনে। পরিশ্রমের উচিত মূল্য না পেয়ে গরিবরা কেনো ধুঁকে ধুঁকে মরবে– এ ছিলো তাঁর প্রশ্ন সচেতন কবি কবিতার ভাষায় তাঁর প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। 'রানার' কবিতায় তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে রানারকে বলছেন যে কেনো তারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে? সামান্য অর্থের জন্য কেনো নিজেকে ক্ষয় করে? ক্ষুধার ক্লান্তিতে বিশ্রাম এবং খাবার না পেয়েও কেনো তারা বোবা পশুর মতো কাজ করে যায়? তাদের এখন প্রতিবাদ করার সময়। সর্বহারাদের দুঃখের শেষ হওয়া প্রয়োজন। ভোর হলে শ্রমের কালো রাত কেটে যায় যেমন করে, তেমিন করে আলোর স্পর্শে তাদের জীবনের দুঃসময়ও যেনো কাটে। কবির এ চাওয়া সর্বকালের সর্বকালের সমস্ত সর্বহারাদের জন্য প্রেরণা হয়ে আছে আজও।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

◆ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষার জন্য রানারকে কবি কি কি বলেছেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
শপথ – প্রতিজ্ঞা। **ভীরুতা** – ভয়। **অগ্রগতির মেল** – দ্রুতগামী গাড়ি। অন্য যে কোন যানের চেয়ে মেলগাড়ি দ্রুত চলে। এখানে শোষণ মুক্তির যে খবর ঘরে ঘরে কবি পৌঁছাতে বলেছেন, তা যেনো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন 'অগ্রগতির মেল' শব্দ ব্যবহার করে। **দুর্দম** – যা দমন করা কঠিন এমন	রানার! গ্রামের রানার! সময় হয়েছে নতুন খবর আনার; শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে– পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে', দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি– নেই, দেরী নেই আর, ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে দুর্দম, হে রানার :

ভাবসংক্ষেপ

রানারকে কবি প্রতিবাদের সাহস দিয়েছেন। সমস্ত ভীরুতা ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়ে বলেছেন যে এখন নতুন শপথের খবর আনার সময় হয়েছে। এ নতুন খবর হবে মুক্তির খবর। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার খবর। মেল গাড়িতে যেমন দ্রুত খবর পৌঁছে যায়, শোষণের হাত থেকে মুক্তির খবরও তেমনি দ্রুত এবং দুর্বার গতিতে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে অগ্রগতির 'মেলে'। কবি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, প্রভাতের আর দেরি নেই। সূর্য উঠলেই যেমন সব আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তেমনি ভাবে সর্বহারাদের জীবনও হয়ে উঠবে আনন্দে ভরপুর যখন মুক্তি আসবে। সূর্য বা প্রভাতকে কবি এখানে মুক্তির দূত বলতে চেয়েছেন। যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকরা প্রভাতকে স্বাগত জানিয়েছেন শুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে।

রানারকে সমস্ত ভীরুতা ফেলে জীবনের ন্যায্য দাবি উচ্চারণের সাহস দিয়েছেন কবি। নতুন শপথের খবর এনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। যে খবরে থাকবে মুক্তির কথা। খুব দ্রুত সে খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তখন রানারের গতি যেনো হয় আরও দুর্দম, আরো দুর্বার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'সময় হয়েছে নতুন খবর আনার' –এ কথা রানারকে কেনো বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

২. বিরাম চিহ্ন দেখে জোরে জোরে কবিতার এ অংশটুকু পড়ুন। তারপর খাতায় লিখুন।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

১. 'সময় হয়েছে ..... লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত রানার কবিতায় সর্বহারাদের পক্ষ হয়ে শোষণের বিপক্ষে কথা বলেছেন। রানার চিঠি পত্রের বোঝা নিয়ে শহরের দিকে ছোটে 'মেলে' তা পৌঁছে দেয়ার জন্য। সারারাত তাকে পথ চলতে হয়। রাতের নির্জনতা, আঁধার,

দস্যুর ভয়– সব কিছুকে তুচ্ছ করে ভোরের আগেই তাকে পৌঁছুতে হয় শহরে। ঘামে-শ্রমে তার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। ঘরে অভাব অথচ তা দূর করার মতো অর্থ সে পায় না। ঘরের প্রিয়জনদের জন্য সময় দিতে পারে না সে। প্রতি রাতেই তার কাজ। পরের জন্য কাজ করতে করতে জীবনের সাধ আহলাদ ত্যাগ করতে হয়। ক্ষয় হয় জীবনীশক্তি। এ তো শোষিত কৃষক মজুরদের জীবনের চিত্র। তাই কবি রানারকে সাহস দিয়ে বলেছেন, এখন সময় হয়েছে নতুন খবর আনার। এ খবর মুক্তির খবর। সমস্ত ভয় ভীতি ফেলে দিয়ে নতুন শপথের সংবাদ আনতে হবে তাকে। আর সেই মুক্তির খবর পৌঁছে দিতে হবে দ্রুত গতিতে – প্রতি ঘরে ঘরে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. কাদের প্রতিনিধি হিসেবে কবি রানারের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, বিশদভাবে এর মূল ভাব বুঝিয়ে লিখুন।

২. 'রানার' কবিতার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায়

৩. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন :

ক. 'ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া, পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোয়া,

খ. 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে'

৪. টীকা : কালো রাত্রির খামে, অগ্রগতির মেলে, শপথের চিঠি।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

১. কাদের প্রতিনিধি হিসেবে ---------- বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে রানারের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যে শ্রেণী বোবা পশুর মতো কাজ করে কিন্তু উপযুক্ত মজুরী পায় না, যে শ্রেণী সমাজের ধনী শ্রেণীর চাকা সচল রাখে প্রচণ্ড শ্রম দিয়ে কিন্তু নিজেরা রাতে ঘুমানোর সময় পায় না- রানার তাদের একজন।

যে সময় সুকান্ত কাব্যচর্চা শুরু করেন তখন ব্রিটিশ ভারতের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, অন্যদিকে কৃষক মজুরদের আন্দোলনে দেশের অবস্থা ছিলো করুণ। কবি ছিলেন দরিদ্র শোষিত এবং বঞ্চিত জনতার পক্ষে। শ্রমিকের ঘাম, দরিদ্রের অভাব, বঞ্চিতদের বেদনা কবিকে ব্যথিত করে তুলতো। একদিকে প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে অনাহার অর্ধাহারের চিত্র দেখে তিনি প্রতিবাদীর ভূমিকায় নামেন। তাঁর হাতিয়ার ছিলো লেখনী। ভাষায় ছিলো শক্তি। শোষকের বিরুদ্ধে কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। সমাজ সচেতন কবির কাব্য চর্চার বিষয়বস্তু ছিলো অসহায় জনতা এবং তাদের নিদারুণ দুঃখ কষ্টের জীবন। রানার তাদেরই একজন হয়ে 'ছাড়পত্র' কাব্যে স্থান পেয়েছে।

রানার শব্দের আক্ষরিক অর্থ দ্রুতগামী ডাক বাহক। সোজা কথায় ডাক পিওন। স্থানীয় চিঠিপত্র সংবাদ টাকা ইত্যাদির বোঝা কাঁধে নিয়ে সে ছুটে চলে শহরের দিকে। গ্রামের সংবাদ বয়ে এনে শহরের 'মেলে' পৌঁছে দেয়াই তার কাজ। পথঘাটে কোনো আলো নেই। তাই রানারের হাতে থাকতে মিটমিটে একটা লণ্ঠন, পায়ে ঝুমঝুমি আর পিঠে খবরের বোঝা। তার যাত্রার সময় হলো রাত। সারারাত তাকে ছুটে চলতে হতো। ঝড় ঝঞ্ঝা, আঁধার, দস্যুর ভয় কোনো কিছুই তার যাত্রা বন্ধ করতে পারতো না। কারণ সূর্য ওঠার আগেই রানারকে পথ মাঠ ঘাট বন পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে। এটাই তার দায়িত্ব। তার চাকরি। অতি সামান্য টাকার চাকরি। কিন্তু দায়িত্বের ভার অনেক বড়ো। তবুও সে কর্তব্যে অটল।

স্বাভাবিক কারণেই রানারের ঘরে অভাব। পৃথিবীর রূপ রঙ তার কাছে কালো ধোঁয়ার মতো ধূসর। প্রতি রাতে অবিরাম ছোটার শ্রমে ক্লান্ত শরীরে ক্ষুধার কষ্ট আরও বেশি মনে হয়। ঘরে প্রিয়জনেরা তার সঙ্গ পায় না। তারা কতো রাত না

ঘুমিয়ে কাটায়। রানারের বিপদ আপদের কথা ভেবে উৎকণ্ঠায় ভোগে। কিন্তু গরিবের সংস্কারে আবেগের কোনো দাম নেই। দাম নেই স্নেহ মমতা মায়া ভালোবাসার। সেখানে সবচেয়ে বড়ো ক্ষুধা। আর ক্ষুধা মেটানোর জন্য কাজ করা। তা সে যতোই কষ্টের কাজ হোক।

কতো শত লোকের চিঠির বোঝায় সহস্র সুখ দুঃখের কথা বয়ে নিয়ে যায় রানার। কিন্তু তার সুখ দুঃখের কথা কেউ জানে না। জানতে চায়ও না। রাতের কালো আঁধারে সেগুলো চাপা পড়ে থাকে। এমনি ভাবেই বঞ্চিত মানুষের জীবন ক্ষয়ে যায় ধীরে ধীরে।

কবি সুকান্ত এ বোবা সহনশীলতার প্রতিবাদ জানিয়েছেন রানার কবিতার। স্পষ্ট বলেছেন, কেনো এতো কষ্ট করবে রানার? কেনো তাদের জন্য এতো অন্যায় বঞ্চনা? সব আঁধারই তো একদিন কেটে যায়! সূর্য উঠলে কাটে রাতের অন্ধকার। তাহলে রানারদের জীবনের আঁধার কাটবে না কেনো? কেনো তাদের জীবনে আশার সূর্য উঠবে না? রানারকে কবি জীবনের দাবির কথা বলতে শিখিয়েছেন। বলেছেন –সব ভয় ফেলে দিয়ে নতুন খবর আনতে হবে। সে খবর হবে মুক্তির খবর। শোষণের কষ্ট থেকে বেরিয়ে আপনার জন্য শপথ নিতে হবে। আর এ খবর অতি দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে ঘরে ঘরে। জাগাতে হবে সবাইকে।

শোষিত শ্রেণীর কবি হিসেবে তাই সুকান্ত আজও দুঃখী জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র।

৩. ব্যাখ্যা করুন :

উত্তর : ৩. খ ব্যাখার জন্য পাঠ **১**-এর **২**নং নমুনা উত্তর দেখুন। বাকিটা নিজে লিখুন।

৪. টীকা লিখুন :

উত্তর : পাঠ ২ এবং পাঠ ৩ -এ দেখুন। বাকিটা নিজে লিখুন।

ভাষার বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. রানার কবিতার প্রতি চরণের শেষ শব্দটি খাতায় লিখুন এবং মিলগুলো লক্ষ্য করুন। যেমন :

..... রাতে	..... রানার	..... আলো
..... হাতে	..... মানায়	..... কালো
..... কাঁধে	..... ধোঁয়া	..... হবে
..... সংবাদে	..... ছোঁয়া	..... কবে

[কবিতার প্রতি চরণে সমান মাত্রা না থাকলেও প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দে মিল আছে। একে অন্তমিল বলে।]

২. কবিতার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করা হয়। তারই কয়েকটি :

অবাক রাতের তারা, কালো রাত্রির খাম

ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, অগ্রগতির 'মেলে'

[ভালো করে বুঝে ব্যবহার করতে শিখুন।]

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

১. কবিতাটি গান হয়েছে। সলিল চৌধুরীর দেয়া সুরে গানটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সম্ভব হলে শুনুন।

আরও যা পড়তে পারেন

১. 'রানার' কবিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ডাক হরকরা, কবিতা ও তারাশঙ্করের 'ডাক হরকরা' গল্পের বেশ মিল আছে। পড়ে দেখতে পারেন।

২. সম্ভব হলে সুকান্তের কাব্যগ্রন্থগুলো পড়ুন।

তোমাতে অমর আমি

আহসান হাবীব

কবি পরিচিতি

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি বর্তমান পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে কবি আহসান হাবীব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দীন হাওলাদার, মাতা জমিলা খাতুন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও ভাবুক প্রকৃতির। নদী বিধৌত বৃহত্তর বরিশালের পল্লিপ্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো শৈশবেই। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়।

পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আহসান হাবীব-এর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৯৩৪ সনে ঐ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে ১৯৩৬ সনে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে আহসান হাবীব কলকাতা চলে যান জীবিকার সন্ধানে। এ- সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার সূচনা।

কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি। ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদিত 'তকবীর' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে পেশা-জীবন শুরু হয়েছিলো তাঁর। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কমরেড পাবলিশার্স থেকে আহসান হাবীব-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই আহসান হাবীব কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। সাম্প্রতিক কবিতার উত্তরাধিকার বহন করেই স্বতন্ত্র কবিকণ্ঠ হিসেবে আহসান হাবীব তাঁর আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আহসান হাবীব ঢাকা চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। বাংলাদেশের কবিতায় আহসান হাবীব এক বিশিষ্ট নাম। মেধার মনন ও আবেগকে শিল্পে রূপ দেয়ার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর। একদিকে গ্রামীণ নিসর্গ অন্যদিকে নাগরিক চেতনা, একদিকে আত্ম-অন্বেষণ অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ অন্বেষণ আহসান হাবীব-এর কাব্যসাধানার প্রেরণা।

আহসান হাবীব-এর উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়া হরিণ (১৯৬২), আশায় বসতি (১৩৮১), দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০)।
উপন্যাস : আরণ্য নীলিমা (১৯৬২)
শিশু-সাহিত্য : উপন্যাস : রাণীখালের সাঁকো (১৯৫৫)
ছড়া : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (১৩৮৪)
কবিতা : রেলগাড়ি ঝমাঝম (১)

পুরস্কার

অনুবাদের জন্য ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০-৬১) বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৮), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক (১৯৯১), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), পদাবলী পুরস্কার (১৯৮২), আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪)।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. আহসান হাবীব-এর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. কবির গভীর স্বদেশ ও মাতৃভাষা প্রীতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

ভূমিকা

"তোমাতে অমর আমি" আহসান হাবীব-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া হরিণ' থেকে সংগৃহীত। 'ছায়া হরিণ' ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ কবিতা পঞ্চাশের দশকে রচিত। এ পর্যায়ের কবিতায় আহসান হাবীব-এর ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সহজেই লক্ষযোগ্য। তাঁর কবিতায় পর্বান্তরের লক্ষণও এ-সময় থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যসাধনার এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে স্থানান্তরের অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা 'ছায়া হরিণ-এর কবিতায় প্রচ্ছন্ন। তবে 'তোমাতে অমর আমি' কবিতাখানি ঐ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির মধ্যে আহসান হাবীব-এর "তোমাতে অমর আমি" কবিতাখানি বিশিষ্ট।

কবি আহসান হাবীব নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন যে, মাতৃভাষা তাঁর সমগ্র সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভাষাচর্চার মধ্য দিয়েই তিনি অর্জন করেছেন মহত্তম শিল্পীর মহিমা- যা অকৃপণ বাংলা ভাষারই অবদান। কবির চেতনায় বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিবিড়ভাবে সংলগ্ন, তাঁর সত্তারই অন্য নাম মাতৃভাষা। কবির ভাষায় বাংলা ভাষা "আশার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মত।"

"তোমাতে অমর আমি" অসমপার্বিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত গদ্য কবিতা। প্রবহমানতা, অন্তঃছন্দ সাবলীল উপমা এবং সহজ শব্দের বুনন কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভাষা বিষয়ে কবির বাস্তবিক আবেগের শুদ্ধ উচ্চারণ শোনা যায় 'তোমাতে অমর আমি' কবিতায়। বিষয়গৌরবে এবং শিল্পমূল্যে কবিতাটি অসামান্য। ভাষার আশ্রয়ে কবি অমরতা প্রত্যাশা করেন বলেই কবিতাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ভাষার রহস্য প্রসঙ্গে কবির শৈশবের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভাষার মহিমা আবিস্কারে কবির অনুভূতির বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- ভাষাকে অর্জন করার সূত্রে কবি আর কী কী পেয়েছেন তার পরিচয় পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মুলপাঠ
তৃষ্ণা – প্রবল ইচ্ছা, এখানে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা অর্থে। **ব্যাকুলতা** – উৎকণ্ঠা। **নিস্পাপ মূঢ়তা**–শিশুর পাপশূন্য নির্বুদ্ধিতা বা সহজতা। **অনন্যমনে** – একাগ্রচিত্তে, একমনে। **স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার** – নীরবতার মধ্যে ভাবনার সমুদ্রে খেলা। **মাধুরী** – মধুরতা, মাধুর্য। **মহিমা** – মাহাত্ম্য, মর্যাদা।	মায়ের দু'চোখে শুধু তৃষ্ণা আর সারা মুখে তার কি গভীর ব্যাকুলতা বুঝিনি! আমার শিশু চোখে নিস্পাপ মূঢ়তা; কেবল অনন্যমনে স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার। মাকে চিনি, খেলার পুতুল, লাল ফুল, সাদা দেয়ালের সব ছবি চিনি; তবু জানি না কোথায় নামের মাধুরী আছে লুকিয়ে; মাকেও মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে জানি না।

আঁধার – অন্ধকার। **তোমার বুকের হীরে** – মাতৃভাষার মণিমুক্তো অর্থে। **অনিন্দ্যপ্রাণের** – সুন্দর মনের।	একদা মায়ের মুখের সেই তৃষ্ণার আঁধার অতঃপর আলো হয়ে আমার অধরে রেখেছে চুম্বন; আমি মা বলে ডেকেছি মাকে। আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি। যৌবনের সব তৃষ্ণা একটি মুখে যখন খুঁজেছে পৃথিবীকে, ক্লান্ত দিনে আশ্রয় চেয়েছে; ফুল পাখি আকাশের চাঁদ দু'হাতে যখন তার তুলে দিতে চেয়েছি, তখন তুমি ছিলে সঙ্গী, তাই সহজেই তাকে পেয়েছি; কেননা তারো আগে তোমার বুকের হীরে নিয়ে তারই জন্যে মালা গেঁথে রেখেছি। তোমাকে পেয়েছি, পেয়েছি তাই সে অনিন্দ্যপ্রাণের সঙ্গীকে।

ভাবসংক্ষেপ

সন্তানের জন্য মায়ের দু'চোখ জুড়ে স্নেহের তৃষ্ণার আর নিবিড় উৎকণ্ঠতার অর্থ কবির শিশুমন অনুধাবন করতে পারেনি। কবির শিশুচোখ নিষ্পাপ সহজতায় একমনে ভাবনার সাগরে সাঁতার কেটেছে। মায়ের দৃষ্টির অর্থ তবু জানা হয় নি তাঁর। মা তাঁর অতি পরিচিত। খেলার সামগ্রী, লাল ফুল, দেয়ালে আঁকা ছবি সবই তাঁর চেনা। তবু জানা নেই তাঁর এ-সব শব্দের ভেতরকার মাধুর্য। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে শব্দ ও সুরের মিশ্রণে যে মাহাত্ম্য লুকানো আছে তাও জানা হয়নি তাঁর শিশু বয়সে।

একসময়ে মায়ের স্নেহের তৃষ্ণা আলো হয়ে শিশুর ঠোঁটে স্নেহচুম্বন রেখেছে; স্নেহসিক্ত কবি মা বলে ডেকেছেন তাঁকে। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে কবি আবিস্কার করেছেন প্রিয় মাতৃভাষাকে। মা ও ভাষা একই সঙ্গে ধরা দিয়েছে কবির কাছে। এরপর কবি যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন, তখন সমগ্র পৃথিবীকে খুঁজেছেন একটি সুশ্রী মুখের মধ্যে, ক্লান্ত কবি আশ্রয় চেয়েছেন তার মধ্যে। কবিতার শব্দে উপমায় বাগানের ফুল, আকাশের পাখি ও চাঁদ যখন প্রিয়ার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন, তখনও মাতৃভাষাই তার সুপ্রিয় সঙ্গী। মাতৃভাষা সঙ্গী ও সহায় ছিলো বলেই কবি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর প্রিয়াকে। কেননা মাতৃভাষার মণিমুক্তো দিয়ে তৈরি করা কবিতার মালা প্রিয়ার জন্যই কবি গেঁথে রেখেছিলেন। কবি মাতৃভাষাকে নিজের করে পেয়েছিলেন বলেই, সুন্দর মনের প্রেয়সীকে পেয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. ভাষার রহস্য প্রসেঙ্গ শৈশবের অনুভূতি কী ছিলো?
২. মা ও মাতৃভাষাকে কবি কীভাবে আপন করে পেলেন?
৩. প্রিয়াকে পাওয়ার ক্ষেত্রে কবি জীবনে ভাষার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৪. 'তোমার বুকের হীরে' চরণাংশের তাৎপর্য লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মা ও মাতৃভাষাকে কবি কীভাবে আপন করে পেলেন?

উত্তর : মায়ের দু'চোখ জুড়ে স্নেহের তৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠার অর্থ শিশু বয়সের কবির কাছে ধরা দেয়নি। একমনে ভাবনার সাগরে সাঁতার কেটেছেন তিনি। মাকে তিনি চেনেন, আরও চেনেন পুতুল, ফুল, ছবি। কিন্তু এগুলির নামের মাহাত্ম্য, এসব শব্দের মধ্যে কথা ও সুরের 'মিশ্রিত মহিমা' জানা হয়নি তাঁর। একসময় মায়ের স্নেহতৃষ্ণা যখন তাঁর ঠোঁটে আদরের চুম্বন এঁকে দিয়েছে, তখনই কবি মাকে 'মা' বলে ডেকেছেন। মাকে 'মা' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি যেমন মাকে নিবিড়ভাবে পেয়েছেন, তেমনি একই সঙ্গে লাভ করেছেন ভাষাকেও। মা ও মাতৃভাষা এভাবেই কবির চেতনায় একাকার হয়ে গেছে। মাকে পেয়েছেন বলেই কবি মাতৃভাষাকে আপন করে পেয়েছেন। কবির চেতনায় এভাবেই মাতৃভাষা মায়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন : 'তোমার বুকের হীরে' চরণাংশের তাৎপর্য লিখুন।

উত্তর : কবি যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন তখন সমগ্র পৃথিবীকে একটি সুন্দর মুখের মধ্যে সন্ধান করেছেন তিনি। পরিশ্রান্ত কবি ঐ মুখশ্রীর মধ্যে খুঁজেছেন আশ্রয়। ফুল পাখি চাঁদকে কবিতার শব্দে উপমায় সাজিয়ে ঐ সুশ্রীর হাতেই তুলে দিতে চেয়েছেন তিনি। কবির এ অন্বেষণ পর্বে, অন্বিষ্ট প্রিয়ার উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা রচনার স্তরে স্তরে মাতৃভাষা ছিলো তাঁর নিত্যসঙ্গী। কবির জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষা নিবিড়ভাবে সংলগ্ন ছিলো বলেই কবি সহজেই প্রিয়াকে পেয়েছেন। মাতৃভাষার ভান্ডারে ছড়ানো রয়েছে যে শব্দ-হীরা বা মণিমুক্তো জহুরির দক্ষতা নিয়ে কবি সেগুলির মালা গেঁথেছেন প্রিয়ার জন্য। ভাষাকে আপন করে পেয়েছিলেন বলেই কবি সুন্দর মনের অধিকারিণী প্রিয়াকে লাভ করেছেন। ভাষার জন্যই কবির অভিজ্ঞতার জগৎ সম্প্রসারিত হয়েছে, সম্ভব হয়েছে কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। প্রিয়াকে পাওয়ার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা তাই কবি জবিনের এক গুরুত্বপুর্ণ প্রসঙ্গ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। আমার
শিশুচোখে নিষ্পাপ মূঢ়তা;
কেবল অনন্যমনে স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার।

২। মাকেও
মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর
মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে
জানিনা।

৩। আমি মা বলে ডেকেছি মাকে।
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।

৪। ফুল পাখি আকাশের চাঁদ
দু'হাতে যখন তার তুলে দিতে চেয়েছি, তখন
তুমি ছিলে সঙ্গী,

৫। তোমাকে
পেয়েছি, পেয়েছি তাই সে অনিন্দ্যপ্রাণের সঙ্গীকে।

উত্তর :

২। *মাকেও*

মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর
মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে
জানিনা।

আলোচ্য কবিতাংশটুকু কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতার অন্তর্গত। উদ্ধৃত অংশে কবি 'মা' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কথা ও সুরের যে মিলিত মাধুর্য রয়েছে তার উৎস সম্পর্কে নিজের শৈশবের অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

কবি তাঁর শৈশবে মায়ের চোখে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা আর উৎকণ্ঠা লক্ষ করেছেন। কিন্তু মায়ের দৃষ্টির অর্থ তাঁর কাছে তখন স্পষ্ট ছিলোনা। একাগ্র মনে ভাবনার সাগরে তিনি সাঁতার কেটেছেন কিন্তু নিষ্পাপ-নির্বোধ শিশুর কাছে মায়ের দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য অর্থহীনই থেকে গেছে। মা তাঁর চেনা; যেমন চেনা খেলার পুতুল, রঙিন ফুল, নানান ছবি। কিন্তু মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে কথা আর সুরের সম্মিলিত যে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা জানা ছিলো না কবির শৈশবে। ভাষার তাৎপর্য, গৌরব ও মাহাত্ম্য যতদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকেছে কবির কাছে, ততদিন পর্যন্ত মা ও মাতৃভাষা কবির অস্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠেনি। যখন মাতৃভাষার ঐশ্বর্য অনুধাবন করেছেন তিনি, তখন মাকেও নতুন করে পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়েছেন কবি।

৩। *আমি মা বলে ডেকেছি মাকে।*
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।

উদ্ধৃত চরণদুটি কবি আহসান হাবীব-এর 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে কবি কীভাবে মাতৃভাষার মহিমা আবিষ্কার করলেন সে কথা বলা হয়েছে।

শৈশবে নিষ্পাপ মূঢ়তা নিয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়েছেন কবি, মায়ের দৃষ্টির মধ্যে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা আর সন্তানের জন্য ব্যাকুলতার অর্থ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি তখন। ভাবনার সাগরেই কেবল সাঁতার কেটেছেন তিনি। খেলার পুতুল, রঙিন ফুল আর দেয়ালে আঁটা ছবির মতোই মা পরিচিত ছিলো তাঁর। মায়ের মূল্য ও মহিমা তখনও অনাবিষ্কৃত তাঁর কাছে। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে যে মহিমা লুকানো রয়েছে ঐ শব্দটি উচ্চারণের মধ্যে কথা ও সুরের মিশ্রিত যে সৌন্দর্য সঞ্চিত আছে - তার মাধুর্য তখনও অজানা ছিলো কবির কাছে। এক সময় মায়ের স্নেহসিক্ত চুম্বন যখন তার ঠোঁটে আদরের প্রলেপ বুলিয়ে দিলো - শৈশবের কবি তখন মাকে 'মা' বলে ডাকলেন। ঐ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে কবির ভাষাজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হলো - তিনি একই সঙ্গে মা ও মাতৃভাষাকে নিবিড় করে পেলেন। মাকে 'মা' বলে ডাকার মাধ্যমে মা ও মাতৃভাষা কবিসত্তায় নতুন মূল্যে অভিষিক্ত হলো।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- কবির কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাতৃভূমি, মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবেন।
- সত্তার প্রতিভূ হয়ে মাতৃভাষা কীভাবে কবিকে শিল্পীর মর্যাদায় মহামান্বিত করলো তার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এ দেশ – স্নেহময়ী জননীর মত যে	মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের

দেশ-অর্থে প্রযুক্ত। **আমার দিনের সারা পথে** – কবির কাব্য সাধনার বিস্তৃত সময় পরিসরে। **বিচিত্র রঙের তুলি** – ভাষা সম্পদের নানা মণিমুক্তো। **ঐতিহ্য** – পরম্পরাগত কথা। **আজন্ম লালনে** – জন্ম থেকে সযত্ন পরিচর্যায়। **আজীবন** – বর্তমান অবধি অর্থে। **আত্মা থেকে অধরে** – প্রাণসত্তা থেকে মুখের ভাষায়। **মূর্ত** – প্রকাশিত। **অনবদ্য** – অনিন্দনীয়। **প্রতিমা** – প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি। **সভ্যতার অমর মিনার** – বাংলা ভাষা বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মারক স্তম্ভ। এ-অর্থেই কবি চরণাংশটি ব্যবহার করেছেন। **জীবন মুকুর** – জীবনের দর্পণ, জীবনের আয়না। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে কবির মূল্যায়নের প্রকাশ ঘটেছে এ-দুটি শব্দে। **বাণীরূপ** – বাংলা ভাষা কবি আত্মার ভাষা প্রকাশ।	আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে। লিখেছি আপন মনে একা আমি আমার দিনের সারা পথে; মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে আমি আলোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ নানা রঙে এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে। ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে, আর আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো আলো তুমি সমগ্র সত্তায়; তুমি আছো আত্মা থেকে অধরে বিস্তৃত। এই দেশ দেশের মানুষ মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মত। পাখিদের সব গান সব সুর তার পথিকের পদচিহ্ন তোমাতেই অমর, এবং তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার। জীবন মুকুর তুমি কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ এবং তুমিই মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা।

ভাবসংক্ষেপ

স্নেহময়ী জননীর মত সন্তানবৎসল্য স্বদেশের প্রতি কবির ভালোবাসার কথা লেখা আছে স্বদেশের প্রকৃতি জগতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে, আকাশে অরণ্যে। কবির কবিতায় স্বদেশের আকাশ, অরণ্য আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেশপ্রেমের বাণীরূপ হিসেবে বিধৃত হয়ে গেছে। সারা জীবনের কাব্য সাধনায় কবি একান্ত মনে তাঁর ভালোবাসার কথা – মা, প্রিয়া আর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা লিখে রেখেছেন বরং এ ভালোবাসা মূর্ত হয়েছে মাতৃভাষার সম্পদ ঐশ্বর্য থেকে সংগৃহীত নানা মণিমুক্তোর সহায়তায়।

কবি কবিতা সৃজনের মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রদীপ ঘরে জ্বালিয়ে রেখেছেন, তার প্রতিটি শিখায় চিরায়ত মূল্য দান করেছে মাতৃভাষা। এভাবে কবিও লাভ করেছেন মহৎ শিল্পীর গৌরব। বাংলা ভাষা তার জন্ম লগ্ন থেকেই কবিদের চর্চার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালির সত্তার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। স্বদেশ, দেশের মানুষ এবং তাদের সুখ দুঃখময় জীবন ভাষার মধ্য দিয়ে হয়েছে মূর্ত। কবির কাছে প্রিয় মাতৃভাষা তাই তাঁর আত্মারই অনবদ্য

প্রতিমূর্তি পাখির গান ও সুর, পথিকের পদচিহ্ন সবকিছুই ভাষার মধ্যে অমর হয়ে আছে, বাংলাভাষা আবহমান বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ও ঐহিত্যের স্মারক স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। এ-ভাষা কবির জীবনেরই দর্পণ, তাঁর আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি। কবির কাছে প্রিয়ার মুখের কবিতা আর স্নেহময়ী জননীর মুখের কথারই অন্যনাম – মাতৃভাষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. 'আমার দিনের সারা পথে' চরণাংশটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২. কবির কাব্যচর্চায় মাতৃভাষা কী ভূমিকা পালন করেছে?

৩. কবির অনুসরণে মাতৃভূমি, মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কের পরিচয় দিন।

৪. ভাষা কীভাবে কবিকে শিল্পীর মহিমা দান করলো?

৫. মাতৃভাষা কীভাবে কবি সত্তার অনিবার্য অংশে পরিণত হলো?

৬. 'আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো' – চরণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : কবির অনুসরণে মাতৃভূমি, মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কের পরিচয় দিন।

উত্তর : সমগ্র জীবনের কাব্য সাধনায় কবি তাঁর ভালোবাসার কথা, – মা, প্রিয়া আর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা একান্ত মনে কবিতার শরীরে গ্রথিত করে রেখেছেন। মাকে 'মা' ডেকে তিনি যেমন ভাষাকে আপন করে পেয়েছেন, তেমনি দেশকে এবং প্রিয়াকেও ভাষাচর্চার মধ্য দিয়ে নিবিড়ভাবে অর্জন করেছেন। কবি তাঁর ভালোবাসার কথা ঐশ্বর্যময়ী ভাষার সম্পদ ভান্ডারের মণিমুক্তো দিয়ে নানা বর্ণে গন্ধে সুষমায় স্বরচিত কবিতায় এঁকে রেখেছেন। কবির অনুভবে মা, মাতৃভূমি ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে সংলগ্ন।

প্রশ্ন : মাতৃভাষা কীভাবে কবি সত্তার অনিবার্য অংশে পরিণত হলো?

উত্তর : কবিসত্তার এক অপরিহার্য অংশ তাঁর মাতৃভাষা। মাতৃভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তো আহরণ করে কবি তাঁর আবেগ অনুভূতির শিল্প সৃষ্টি করেছেন কবিতার আঙ্গিকে। কবিতার মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের যে প্রদীপ তিনি জ্বালিয়েছেন, শত মূল্য দিয়ে মাতৃভাষাই তাকে দান করেছে অমরতা। এ-সূত্রে কবিও মহৎ শিল্পীর পরিচয় গৌরবে সম্মানিত হয়েছেন। কাল ধরে যে ভাষা শিল্পীদের পরিচর্যার মাধ্যমে আজ অবধি সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে সে ভাষার মূল্য ও প্রেরণা কবির সমগ্র সত্তার অংশ। তাঁর অন্তরের অনুভব ভাষার আশ্রয়ে অধরে বিস্তৃত হয়ে শব্দ ও অর্থে পরিণত হয়। এভাবেই মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে কবি আত্মার অনবদ্য প্রতিকৃতি।

প্রশ্ন : 'আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো' - চরণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাংলা ভাষার উদ্ভবের রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে যখন বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়, তখন থেকেই এ-ভাষা সমকালীন কবিদের কাব্যচর্চার মাধ্যম হয়ে ওঠে। এর পর বিগত বারো শ বছর ধরে কবিদের ভাষা পরিচর্যার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধতর হয়েছে মাতৃভাষা বাংলা। কবি আহসান হাবীবও ভাষার পরিচর্যাকারী কবিসম্প্রদায়ের অংশ যার সমগ্র অস্তিত্বের অংশ হয়ে মাতৃভাষা বাংলার অবস্থান।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।

২। ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই
অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে,

৩। আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো
আছো তুমি সমগ্র সত্তায়;

৪। এই দেশ দেশের মানুষ
মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মতো।

৫। তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার।

৬। জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ।

৪। ***এই দেশ দেশের মানুষ***
মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মতো।

উপস্থাপিত স্তবকটি কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে স্বদেশ, দেশের মানুষ ও তাদের জীবন যে ভাষার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে সেই মাতৃভাষার সঙ্গে কবির সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

হাজার বছরের বাংলাদেশ, দেশের মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা মূর্ত বাংলা ভাষায় কবির কাব্যচর্চা ও সাধনায় স্বদেশ ও মানুষের জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে। ভাষার অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার মধ্য থেকে কবি সাহিত্যিকরা আহরণ করেন মণিমুক্তো। আর এ মণিমুক্তো দিয়ে জাতীয় জীবনের আবেগ ও ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তাঁরা শিল্পরূপময় করে তোলেন আহসান হাবীবও মাতৃভাষার সহায়তায় নিজের আবেগ অনুভূতিকে কবিতার আঙ্গিকে সঞ্চার করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আর এভাবেই মাতৃভাষা আহসান হাবীবের কবিসত্তার অনবদ্য প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়েছে। কবির সত্তা ও মাতৃভাষা পরস্পর একীভূত হয়ে কবি আত্মাকে দিয়েছে সম্পূর্ণতা।

যিনি প্রকৃত কবি, মাতৃভাষার সহায়তাতেই তিনি অর্জন করেন সাফল্য। মাতৃভাষা যখন কবি আত্মার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে, তখনই সাফল্য আসে কবিতায়, কৃতিত্ব অর্জন করেন কবি।

২। ***ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো ..... রেখেছো অমর করে।***

কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে আলোচ্য চরণটি চয়ন করা হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে বাংলা ভাষার মূল্য ও গৌরব প্রসঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাংলা ভাষাও এ ঐতিহ্যেরই এক অপরিহার্য অংশ। আবহমান বাংলা বাঙালির জীবন-ইতিহাস, তার পতন উত্থান, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা ভাষাশিল্পীর পরিচর্যার হাজার বছরের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অবিমিশ্র স্মারক স্তম্ভ সহস্রাধিক বছর বয়সী বাংলা ভাষা। কেননা বাংলা ভাষাতেই প্রমূর্ত হয়েছে হাজার বছরের বাঙালির সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা স্বপ্ন-সম্ভাবনার ইতিকথা, কবি আহসান হাবীবের বিবেচনায় প্রিয় মাতৃভাষা 'বাংলা' বাঙালি সভ্যতার অমর স্মারক স্তম্ভ।

৬। *জীবন মুকুর তুমি*
কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ।

উদ্ধৃত চরণ দুটি কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতার অন্তর্গত। আলোচ্য অংশে কবি মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্র অকপটে উচ্চারণ করেছেন।

মাতৃভাষা বাংলা কবির আত্মজীবনের দর্পণ কবির আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাফল্য-ব্যর্থতা দুঃখ-সুখ, স্বপ্ন-সাফল্য সবকিছুই বিধৃত হয়ে আছে স্বরচিত কবিতায়। ভাষার অকৃপণ সহায়তায় কারণেই কবির পক্ষে কাব্যসৌন্দর্য সৃজনে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। এ-কারণেই কবি ভাষাকে নিজের জীবনের দর্পণ হিসেবে চিহ্নিত করে কবি আত্মার অনন্ত পিপাসার বাণীমূর্তি রূপে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার গৌরবকথায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। কবির অতৃপ্তি ও আকুতি, যাকে ভিন্ন নামে বলা হয় সৃজনবেদনা, তারই প্রেরণায় ও তাগিদে কবি ভাষার আশ্রয়ে সৃষ্টি করেন অনুপম সব কবিতা। ঐ কবিতাবলি সঙ্গত কারণেই হয়ে ওঠে কবির সৃজন পিপাসার বাণীরূপ। ফলত, এ যুক্তিতেই কবি আহসান হাবীবের কাছে মাতৃভাষা বাংলা তাঁর কবি আত্মার বাণীমূর্তি নামে অভিহিত হয়েছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "তোমাতে অমর আমি" কবিতার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।
২. কবি জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।
৩. মাতৃভাষা প্রসঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।
৪. কবির জীবনে ও সাধনায় মাতৃভাষার প্রভাব ও অবদানের মূল্যায়ন করুন।
৫. "তোমাতে অমর আমি" কবিতার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন : "তোমাতে অমর আমি" কবিতার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : মাতৃভাষার অস্তিত্ব কবির সমগ্র সত্তায় বিরাজিত। মাতৃভাষা বাংলা কবির জীবনের দর্পণ, তাঁর কবি আত্মার শিল্পসৃজন আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি। "তোমাতে অমর আমি" কবিতায় কবি আহসান হাবীবের এ বিশ্বাস শিল্পরূপ লাভ করেছে।

আহাসন হাবীব রচনাবলী-র সম্পাদক আহসান রফিক "তোমাতে অমর আমি" কবিতার বিষয়গৌরব বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন যে, "দেশকালের চৌহদ্দিতে পরিস্ফুট ভালোবাসা নামক বহুমাত্রিক শক্তিমান আবেগ রোমান্টিকতার স্পর্শ সত্ত্বেও সচেতনতার যাত্রায় মুক্তি খোঁজে; যে আবেগ মা, প্রেয়সী ও মাতৃভূমির শৈল্পিক বিক্রিয়ায় একাকার হয়ে যায়।" কবিতাটির শিল্পসাফল্যের উৎসও কবির চেতনাধারার উল্লিখিত বিক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। জননী, প্রেয়সী এবং দেশমাতাকে একান্ত অনুভবের শৈল্পিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কবির চেতনায় মাতৃভাষার মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কবি শৈশবে মায়ের দুচোখ জুড়ে উৎকণ্ঠা আর স্নেহের তৃষ্ণার অর্থ বুঝতে পারেননি। কবির শিশুচোখ নিষ্পাপ সহজতায় বাসনার সাগরে সাঁতার কেটেছে কেবল। খেলার সামগ্রী তাঁর যতটুকু চেনা, মা ছিলেন তাঁর কাছে ততটুকুই পরিচিত। কিন্তু একসময় মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন মায়ের মাধুর্য ও মহিমা। 'মা' শব্দ উচ্চারণের

মধ্যে ধ্বনি ও সুরের মিশ্রিত যে ব্যঞ্জনা তা কবিকে ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন করে তুললো, মা ও ভাষাকে তিনি একই সঙ্গে লাভ করলেন। এরপর কবি যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন তখন প্রিয়ার মুখশ্রীর মধ্যে সন্ধান করছেন সমগ্র পৃথিবীকে। প্রিয়াকে উপহার দিয়েছেন শব্দে উপমায় তৈরি কবিতা। এখানেও মাতৃভাষা কবির প্রিয় সঙ্গী। কবির বিশ্বাস মাতৃভাষাকে আপন করে পেয়েছিলেন বলেই সুন্দর মনের অধিকাররিনী প্রেয়সীকে তিনি পেয়েছেন।

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার উৎস হিসেবেও ভাষার সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন কবি। স্বদেশের নিসর্গলোক অবলম্বন করে কবি অনেক কবিতা লিখেছেন। এজন্যেই অতি সহজেই তিনি বলতে পারেন—

'মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কতা সে সোনার দেমের
আকামে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।'

সারা জীবনের সাধনায় কবি একান্ত মনে তাঁর ভালোবাসার কথা – নাম প্রিয়া আর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা লিখে রেখেছেন। কবির এ ভালোবাসা মূর্ত হয়েছে মাতৃভাষার সম্পদঐশ্বর্য থেকে সংগ্রহ করা মণিমুক্তোর সহায়তায়।

মাতৃভাষাই কবিকে দিয়েছে মহৎ শিল্পীর গৌরব। বাংলা ভাষা তার জন্মলগ্ন থেকেই কবিদের চর্চার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালির জাতিসত্তার অনিবার্য অংশে পরিণত হয়েছে। ভাষার মধ্য দিয়েই প্রমূর্ত হয়েছে হাজার বছরের বাঙালির সুখ-দুঃখময় জীবনের কথা। কবির কাছে প্রিয় মাতৃভাষা তাই তাঁর আত্মার অনবদ্য প্রতিমূর্তি।

বাংলা ভাষা আবহমান বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাসও ঐতিহ্যের স্মারক স্তম্ভে রূপ লাভ করেছে। এ ভাষা কবির জীবনের দর্পণ স্বরূপ। তাঁর আকুতি ও আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি প্রিয় 'মাতৃভাষা। কবি লিখেছেন ঃ

জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ'

কবির কাছে প্রিয়ার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত কবিতার আর স্নেহময়ী জননীর মুখের কথার অন্য নাম – মাতৃভাষা। কবির অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা, যাকে ভিন্ন নামে বলা যায় সৃজনপিপাসা, তারই অনুপ্রেরণায় ভাষার আশ্রয়ে কবি সৃষ্টি করেন অনুপম সব কবিতা। কবির রচিত কাব্যসম্ভার সঙ্গত কারণেই তাই হয়ে ওঠে তার সৃজনপিপাসার বাণীরূপ। কবিতার উপান্তে এ যুক্তিতেই কবি আহসান হাবীবের কাছে মাতৃভাষা বাংলা তাঁর সত্তার অনিবার্য অংশ হয়ে সৃজনপিপাসু কবি আত্মার বাণীমূর্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রশ্ন : "তোমাতে অমর আমি" কবিতার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মাতৃভাষা 'বাংলা'কে উপলক্ষ করে লিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির মধ্যে কবি আহসান হাবীবের "তোমাতে অমর আমি" কবিতাখানি অন্যতম। এ কবিতায় যুগপৎ ভাষার রহস্য সন্ধানে কবির শৈশবকালীন ব্যাকুলতা, মাতৃভূমি মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক নির্ধারণে কবির দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজের সত্তার প্রতিভূ হয়ে মাতৃভাষা কীভাবে কবিকে শিল্পীর মর্যাদায় মহিমান্বিত করলো, তার শিল্পিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

শৈশবের নিষ্পাপ ও সহজ প্রাথমিক স্তরে ভাষার মূল্য অনাবিষ্কৃত ছিলো কবির কাছে। মাকে 'মা' বলে সম্বোধনের মধ্য দিয়েই কবির ভাষাজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ঘটে। এভাবেই একই সময়ে একসঙ্গে তিনি মা ও মাতৃভাষাকে নিবিড়ভাবে লাভ করেন। যৌবনে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যখন কাঙ্ক্ষিতা প্রিয়ার মুখশ্রী সন্ধান করেছেন কবি – তখনও তাঁর এ অন্বেষণ পর্বের কবিতায় মাতৃভাষা বাংলাই ছিলো প্রধান সহায়। উপর্যুক্ত বক্তব্যেই চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নিচের কবিতাংশে –

'মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে
আমি ভালোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ
নানা রঙে

এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে।'

বাংলা ভাষা কবির কাব্যচর্চার অবলম্বন এবং কবিসত্তার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। কবি লিখেছেন –

'জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ
এবং তুমিই
মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা।'

মাতৃভাষা বাংলা তার জন্মলগ্ন থেকেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার কাব্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং বর্তমান কাল অবধি সৃজনপ্রতিভার পরিচর্যায় সমৃদ্ধতর হয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাস যেমন সহস্রাধিক বছরের তেমনি বাংলাভাষা চর্চার ইতিহাসও সমান্তরালভাবে তাকে অনুসরণ করেছে। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসও ঐতিহ্যের উপাত্ত ধারণ করে আছে সহস্রাধিক বছর বয়সী এই মাতৃভাষা বাংলা। কবি বাংলাভাষার এ অবদানকে চিহ্নিত করে লিখেছেন :

পাখিদের সব গান সব সুর তার
পথিকের পদচিহ্ন তোমাতেই অমর, এবং
তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার।

কিন্তু জাতিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়েই কবির ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ হয় না। কবি জানেন তাঁর ব্যক্তিগত কাব্যসাধনায়ও মাতৃভাষা বাংলার রয়েছে এক অমোঘ ভূমিকা। কবি তাঁর রচিত পঙক্তিমালায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের যে আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন তার প্রতিটি শিখাকে অনন্ত জীবন দান করেছে মাতৃভাষা। এ অনির্বাণ শিখাই কবিকে দেবে অমরত্ব, দেবে মহত্তম শিল্পীর মহিমা। মাতৃভাষা বাংলার কাছে কবিঋণ তাই অপরিশোধ্য। কবির ব্যক্তিগত জীবনের অবসান অবধারিত, কিন্তু বেঁচে থাকবে আবহমান বাংলা ও বাঙালি। বাঙালির মুখের ভাষায়, সৃজনশীল প্রতিভার মহিমায় অনন্ত জীবন পাবে বাংলা ভাষা। আর এ ভাষার আশ্রয়েই কবি লাভ করবেন কাঙ্ক্ষিত অমরতা। কবির ভাষায়–

'ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই
অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে, আর
আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা।'

কবির ঘোষণার মধ্যেই নিহিত আছে "তোমাতে অমর আমি" কবিতার নামকরণের তাৎপর্য। নির্দ্বিধায় তাই বলা যায়, কবিতাখানির "তোমাতে অমর আমি" শিরোনাম সমগ্র কবিতার অনুষঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সার্থক।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

বিরামচিহ্ন : লিখিত বাক্যে বিরাম বা ছেদ নির্দেশ করার জন্য যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম **বিরাম চিহ্ন** বা **ছেদ চিহ্ন**। "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দু'ধরনের **বিরাম চিহ্ন** ব্যাখ্যা করা হলো।

ক) 'মায়ের দু'চোখে শুধু তৃষ্ণা আর সারা মুখে তার
কি গভীর ব্যাকুলতা বুঝিনি!

– দ্বিতীয় চরণের শেষে স্থাপিত! এ প্রান্তিক বিরামচিহ্নকে বলা হয় **বিস্ময়চিহ্ন**। সাধারণত বিস্ময়, আনন্দ, ভয়, ক্ষোভ, প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করার জন্য **বিস্ময়চিহ্ন** ব্যবহার করা হয়।

খ) আমার
শিশুচোখে নিষ্পাপ মূঢ়তা;
কেবল অনন্যমনে স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার।

– উপর্যুক্ত তিনটি চরণের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় চরণের বিরামচিহ্নটির (;) নাম **সেমিকোলন** বা **অর্ধচ্ছেদ**। সেমিকোলন সর্বদা বাক্যের ভেতরে ব্যবহার করা হয়। বিরামকাল সেখানে **কমা**-র চেয়ে বেশি, কিন্তু দাঁড়ি-র চেয়ে কম, এমন স্থানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ্য ও বিশেষণ

যে **পদ** কোনো কিছুর নাম প্রকাশ করে তা-ই **বিশেষ্য** বা **নামপদ**

বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে **বিশেষণ** বলে। **বিশেষণ** অন্য পদকে বিশেষিত করে।

– "তোমাতে অমর আমি" কবিতায় ব্যবহৃত কিছু **বিশেষ্যপদ**-এর **বিশেষণ**–রূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

বিশেষ্য	**বিশেষণ**
তৃষ্ণা	তৃষ্ণার্ত
ব্যাকুলতা	ব্যাকুল
মূঢ়তা	মূঢ়
মাধুরী	মধুর
পিপাসা	পিপাসিত/পিপাসী

প্রতিশব্দ : যে-সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে অথবা যে-সব শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়, তাদের বলা হয় **প্রতিশব্দ** বা **সমার্থক শব্দ**।

বর্তমান কবিতা থেকে কিছু শব্দ এবং সেগুলির কিছু প্রতিশব্দ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

মূল শব্দ	**প্রতিশব্দ/সমার্থক শব্দ**
গভীর	অথই, অতল, অনন্ততর, গহীন, নিস্তল
সুন্দর	চমৎকার, অনবদ্য, অপরূপ, শোভন
আকাশ	গগন, অম্বর, আশমান, নভঃ, ব্যোম
অরণ্য	বন, অরণ্যানী, অটবী, বনস্থল, বিপিন, জঙ্গল
সমুদ্র	সাগর, সায়র, সিন্ধু, দরিয়া, পারাবার, অর্ণব, জলধি

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

সংকলিত কবিতা থেকে বিশেষণ পদের তালিকা প্রস্তুত করে এগুলিকে বিশেষ্য পদে রূপান্তর করুন। প্রয়োজনে অভিধান-এর সাহায্য নিন।

'মহান ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।
বাংলা ভাষাকে উপলক্ষ করে লেখা পাঁচটি বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম কবির নাম-সহ লিখুন।
প্রাচীন বাংলা-য় কবিতা লিখেছেন এমন পাঁচজন কবির নাম সংগ্রহ করুন এবং লিখে রাখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

আহসান হাবীব রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : আহমদ রফিক সম্পাদিত

অনন্য স্বদেশ

হাসান হাফিজুর রহমান

কবি পরিচিতি

কবি হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ জুন নানার বাড়ী জামালপুরে জন্ম করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহমান ও মাতার নাম হাফিজা খাতুন। পিতা শিক্ষাবিভাগে চাকুরি করতেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় পিতার সঙ্গে ঢাকাতেই কেটেছে।

১৯৪৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯৪৮ এ ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্পৃক্ততা পরবর্তীতে কবির সাহিত্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে কেবল অংশগ্রহণই নয়, সেই সঙ্গে কর্মী এবং সংগঠক হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬২ সালে কবি জগন্নাথ কলেজে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের মনে মনোবল যুগিয়েছেন। ১৯৭৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প-এর প্রধান হন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৮২ সালে ষোল খণ্ডে পরিকল্পিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' সংকলনের কাজ শেষ হয়। এ কাজ করার সময়ই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য মস্কোতে পাঠান হয়। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল কবির কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় নিজের মনের দ্বন্দ্ব জটিলতার চেয়ে সময় এবং সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণার প্রকাশ বেশি। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর বহু কবিতায় প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মত হতাশা নয়, বরং সম্ভাবনাময় আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য চেতনার মূলে রয়েছে বাঙালি জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

কবির উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭১), বজ্রে চেরা আঁধার আমার ১৯৭৬), শোকার্ত তরবারি (১৯৮১)।

গল্পগ্রন্থ : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭১), হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত গল্প (১৯৭০)

প্রবন্ধ ও সমালোচনা : আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্য (১৯৭০) সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩)।

অনুবাদ : হোমার : ওডেসী (১৯৮৭)

ভূমিকা

হাসান হাফিজুর রহমানের 'অনন্য স্বদেশ' কবিতাটি 'আর্ত শব্দাবলী' (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এটি একটি দেশাত্মবোধক কবিতা। হাসান হাফিজুর রহমানের এ কবিতায় দেশপ্রেম একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখানে দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা নয়, মাতৃভূমির অস্তিত্বের সঙ্গে আপন অস্তিত্বের একাত্মতা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মৃত্তিকার সুবাস, জনজীবনের ধারাবাহিক ঐতিহ্য সবই কবির কাছে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। অনন্য স্বদেশ একটি গদ্য কবিতা।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. গদ্য কবিতার আঙ্গিক কেমন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. কবির দেশ প্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কবি দেশের কাছে কী সমর্পণ করতে চান তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেশের সঙ্গে কবির একাত্মতার অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ/টীকা	মূলপাঠ
অনন্য – অদ্বিতীয়, একক।	আমার হৃদপিণ্ডকে আমি উপড়িয়ে আনতে পারিনে,
স্বদেশ – নিজের দেশ, জন্মভূমি।	কিন্তু পারি সমগ্র অস্তিত্বকে সমর্পণ করতে;
হৃৎপিণ্ড – হৃদয়। এখানে আমাদের রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।	আমার সত্তাকে আমি পারি নে দেখাতে
উপড়িয়ে – টেনে তুলে আনা।	কিন্তু পারি আমার আশা–বাসনার
অস্তিত্ব – বিদ্যমানতা, স্থিতি, সমগ্র অস্তিত্ব, এখানে দৈহিক ও মানসিক দুটোসহ পরিপূর্ণ মানুষ।	রঞ্জিত ফুল স্পন্দিত ধ্বনিতে ফোটাতে;
সমর্পণ – অর্পণ করা, দান করা।	আমার দেহের শিরা–উপশিরাকে আমি জানি নে
সত্তা – বিদ্যমানতা, নিত্যতা, উৎপত্তি, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ, সাধুতা। এখানে অস্তিত্বকেই বোঝানো হয়েছে।	কিন্তু জানি আমার দেহকে–
বাসনা – কামনা, ইচ্ছা।	ব্যথা-আনন্দ-সুখ, তৃষ্ণা-ঘৃণা-পুঞ্জিত
রঞ্জিত – রঙিন, রঙ করা হয়েছে, চিত্রিত।	সুগভীর ত্বকের সীমানা,
স্পন্দিত – রক্ত সঞ্চালন করে যেসব ধমনী বা নাড়ী।	প্রখর প্রবল ইন্দ্রিয়ের সত্যকে
পুঞ্জিত – এক জায়গায় সঞ্চিত।	আমার হৃৎপিণ্ডের মতো
সুগভীর – অনেক গভীর।	আমার সত্তার মতো
ত্বক – গায়ের চামড়া।	আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মতো
প্রখর – কড়া, তীব্র।	সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
প্রবল – প্রচণ্ড, তীব্র, বলশালী।	আমার দেহের আনন্দ কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত
ইন্দ্রিয় – যে সকল দেহ-যন্ত্র বা শক্তি দ্বারা কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও বিভিন্ন কাজ করার সামর্থ জন্মে। ইন্দ্রিয় চৌদ্দটি। যথা- বাক, পাণি, পাদ, পায়ু,	পল্লবে আর ধূলিতে পলিতে রয়েছি মিশে
	পর্বতে আর মরুতে নদীতে গমের শীষে
	ধন্য ধানের পুষ্পিত সুধাগন্ধভারে
	অযুত যোজন বন্ধনগাঢ় নীলিমা পারে
	এক হাওয়া মাখি মুগ্ধনয়ন দেহের তীরে
	যতদূরে যাই তোমাতেই ফের আসি যে ফিরে।

উপস্থ- ৫টি কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক - ৫টি জ্ঞানোন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, **চিত্ত** – এই ৪টি অন্তরিন্দ্রিয়। **স্নায়ুতন্ত্রী** – দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীকে বলে স্নায়ু। সমস্ত দেহে সুতার মতো এ স্নায়ু জালের মত সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে। যে কোন অঙ্গ কর্তৃক যে অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয় তা দ্রুত মস্তিস্কে এ স্নায়ু পৌঁছে দেয়। **সর্বক্ষণ** – সব সময়। **পল্লব** – বৃক্ষের নতুন কচিপাতা, নতুন পাতাযুক্ত ডালের অগ্রভাগ, **অযুত** – দশ হাজার। **যোজন** – এক অর্থে একত্র করা, সঙ্ঘটন, চারক্রোশ বা আট/নয় মাইলের মতো দূরত্ব। **শীষ** – অগ্রভাগ। **নীলিমা** – আকাশ (নীল+ইমন) বা নীলবর্ণ। **বন্ধনগাঢ়** – নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ।	

ভাবসংক্ষেপ

কবি আপন হৃৎপিণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে স্বদেশের কাছে সমর্পণ করতে পারবেন। কবি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কথার মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারেন। দেহের ভেতরের অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্রীকে দেখতে পাওয়া যায় না সত্যি, কিন্তু দেহে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে তা আমরা জানি। সেই অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মত স্বদেশ প্রতি মুহূর্তে কবির কাছে সত্য। এ দেহেই রয়েছে সুখ দুঃখ, আনন্দ,, বেদনা ঘৃণা, সব কিছু। ইন্দ্রিয় লব্ধ সব কিছুই কবি স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে চান। স্বদেশের পত্র-পল্লবে, ধুলিতে, মাটিতে, নদীতে, গমের শীষে, পুষ্পিত শস্যের সুবাসে, আকাশের নীলে, হাওয়ার মাঝে কবি যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে আছেন। যতই দেখেন স্বদেশের সৌন্দর্যে আপ্লুত কবির মুগ্ধতা যেন কাটতে চায়না। তাই দেশ ছেড়ে যত দূরেই তিনি যান না কেন, আবার স্বদেশের কোলেই ফিরে আসতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কবি স্বদেশের কাছে কী সমর্পণ করতে চান?

উত্তর : পঞ্চাশের দশকের অনন্য কবি হাসান হাফিজুর রহমান 'অনন্য স্বদেশ' কবিতায় স্বদেশ সম্পর্কিত ভাবনাকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। বাংলা কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত থেকেই স্বদেশ চিন্তা স্থান পেয়েছে। কিন্তু কবি হাসান হাফিজুর রহমানের দেশপ্রেমের মাঝে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে তিনি স্বদেশকে একাকার করে ফেলেছেন। কিন্তু তার পরও কবির মনে অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে। এমনি করেই স্বদেশ সম্পর্কে কবির অনন্য উপলব্ধির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে।

কবি তাঁর হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনতে পারেন না, কারণ দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে স্বদেশের কাছে সমর্পণ করতে চান। নিজের সত্তাকে কেউ অন্যকে দেখাতে পারে না সত্য, কিন্তু কামনা বাসনাকে রঙিন ফুলের মত কথার মালায় সাজিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। দেহের শিরা উপশিরাকে আমরা বাইরে থেকে চোখে দেখিনা, কিন্তু দেহকে সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। দেহের ভেতরের ব্যথা-বেদনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঘৃণা-আনন্দ মিশ্রিত সমস্ত অনুভূতি নিয়েই কবির সত্তা।
দেহের ইন্দ্রিয় লব্ধ সমস্ত অনুভূতি, হৃৎপিণ্ডের চলমান সত্তার অজানা, অদেখা স্নায়ুতন্ত্রীকে কবি যেমন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, দেশকেও ঠিক তেমনি পরম সত্যের মত প্রতি মুহূর্তে নিজের মধ্যে অনুভব করেন। কবি তাই তাঁর দেহের অভ্যন্তরে জাত সর্ববিধ আনন্দ-বেদনা, সুখ-সুঃখ স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন।

২. দেশের সঙ্গে কবির একাত্মতার অনুভূতি বর্ণনা করুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দেশের প্রতি কবির আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ	শব্দার্থ/টীকা
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ – আকাশে উড়ন্ত পাখি। **নীড়** – পাখির বাসা। **স্বাদ** – জিহ্বায় খাদ্য পানীয়ের গুণাগুণ বোধ। **তৃপ্তি** – তৃষ্ণার নিবৃত্তি। **শিকড় বিহীন** – অবলম্বনহীন, ত্রিশংকু অবস্থা। **পূর্বপুরুষ** – পুরুষ পরম্পরায় যা গড়ে ওঠে। **কুটির** – কুঁড়েঘর। **মাটির সুধা** – মাটির রস। **রসনা** – আস্বাদনের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা। **শয্যা** – বিছানা, যেখানে ঘুমানো হয়। **তনুমন** – দেহ ও মন। **বদলে** – বিনিময়ে।	যদি জানতাম তোমাকে ফেলে যাওয়া যায় যদি জানতাম তোমার ফেলে যাওয়া যায় যদি জানতাম তোমার আহত মাটির কঠিন ব্যথা আমার দেহে লাগে না, কোন্ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো নীড়হীন শূন্যতায় আমি উড়তাম তবে? যদি জানতাম পৃথিবীর সমগ্র আকাশে সব ঠাঁই একই নিশ্বাসের বায়ু প্রবাহিত, সব ফলে এক স্বাদ সব ফুলে এক ঘ্রাণ, সব ফসলে একই তৃপ্তি, আমি কোন্ সব-যাওয়া আনন্দে শিকড়-বিহীন নিরাবলম্ব ভাসতাম তবে? কে জানত আমার নাম, আমার পূর্বপুরুষের পরিচয়, আমার গায়ে কোন্ মাটির রঙ? আমি কেন কাঁদি, কেন খুশি হই, মায়ের হাতলাগা কোন্ কুটিরের দিকে আমার তনুমন ফিরে চায়? কে জানত? তোমার হাওয়া ছাড়া আমার নিশ্বাসে তৃপ্তি নেই, তোমার মাটির সুধা ছাড়া আমার রসনায় স্বাদ নেই, তোমার বুকের শয্যা ছাড়া আমার প্রাণের মুক্তি নেই,

	এত দিয়েছ তুমি আমাকে, বদলে তার কিছুই দিতে পারিনে, আমি, শুধু দিতে পারি আমার ওপরে তোমার অধিকার।

ভাবসংক্ষেপ

স্বদেশের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণেই কবি মুক্ত পাখির মত নীড়হীন হয়েছেন। পৃথিবীর সব জায়গায়ই রয়েছে শস্যের মাঠ, ফল ও ফুলের বাগান, বইছে নিঃশ্বাসের বায়ু, কিন্তু নিজের দেশের ফুলের সুবাস, ফলের স্বাদ, নিঃশ্বাসের বায়ুর মত আর কোথাও পাওয়া যায় না। নতুবা কবি নিরাবলম্ব ত্রিশংকু অবস্থায় ভাসমান থকতেন। তাহলে কবির ঐতিহ্য বলতে কিছু থাকতোনা। এমন মায়ের আদর পাওয়ার আকর্ষণে নিজের কুটিরের দিকে আসতে হয় বারবার। মায়ের বুকে শিশুর যেমন তৃপ্তি, কবিরও তেমনি দেশের আলো-হাওয়া, মাটির সুধায়, এ মাটিতে শয্যাগ্রহণে সমান তৃপ্তি। যে দেশ কবিকে এত কিছু দিয়েছে, তার বিনিময়ে তিনি তার সমস্ত অস্তিত্বের উপর সর্বাত্মক অধিকার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. "সমগ্র আকাশে সব ঠাঁই একই নিঃশ্বাসের বায়ু প্রবাহিত।" বাক্যটি কোন প্রসঙ্গে কেন ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তর : পঞ্চাশের দশকে কবি হাসান হাফিজুর রহমান "অনন্য স্বদেশ" কবিতায় তাঁর স্বদেশের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে চরণটি ব্যবহার করেছেন।

কবি যদি এরকম পারতেন যে দেশ ছেড়ে যে কোন সময় চলে গেলে তাঁর কোন পশ্চাৎ আকর্ষণ থকবে না; বা এ দেশের অপমানে, পরাভবে, বেদনায় তাঁর হৃদয়ও অপমানে, আঘাতে আলোড়িত, বেদনার্ত হয়না; তাহলে আকাশে পাখির মত ডানা মেলে উড়ে বেড়াতেন, শূন্যতায় ভেসে বেড়াতেন, নীড়ের সন্ধান না করে ত্রিশঙ্কুর মতো ভাসমান অবস্থায় থাকতেন।

পৃথিবীর সব জায়গায় আলো আছে, নিশ্বাসের জন্য খোলা বাতাস রয়েছে, অবারিত ফসলের ক্ষেত রয়েছে, সুস্বাদু ফল আছে, পুষ্পিত ফুলের সুবাস রয়েছে। কিন্তু কবি অনুভব করেন স্বদেশের আকাশের নীল, নিজের দেশের ফলের স্বাদ, ফুলের সুবাস, ফসলের তৃপ্তি, বাতাসের নিশ্বাস নেবার আনন্দ অন্য কোথাও নেই। স্বদেশ ছাড়া কবির অবস্থা মূল্যহীন, নিরাবলম্ব ত্রিশঙ্কুর ভাসমান অবস্থায় থাকার মতো হয়ে পড়ত। অর্থাৎ কবির নিজের কোন অস্তিত্বই আর থাকতোনা বলে কবির এ অকৃত্রিম আকর্ষণের কারণটি আমাদের কাছে স্বচ্ছ করে তোলার জন্যেই আশ্চর্য সুন্দর চরণটি ব্যবহার করেছেন।

২। "কে জানত আমার নাম আমার পূর্ব পুরুষের পরিচয়" উক্তিটি বুঝিয়ে লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। 'অনন্য স্বদেশ' কবিতাটি অবলম্বনে কবির স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিন।

আরও যা পড়তে পারেন

হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্য ও গদ্যগ্রন্থসমূহ।

ইউনিট ১

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি -

- গ্রাম বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মসংলগ্নতা, পশ্চাদপদতা ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে-প্রদেশেরও; হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছোয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মুক্ততা আগুনের হল্কার মত পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চীৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে- তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা-যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না– কি করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়– এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মত দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতই। আর অপেক্ষা করে ধৈর্যের কাটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেচে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরাণ মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেস্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্টভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোন এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরিভাবাপন্ন ব্যক্তি সুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে-থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ— এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, হয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে— যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল— সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এ দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠে আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

—আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

—আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবীর মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে—মৌলবীর গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবীর চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়তো।

শব্দার্থ ও টীকা

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের – বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন- এখানে খাদ্যশস্যের প্রকট অভাব অথচ জনসংখ্যার ভারে মানুষ গিজ গিজ করছে। **বাসিন্দাদের** – অধিবাসীদের। **বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা** – কাজের খোঁজে বা চাকরির সন্ধানে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য আগ্রহ। **ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে** – ধোঁয়াটে আকাশ অজানা ভবিষ্যৎ, অনিশ্চয়তা ও আঁধারের প্রতীক। যে অঞ্চলের কথা লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন তাদের অভাব অনটনের জীবন এতই অনিশ্চিত যে তা যেন ধোঁয়াটে আকাশকেও হার মানায়। **নলি** – ভেলা চালানোর জন্য লম্বা বাঁশের কঞ্চি। **জ্বালাময় আশা** – তীব্র জ্বালা ও ক্ষুধা মিশ্রিত আশা। **হা শূন্য** – অভাবগ্রস্ত। **মুখথোবড়ানো** – পর্যুদস্ত, ক্লান্ত। **দিনমানক্ষণের সবুর** – সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা। দেরী করা সহ্য হয় না। তর সয় না। **ফাঁসির সামিল** – ফাসির শাস্তির ন্যায় কষ্টকর। **ঝিমধরা** – আচ্ছন্ন। **সর্পিল গতিতে** – সাপের চলার মতো আঁকাবাঁকা গতিতে আস্তে আস্তে। সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে – আচমকা জেগে ওঠে। বহির্মুখী উন্মত্ততা – বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠা। **অপরিসীম** – সীমাহীন। **জানপছানের লোক** – আত্মীয়স্বজন, প্রাণ প্রিয় লোক, প্রিয়জন। **আলগোছে** – আলগাভাবে, পৃথকভাবে। **নিদ্রাচ্ছন্ন** – ঘুমে বিভোর, ঘুমন্ত। **দেহচ্যুত হয়ে** – ট্রেনের বগি থেকে ইঞ্জিন যখন পৃথক হয়ে পড়ে। **নিশুতি রাত** – গভীর রাত। **বিরাণ** – ফাঁকা, খালি। **সরভাঙা পাড়** – নদীর প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া পাড়। **শস্যের চেয়ে টুপি বেশি** – খাদ্যশস্যের অভাব হলেও মাথায় টুপি পরা মুসলমানের সংখ্যা বেশি। **ধর্মের আগাছা বেশি** – সত্যিকারের ধর্মভাবের চেয়ে কুসংস্কারের প্রাধান্যই বেশি। **হেফজ করা** – মুখস্থ করা। **শীর্ণ দেহ** – চিকন দুর্বল শরীর। **সরুগলা কেরাত** – চিকন মিহি সুরে কোরানের সুরা পড়া। **ফিকে দাড়ি** – পাতলা দাড়ি। **চড়া কেটে সে বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে** – অতীতের ধর্মীয় শিক্ষাকে বর্তমানের যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে উপযোগী করে তোলা। **বৈরিভাবাপন্ন** – শত্রু ভাবাপন্ন। **খোদার এলেম** – ধর্মীয় বিদ্যা। **বাহে মুলুকে** – উত্তরবঙ্গে। **দৌলতখানা** – বাড়ি বা ঠিকানা। ক্বচিৎ – কদাচিত, কখনও কখনও। **দীপ্ত** – আলোয় ভরা।

বাগ্‌ধারা

খাবি খায় – কূল কিনারা খুঁজে পায় না।

মরার খরা – যে বৃষ্টিহীনতা মরণ নিয়ে আসে।

দাবড়ে কুঁদে – দাপট দেখিয়ে।

ঝিমধরা – স্তব্ধ হওয়া।

আগুনের হলকার মত – আগুনের প্রচণ্ড গরমের মত।

পাঠসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, অভাব ও ক্ষুধাক্লিষ্ট নোয়াখালী জেলার গ্রামাঞ্চল। এ অঞ্চল যেমন জনবহুল তেমনি নদীবহুলও বটে। তবে ক্ষেতে শস্য নেই, কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। তাই লোকজন দেশের নানা অঞ্চলে সামান্য কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। শহর, গ্রাম, বন্দর যেখানেই হোক কাজ চাই। যত দুর্গম অঞ্চল হোক তারা সেখানে ছুটে যায়, কাজের আশায়। নিবিড় রাতে নিস্তব্ধ স্টেশনে রেলগাড়ির খুপরিতে তারা ঢুকে পড়ে। অজানা পথে তারা পাড়ি জমায়। পথের সম্বল তাদের পুটলি-বদনা, কারও কারও পুথিগত কিছু ধর্মবিদ্যা। কেউ আমসিপারা পড়া, কেউ কোরানে হাফেজ, কেউবা আলীয়া মাদ্রাসা ডিঙানো। এমনকি কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে বড় বড় ভারি ভারি কেতাব ও মন্থন করেছে। যদিও এগুলোর অর্থ কোনদিন বুঝেনি। শহরে বন্দরে গ্রামে, নদীতে সমুদ্রে যেখানেই হোক কাজ চাই। হোক না এ কাজ জাহাজের খালাসী, কারখানার শ্রমিক, ছাপাখানার মেশিনম্যান ইত্যাদি। কেউ কেউ হয় মসজিদের ইমাম, কেউ

মোয়াজ্জিন। শহর-বন্দরে হাজারো মসজিদ। তারপরও কর্মসংস্থান হয় না। যমুনা পার হয়ে কেউ চলে যায় উত্তরবঙ্গে কেউ বা গারো পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে। এমনি জঙ্গলময় নিভৃত গারো অঞ্চলে এক বাঁশের তৈরি মসজিদ আঁকড়ে পড়ে আছে একজন, সেও সুদুর নদীআশ্রিত অঞ্চল নোয়াখালী থেকে আসা- এ মসজিদের ইমাম। একদিন দেখা হয় এক শিকারীর সঙ্গে। সে তাকে বলে ভিন্ন কথা। বলে খোদা তালার আলো ছড়াতে সে এসেছে এখানে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের এ অংশে নোয়াখালী অঞ্চলের জনজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হলেও গ্রাম বাংলার ধর্মপ্রভাবিত জীবনধারার মূলসুর এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

জীবনের কোন স্পর্শ নেই জনসংখ্যায় ঠাসা এমন গ্রাম বাংলাদেশে অনেক। কিন্তু যে অঞ্চলের বর্ণনা লেখক এখানে দিয়েছেন সেখানে এত অভাবের মধ্যেও ভোরবেলায় মক্তবে কচিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে আমসিপারা পড়ার কোলাহল। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, ন্যাংটো ক্ষুধাতুর ছেলেরাও সেই কোলাহলের অংশীদার। তাই লেখক কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বলেছেন এটা হয়ত খোদাতালার বিশেষ একটা অঞ্চল যেখানে মানুষ এত ধর্মসংলগ্ন।

উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার

১. 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' এ বাক্যে শস্য, টুটি ও আগাছা শব্দগুলো লেখক কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?

উত্তর : লেখক 'শস্য' বলতে খাদ্য, 'টুপি' অর্থে ধর্মভাবাপন্ন মুসলমান ও 'ধর্মের আগাছা' বলতে কুসংস্কারচ্ছন্ন তথাকথিত ধর্মভাবাপন্ন মানুষদের কথা বুঝিয়েছেন। আসলে গ্রাম বাংলার অনেক অঞ্চলের চিত্র এ রকম। প্রচুর লোকজন, কাজকর্ম নেই, খাদ্যের অভাব। কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ছেলেবুড়ো সবার মাথাতেই টুপি।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- গ্রাম বাংলায় মাছ ধরার একটি চিরন্তন দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ ও খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে প্রথম জমায়েতের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠ প্রান্তর আর বিস্তৃত ধান ক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রঙ দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেত্রে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান-ক্ষেত্রে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেলো। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে একজন-চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের একপ্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে– চোখে তার তেমনি শিকারির সুচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাই-এর ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নীচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে– নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতকে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙ্গুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিলো, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মত টান-হয়ে ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠলো, তীরের মত বেরিয়ে গেলো একটা কোঁচ। সা–ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হা-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙ্গুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়–সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা– নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

নিরাক পড়া – হাওয়া বাতাসহীন গুমোট আবহাওয়া। **নিস্পন্দ** – কোনরূপ শব্দহীন সূচাগ্র। **একাগ্রতা** – সূচের আগার মতো তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন একমুখী দৃষ্টি। **নিথর** – নিস্তব্ধ, নিশ্চল। **কোঁচ-জুতি** – বিল থেকে মাছ ধরার জন্য লোহার তৈরি ধারালো ফলার বল্লম জাতীয় হাতিয়ার। **সন্তর্পণে** – সাবধানে। **পানি নয় তুলো** – বিলে নৌকা এত সাবধানে ও নিঃশব্দে চলে যেন মনে হয় পানির ওপর দিয়ে নয় তুলোর ওপর দিয়েই চলছে নৌকা। **নিস্পলক** – চোখের পাতা না ফেলে। **কোটরাগত নিমীলিত চোখ** – ভেতরে বোঁজা দুটি চোখ।

পাঠসংক্ষেপ

শ্রাবণের মেঘহীন হাওয়াবিহীন আকাশ। গ্রামের বিলের পানি নিথর স্থির হয়ে আছে। তাহের কাদের ডিঙিতে করে মাছ ধরতে বেরিয়েছে বিলে। খুব সাবধানে তারা নৌকা চালায় যেন এতটুকু শব্দও না হয়। ধানক্ষেত দিয়ে নৌকা চালাতে চালাতে তারা দেখে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর একটি লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। হালকা পাতলা একটা লোক। চোখ দুটি বোঁজা। মুখে কগাছি দাড়ি। নৌকা থেকে দেখে মনে হচ্ছে লোকটির যেন চেতনা নেই। কিছুক্ষণ পর লোকটি উত্তর দিকে হেঁটে মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে। এখানেই তাহের-কাদেরের বাড়ি। লোকটিকে তারা বিকেলে গ্রামের জোতদার খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে দেখতে পায়। দেখতে পায় তারা নানা বয়সের লোকের সমাগম হয়েছে বৈঠকখানায়।

ইউনিট ২

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের আগমন ও অজ্ঞাত মোদাচ্ছের পীরের মাজার স্থাপন সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মজিদের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

এ-ভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এ জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর। শীর্ণ লোকটি চীৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলী ছিলো। জোয়ান মদ্দ কালু মতি, তারাও ছিলো। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

–আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিলো সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মত। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিলো। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

–আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ। –মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিলো। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভূঁই-এ সে বসবাস করছিলো। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মত। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিলো; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চল মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিলো তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার কয়েক শুনেছে সে-কথা,তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

–উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন.....

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে ওঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি-ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে ওঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লীদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে কথা স্পষ্ট বুঝেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিলো যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিলো, ভয়ও ছিলো। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখে নি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেলো। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোন মানুষের কবরের মত নোতুন দেহ ধারণ করলো। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মত সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগলো, মোমবাতি জ্বলতে লাগলো রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিলো, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠলো; হাওয়ার ভাঁপসা গন্ধ খড়ের মত শুষ্ক হয়ে উঠলো।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগলো। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মত অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠলো। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালী হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো, মাছের পিঠের মত সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বেরকরা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

শব্দার্থ ও টীকা

গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি – চমকপ্রদ কোন ঘটনা অত্যন্ত সহজেই গ্রামের সাধারণ লোকদের আকর্ষণ করে। তাই লেখক কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছেন গ্রামের লোকেরা নাটকের পক্ষপাতি। **জোয়ান মদ্দ** – যুবক ছেলে। জাহেল (আরবি শব্দ) মূর্খ। **বে-এলেম** – বিদ্যাহীন, লেখাপড়া না জানা। **আনপড়াহ** – যাদের কোন পড়াশোনা নেই। **অশীতিপর** – আশি বছরেরও বেশি বয়সের। **সন্নিবিষ্ট** – সঙ্গে লাগানো, সন্নিহিত। **দম খিঁচে** – নিশ্বাস বন্ধ করে। **সাচ্চা** – পরিষ্কার। **উৎকর্ণ** – সজাগ। **ছাপিয়ে ওঠা** – ভরে ওঠে। **ইদানীং** – আজকাল, সম্প্রতি। **চিকনাই** – উজ্জ্বলতা, সতেজভাব। **নজর** – দৃষ্টি, মনোযোগ। **যে খেলা খেলতে যাচ্ছে** – এখানে 'খেলা' শব্দের অর্থ এক ধরনের প্রতারণা, মিথ্যা ছল-চাতুরি। **জমায়েতের** – সমাবেশের, সভার। **মর্মন্তুদ কান্না** – মর্মভেদকারী কান্না, যে কান্না হৃদয় স্পর্শ করে। অশ্রুসজল **কৃতজ্ঞতা** – চোখের পানিতে ভেজা কৃতজ্ঞতা, গভীর কৃতজ্ঞতা। **বতোর দিনে** – ধান কাটার মৌসুমের দিনে। 'বতর্ শব্দটি কুমিল্লা, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ। **মগরা মগরা ধান** – মগরা শব্দটি আঞ্চলিক। এখানে ভারে ভারে বা প্রচুর ধান ওঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাগধারা

মাথা হেঁট হওয়া – সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়া।
চোখে আগুন – প্রচণ্ড রাগ।
চড়াই উতরাই ভাব – বিক্ষিপ্ত মনোভাব।
আকাশে ভাসে – দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

পাঠসংক্ষেপ

মহব্বত নগর গ্রামে প্রবেশ করে মজিদ গ্রামের সবাইকে মধ্যে চমক লাগিয়ে দেয়। সে এসেই প্রথমে তার অব্যর্থ শিকারিসুলভ আচরণে গ্রামবাসীকে তিরস্কার করে। ধর্মে অবহেলার জন্য তাদের গালাগাল করে। গ্রামবাসী মজিদের তিরস্কারে বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা গ্রামের একটু বাইরে পুকুরপাড়ের একটা বড়ো বাঁশঝাড়ের কাছে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শেওলাধরা কবর দেখেছে বটে, তবে এটা যে কোনো পীরের কবর হতে পারে তা তারা কোনদিন ভাবেনি। কোন এক অচেনা মৌলবী মজিদ এসেই তাদের এ প্রথম জানাল যে এটা মোদাচ্ছের পীরের কবর।

মজিদ জানায় সে ময়মনসিংহের মধুপুরের গারোপাহাড়ে ভালোই ছিল। ওই অঞ্চলের লোকদের মন নরম। তারা আল্লাহ রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা আল্লাহ রাসুলের নামে বেচাইন হয়ে পড়ে। কিন্তু এতসুখ শান্তি ফেলে সে চলে এসেছে তার কারণ– এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে মোদাচ্ছের পীর তাকে ডাকছেন। সে ডাকেই সে দৌড়ে এসেছে।

মজিদ মহব্বত নগরে এসেই বুঝে নিয়েছে এ অঞ্চল শস্যশ্যামল, অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে এখানে। কিন্তু লোকজন ধর্মকর্মের প্রতি অত মনোযোগী নয়। সুতরাং ওখানেই তাকে ঘা দিতে হবে। মজিদ এও বুঝে, যে মিথ্যার ওপর তার ভিত তৈরি করে যে খেলা খেলছে সেটা খুবই কঠিন খেলা। তবুও তাকে এগুতে হবে। গ্রামের লোকজনের চোখে পানি দেখে সে বুঝেছে তার ওষুধ ধরেছে।

দেখতে না দেখতে দীর্ঘদিনের জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। পুকুর পাড়ের সেই অজ্ঞাত-অখ্যাত প্রাচীন জীর্ণ কবর ঝালরওয়ালা লালসালুতে আচ্ছাদিত হয়ে নতুন হয়ে ওঠে। আগরবাতির খুশবু আর মোমবাতির আলোতে ভরে উঠল চারদিক।

এবার কবরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আসতে লাগল। এতে মজিদের কবর-বাণিজ্য আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে ওঠল। মজিদের ঘর হলো, গৃহস্থালী হলো। অন্দর ঘর, গোয়ালঘর হলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মহব্বত নগর গ্রামে মজিদের নাটকীয়ভাবে প্রবেশের কারণ কী? তার এ প্রবেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।
২. 'আপনারা জাহেল, বে এলেম, আনপড়াহ।' এ উক্তি কার। এ উক্তির কারণ কী?
৩. মজিদ মধুপুরে কী অবস্থায় ছিল? তার এ বর্ণনার মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে?
৪. 'খোদার দিকে তাদের নজর কম।' কেন? মজিদ তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার জন্য কী কৌশলে অবলম্বন করেছিল?
৫. 'দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে খেলা সে খেলতে যাচ্ছে সে খেলা সাংঘাতিক' মজিদের এ আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের রচয়িতার কোন বক্তব্য কী ধরা পড়েছে?
৬. 'বতোর দিনে', নিরাকপড়া', মগরা মগরা' এ সব শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করে বাক্য লিখুন।
৭. 'খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ'। এ কথার ব্যাখ্যা লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বল্লেন - উনি কে? কাকে স্বপ্নে ডাকা হল? সেই স্বপ্নই বা কী?

উত্তর : 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের বক্তব্য অনুযায়ী মহব্বতনগর গ্রামের মোদাচ্ছের পীর তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন– সে যেন মধুপুর ছেড়ে এ গ্রামে চলে আসে। স্বপ্ন বৃত্তান্তের মূল কথা হলো মজিদ এ পরিত্যক্ত বাঁশ ঝাড়ের পাশের কবরটিকে ঝাড়পোছ করে নবরূপ দেবে নিজের জীবনধারণের উপায়টা ভালোভাবে গড়ে নেবে। এ স্বপ্ন মজিদের বানানো মিথ্যা ও অলীক।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সেই সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে এ গদ্যাংশটি উৎকলিত হয়েছে। এখানে মজিদের নিজস্ব ভাবনার একটি দিক উদঘাটিত হয়েছে।

মজিদ মধুপুর ছেড়ে নতুন আশায় মহব্বত নগর গ্রামে এসে ওঠেছে। এখানে টিকে থাকা ও স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা করা প্রয়োজন, তাই তাকে করতে হবে। এটাই তার মূল সিদ্ধান্ত। নানা দুর্বল চিন্তা তার মনের মধ্যে আসবে। কিন্তু ওসব তো প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ওগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।

মজিদ মনে করে পৃথিবীর সবারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মজিদের মুখ দিয়ে কথাটি বেরোলেও এটি জীবনের একটি গভীর দিক। ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি দুর্নীতি ইত্যাদি মূল্যবোধ মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টিতে বেঁচে থাকার অধিকার সবারই আছে। তাই মিথ্যা প্রতারণার কথা জেনেও মজিদ এ কঠিন দুঃসাহসী কাজে নেমেছে। তার যুক্তি হল মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার তারও তো আছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মজিদের বিবাহ পরবর্তী জীবনের অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মজিদের নবপরিণীতা স্ত্রী রহীমার চালচলনের ধরন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মহব্বত নগর গ্রামের লোকদের সঙ্গে ফসলি জমির সম্পর্ককে মজিদ কোন দৃষ্টি দিয়ে দেখে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিলো। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে ওঠেছিলো।

শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা। সত্যি সে লম্বা চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ– যে- দেহ দূর থেকে আলি ঝালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিলো– তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মত মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

–অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহীমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

–অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এ মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা–থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুণাহ্।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহীমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহীমার চোখে ভয়। মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

–অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইব।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তালাওয়াৎ শুরু করে। গলা ভালো তার,পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহীমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মত থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহীমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,

–খোলা জাগায় অমন বেশরমের মত দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহীমা হাত নামায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপ্‌টে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ঐ তো কেবল মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে হুকা। গলাসীসার মত অবশেষে লজ্জা আসে রহীমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো।

গ্রামের লোকেরা যেন রহীমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে-জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝান্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মত ভাগ করে ফেলে। সে জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মত জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের জমি–সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি–তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে–তবু কোমর পরিমাণ পানিতে

ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকের পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা—ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে—মন-কে মন।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোন এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাঠে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহীমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতই এরা তাগড়া গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের সামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মত লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুণাগার। জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা এ কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

শব্দার্থ ও টীকা

বেওয়া – সন্তানহীনা বিধবা। **আবছা আবছা** – অস্পষ্ট। যা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। **শীর্ণ** – চিকন, সরু। **প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা** – যার যৌবন উপচে পড়ছে। **হাড় চওড়া** – শক্ত দেহের বাঁধন। **গোঁয়ার** – এক রোখা স্বভাবের। **গোস্বা** – রাগ (ফারসি শব্দ)। **গুণাহ** – পাপ(ফারসি শব্দ)। **কবর আজাব** –কবরে শাস্তি। **শক্তিমত্তা** – প্রচণ্ড শক্তি, গায়ের জোর। **ঘনায়মান** – যা চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে। **হাস্নাহেনার মিষ্ট মধুর গন্ধ ছড়ায়** – মজিদের সুরেলা কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে মিষ্টি

মধুর সুরের হাওয়া বইছিল লেখক তাকে যথার্থভাবে হাস্নাহেনা ফুলের স্নিগ্ধ খুশবুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। **খোদা তালার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মত থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে** – মজিদের কুরআন তেলায়াতের ফলে এবং মাজারের রহস্যময় পরিবেশে তার প্রভাব পড়ার আলোকে মজিদের যুবতী স্ত্রী রহীমার মনে দারুন প্রতিক্রিয়া হয়। রহীমার মনের এ প্রতিক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক বিদ্যুতের আলোর ঝলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। **অব্যক্ত** – অপ্রকাশিত। **তাল পায় না**– কোন কূল কিনারা পায় না, হদিস পায় না। **বেশরম** – নির্লজ্জ। **বেগানা - বেগায়ের** – অনাত্মীয়, অপরিচিত। **তাগড়া-তাগড়া** – মোটা তাজা, শক্তিশালী। **আত্মমর্যাদার ভুয়োঝান্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্য** - গ্রামে জমিজমার অধিকারের সঙ্গে মর্যাদার সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি। তাই জমির প্রতি টান ও জমিকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপাত করতেও তাদের দ্বিধা নেই। জমির অধিকারের এ আত্মমর্যাদাকে ঔপন্যাসিক 'ঝাণ্ডা' বা পতাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিজের ভূখণ্ডে পতাকা উচিয়ে রাখার মত এটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তবে এ আত্মমর্যাদার মধ্যে কিছুটা প্রবঞ্চনাও আছে। তাই লেখক এটাকে 'ভূয়ো' বা -- নিরর্থক বলেছেন। **দলাগুলো** – মাটির ঢেলা। **সিপাইর খণ্ডিত** – ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন। **মাংসের মত** – ঔপন্যাসিক জমির ঢেলা ঢেলা মাটির খণ্ডকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের টুকরো টুকরো একত্রিত মাংসখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ এ মাটির ঢেলার জন্যও যুদ্ধ হয়, হানাহানি হয়, প্রাণপাত হয়। **রুঠা জমি** – নিস্ফলা জমি। অনুর্বর জমি। **আকাশ বিশাল নগ্নতায় জলেপুড়ে মরে** – মেঘ বৃষ্টি হীন নীল আকাশকে লেখক এ উপমায় চিত্রিত করেছেন। **পাথর হয়ে যায়** – নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে যায়। **দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে** – সরু চিকন কাস্তে। গাট্টাগোট্টা – শক্ত বাঁধুনিতে গড়া শরীর। **অবজ্ঞা** – অমর্যাদা, বিদ্রূপ। **খরাপড়া** – অনাবৃষ্টি দেখা দেয়া। **খতম পড়াবার জন্য** – গ্রামে যখন অনাবৃষ্টি বা কোন বিপদ আপদ দেখা দেয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআন পড়াবার ব্যবস্থা করে। কুরআনের ৩০ অধ্যায় পড়ে শেষ করাকে কোরান খতম করা বলে। এর মধ্যে যে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আসবে এটাই ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস। **বুত পূজারী** – মূর্তি পূজক। **নছিহত** – উপদেশ। **রিজিক দেনেওয়ালা** – খাদ্য যোগানদানকারী।

পাঠসংক্ষেপ

মহব্বত নগর গ্রামে মজিদ নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে নেয়। তারপর যৌবনদীপ্ত এক গ্রাম্য তরুণীকে বিয়ে করে। তার নাম রহীমা। রহীমার চাল-চলন একটু বেসামাল। মজিদ এজন্য তাকে খোদার ভয় দেখায়, সুরেলা কুরআন তেলোয়াত করে তার মনে প্রভাব বিস্তার করে। 'লালসালু' আবৃত মাজারটিও রহীমার মনে এক ধরনের রহস্যময় ভয়ের সঞ্চার করে।

মজিদ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যখন তাকায় তখন দেখে গ্রামের লোকগুলো ও রহীমার মতোই। তাদের মধ্যে খোদার ভয় কম। জমিতে ফসল ফললেই তারা খুশি। জমি ছাড়া তারা কিছু চেনে না। জমিই তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির ধারক বলে তারা মনে করে। এ জন্য একখণ্ড জমির জন্য তারা প্রাণ দিতেও দ্বিধা করেনা। খরার সময় জমি শুকিয়ে যায়। খোদাকে ভুলে থাকার জন্য তাদের ওপর নানা বিপদ এসে পড়ে। গ্রামের মানুষের এত পরিশ্রম। তবুও তাদের ভাগ্যের ঠিক ঠিকানা নেই। মজিদ এ ধরনের অবস্থায় মনে মনে উদ্বেগ ও চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। সে দাঁত খিলাল করতে করতে ভাবে রহীমাও ফসলের প্রাচুর্য ভালবাসে। কিন্তু লোকদের মতো ধানকে রক্তমাংসের মতো মূল্যবান মনে করে না। খরার পর, পানি সেচার ফলে যখন প্রচুর ধান জন্মে, গ্রামের মানুষ হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে ধান কাটতে যায়। তখন এ দৃশ্য মজিদের ভাল লাগে না। তখন তার চোখে ভেসে ওঠে 'লালসালু'তে ঢাকা কবর। কারণ এটাইত তার প্রধান সম্পদ।

মজিদ গ্রামের লোকদের বলে ফসলের মাঠে ধান দেখে যারা ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হয়। তারা মূলত মূর্তি পূজক। তার কথায় কাজ হয়। গ্রামের লোক লালসালুর কবরের কাছে আবার আসে। সে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদ তার স্ত্রী রহীমাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? রহীমার চালচলনের তার শাসনের কারণ কি?

২. 'মাটি-এ গোস্বা করে'। – এ কথার তাৎপর্য কী ? এ উক্তির পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য কি?

৩. মজিদ কখন রহীমার প্রতি গুরু গম্ভীর হয়ে পড়ে? তার কারণ কি?

৪. কারা জমিকে দাবার ছকের মতো ব্যবহার করে? এ জমির প্রতি গ্রামের মানুষের এত নিবিড় সম্পর্ক ও ভালোবাসা কেন?

৫. মুমূর্ষু যেমন সুস্থ মানুষের বা জরাজীর্ণ আত্মীয় জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের।' –কোন প্রসঙ্গে এ উপমা দেয়া হয়েছে? এ উপমার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৬. 'মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত পূজারী। তারা গুণাহগার।' – মজিদের এ উক্তি বিশ্লেষণ করুন।

৭. মজিদ কখন আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় – আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত পূজারী। তারা গুণাহগার।' - মজিদের এ উক্তি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : মজিদ মহব্বত নগর গ্রামে এসে লক্ষ করেছে গ্রামের লোকদের কাছে জমিই হল প্রাণ। কচি ধানে যখন জমি দেখা দেয় তারা গান গায়, ভুলে যায় খোদাকে। জমির জন্য তারা সব কষ্ট করতে রাজি। সে তুলনায় তারা ধর্মমুখী নয় যতটুকু তারা কর্মমুখী। খরার সময় এটা আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। তখন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জমিতে পানি দিয়ে ফসল ফলায়। গান গাইতে গাইতে সরু কাস্তে নিয়ে ফসলের মাঠে ছুটে। তখন খোদাকে স্মরণ করে না। 'লালসালু'র মাজারের দিকে তাকায় না। মজিদ নিজের স্বার্থেই ভাবে এটা ভাল লক্ষণ নয়। তাই তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্য সে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলে জমিতে ধান দেখে যাদের মনে আনন্দ ফূর্তি হয় তারা পাপী, তারা মূর্তিপূজক।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- খৎনা প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রহীমা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

–কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিয়া। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে ওঠে মজিদ বলে,

–হাসিও না মিঞা!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিলো। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মত হয়ে ওঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

—আমি গরীব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে—গাধার মত পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

—কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি—যে দেশ ছেড়ে এসেছে, যে শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান —সেখানে একদা এক মক্তবে এ রকম করে সে আমসিপারা পড়তো।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

—ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কল্মা শিখবা। ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মত বলে,

—গরীব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মত ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ্।

একদিন ধাড়িধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

—কীরে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

—অর অয় নাই।

সে রেগে বলে, —অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ। বলে, পরশুদিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয় তবে মুশ্কিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,

—হেই কবে আমার খৎনা হইছে।

তারপর বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,

—ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হুজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয়নি। গর্জন করে ওঠে বলে,

—তোল্ লুঙ্গি?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিলো, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিলো, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মত চোখ মেলে বসে থাকে।

খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

—আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।

দাড়িগোঁফ ওঠা মদ্দের মত ছেলে ঠির ঠির করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে।

সারাটি দুপুর কোরবানীর ছাগলের মত খুঁটিবন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারীও এসেছিলো ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়মড় করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মত গান যখন ধরে, তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয়নি। ভাবতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারীকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

—আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে বলে,

—আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই—তানারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারীর পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিস্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা জোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারীর কান পর্যন্ত লাল।

আধ ঘন্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেলো। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হলো। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিলো বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলো পাড়ার যত মেয়েরা—ছুকড়ি, জোয়ান, বুড়ি। রহীমা পর্যন্ত না দেখে পারলো না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা হাসলো।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেতো মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রামে নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ অপরাহ্নে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে। সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহীমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করতো— সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা। রহীমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মত স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোন বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে

বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন্ মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন—যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহীমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালু কাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে—না হয় লজ্জা, না হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এ সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অতর্কিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রূপালি ঝালর। রহীমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনদিন রহীমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে— তার ওপর করুণা করো। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

কলমা – মূল শব্দ আরবি 'কলমহ'। শব্দ, উক্তি, বাণী, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস পরিজ্ঞাপক উক্তি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদ রসুলুল্লাহ - আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই; মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। **ঘাড়গুঁজে** – হাঁটুর ভেতর ঘাড় ঢুকিয়ে বসা। **জ্বলন্ত পেট** – ক্ষুধার্ত পেট। **কলতান করে** – উচ্চস্বরে এক সঙ্গে সুর মিলিয়ে। **আমসিপারা** – আরবি বর্ণমালা এর উচ্চারণ সংবলিত সুরা সংকলন। কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। **যত্রতত্র** – যেখানে সেখানে। **ধাড়িধাড়ি ছেলে** – বয়স্ক ছেলে। **ধা করে** – হঠাৎ করে তীব্র গতিতে। **মদ্দ** – বয়স্ক পুরুষ। 'মরদ' শব্দ থেকে এ আরবি শব্দটি এসেছে। **মাথায় ছিট** – মাথা খারাপ। **ঠির ঠির করে** – ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। **মুখে রা নেই** – নিঃশব্দ, নির্বাক। **ধামড়া** – বয়স্ক। **তারস্বরে** – তীব্র শব্দে। **নির্নিমেষ চোখে** – এক দৃষ্টিতে, চোখের পলক না ফেলে তাকানো। **আর্জি** – আবেদন, অভিযোগ। **মহাতমিস্রা** – ঘোর অন্ধকার।

পাঠ সংক্ষেপ

মজিদ গ্রামের বৃদ্ধ দুদু মিঞাকে কলেমা না জানার জন্য কদর্য ভাষায় তিরস্কার করে। তার বয়স্ক ছেলের খৎনা দেয়া হয়নি এ জন্য গালমন্দ করে। গ্রামের মাতব্বর ও জোতদার খালেক ব্যাপারীর সঙ্গে ইতোমধ্যে মজিদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়ে ওঠেছে। খালেক ব্যাপারী মজিদের সব কথায় সায় দেয়। স্থির হয় আছরের নামাজের পর দুদু মিঞার বয়স্ক ছেলের খাৎনা দেয়া হবে। মজিদ সব যোগাড় করে। কিন্তু খাৎনা দেয়ার আগ মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যায় যে— বৃদ্ধ দুদু মিঞারও খৎনা হয়নি। খালেক ব্যাপারীর মাথা লজ্জায় নত হয়। কারণ সে এ গ্রামের মাতব্বর। মজিদ দুদু মিঞা ও তার বয়সী পুত্র দুজনকে এসঙ্গে খৎনা দেয়। গ্রামে এ ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বুড়ো-যুবক-শিশু-নারী সবাই এ মজার দৃশ্য দেখে। রহীমাও দেখে এ দৃশ্য। সবার মুখে চাপা হাসি আর ভয়। মজিদ এ ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রামে তার আসন আরও শক্ত করে নেয়। সে ভাবে খালেক ব্যাপারীর শক্তি আছে ঠিকই। কিন্তু তারও শক্তি আছে। তার শক্তির মূল হল মাজার। রহীমার অবস্থানও আস্তে আস্তে শক্ত হয়। কারণ সে শক্তিধর মজিদের স্ত্রী। তার মাধ্যমেই সবাই মাজারের দোয়া চায়। রহীমার মনও দয়ায় ভরে ওঠে। সে সবার জন্য দোয়া কামনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদ দুদু মিঞা ও তার ছেলেকে কীভাবে খৎনা দেয়? এতে গ্রামে কীরকম দৃশ্যের অবতারণা হয়?

২. 'আমার বাপেরও খৎনা হয় নাই– তানারে আগে দেন।' – একথা শুনবার পর মজিদও খালেক ব্যাপারীর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।

৩. 'মাজারটি তার শক্তির মূল।' – কথাটির ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করুন।

৪. রহীমার অবস্থান কীভাবে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে?

৫. 'না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার।' এটা কার অভ্যাস? তার এ কথা শুনে মজিদের কী প্রতিক্রিয়া হয়?

৬. স্বামীর কীর্তিতে রহীমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেন? এ কীর্তিটি কি?

৭. 'কোন কোন দিন রহীমা সারা মানব জাতির জন্য দোয়া করে।' – ঔপন্যাসিকের এ উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

ইউনিট ৩

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হাসুনির মা ও তার বাবা-মায়ের জীবন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হাসুনির মার-বাবাকে ঘিরে মজিদের ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহীমার কাছে। যেমন আসে ধান-ভাননি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিলো, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

—আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহীমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

—আমার আর্জি —ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহীমা বলে;

—ক্যান গো বিটি?

—জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহীমা প্রশ্ন করে,

—তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

—তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু। রহীমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

—আমার এক আর্জি বুবু।

—কও?

ওনারে কইবেন—বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহীমা প্রশ্ন করে,

—ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

—হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ-ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাপিয়ে-ঝাপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হানে।

—ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী—হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে— আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

—হুনছস্ কথা, হুনছস্?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

—ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌঁড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

—থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহীমাকে এসে বলে কথাটা।

—হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক—নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার। হঠাৎ সমবেদনায় রহীমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

—তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুঃস্থা মেয়ে। স্বামীর মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনতিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মত যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহীমা বলে,

শ্বশুর বাড়িতে যাওনা ক্যান?

—অরা মনুষ্যি না।

—নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রঙ ধরে। বতোর দিনে বাড়ির-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোন দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

—শরীলে রঙ ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মত মুখটা বাড়িয়ে বলে,

—খানকির বেটির নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে –গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিতো।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে, –তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধম্‌কে ওঠে।

–কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

–তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যাম্‌নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারি গলায় বলে,

–আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মদ্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাট নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেতো–যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিতো। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

–বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান–

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

–বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোন দিন কয় তাইলে মছিবৎ হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

–হুজুর, কোত্থিকা হুনছেন বেটির কথা?

–তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো–কোন কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোন বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিলো। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি–যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়তো তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিলো সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মত কথা ফুটতো মুখ দিয়ে আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এ হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মত? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না—তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দু মাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে। এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিলো, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হতো কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব ওঠেছিলো। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কান্ডটি নাকি ঘটেছিলো। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিলো যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মত গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা-ওরে ভাতার খাইকা জারুণি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিলো না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিলো না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেলো মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর, সে-ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহীমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহীমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিলো। প্রথমে কিছু বোঝা গেলো না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহীমাকে বলেছে; ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুকা টানে আর চেয়ে-চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে—এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহীমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোন কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এ জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহীমাকে বলে,

—অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহীমা বলে,

—ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গাম্ভীর্য কণ্ঠে বলে, —থাক তাইলে এখানে।

শব্দার্থ ও টীকা

সোপর্দ — সপে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া। **খালাস হমু** — মুক্তি পাব। **দুনিয়ার থন** — দুনিয়ার থেকে। **ঢেঙা** — লম্বাটে, লম্বা। **মুখে বিষ** — কদর্য ও অশ্রাব্য ভাষা যা বিষের মতো কটু। **সমস্বরে** — একই সঙ্গে শব্দ করে। **গুজরান** — অতিবাহিত করা, কাটানো। **অন্ন ধ্বংস করা** — খেয়ে দেয়ে শেষ করা। **পুলক যাহা** — আনন্দ হয়। **শুধায়** — জিজ্ঞাসা করে। **আমতা আমতা করে** — কী করবে বুঝতে না পেরে সংকোচ বা ইতস্তত করা। **মদ্দ** — বেটা ছেলে। **দেমাক** — মূল শব্দ আরবি দেমাগ্ বা দিমাগ্। অহংকার, গর্ব, এখানে বিগড়ে গেছে বা বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে এ অর্থে ব্যবহৃত। **আড়ি পেতে শুনবে** — চুপ করে অগোচরে ওৎ পেতে শোনা। **খচ করে ধরে** — মনে কাঁটার মতো বিধে যায়। **খোদাবন্দ** — খোদার বান্দা থেকে শব্দটি এসেছে। খোদারভক্ত। ঘূর্ণি খেয়ে — চক্কর মেরে বা ঘোরান দিয়ে। **আশ মিটিয়ে** — আশা বা সাধ পূরণ করে। **ফুরণ** — ফোড় দেয়া।

পাঠ সংক্ষেপ

তাহের কাদেরের বোন হাসুনির মা বিধবা। সে মজিদের স্ত্রী রহীমার কাছে এক আবেদন নিয়ে আসে। তার মনে অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা। সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। রহীমা তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে। আশ্বাস দেয় তার আবেদনের কথা মজিদকে বলবে। হাসুনির মার আবেদন তার বৃদ্ধ বাবা মা সারাক্ষণ গালাগালি ঝগড়া ঝাটি ও মারামারি করে। হাসুনির মার মা ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় তার ছেলেপুলের জন্ম নিয়েও কথা তোলে। তখন বৃদ্ধ রাগ সামলাতে না পেরে বুড়িকে পেটাতে আসে। হাসুনির মার ভাই তাহের কাদের বাপকে বাধা দেয় না– কারণ বাপের নামে সামান্য যে জমিটুকু আছে সেটা বাপকে চটিয়ে হাতছাড়া করতে চায় না। এসব কথা রহীমাকে বোঝায় সে। রহীমা তাকে সান্ত্বনা দেয়।

হাসুনির মা বিধবা হওয়ার পর থেকে বাপের বাড়িতেই থাকে এবং খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটে। ছোট মেয়ে হাসুনিও আছে। তাকেও খাওয়াতে হয়। রহীমা শ্বশুর বাড়িতে আর যেতে চায় না। ধানের মৌসুমে ধান ভানে গ্রামে। মাঠে ফসল হলে তার ভাল লাগে।

হাসুনির মার কথার সূত্র ধরে মজিদ তার বাপকে ডেকে পাঠায়। মজিদ জিজ্ঞাসা করে তার ঝগড়াঝাটির খবর। বুড়িকে শাসন করার কথা বলে। কিন্তু বুড়ো ভেবে অবাক হয় ঘরের কথা পরে জানল কীভাবে। হাসুনির মা ছাড়া মজিদের বাড়িতে তো কেউ আসে না। রাগে আর দুঃখে তার মাথা ঘোরে। বাড়িতে ফিরে হাসুনির মাকে বেদম পেটায় সে। হাসুনির মা মার খেয়ে ঘরে বসে থাকে না। মজিদের ওখানে ছুটে গিয়ে মরাকান্না জুড়ে দেয়। মজিদ হাসুনির মার কান্না শুনে কিছুটা খুশি হয়। এ ধরনের ক্রন্দনরতা মেয়ে মানুষের চেহারা তার ভাল লাগে। তবু বউকে বলে হাসুনির মার ব্যাপারটা সে দেখবে। আজ যেন চলে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হাসুনির মা কে? তার মা-বাবার জীবনযাত্রা কীরূপ?
২. হাসুনির মা মজিদের কাছে কি আর্জি জানায়?
৩. বুড়ো বাপ হাসুনির মাকে মারধর করে কেন?
৪. হাসুনির মার মা-বাবার কলহ থেকে মজিদ নিজের অবস্থান কীভাবে দৃঢ় করে নেয়?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতালা।' – এটা কার উক্তি? কেন এ উক্তি করেছে সে।
২. তাহের কাদের তাদের মা-বাপের ঝগড়ায় চুপ করে থাকে কেন?
৩. 'ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে।' – কেন?
৪. 'অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।' কে, কাকে, কোন উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছে?

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- তাহেরের বাপ ও তার বৃদ্ধা স্ত্রীর কলহপূর্ণ জীবন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

- হাসুনির মার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বৃদ্ধ বাপ-এর বিচার ও মজিদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিবরণ দিতে পারবেন।
- তাহের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা, আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তিবিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

—তোমার বিবি কি বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

—হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবারে ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

—এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমত— এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

—এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়-তা বইলা আমি কী পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে বলে,

—কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে, —কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও। বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,

—তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?

—আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি! — লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে—বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিলো সে, এবং ভেবেছিলো তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমত চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস্ করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করবার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদা-তা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষগুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তাও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরী বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয়

ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে—তারা এসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

—পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরীতে প্রিয় পয়গম্বর বাণি-এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব —যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। হজরতের এতো পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগলো। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবন্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা'লা মানবজাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিল্লা পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিলো, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদা তা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মত করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুণাহ্ বড় মস্ত গুণাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

—তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মত লোকের মুখের ওপর ঠাস্-ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ—এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মত নাচতো, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব ওঠেছিলো সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারতো। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাতো না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিলো, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, , পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস-তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

—কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোন কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিঃশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মত তাহেরের বাপ বলে,

—কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাতে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছট্‌ফট্ করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরণার মত বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

—তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পয়সার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবী করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সে কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, ওঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ চেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধুলিস্মাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠে না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

—দেখ্‌তো, ব্যাটা কী মরলো নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কি যে, কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

—তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

—বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মত আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মত শোঁ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মত ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মা'র হৈ-হৈ করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

—আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মত হয়ে ওঠেছে।

চিড়া-কটা গলাধঃকরণ করে, বলে,

—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে। বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়।

তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

—আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মত পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেক-ক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে, —মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হুহু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেলো। কেউ বলতে পারলো না গেলো কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তালাওয়াৎ শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

—আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে ওঠে কয়েকবার শিশুর মত বলে, আল্লা, আল্লা—। মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ—যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে—সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে ওঠেছে কি না জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ, ওঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম মৃত্যু ফসল হওয়া না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিলো, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিলো—যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিলো সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মত চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়—সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

—খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মা'র প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে। বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপ চাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসতো না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসতে লাগলো। কখনো ক্বচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতো, আর বুকটা দূর দূর কাঁপতো ভয়ে। বতোর দিনে এ বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেলো। মজিদের হাতে হুকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

—হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে-ক্রমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষতো রহীমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহীমাকে বলে,

—ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহীমা রুষ্ট স্বরে বলে,

—অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

—আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনিরে একটা জামা দিলেও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহীমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসতো। আজ হাসেও না।

শব্দার্থ ও টীকা

ঢেঙা – লম্বাটে, দীর্ঘ। **শয়তানের খাম্বা** – খাম্বা' শব্দটি হিন্দি 'খম্বা' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। একানে হাসুনির মার বাপ অর্থাৎ তাহেরের বাপকেই মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার বৃদ্ধা স্ত্রী সঙ্গে সদাসর্বদা ঝগড়া লেগেই আছে। এদিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা এসে মজিদের কাছে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়। তাহেরের বাপ একটু এক বোকা ধরনের লোক, প্রতিবাদী। মজিদের এটা মোটেই পছন্দ হয় না। তাই তার দৃষ্টিতে দীর্ঘ এ লোকটা যেন শয়তানের প্রতিমূর্তি। **বাজখাঁই** – অত্যন্ত গম্ভীর ও কর্কশ আওয়াজ। **ব্যাক্কই** – সকলেই, আঞ্চলিক শব্দ। **ঝুটমুট** – মিথ্যা, মিছামিছি। **ঢোল-সোহরত** – কোন বিষয় ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়া বা প্রচার করা। **ধিকিধিকি** – ধীরে ধীরে, ক্রমগত। **ঠ্যাঙাইছ** – মেরেছ। মূল শব্দটি ঠেঙানো, সেখান তেকে আঞ্চলিক প্রয়োগে ঠ্যাঙাইছ হয়েছে। **কুদরাত** – শক্তি, লীলাখেলা। **নেকবন্দ** – পুণ্যবান। **কুৎসা** – অপরের নামে বদনাম রটানো। **গর্হিত** – নিষিদ্ধ। **রসনা** – জিহ্বা, মুখের কথা। **প্রক্ষিপ্ত** – নিক্ষিপ্ত, বেরিয়ে আসা। **ঋজু ভঙ্গিতে** – সোজাভাবে বসা। **মোহিত** – মুগ্ধ। **রোশনাই** – আলো। **পেয়ারা** – প্রিয়। **পর বদ্দেগার** – প্রকৃত শব্দ পরওয়ার দিগার, ফার্সি এ শব্দের অর্থ দয়াময় আল্লাহ। **উদ্ধত** – অবাধ্য, গোঁয়ার। **খোদাতালার ভেদ** – খোদাতালার সৃষ্টির রহস্য। **ভালাই** – ভাল। **হলফ** – প্রতিজ্ঞা। **দিলে ময়লা নাই** – অন্তরে খারাপ কিছু নাই। **রদ্দি** – শব্দটি আরবি। অর্থ হল নিকৃষ্ট বা অচল। যেমন- রদ্দিমাল। **রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্তব্ধতা** – নিঃশ্বাস বন্ধ বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো নীরবতা। **এধার ওধার** – এদিক সেদিক। **থই পাচ্ছে না** – মারের দাগ পড়া। **বিভ্রান্ত** – হতবুদ্ধি। **লেলিহান** – দাউ দাউ করে জ্বলা। **সর্বসমক্ষে** – সকলের সামনে। **খোলাসা** – পরিষ্কার। **সায় দিয়ে** – সম্মতি দিয়ে। **রক্ত চড়চড় করে ওঠে** – রাগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপসিপানা মুখ – শুকিয়ে যাওয়া মুখ। **তালাশ** – খোঁজ, অনুসন্ধান। **নিত্য নিয়ত** – সদাসর্বদা। **দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ** – দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী বুঝাবার জন্য এ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। **অগ্নিদৃষ্টি** – রাগান্বিত চোখে তাকানো। **বালা** – (আরবি শব্দ) আপদ-বিপদ।

দ্বিরুক্ত বাচক শব্দ

উপন্যাসের এ পাঠে ঔপন্যাসিক অনেকগুলো দ্বিরুক্তিবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেএ-

এধার-ওধার, অস্থির-অস্থির, আথালি-পাথালি, পিট-পিট, কুর কুর (আওয়াজ), টিপে-টিপে, শূন্য-শূন্য, গবগব, সপসপ, চিনচিন, গোঙিয়ে-গোঙিয়ে, ছলছল (চোখ)।

পাঠসংক্ষেপ

হাসুনির মা বৃদ্ধ বাপের বিরুদ্ধে মজিদের কাছে অভিযোগ জানায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে মজিদের দরবারে বিচার বসে। এ বিচার সভায় মজিদের সর্বকর্মের সহায়ক খালেক ব্যাপারীও আসে। মজিদ তাহেরের বাপকে নানা প্রশ্ন করে জানতে চায় তার বৃদ্ধা স্ত্রী তার সম্পর্কে যেসব কথা বলে অর্থাৎ তাদের ছেলেপুলেদের জন্ম সম্পর্কে যেসব সংশয়মূলক ও আপত্তিকর কথা বলে সেগুলো সত্য কীনা। বুড়ো লজ্জায় ও ক্ষোভে বিচার সভায় কিছুই বলে না। শুধু মাথা নিচু করে বসে থাকে। মজিদ জিজ্ঞাসা করে সে কেন তার মেয়ে হাসুনির মাকে মেরেচে। বুড়ো তাহেরের বাপ নিরুত্তর থাকে। মজিদ পরোক্ষভাবে বুড়োর পক্ষ অবলম্বন করে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। মজিদ বলে মুখ দিয়ে অশালীন কথা রটনা করা মহাপাপ। মজিদ মহানবী (স)-র প্রিয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) র বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম প্রচার করারও উদাহরণ টেনে আনে।

সে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে সুরেলা ভাষায় কুরআনের সুরা পড়ে সবার মন ভিজিয়ে তোলে। তারপর তার অনুকূলে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলে বুড়ো তাহেরের বাপকে সরাসরি প্রশ্ন করে বুড়ির কথা সত্য কি না? বুড়ো এবারও অবাক বিস্ময়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। কী জবাব দেবে সে ভেবে পায় না। বুড়ির যৌবন বয়সে তাদের সংসার জীবনের প্রথমে তার স্ত্রী সম্পর্কে একটা কথা ওঠেছিল বটে, তবে সেসব কথা সে তখন পাত্তা দেয়নি। এতকাল পর এসব কথা টেনে এনে তাকে অপদস্ত করার কী অর্থ থাকতে পারে? মজিদ নানাভাবে ঘুরে ফিরে তার মুখ থেকে সেসব কদর্য কথা বের করে আনতে চায়। অবশেষে বৃদ্ধ লোকটি অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ এবার খুশি হয়। সে বলে ভালো মন্দের বিচার খোদা করবেন। তার করার কিছু নেই। তবে বুড়ো যেন তার মেয়ের কাছে মাফ চায়।

এ ঘটনার পর বুড়ো বাড়ি গিয়ে মনের দুঃখে শুয়ে পড়ে। তার মনে হয় সে তো কোন রূপ প্রতিবাদ জানায় নি। এতে বুড়ির অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ কষ্টে সে আর ও হতাশ হয়ে পড়ে। রাগে ও অপমানে ছটফট করে। তবুও বুড়ো মেয়ের কাছে ক্ষমা চায় একদিন ঝড়ের সময়। হাসুনির মা অবাক হয় বাপের এ ক্ষমা চাওয়ায়। এ ঝড়ের মধ্যে বুড়ো এসময় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কেউ আর তার খোঁজ পায় না।

ক্রমে ক্রমে নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সবাই ভুলে যায়। দুনিয়ায় সব কিছু আল্লাহর হুকুমে চলে এবং আল্লাহ যা করেন সব ভালোর জন্যই করেন- এ বিশ্বাসে তারা তাহেরের বাপের এ ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দেয় না। হাসুনির মাও বাপের কথা আস্তে আস্তে ভুলে গিয়ে মজিদের সংসারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট হয়। মজিদ একদিন তার জন্য একটা নীল রঙের কালো পাড়ের শাড়ি কিনে আনে। মজিদের স্ত্রী রহীমা এতে কোন কথা বলে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. তাহেরের বাপের বিরুদ্ধে কী অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার বসে।
২. 'ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?' কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? কেন তার ক্রোধ?
৩. বুড়ো তাহেরের বাপের বিচারের সময় ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে কোন ঘটনার উদাহরণ দেয়?
৪. তাহেরের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কী?
৫. হাসুনির মা কীভাবে মজিদের সংসারে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : তাহেরের বাপের বিরুদ্ধে কী অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার বসে।

উত্তর : তাহের বাপ তার মেয়ে হাসুনির মাকে ভয়ানক রকম মেরেছে। হাসুনির মা মরা কান্না জুড়ে দিয়ে মজিদের কাছে এ প্রহারের বিবরণ জানিয়েছে। মেয়েকে বাপের মারার কারণ হল, হাসুনির মা মজিদকে এমন এক গোপন কথা মজিদকে জানিয়ে দিয়েছে যা হাসুনির মা ছাড়া আর কেউ জানে না। ঝগড়ার এক পর্যায়ে হাসুনির মায়ের মা তার স্বামীকে বলছে, এ ছেলেমেয়েগুলো তার নয়। একথাটি মজিদের কানে কীভাবে পৌঁছিল? নিশ্চয়ই হাসুনির মা বলেছে। সে জন্য বুড়ো মেয়েকে খুব মেরেছে। এ অভিযোগের কারণে তার বিচার বসে।

প্রশ্ন : বুড়ো তাহেরের বাপের বিচারের সময় ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে কোন ঘটনার উদাহরণ দেয়?

উত্তর : তাহেরের বাপের বিচার সভায় মজিদ হযরত মুহাম্মদের (স.) স্ত্রী বিবি আয়েশা প্রসঙ্গে যে কুৎসা রটেছিল তা বর্ণনা করে। এক যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় হযরতের স্ত্রী আয়েশা দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তখন এক নওজোয়ান সেপাই তাঁকে সসম্মানে উটের ওপর বসিয়ে নিজে হেঁটে হেঁটে আসে এবং বিবি আয়েশাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বিবি আয়েশা হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহম্মদ (স.) এর পেয়ারা স্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধেও সেদিন কুৎসা রটনা করা হয়েছিল।

হযরত আল্লাহর কাছে কেঁদে কেটে প্রতিকার চাইলে আল্লাহ এক সুরা নাযিল করেন। সেই সুরা থেকে মজিদ কিছু পড়ে শোনায়।

প্রশ্ন : তাহেরের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : মজিদ তাহেরের বাপকে মেয়ের কাছে মাপ চাইতে নির্দেশ নিল। বিচারসভা এভাবে শেষ হয়ে যায়। এদিকে তাহেরের বাপ বাড়িতে এসে সটান শুয়ে পড়ে, তারপর চোখ বুজে ভাবে। বিচার সভায় সে স্ত্রী কথায় সায় দিয়ে এসেছে। এতে নিজের প্রতি তার ধিক্কার জাগল; ভয়ঙ্কর অপমানও বোধ হল। তার সম্পর্কে বুড়ি যে কুৎসিত ইংগিত করেছে তাতে তার মরমে মরে যেতে ইচ্ছা করল। এ লজ্জায় হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অবশ্য যাওয়ার আগে মেয়ের কাছে সে মাফ চেয়ে নিয়েছিল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কুৎসা রটনা বড় গর্হিত কাজ।
২. সে ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।
৩. যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না।
৪. যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

নমুনা উত্তর

কুৎসা রটনা বড় গর্হিত কাজ।

আলোচ্য অংশটুকু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'লালসালু' উপন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। উক্তিটি মজিদের।
হাসুনির মায়ের মা তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সে কুৎসিত বক্তব্য দিয়েছে তা চরম কুৎসা। মন্দ মানুষই কুৎসা রটনা করে। ভালো মানুষ কখনো এ কাজ করবে না। অনেক সময় মানুষ শয়তানের ফাঁদে পড়ে অন্যের কুৎসা রটনা করে। এক্ষেত্রে সে সত্য মিথ্যা যাচাই করে না। কুৎসায় অনেক ক্ষতি হয়, মান-মর্যাদার হানি হয়। সে জন্য কুৎসা হল একটি খারাপ কাজ। কুৎসা রটনাকারী বা নিন্দুক সর্বত্র ঘৃণিত। এ লোককে কেউ পছন্দ করে না। এ লোক মানুষের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ায়। সুতরাং কুৎসা প্রচার বন্ধ করতে হবে।

যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহর মহিমা ও মর্ম বোঝা যে সকলের পক্ষে সম্ভব নয় সে কথাটি এখানে বলা হয়েছে।
মজিদ গ্রামবাসীদের ভালো শিক্ষা দিয়েছে। তার শিক্ষায় তারা বুঝেছে যে জন্ম মৃত্যু রোগ শোক সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। সৃষ্টির মর্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন। তবে এটি বুঝতে হবে যে আল্লাহ যা কিছু করেন সবই মানুষের ভালোর জন্য করেন। অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যে অসহনীয় মনে হয়। ঘটনাটি বাস্তবে রূপ নিতই। তাছাড়া এর ফলও ভালো হচ্ছে। সে জন্য আল্লাহর কাজকর্মের ব্যাপারে বান্দার অত কৌতূহলী না হওয়াই ভালো। যে জিনিস বোঝা যায় না, তা নিয়ে কৌতূহল না থাকাই উত্তম।

ইউনিট ৪

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদের আকর্ষণের কথা এবং এর ফলে মজিদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহীমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে ওঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় সাপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে সিরসির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহীমাকে সে লক্ষ করেনি, সে-রহীমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহীমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

—পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহীমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মত কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

—ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করণ লাগবো।

—থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে-মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মত চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কী কোন কথা? তারই দেয়া বেগুনি রঙের শাড়ি পরা মেয়েলোকটিকে—খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল করছিলো উজ্জ্বল লালিত্যে—তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির

এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহীমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিলো, ধান সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সেও তাকায় না রহীমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূব আকাশ হতে স্বপ্নের মত ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন ওঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যূষের ঝিরঝির হাওয়ার মত ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তানার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ! কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার । মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়—বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁখাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মত লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারী কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজ কামকে অবহেলা করতে বলেন নি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

—ব'লে মজিদ চোখ পিট-পিট করে—যেন তার চোখ ছলছল করে ওঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

—খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারী করে। কিন্তু আবার দুমুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কা করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে-থেকে। গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহু ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ: সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমার কেমন ধান হইল মি:া?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মি:া বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতি-বিতি করে বলে, —যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মন ধান হলে অন্তত একশ মন বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয় নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে।

তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কি হবে বুঝে না ওঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে ওঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

শত সহস্র সাপ শিস দেয় – গনগনে আগুনের উত্তাপে যে ধোয়া হয় এবং ভাষা ওঠে তাতে এক ধরনের শব্দ হয়। লেখক এই শব্দকে সাপের শিষ দেয়ার শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ তুলনা আগুনের ভয়াবহতার সঙ্গে মজিদের মনে জাগ্রত কামুকতার চিত্র বলে ধারণা করা যায়। **তানার দোয়া** – এখানে লালসালুর নিচে শায়িত বলে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের কথা বলা হয়েছে। **অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে** – বড়াই করার ভাব গোপন রাখে। **শোকর গুজার করবার ভাষা** – আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দোয়া, যে ভাষায় ও প্রশংসায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেরকম ভাষা। **তোয়াক্কল** – ভরসা বা নির্ভর। **দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে** – অনেক দূরের সীমানায়। **নিতিবিতি করে** – সংকোচ ও ইতস্তত করে।

পাঠসংক্ষেপ

পৌষ মাসের প্রচুর নতুন ধান আসে মজিদের ঘরে। মজিদের স্ত্রী রহীমা আর হাসুনীর মা রাত জেগে ধান সিদ্ধ করে। চারদিকে আগুনের হলকা আর ধোঁয়া আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। মজিদ লাল আগুনের হল্কায় হাসুনির মাকে দেখে আকৃষ্ট হয়। তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। অবশেষে সে অস্থির হয়ে বিছানা থেকে ওঠে এসে রহীমাকে ডাক দেয় এবং তার পাদুটি টিপে দিতে বলে। রহীমা শেষ রাতে ভোর হওয়ার একটু আগে আবার ধানের কাছে চলে আসে। হাসুনির মা কোন কথা বলে না সংকোচে। ভোর হয়ে আসে এভাবে।

মজিদের ঘর ধানে ধানে ভরে ওঠে এ বছর মজিদ বলে আল্লাহর রহমতেই এসব হয়েছে। আর তার ওপর রয়েছে লালসালুতে আবৃত কবরের নিচের মোদাচ্ছের পীরের বিশেষ দোয়া। গভীর কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে। সে তার কাছে আসা লোকজনদের খোদাতালার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। তার ছোট ছোট দুটি চোখের চাওনি দৃষ্টি সীমার অনেক দূরে চলে যায়। কিন্তু এসব মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় তার মনের গভীরে ভাসতে থাকে হাসুনির মায়ের চেহারা। মনের এ ভাব ঢাকবার জন্য সে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে বলে এ বছরের ফসলের প্রাচুর্যের কথা। তবে তার কাছে আসা লোকজন ফসলের প্রাচুর্যের কথা মজিদকে বলতে কিছুটা ভয় পায়। কারণ আল্লাহর কালাম জানা লোকের সামনে যেন তেন কথা মন খুলে বলা যায় না। এদিকে মজিদের অন্তরে অন্য ধরনের ব্যথা বাড়তে থাকে, মাথায় আগুন চড়তে থাকে। আর তা হল হাসুনির মায়ের ভিন্নতর রূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদ আকৃষ্ট হয় কেন?
২. 'মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।' কোন প্রসঙ্গে লেখক একথা বলেছেন? এর তাৎপর্য কী?
৩. আল্লাহর ওপর এত ভরসা সত্ত্বেও মজিদের চোখে জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে কেন?

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. অন্ধকারে সাপের মত চকচক করে তার চোখ।
২. যার অন্তর খোদা-রসূলের স্পর্শ লাগে তার কী দুনিয়াদারী আর ভালো লাগে?

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নতুন পীর সাহেবের আগমনে মজিদের মনে যে আশঙ্কা ও ক্রোধ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। –গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই ওঠেছেন।

পীর সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিলো তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একথা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ-দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোন এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোন সম্বন্ধ নেই–কেবল বৃহৎ খড়্গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোন এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোন এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দূ জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে গল্প তাঁর রুহানি তা'কত ও কাশ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোন্‌কার মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রূহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মজিদ নিশ্চিত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। এতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তার নুরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝল্‌সে যায়, কারো এমন চোখ ভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক গন্ধ ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহীমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন, আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে–আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহীমা হঠাৎ বলে,

—এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

—মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহীমা দমে গেলো। তারপর আর কোন কথা হয় না। এক সময় রহীমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

এক সময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথার খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোন অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা ওঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহীমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহ ঘেষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মত পড়ে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

বজ্রনিনাদ – মেঘের প্রচণ্ড শব্দের মতো কণ্ঠের আওয়াজ। **এস্তেমাল** – ব্যবহার করা। **রুহানি তাকত** – আত্মার শক্তি। **কাশ্‌ফ** – উন্মোচিত। **নির্ণীত করা** – স্থির বা ধার্য করা। ধরে নেওয়া। **খড়্গনামা গৌরবর্ণ চেহারা** – ধারালো নাক আর সুন্দর উজ্জ্বল রঙের চেহারা। **রুহানি তাকত** – আত্মার শক্তি। **দীনতাবোধ** – নিজেকে ছোট মনে করা নিজের ক্ষুদ্রতাবোধ। **শঙ্কিত** – ভীত। **কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের** – অত্যন্ত চোট ও ক্ষণ স্থায়ী। **বাতরসস্ফীত পদযুগলে** – পীর সাহেবের মোটাসোটা ফোলা পা। লেখক ব্যঙ্গ করে পীরের পায়ের মোটামোটা রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, বাতরসের জন্যই পীর সাহেবের পা দুটো অত মোটা। **বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার** – মিথ্যা আশ্বাস ও নানা প্রলোভনের দোহাই দিয়ে সরল লোকজনকে আকৃষ্ট করে ফেলা, অনেকটা মায়াজালে আবদ্ধ করার মত। **নুরানী চেহারার দীপ্তি** – পীর সাহেবের চেহারার মধ্যে যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা তাকে নূরের ছটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **তামাক গন্ধ ভারী বুকের হাওয়া** – পীর সাহেব প্রায় সময় যেহেতু সুগন্ধী তামাক পানে রত থাকেন তাই তাঁর দোওয়া চাওয়ার জন্য যে কেউ কাছে গেলেই বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেই মিষ্টি গন্ধে আবিষ্ট হতে হয়। তামাকের সেই মিষ্টি গন্ধটা যেন পীর সাহেবের বুক থেকে বেরিয়ে আসে।

পাঠসংক্ষেপ

যে বছর গ্রামে প্রচুর ধান হয় সে বছর পীরের আগমনও ঘটে বেশি। এবারও মতিগঞ্জ থেকে তিন গ্রাম দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁর বাড়িতে এক বিরাট পীর এসেছেন। মতলুব খাঁ ঐ পীরের মুরিদ। পীরের আগমনে চারদিকে যে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে মজিদ তা টের পায়। টের পায় এ জন্যে যে মাজারে লোকজন আসা কমে

গেছে। সবাই ছুটেছে ঐ পীরের কাছে। মজিদ রাতে রহীমার মুখে সেই পীরের কথা শুনে জ্বলে ওঠে রাগে। এবার সে শংঙ্কিত না হয়ে পারে না। রাগে ও ক্ষোভে সে ফেটে পড়ে মতিগঞ্জের লোকদের প্রতি। একবার ভাবে সে তার সৃস্ট নকল মাজারটির কথা গ্রামবাসীদের জানিয়ে মজা করবে, প্রতিশোধ নেবে। তারপর এখান থেকে চলে যাবে অন্য আস্তানায়। কিন্তু ক্রমে তার রাগ কমে আসে, মাথা ঠাণ্ডা হয়। মৃতের মত চোখ দুটি খোলা রেখে চিত হয়ে শুয়ে তাকে রাতের বিছানায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পীর সাহেবের আসার কারণ কি? তিনি দেখতে কেমন?
২. মাজার সম্পর্কে মজিদের নিজের ভাবনার পরিচয় দিন।
৩. মজিদের মন থম থম করে কেন?
৪. মজিদের ক্রোধ হয় কেন?
৫. এ পাঠের কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন : পীর সাহেবের আসার কারণ কি? তিনি দেখতে কেমন?

উত্তর : গৃহস্থ বাড়িতে গোলায় ধান ওঠার পর পীরেরা সফরে বের হন। নানা জায়গায় পীরের দুএকটা মুরিদ থাকে। ধান ওঠার পর মুরিদের বাড়িতে এলে পীরের খাতির যত্ন বেশি হয়। কারণ ধান থাকার জন্যে মানুষের মনও এ সময় প্রসন্ন থাকে।

পীর সাহেব এসেছেন এ জন্য যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর মুরিদ। পীর সাহেব এর বাড়িতেই ওঠেছেন।

পীর সাহেবের বেশ বয়স। তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছেন বলে কথিত আছে। পীর সাহেবের গায়ের রং ফর্সা এবং তিনি উন্নত নাসা সুপুরুষ।

প্রশ্ন : মাজার সম্পর্কে মজিদের নিজের ভাবনার পরিচয় দিন।

উত্তর : মাজার সম্পর্কে মজিদের নিজের কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। কারণ এ মাজার যে মোদাচ্ছের পীরের মাজার নয় এ কথা মজিদই ভালো জানে। আসলে মোদাচ্ছের পীর বলে কেউ নেই। মজিদ একটি ভাঙা কবরকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে চালিয়েছে। এ মাজার মজিদের সৃষ্টি। এর সব কিছু মজিদ জানে। সুতরাং এ মাজার সম্পর্কে মজিদের কোনো বিশ্বাস থাকার কথা নয়।

প্রশ্ন : মজিদের মন থম থম করে কেন?

উত্তর : মজিদের মন থম থম করে এ জন্য যে পীর সাহেবের আগমনে সে সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। পীর সাহেবের মতো রুহানি শক্তি তার নেই। তা ছাড়া লোকজন মজিদের চেয়ে পীরকে বেশি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। পীর সাহেবের আসার পর থেকে মাজারে ও লোকজন কম আসে। লোকজন ছোটে আওয়ালপুরে পীর সাহেবের কাছে। তাঁকে একটু দেখতে চায়, তাঁর পায়ে একটু চুমু দিতে চায়। এসব দেখে শুনে মজিদ গম্ভীর হয়ে যায়। মাজারে লোক না এলে মজিদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামের লোকের ওপর মজিদের প্রভাবও কমে যাবে।

প্রশ্ন : মজিদের ক্রোধ হয় কেন?

উত্তর : রাতে শোয়ার সময় মজিদের স্ত্রী রহীমা পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। এতে মজিদ বোঝে যে ব্যাপার অনেক দূর এগিয়েছে। তাছাড়া পরদিন মজিদ দেখে লোকজন সব পীরের কাছে ছুটে চলেছে। এতে

মজিদ মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। মজিদ জানে পীর সাহেবও তার মত ভণ্ড। অথচ পীরের প্রতি তার নিজের এলাকার লোকও শ্রদ্ধাবান। গাঁয়ের লোকজনের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ হয়। তাঁর মনে হয় এরা সব বিশ্বাসঘাতক। ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ নকল মাজারের রহস্য সবাইকে জানিয়ে দেয়ার কথাও ভাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতে তার বিশ্বাস হয় না।
২. এ বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোন অভাব আছে?

নমুনা উত্তর

এ বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোন অভাব আছে?

আলোচ্য লাইনটি সেয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। গাঁয়ের লোকজনের প্রতি ক্রুদ্ধ মজিদের মনোভাবের পরিচয় এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

আওয়ালপুরে এক পীর সাহেব আসাতে লোকজন সব তাঁর কাছে ছুটছে। মাজারের লোকজন আসা কমে যায়। এতে মজিদ বিপদ গণে। মাজারে লোক না এলে তার প্রতিপত্তি কমে যাবে। তখন এ গ্রামে থাকা অর্থহীন। মজিদ লোকজনের এ ব্যবহারকে মনে করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা। সে একবার ভাবে নকল মাজারের রহস্য সবাইকে বলে দেবে। তারপর সে ঘরবাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় চলে যাবে। মজিদ ভাগ্যান্বেষী মানুষ। সে অন্য জায়গা থেকে এসে মহব্বতনগরে আস্তানা করেছে। এখন এখানে যদি তার ভালোভাবে থাকবার উপায় না থাকে তাহলে অন্যত্র সে তার ভবিষ্যৎ দেখবে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- পীর সাহেবের প্রতি ভক্তিমান মহব্বতনগরের লোকদের কীভাবে মজিদ আবার তার প্রভাবে নিয়ে এল সে কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলো তখন সূর্য হেলে পড়ছে। মতলুব মি:ার বাড়ির সামনেকার মাঠটা লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশ্‌কিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মত মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে-পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ্য করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিয়া হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়তো তিনি এমন এক জরুরী কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা করে, কারো-বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধ ঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে, এমনি সময় হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠলো। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো। —পীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মত হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মত ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন—সোহবতে তো'য়ালে তুরা তো'য়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে) —তখন গোটা জমায়েতের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও করে ফেললো। হঠাৎ পাগল হয়ে ওঠেছে তারা। যে যা পারলো ধরলো, —কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটলো। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এ আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে ওঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠলো পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আর তা-শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠলো। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এ মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে ওঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারি পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনের দ্রুতবিস্তারের মত পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না দেখতে ছড়িয়ে গেলো। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে ওঠেছিলো, এবার তারা মরা-কান্না জুড়ে বসলো। পীর সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারী ঢেউ-এর মত সম্মুখে ভেঙে এলো জনস্রোত। অনেক মরা-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ ওঠে দাঁড়িয়ে বললে,

—ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেলো।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠলো। শতশত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নি:সঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এলো। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো,

—চেঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

কোন্ নামাজ হইলো এটা?

—কাহে? জ্বোহরকা নামাজ হুয়া। উত্তর শুনে আবার চীৎকার করে গালাগাল শুরু করলো মজিদ। বলরে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জ্বোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জ্বোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস ছেকে ছায়া আছলী এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জ্বোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেলো না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিলো তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যে ছিলো।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বলে,

—কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

মহ্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলো। কারো কারো মনে ভয়ও হয়েছিলো— এ বুঝি পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এলো।

মতিগঞ্জের সড়কে ওঠে ফিরতিমুখো পথ দিয়ে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নি:শ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করলো, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরী বৈঠক বসলো। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করলো—ভাই সকলরা সকলে অবগত আছেন, যে, বে'দাতি কোন কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হলো বে'দাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভনিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। —আউয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ নিয়ে লক্ষ্য করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিক-ই আছে যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে পড়বে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া,

খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্য তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ কবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ ক্বাজা করেননি—তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ্ করছেন।

এ পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাই গলায় প্রশ্ন করে, হুনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোন মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেলো যে না, তা নয়। কিন্তু গেলো অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেলো দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জে গেলো। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো, বেহেস্ত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করলো কতক্ষণ।

কালু মি:া গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে, বলে, —পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব। ভাঙ্গ-গাঁজা খাওয়া রসকষশুন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথম দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে ওঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদনমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকতে ঝাঁকছে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মি:ার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

—কোন চিন্তা করবানা মি:া। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদরযত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোন প্রয়োজন ছিলো না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রুষার শেষ নাই। খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বসেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কিনা তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

শব্দার্থ ও টীকা

লোকে-লোকারণ্য – অনেক লোক। **কালো মাথার সমুদ্র** – অনেক লোকের মাথা এক দৃষ্টিতে কালো সমুদ্রের মত দেখায়। **ব্যাহত** – বাধাপ্রাপ্ত। **জন সমুদ্রের উত্তাপ** – অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকতে জায়গাটা গরম হয়ে ওঠেছে। **দফায় দফায়** – কিছুক্ষণ পর পর। **সর্বজনবিদিত** – সকলের জানা। **মূর্তিবৎ** – মূর্তির মতো। **বয়েত** – শ্লোক। **পাখা সঞ্চালন** – পাখা চালনা বা নাড়ানো। **ভাবমত্ততা** – ভাবের পাগলামি। **সাবলীল** – স্বচ্ছন্দ। **দ্রুত বিস্তার** – তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাওয়া। **মরা কান্না** – কেউ মারা যাওয়ার সময় নিকট জনেরা যেভাবে কাঁদে। **জনস্রোত** – অনেক মানুষের এক সঙ্গে ধেয়ে চলা। **কাতার** – সারি, লাইন। **খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্নতায়** – পাগলা, বা উত্তেজিত কুকুর যে রকম তীক্ষ্নভাবে ডাকে। **বেদাতি** – ইসলাম ধর্মের প্রচলিত

রীতিনীতির বাইরের কোন কিছু। **মস্করা** – ঠাট্টা। **চেঁচামেচি করতা কিছকা ওয়াস্তে** – কি জন্য চেঁচামেচি করছ। **জবান** – ভাষা। **পন্থা** – পথ। **বেশরিয়তি** – ইসলাম ধর্মের আইন বিরুদ্ধ। **কাহে? জ্বোহরকা নামাজ হুয়া** – কেন? জোহরের নামাজ হয়েছে। **আছলী** – পুরো, অবিকল, সঠিক। **কদম** – পদক্ষেপ। **নাগাল** – ধরা ছোঁয়া। **মুখ খিস্তি** – মুখ বিকৃত করে খারাপ কথা বলা। **তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুযটারে** – তখন তোদের পীর সূর্যটাকে ধরে রাখতে পারলো না? **তওবা** – মুসলমান ধর্মমতে প্রায়শ্চিত্ত। **অশ্রাব্য** – যা শোনার যোগ্য নয়। **দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়** – পীর ও মজিদ ও দুইয়ের মধ্যে কাকে তারা মানবে সেই দ্বন্দ্ব তাদের মনে আসে। **জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে** – রাগের মধ্যে জ্বালা আছে, কিন্তু রাগের উদ্দেশ্য মানুষগুলোকে সুপথে আনা। **প্রলুব্ধ করবার জন্য** – লোভ দেখানোর জন্য। **মনোমুগ্ধকর** – মনকে যা মুগ্ধ করে। **কারসাজি** – কৌশল, ফন্দি। **ভণ্ডুল** – নষ্ট। **জাহান্নাম** – নরক। **চরিতার্থ** – সফল। **মকরুহ** – গর্হিত, নিষিদ্ধ। **বাজখাঁই** – উঁচু ও কর্কশ আওয়াজ। **জেহাদি জোশ** – ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা। **তারতম্য** – পার্থক্য। **ব্যাণ্ডেজ** – Bandage, ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্য কাপড়ের পট্টি। **কম্পাউন্ডার** – ডাক্তারের সহকারী, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী যে লোক ওষুধ তৈরি করে। **ভাঙ্গ-গাঁজা খাওয়া রস কষ শূন্য হাড়গিলে চেহারা** – গাঁজা ভাঙ ইত্যাদি নেশা খেলে মানুষের চেহারা খুব বিশ্রী হয়ে যায়। **শাহি কাণ্ডকারখানা** – বিরাট আয়োজন। **তকলিফ** – কষ্ট। **লেজুড়** – লেজ।

পাঠসংক্ষেপ

মজিদ দুপুরের পরে আওয়ালপুরে গিয়ে পৌঁছে দেখে, অসংখ্য লোক। সবাই পীর সাহেবকে দেখতে ও তার ওয়াজ শুনতে এসেছে। মতলুব মিয়া হুজুরের গুণ বর্ণনা করতে বলে, তাঁর ক্ষমতা এত বেশি যে তিনি সূর্যকেও ধরে রাখতে পারেন। পীর সাহেবের ওয়াজ শুনে লোকজন ভাবে বিগলিত হয়ে যায়। ভক্তজনের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি গাছের ডালে ওঠে পড়েন। এতে লোকজন আরো বিচলিত হয়ে পড়ে। লোকজনের কান্নাকাটিতে তিনি অবশেষে গাছ থেকে নামেন। ততক্ষণে বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। পীর সাহেবের লোকেরা জোহরের নামাজ পড়ার জন্য সবাইকে কাতারে দাঁড়াতে বলে। মজিদ এতক্ষণ এসব কাণ্ড দেখছিল। এবার সে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। পীরের লোকেরা লাঠি দিয়ে মেপেও জোহরের নামাজের সময় বের করতে পারে না। মজিদ তখন মুখ খিস্তি করে পীরের ক্ষমতা নিয়ে কটাক্ষ করে। আর মহব্বতনগরের লোকদের নিয়ে ফিরে আসে। মজিদ গ্রামের লোকজনকে বুঝায় যে, পীর সাহেব মানুষকে বিপথে নিচ্ছে। মহব্বতনগরের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে পীরের আস্তানায় হামলা করতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। খবর শুনে মজিদ তাদের দেখে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদ আওয়ালপুরে কেন গেল?
২. পীর তখন কী করছিল? মতলুব আলী পীরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলেছিল?
৩. পীর ফারসি বয়াতে কী বলেছিল? ভক্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পীর কী করেছিল?
৪. মজিদ কোন্ ব্যাপারে প্রতিবাদ করল? এতে কী ফল হল?

৫. মজিদ গ্রামের লোকদের কী কথা বলল?
৬. যে সব নতুন শব্দ ও বাক্যাংশ আপনি শিখলেন সেগুলো লিখে রাখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মজিদ আওয়ালপুরে কেন গেল?

উত্তর : মজিদ আওয়ালপুরে গেল পীরের কারসাজি ধরিয়ে দেয়ার জন্য। বিশেষ করে মহব্বতনগরের লোকদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে তার অসুবিধা হবে। কেননা এরাই তাকে মান্যগণ্য করেছে। এদেরকে যেভাবে হোক বোঝাতে হবে। পীর সম্বন্ধে এদের মোহ দূর করতে হবে।

প্রশ্ন : পীর তখন কী করছিল? মতলুব আলী পীরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলেছিল?

উত্তর : মজিদ আওয়ালপুরে পৌঁছে বহু লোকের ভিড়ের সামনে পীরকে দেখতে পায়। পীর তখন একটি বটগাছের তলায় বসা। একটি লোক মস্ত এক পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করছে। পীর দফায় দফায় ওয়াজ করছেন।

পীরের মুরিদ মতলুব মিয়া পীরের গুণপনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। ইচ্ছে করলে তিনি সূর্যকেও এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন। যেমন, সূর্যকে ধরে রেখে পীর যখন ইচ্ছা জোহরের নামাজ পড়তে পারেন।

প্রশ্ন : মজিদ কোন্ ব্যাপারে প্রতিবাদ করল? এতে কী ফল হল?

উত্তর : জোহরের নামাজের সময় বহুক্ষণ আগে পার হওয়ার পরও পীর সাহেবের নির্দেশে এক লোক সবাইকে কাতারবন্দী হতে বলে। নামাজ শেষ হওয়ার পরে মজিদ চীৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, জোহরের নামাজের সময় বহু আগে পার হয়েছে। পীরের লোকেরা লাঠি দিয়ে সূর্যের ছায়া মেপে দেখে মজিদের কথা ঠিক। মজিদ তখন মহব্বতনগরের লোকদের তার সঙ্গে ফিরে আসার জন্য বলে। লোকজনও তার সঙ্গে চলে আসে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

প্রদত্ত অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের সঙ্গে মজিদের তুলনা করা হয়েছে।

মজিদ ধর্মকে ব্যবহার করে মহব্বতনগরের লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই লোকজনই আওয়ালপুরে এক পীর এসেছে শুনে দলে দলে তাঁর কাছে গিয়েছে। অর্থাৎ তারা মজিদের চেয়ে ঐ পীর সাহেবকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাস্তবে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। মজিদ আওয়ালপুরে গিয়ে দেখে মহব্বতনগরের বহু লোকও বিশাল ভিড়ের মধ্যে আছে। এরা মজিদকে চেনে, কিন্তু আজ কেউ মজিদকে রক্ষ্য করছে না। সকলের লক্ষ্য ঐ পীর সাহেব। পীর গুণে মানে মজিদের চেয়ে অনেক বড়। পীর যেন সূর্য, অন্যদিকে মজিদ হল ক্ষুদ্র প্রদীপ। সূর্যের প্রখর আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমনি পীরের কাছে মজিদ আজ ম্লান।

দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

এ অংশটি নেয়া হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে। এখানে মজিদের এক বিশেষ উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে।

মজিদ যখন আওয়ালপুরের পীর সাহেবের শয়তানি ব্যাখ্যা করে বোঝাল তখন মহব্বতনগরের লোকেরা স্থির করল তারা ঐ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর যাবে না। অতি উৎসাহী হয়ে কিছু জোয়ান পরদিন পীরের আস্তানায় হাঙ্গামা করতে এসে পীরের চেলাদের হাতে প্রচণ্ড ঠাঙ্গানি খেল এবং স্বভাবতই গুরুতর আহতদের যেতে হল হাসপাতালে। খবর শুনে মজিদ তাদের দেখতে গেল। মজিদের সঙ্গে কম্পাউন্ডারের কথা হয়েছিল মাত্র। কম্পাউন্ডার তাকে পাত্তাও দেয়নি। মজিদ কিন্তু ফিরে এসে আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বলল সে বড় ডাক্তারকে বলে এসেছে। বিরাট হাসপাতালের ডাক্তার তাকে খাতির যত্ন করেছে এবং রোগীদের ভালো করে দেখবে বলেছে। এ ডাক্তার তার মুরিদ। অবলীলায় সে মিথ্যা কথা বলতে পারল। অথচ তার মতো লোকের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা একেবারেই অকল্পনীয়। কিন্তু মজিদ জানে সবাইকে খুশি করতে হল সম্ভব-অসম্ভব অসত্য কথা বলতে হয়। কেননা তাকে দুনিয়াতে টিকে থাকতে হবে। সেজন্য সে বলছে দুনিয়া বড় বিচিত্র জায়গা।

ইউনিট ৫

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমেনা বিবির সমস্যা সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- আমেনা বিবির জন্য পীর সাহেবের পানি পড়া নিয়ে আসা সম্পর্কিত ঘটনাটি বিবৃত করতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও সচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘ পথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পান্‌সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাত দিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কি হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোন খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিলো না। তার প্রধান কারণ তাঁর জঈফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গী ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উল্‌টো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাগরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মত জোরালো। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেতো, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিলো যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গা-টা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষকাটালে। যৌবনের দিক থেকে সে তানু বিবির মত জোয়ারলাগা ভরগাঙ না হলেও একেবারে টস্‌কানো নয়, বোচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছ্যাতা

পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রঙ ধবধব করে; নাকে সতীনের মত জ্বলজ্বলে নাকছাবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকলো। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মত সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশ্‌কিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসলো। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সা'বের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনদিন জ্বরজ্বারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, —তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, —আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ-এর খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা সচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক—যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্‌টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। এক জনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবি কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে-বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলামিঞা। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়-দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। কচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কী হয় না, কোনদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন ধলামিঞা।

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অশ্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনমতে বলে,

—কী কাম দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথমে বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভনিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে—যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রামে থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়া পানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এ যে, শেষপর্যন্ত কোন ছেলে-পুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুব্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুরুব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

—কি গো ধলামিঞা, বুঝলান নি আমার কথাডা?

—জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাৎ করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এ যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিলো যে, যে-সব দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাড়াটা কাটলেও ঐখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাৎ সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা ধলা মিঞা।

—ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

—জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

—আরেক কথা। কথাডা যানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

—তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুকায় টান দিচ্ছিলো, হঠাৎ সেটা নাবিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢঙ দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—তার ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নীচু করে সে বললে,

—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভনিতাসহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলো, তারই ওপর রঙ ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিঞাকে ডেকে বলে দিলে, আওয়ালপুরে গিয়ে পীরসাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিঞা হঠাৎ ফিচ্‌কি দিয়ে হাসে।

—আওয়ালপুর গেলে কী আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কী ঠিক হইব? — আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা—আর কথাডা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

—কী কন?

—কী আর কমু এ সব কাম কী চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কী আইন-আদালত না মামলা মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিঞার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডান্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিঞা বলে,

—আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্ট স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিঞা যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিঞা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

—হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামু নে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিঞার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

—তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুমনে পানি পড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কী বিবেক বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,

—না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিঞা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ ক'রে সে-ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য—সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মত।

ধলামিঞা ভারিমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোন বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

শব্দার্থ ও টীকা

আস্তানা - স্থান। **আবক্ষ** - বুক পর্যন্ত। **শানদার** – উজ্জ্বল, জৌলুশপূর্ণ। **জোব্বা জুব্বা** – জোব্বা ও জুব্বা একই অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ লম্বা আলখাল্লা জাতীয় ঢিলে জামা। **ভাটির দেশ** – নদী বিধৌত অঞ্চল, বাংলাদেশ অর্থে। **অস্বস্তিকর** – অশান্তিপূর্ণ। **হদিশ** – সংবাদ, খবর। **জো** – উপায়। **খচখচ** – অস্বস্তির ভাব। **হামলা** – আক্রমণ। **জঈফ** – অতি বৃদ্ধ, শক্তিহীন। **দাঙ্গাবাজি** – মারপিট। **সাকরেদ** – শিষ্য। **নিরস্ত** – ক্ষান্ত। **নিস্পৃহতা** – ইচ্ছার অভাব। **কল্লা** – মাথা। **ধড়** – শরীর। **আফসোস** – অনুতাপ, দুঃখ। **অন্দর** – ভিতর বাড়ি। **ফি-বৎসর** – প্রত্যেক বৎসর। **নানি বুড়ি** – নানি দাদী জাতীয় গ্রাম্য ধাত্রী। **টসকানো** – দুমড়ানো। **ছ্যাতা** – ছত্রাক, ময়লা দাগ। **নাকছাবি** – নাকের অলংকার। **টিকলো** – তীক্ষ্ণ। **আলগোছে** – আস্তে করে। **ফিকির ফন্দি** – কৌশল, বুদ্ধি। **খোদ** – স্বয়ং, নিজেই। **ইবলিশ** – প্রধান শয়তানের নাম। **লেবাস মুক্ত** – পোশাকহীন। **নিরালা** – একলা, নির্জনে। **পলক** – অতি সামান্য সময়, চোখের পাতা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। **ত্রিসীমানায়** – কাছে কিনারে। **সাহায্য** – মর্যাদা। **গাভুর** – চাকর, শ্রমিক। **মাঠাইল** – মাঠচাষী। **প্রতিপত্তি** – ক্ষমতা, দাপট। **একাট্টা** – এক সঙ্গে যুক্ত। **ঠাহর** – অনুমান, খোঁজ। **কিছিম** – ধরন। **নির্বিবাদে** – শান্তিতে। **মস্করা** – ঠাট্টা। **খায়েশ** – ইচ্ছা। **ভনিতা** – ভূমিকা। **রেস্তা** – সম্পর্ক, আত্মীয়তা। **দেবংশি** – দেও-দানবের অংশ, ভুতের আশ্রয়। **সন্নিকটে** – কাছে। **দজ্জাল** – দুষ্ট, অত্যাচারী। **নিস্তার** – অব্যাহতি। **ফিচকি দিয়ে হাসা** – দুষ্টের মতো হাসা। **সন্দিগ্ধ** – সন্দেহযুক্ত। **কালাম** – বাণী। **চেলা** – শিষ্য। **মমার্থ** – মূল কথা। **মতলব** – উদ্দেশ্য **উপলব্ধি করা** – বোঝা। **খেদমতে** – সেবায়। **বেমালুম** – অগোচরে, অজ্ঞাতে। **বেহুদা** – অকারণে। **নিমরাজি** – অর্ধেক রাজি। **বরখেলাফ** – অমান্য। **ভারি মুখ** – বেজার, অখুশি মুখ।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

উপন্যাসকে জীবনধর্মী করার জন্য চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়। 'লালসালু' একটি বাস্তব জীবনধর্মী উপন্যাস, সে জন্য এ উপন্যাসেও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। আপনি 'লালসালু' উপন্যাসের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি ভালো করে দেখুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।

'লালসালু' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সবাই গ্রামের, সুতরাং এটা স্বাভাবিক। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর লালসালু' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার চমৎকার ব্যবহার করেছেন। মজিদ মাজারের খাদেম এবং একজন মোল্লা। তার মুখের কথা মোল্লা-মৌলবীর মতো হয়েছে; এতে মাঝে মাঝে আরবি ফারসি শব্দের মিশেল আছে। গ্রামের অন্যান্য চরিত্রের সংলাপও যথাযথ হয়েছে। 'লালসালু' উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলের ভাষা সে প্রশ্ন করা যায়। আমাদের মনে হয, ঢাকা অঞ্চলের ভাষার আদল এতে আছে। এ-ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ প্রায় ক্ষেত্রে অপিনিহিতজাত, - যেমন 'পরে'র বদলে পইড়া, 'করে'র বদলে 'কইরা',, 'কেঁদে কেটে' হয় 'কাইন্দা কাইটা', এ ছাড়া রয়েছে 'করতে'র বদলে 'করবার', নেওয়ার বদলে নিবার, যাবো'র পরিবর্তে 'যামু, 'স'র জায়গায় 'হ', যেমন 'সেই'-এর বদলে 'যেই', শুনি হয় হুনি, সর্বনাম 'তিনি' ও তাঁর 'তানি' ও 'তানার' আমাদের বদলে 'আমাগো, নির্দেশক টা ও টি যথাক্রমে 'ডা' ও 'ডি'-যেমন কথাটা 'কথাডা, ছোটটি ছোডডি প্রশ্নবোধক কেন হয় ক্যান, অব্যয় যেন ও থেকে হয় 'যানি' ও থিকা ইত্যাদি। আঞ্চলিক শব্দ তো আছেই, যেমন ছেলে অর্থে 'ছ্যামরা', শরীর অর্থে 'শরীল' আঞ্চলিক কথ্যবুলি উচ্চারণের টানটুনে বেশি স্পষ্ট হয়। আঞ্চলিক শব্দ, বাকরীতি ও উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে আঞ্চলিক ভাষার রূপ ফুটে ওঠে। আপনারা 'লালসালু'র আঞ্চলিক ভাষারীতি লক্ষ্য করুন।

শেষকাটালে – শেষ সময়ে।

থিকা – থেকে।

আইনা – এনে।

ক্যান – কেন।

আইচ্ছা – আচ্ছা।

কাম – কাজ।

দুলামিঞা – বোনের স্বামী, জামাই।

বুঝলান নি – বুঝলেন কি।

কথাডা – কথাটা।

যানি – যেন।

বইনে – বোনে।

হুনে – শোনে।

করবার – করতে।

লগে – সঙ্গে।

আছিল – ছিল।

আহি – আসি।

কেলা – কলা (তুচ্ছার্থে)।

চাইপা – চেপে, গোপন করে।

জী কন – কি বলেন।

কী আর কমু – কি আর বলব।

চাপাচাপি – গোপন করে।

হেই পীরের কাছে আমি যামু না – সেই পীরের কাছে আমি যাব না।

পইড়া – পড়ে।

আসুম – আসব।

বাগধারা

ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া -	রাগ বা উত্তেজনা কমানো
এক হাত দেখে নেওয়া -	প্রতিশোধ নেওয়া।
শূন্য কোল -	সন্তানহীন
বুক বেঁধে থাকা -	ধৈর্য ধরে থাকা
ওস্তাদের মার -	কুশলী ব্যক্তির নৈপুণ্য
জোয়ার লাগা ভরা গাঙ	পরিপূর্ণ যৌবন
কথা পাড়া -	বিষয় উত্থাপন করা
মরিয়া হয়ে ওঠা -	বেপরোয়া ভাব
লজ্জা-শরমের বালাই -	লজ্জার বোধ।
ভর দুপুরে -	ঠিক দুপুর বেলায়
খাপে খাপে মেলা -	সম্পূর্ণ রূপে মিলে যাওয়া
পালাই-পালাই ভাব -	পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে
কাক পক্ষীও খবর না পায় -	কেউ যাতে টের না পায়, সকলের অজ্ঞাতে
ঘুণাক্ষরে -	আভাসে ইঙ্গিতে
বংশে বাতি জ্বালা -	বংশ রক্ষা করা
মন গলে পানি হওয়া -	দয়ালু হওয়া
পরগাছা -	যে অন্যের খেয়ে বাঁচে
কেতা দুরস্ত -	ফিটফাট
ফাড়া কাটা -	বিপদ দূর হওয়া
ধরা পড়ে যাওয়া -	পরিচয় প্রকাশ পাওয়া
বুদ্ধি গজানো -	বুদ্ধির জন্ম
থ হওয়া -	হতবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়া
রঙ ফলানোর	বাড়িয়ে বলা
মুখে ছায়া পড়া -	বিরক্তিতে কিংবা চিন্তায় মুখ অপ্রসন্ন হওয়া
বুকের রক্ত শীতল হওয়া -	অতিরিক্ত ভয় পাওয়া
গলা শুকানো -	ভীত হওয়া
গা ঢাকা দেয়া -	লুকিয়ে থাকা
ধামাচাপা দিয়ে রাখা -	গোপন করা
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া -	ওপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা।

ব্যাকরণ

বাংলা শব্দ তৈরির একটা উপায় হল সমাস। সমাসের সাহায্যে দীর্ঘ কথাকে এক শব্দে পরিণত করা যায়। এতে ভাষার সৌন্দর্য বাড়ে। আলোচ্য পাঠে এ রকম কিছু সমাসবদ্ধ শব্দ আছে। এ-শব্দগুলো এবং এগুলোর ব্যাখ্যামূলক বাক্য (ব্যাস বাক্য) ভালো করে দেখে নিন।

নিরুদ্বিগ্ন – নিঃ(নয়) উদ্বিগ্ন

আবক্ষ – বক্ষ পর্যন্ত

আ-নোনা – আ(নয়) নোনা

অস্বস্তি – স্বস্তির অভাব

ভাগ্যান্বেষী – ভাগ্য অন্বেষণ করে যে

বাঁচা মরা - বাঁচা ও মরা

ফি-বৎসর – বৎসর বৎসর

ভরা গাঙ - ভরা যে গাঙ

কান্না সজল – কান্নায় সহজ

আগাগোড়া – আগা থেকে গোড়া

দেবংশি – দেব অংশ যার

দলিল-দস্তাবেজ – দলিল ও দস্তাবেজ

আইন-আদালত – আইন ও আদালত

মামলা-মোকদ্দমা – মামলা ও মোকদ্দমা

নিমরাজি – অর্ধেক রাজি

ঠক-পীর – ঠক যে পীর

পাঠসংক্ষেপ

মজিদের মনের ভিতরে ভয় থাকলেও আওয়ালপুরের বুড়ো পীর সাহেবের কাছ থেকে পাল্টা হামলা হয়নি। খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমেনা বিবি নিঃসন্তান। সন্তান লাভের কামনায় সে স্বামীকে অনুরোধ করে ঐ পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া আনতে। মজিদ এর আগে পীর সাহেবের কাছে যেতে সবাইকে মানা করে দিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর খাতিরে ব্যাপারী তার সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে আওয়ালপুর থেকে রাতে গোপনে পীরের পানি পড়া আনতে বলে। ধলা মিয়া মুখে রাজি হলেও ভূতের ভয়ে আওয়ালপুরে যায় না। সে মজিদের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে এবং মজিদকে অনুরোধ করে পানি পড়া দিতে। এ পানি পড়া সে পীরের পানি পড়া হিসেবে চালিয়ে দেবে। মজিদ পানি পড়া দিতে মোটেও রাজি হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদের মনে অস্বস্তি কেন?
২. পীর সাহেব মহব্বত নগরে হামলা করতে চায়নি কেন?
৩. মহব্বত নগরের কোন্ লোক পীর সাহেবের সাহায্য চায় এবং কেন?
৪. ধলামিঞা কে? খালেক ব্যাপারী তাকে কি করতে বলল?
৫. ধলা মিঞা আওয়ালপুরে যেতে চায় না কেন?
৬. ধলা মিঞার মনে কী মতলব ছিল?

৭. মজিদ ধলা মিঞার প্রস্তাবে রাজি হয়নি কেন?

৮. বাক্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করুন।

এক হাত দেখে নেওয়া, ওস্তাদের মার, ঘুণাক্ষরে, কেতাদুরস্ত, গা ঢাকা দেয়া, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মজিদের মনে অস্বস্তি কেন?

উত্তর : মজিদ কিছুদিন আগে আওয়ালপুরের পীর সাহেবেকে ইবলিশ শয়তান বলে গালাগাল করেছে। সে মহব্বত নগরের লোকদের বুঝিয়েছে যে, এ পীর আসলে ভণ্ড এবং বিপথগামী। মজিদের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহব্বত নগরের কিছু যুবক পীরের আস্তানায় গিয়ে হামলাও করেছে। হামলা করতে গিয়ে নিজেরাও জখম হয়েছে। মজিদ আশঙ্কা করে পীরে সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা এ হামলার বদলা নেবে। তারা নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য মজিদের মনে রাত-দিন অস্বস্তি জেগে রয়েছে।

প্রশ্ন : পীর সাহেব মহব্বত নগরে হামলা করতে চায় নি কেন?

উত্তর : আওয়ালপুর থেকে মহব্বতনগর অনেকটা দূর, প্রায় তিন গ্রাম ব্যবধান। এতে দূরে এসে হামলা করা তেমন সুবিধার হবে বলে পীর সাহেব মনে করেননি। তাছাড়া তাঁর বয়সও হয়েছে অনেক। তিনি এখন জরাক্রান্ত ও দুর্বল, যৌবনের তেজ নেই। এ-বয়সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাঁর পছন্দের নয়। সে জন্য মহব্বত নগরে হামলা করতে তিনি উৎসাহ দেখান নি।

প্রশ্ন : মহব্বত নগরের কোন্ লোক পীর সাহেবের সাহায্য প্রার্থী এবং কেন?

উত্তর : মহব্বতনগর গ্রামের প্রতিপত্তিশালী জোতদার খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমেনা বিবি পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। আমেনা বন্ধ্যা নারী। ব্যাপারীর সঙ্গে বহুদিন ঘর করছে সে, কিন্তু তার কোনো সন্তান হচ্ছে না। তের বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, এখন তিরিশ। অন্য দিকে আমেনা বিবির সতীন তানু বিবির সন্তান হচ্ছে প্রত্যেক বৎসর। আমেনা বিবির বিশ্বাস, পীর সাহেবের পানি পড়া খেলে সে সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে। সে শুনেছে, যে মেয়ে লোকের সারা জীবন সন্তান হয়নি সেও পীরের পানি পড়া খেয়ে ছেলের মা হয়েছে। সে জন্য আমেনা পীরের দোয়া চায়।

প্রশ্ন : ধলা মিঞা আওয়ালপুরে যেতে চায় না কেন?

উত্তর : খালেক ব্যাপারী তাঁর সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে আমেনা বিবির জন্য আওয়ালপুর থেকে গোপনে পীর সাহেবের পানি পড়া আনতে বলে। পানি পড়া নিতে তাকে আওয়ালপুর থেকে যাত্র শুরু করতে হবে শেষ রাতে, যাতে ভোর হওয়ার আগেই ধলামিঞা মহব্বত নগরে ফিরে আসতে পারে এবং এ ব্যাপারে কেউ যেন টের না পায়। কিন্তু ধলা মিঞা আওয়ালপুরে যেতে চায় না। আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথের তেঁতুল গাছের তলা দিয়ে রাতের বেলা আসতে সে ভীষণ ভয় পায়। কারণ তেঁতুলগাছটি দেবংশি অর্থাৎ এগাছ ভুত প্রেতের আস্তানা। তা ছাড়া পীর সাহেবের সাঙ্গোপাঙ্গোদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ও তার ছিল।

প্রশ্ন : ধলা মিঞার মনে কী মতলব ছিল ?

উত্তর : ধলা মিঞা তেঁতুল গাছ ও পীরের চেলাদের ঠ্যাঙ্গানি খাওয়ার ভয়ে আওয়ালপুরে যেতে চায় না। সে মজিদের কাছ থেকে গোপনে পানি পড়া নেওয়ার মতলব করে। এ পানি পড়াকে সে পীর সাহেবের পানি পড়া হিসেবে চালাবে। মনে মনে সে স্থির করে, শেষ রাতে উঠে সে গ্রামের বাইরে কোথায়ও লুকিয়ে থাকবে, দুপুরে সুযোগ বুঝে সে মজিদের কাছ থেকে পানি পড়া চেয়ে নেবে। আর খালেক ব্যাপারী পীর সাহেবের জন্য যে টাকা দিয়েছে তার অর্ধেকটা মজিদকে দেবে, বাকি টাকা সে আত্মসাৎ করবে।

প্রশ্ন : মজিদ ধলা মিঞার প্রস্তাবে রাজি হয়নি কেন?

উত্তর : ধলা মিঞার কাছ থেকে সব কথা জেনে মজিদ খুব রেগে যায়। সে মহব্বত নগরের প্রধান তার নিষেধ সত্ত্বেও আমেনা বিবি ও খালেক ব্যাপারী কেন আওয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া আনতে চায় তা মজিদের রাগের কারণ। তাছাড়া মহব্বতনগরের সবাই তাকেই পীর হিসেবে জানে। সে ক্ষেত্রে আমেনা বিবি তার ওপর বিশ্বাস

রাখল না কেন? এ সব প্রশ্ন মজিদকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সে জন্য ধলা মিঞার প্রস্তাবে সে পানি পড়া দিতে রাজি হয়নি।

প্রশ্ন : বাক্যে নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারাগুলো ব্যবহার করুন

মরিয়া হয়ে ওঠা, বুক বেঁধে থাকা, ফাড়া কাটা, বংশে বাতি জালানো, থ হওয়া।

উত্তর

মরিয়া হয়ে ওঠা – প্রথম পুরস্কার পাওয়ার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বুক বেঁধে থাকা – ছেলেরা মানুষ হবে- এ আশায় স্বামী-স্ত্রী বুক বেঁধে আছে।

ফাড়া কাটা – যাক, এবারের মত ফাড়াটা কাটল।

বংশে বাতি জ্বালান – আবার বংশে বাতি জ্বালানোর কেউ নেই; আমি মরলেই সব শেষ।

থ হওয়া – এক রত্তি ছেলের কাণ্ড দেখে থ হতে হল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা বাঁচা-মরার মত জোরালো।

২. দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

৩. এক জনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি।

৪. সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

৫. ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মত।

নমুনা উত্তর

সে অন্দরের লোক গো, ... মত জোরালো।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে আমেনা বিবির জন্য পীর সাহেবের পানিপড়া আনার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

আমেনা বিবি মহব্বত নগর গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সে সন্তানের মুখ দেখতে পায়নি। ওদিকে তার সতীন তানু বিবির প্রতি বছর বাচ্চা হচ্ছে। সন্তানহীনা আমেনা বিবির মনে বড় দুঃখ। নিজেকে বড় অপূর্ণ মনে হয় তার। সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে নারীর জীবনে সার্থকতা থাকে না। আর সন্তান না থাকলে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? সে জন্য আমেনা বিবি এ-বয়সেও সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আওয়ালপুরে এক পীর সাহেব এসেছেন জেনে সে খুব খুশি হয়। কিন্তু মজিদ এ পীরকে ভণ্ড শয়তান ও বিপথগামী আখ্যা দিয়েছে। মহব্বতনগরের সব মানুষকে সে পীরের কাছে যেতে মানা করেছে। মজিদের লোকেরা গিয়ে পীরের আস্তানায় দাঙ্গাও করেছে। কিন্তু এ সব কাণ্ড আমেনা বিবি মোটেও পছন্দ করে নি। সন্তান লাভ করতে হলে পীরের সাহায্য চাই। পীরের পানি পড়া খেলেই তার ইহজীবনের দুঃখ ঘুচে যাবে, সে সন্তানবতী হতে পারবে। আমেনা বিবির কাছে পীরের গুরুত্ব সেজন্য এত বেশি।

সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা পথ তাদের এক।

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে মহব্বতনগরের দুই শক্তিশালী মানুষ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

এ দুই শক্তিমান পুরুষ হল মজিদ ও খালেক ব্যাপারী। এরা একে অন্যের পরিপূরক। তবে মজিদের শক্তি খালেক ব্যাপারীর চেয়ে বেশি। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান লাভের জন্য আওয়ালপুরের পীর সাহেবের পানি পড়া খেতে চায়। কিন্তু মজিদ পীর বিরোধী। মজিদ সিদ্ধান্ত দিয়েছে, পীরের ত্রিসীমানায় কেউ ঘেষবে না। এখন বিবির জন্য পানিপড়া আনতে গেলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ হয়। খালেক ব্যাপারী বিস্তর জমিজমার মানুষ এবং সে গ্রামের মাতব্বরও। মজিদকে তোয়াক্কা না করলেও সে পারে। কিন্তু ব্যাপারী জানে মজিদ হল সমাজের মূল, তার কথায় সমাজ উঠে বসে। মজিদের শক্তির উৎস সালু কাপড়ে আবৃত মাজার। এ মাজারের প্রতি মানুষের ভয়-বিশ্বাস ও ভক্তি রয়েছে। খালেক ব্যাপারী সে জন্য মজিদকে চটায় না। অন্যদিকে মজিদেরও প্রয়োজন খালেক ব্যাপারীকে। এ গ্রামে ব্যাপারীই সবচেয়ে বেশি বিষয়-আশয়ের মালিক। তাকে হাতে রাখা খুবই প্রয়োজন। এতে গ্রামের সব লোক মজিদকে মান্য করবে। এ বিচারে বলা যায় মজিদ আর খালেক ব্যাপারী একই পথের পথিক। দুজনেরই মূল লক্ষ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখা।

ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মত।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া। এখানে মজিদকে উপেক্ষা করে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া আনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তানের জন্য পীর সাহেবের পানিপড়া খেতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে সে স্বামীকে অনুরোধ করে। কিন্তু ব্যাপারীর হয়েছে বিপদ। মহব্বতনগরে সবচাইতে প্রতাপশালী লোক হল মজিদ। মজিদ সবাইকে পীরের ধারে কাছে ঘেষঁতে মানা করে দিয়েছে। তানু বিবির খাতিরে খালেক ব্যাপারী তার সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে গোপনে পানিপড়া আনতে বলে। ভূতের ভয়ে ধলা মিঞা আওয়ালপুরে না গিয়ে মজিদের কাছে পানিপড়া নিতে আসে। মজিদ কিন্তু বেঁকে বসে। মজিদই এ গ্রামের ধর্মগুরু, সে মাজারের খাদেম। তাকে উপেক্ষা করে এবং তার কথা না শুনে ঠক পীরের কাছ থেকে পানিপড়া আনার জন্য লোক পাঠানো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো। মজিদ এ জন্য খুব রাগ করে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আমেনা বিবির সন্তানলাভের উপায় হিসেবে মজিদের মতলবের একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

যতক্ষণ নোতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু-জনে গরু-ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহীমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধুমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

—হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ঈমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সট্‌কাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মত আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

—কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধ্বসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

—তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

—লোক পাঠামু তানার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখদুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধ্বসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারী বলে,

—হেই কথা আমি ভাবতাছি। আছে কী না আছে —হুদাহুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝান আর কী। ঠগ-পীরের পানিপড়ায় কী কোন কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে-বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মত বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়—শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে—ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলামিঞারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই—

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

—খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কী জোর নাই?

—আহা-হা , মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

—কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, তাগো কথা হুনলে পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোঁফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মত মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

—ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কি করি এহন । কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

—তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নোতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

—পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দ। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দ প্যাঁচ!

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?

—ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবো কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে—তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহ্‌রী না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরীফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরীফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যাথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দ প্যাঁচ কী আরো বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়-চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

শব্দার্থ ও টীকা

ছিলিম — এক কল্কে তামাক। **ব্যারাম** — অসুখ। **দানাপানি** — খাদ্য। **ঈমানদার** — বিশ্বাসী। **ঘাবড়াবার** — ভয় পাওয়ার। **মনের কথা পড়া** — ভিতরে কি আছে তা জেনে ফেলা। **গলা ধ্বসে যাওয়া** — গলা দিয়ে শব্দ না আসা। **বিসদৃশ** — উল্টাপাল্টা। **চাঙ্গা** — সজীব। **দিল** — মন। **চোট** — আঘাত। **ডর** — ভয়। **পুলকিত** — আনন্দিত। **ধাক্কা সামলানো** — স্বাভাবিক হওয়া। **মনে ধরা** — মনে কষ্ট পাওয়া। **প্রতিপত্তিশালী** — শক্তিমান। **গুণচর্চা** — গুণের প্রশংসা। **ঢলে** — ঝোঁকে, বিশ্বাস করে। **বিস্তারিত** — খোলাখুলি। **পাক ধরেছে** — পেকে উঠছে। **বেকুফ** — বোকা। **ভুয়া** — মিথ্যে। **ফায়দা** — লাভ। **বেড়ি** — বেষ্টনি, বন্ধনি। **কৌতূহল** — জানার আগ্রহ। **উৎকণ্ঠিত** — চিন্তিত, ব্যাকুল। **উদরাঞ্চল** — পেট। **নগ্ন দৃষ্টি** — খোলা চোখ। **সেহেরী** — রোজা রাখার জন্য শেষ রাতের খাবার। **শুদ্ধচিত্তে** — পবিত্র মনে। **প্রসব বেদনা** — বাচ্চা হওয়ার বেদনা। **এফতার** — রোজা ভাঙার জন্য খাবার। **অসংলগ্ন** — এলোমেলো।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

করতাছে — করছে

সট্‌কাইছে — পালিয়ে গেছে

কইবার পারি না — বলতে পারি না

গেছে গিয়া — চলে গেছে

তানার — তাঁর

পাঠামু — পাঠাব

হেই কথা আমিও ভাবতাছি — সে কথা আমিও ভাবছি

হুদাহুদি — শুধু শুধু

আইনা — এনে

হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী — সে ভেবেছে মিথ্যে পানি এনে লাভ কি ?

কইয়াও দেখলেন না — বলেও দেখলেন না

দূর থেকে যা হোনে তাতেই চলে — দূর থেকে যা শোনে তা বিশ্বাস করে

কথাডা ঠিক কইছেন — কথাটা ঠিক বলেছেন

তাগো — তাদের

এহন — এখন

কাইন্দা কাইটা – কেঁদেকেটে

তানারে কন – তাঁকে বলুন।

খোলন – খোলা

পোলা পাইন – ছেলেপিলে, সন্তান

বইলাই – বলেই

তয় – তবে

দেখন লাগবো – দেখতে হবে।

পাঠসংক্ষেপ

মজিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায়। কথায় কথায় ব্যাপারী এটি বুঝতে পারে যে পানি- পড়া আনার ঘটনা মজিদ জেনে গেছে। মেয়ে মানুষের মন বোঝানোর জন্য যে এককাজ করেছে এ রকম একটা ধারণা দিতে ব্যাপারী চেষ্টা করে। মজিদের দুঃখ আমেনা বিবি তার চেয়ে ঠক-পীরকে বেশি বিশ্বাস করল। মজিদ ব্যাপারীকে এক অদ্ভুত কথা শোনায়। বলে, আমেনা বিবির পেটে বেড়ি পড়েছে, সেজন্য তার সন্তান হচ্ছে না। কথাটি সে এমনভাবে বলে যাতে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। মজিদ উদ্বিগ্ন ব্যাপারীকে বেড়ি খোলার উপায়ও জানিয়ে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পানিপড়া আনার প্রসঙ্গ নিয়ে মজিদ খালেক ব্যাপারীকে কী বোঝায়?

২. 'আমার মুখে কী জোর নাই? - কথাটির তাৎপর্য কী?

৩. মজিদের মতে আমেনা বিবির সন্তান লাভের উপায় কী? বর্ণনা করুন।

৪. যে আঞ্চলিক শব্দগুলো আপনি জেনেছেন সেগুলো লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : পানিপড়া আনা প্রসঙ্গে খালেক ব্যাপারী মজিদকে কি বোঝায়?

উত্তর : মজিদের কথায় খালেক ব্যাপারী বুঝে ফেলেচে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মজিদ পীরের কাছ থেকে পানিপড়া আনার পরিকল্পনা জেনে গেছে। ধরা পড়ে ব্যাপারী লজ্জিত হয় এবং সে মজিদকে বোঝাতে চায় আমেনা বিবির জন্য সে এ কাজ করেছে। মেয়েমানুষের মন বোঝা ভারি মুশকিল। তা নইলে ঠক পীরের পানিপড়ায় যে কোনো কাজ হয় না তা সে বোঝে। ব্যাপারী মজিদকে এও বোঝাতে চায় যে ধলামিঞা লোকটা তত বোকা নয়। সে মজিদের কাছে পানি পড়া চেয়েছে এ জন্য যে মজিদের পানি পড়াই খাঁটি, আর পীরের পানি পড়া ভুয়া।

প্রশ্ন : আমার মুখে কী জোর নাই? - কথাটার তাৎপর্য কী?

উক্তিটি মজিদের। আমেনা বিবি ও খালেক ব্যাপারী মজিদের চেয়ে পীর সাহেবকে বেশি মূল্য দেয়াতে মজিদ এ উক্তি করেছে। তার দুঃখ কেন আমেনা বিবি তাকে একবার বলে দেখল না। সে মাজারের খাদেম। সেও ঐশী শক্তিতে বলবান। তার কাছ থেকে কত লোকে পানিপড়া চেয়ে নিচ্ছে এবং উপকার পাচ্ছে। অথচ আমেনা বিবি তার ওপর বিশ্বাস রাখে নি। সে পীরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এ কথাটি সে বোঝাতে চায়। আসলে মজিদ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার এলাকার বাইরের লোকের কদর হবে তা সে ভাবতেই পারে না।

প্রশ্ন : মজিদের মতে আমেনা বিবির সন্তান লাভের উপায় কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর *।* মজিদ খালেক ব্যাপারীকে এক অদ্ভুত কথা জানায়। সে বলে আমেনা বিবির পেটে বেড়ি পড়েছে। এ বেড়ি না খুললে সন্তান লাভের আশা নেই। পেটে বেড়ি পড়ে বলেই মেয়ে লোকের সন্তান হয় না। কারো বেড়ি সাত, কারো চৌদ্দ বা তার বেশি। তবে সাতের বেশি হলে ছাড়ান যায় না। আমেনা বিবির পেটের বেড়ি খোলার উপায় জানতে চাইলে উৎকণ্ঠিত খালেক ব্যাপারীকে মজিদ একটি নিয়ম পালনের কথা বলে। তা হল একদিন সেহ্‌রী না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে এবং সারাদিন কারো সঙ্গে কথা না বলে কোরান পড়তে হবে। এরপর সন্ধ্যায় এফতার না করে তাকে মাজারে আসতে হবে। তখন মজিদের দেয়া পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি মাজারের চারদিকে সাতপাক দেবে। আমেনা বিবির বেড়ি যদি সাত হয় তাহলে সাতবার ঘুরলেই পেটে তীব্র বেদনা হবে। তখন বুঝতে হবে যে বেড়ি খুলে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা

চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এ অংশে খালেক ব্যাপারীর মনের অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

মজিদ ধলামিঞার কাছ থেকে পানিপড়া আনার কথা জেনে যায়। তারপর সে খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায় এবং আওয়ালপুরের পীরের কথা জিজ্ঞাসা করে। পীরের নাম শুনে ব্যাপারী চমকে ওঠে এবং তার চোখের পাতা নাচতে থাকে। চোখের পাতা নাচলে অমঙ্গল বা বিপদ ঘনিয়ে আসে এ-রকম একটা কুসংস্কার মানুষের মনে রয়েছে। কিন্তু সব সময় তা যে হবে এমন কথা বলা যায় না। সেজন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এভাবে চিন্তা করে ব্যাপারী মজিদের সামনে স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হাসুনির মার মায়ের মৃত্যুর খবর ও মজিদের প্রতিক্রিয়ার একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

—কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিলো সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাস-খানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিলো মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোন মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মা মরছে।

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মরলো গো বিটি?

—এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামরারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছে নি?

—করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়বো।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না।

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুঁকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মত বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে যে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে কবরে লোক-চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে—এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মত কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাধে। থেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেস্তে-নছিব কর, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মত গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ ক্বাজা হবে না তো?

শব্দার্থ ও টীকা

ধোঁয়াটে – ধোঁয়ার মতো। **আলতোভাবে** – হালকাভাবে। **নিকটবর্তী** – কাছে। **সঞ্চালন** – নাড়ানো, চালানো। **আকস্মিক** – হঠাৎ। **উদ্বেগ** – দুশ্চিন্তা। **চলন-বলন** – চলাফেরা ও কথাবার্তা। **আনাড়ি** – অদক্ষ। **বেঠিকপানা** – ভুলযুক্ত। **খড়্‌কুটো** – শুকনো ঘাস। **শ্বসন** – শ্বাস প্রশ্বাস। **দরদ** – সহানুভূতি। **ফ্যাৎ-ফ্যাৎ** – নাকের শব্দ। **বজ্রাহত** – বাজ পড়েছে এমন। **ভান করা**

– কৃত্রিম আচরণ করা। **আর তার ... করে আসছে** – মুসলমানেরা মৃত্যু সংবাদ শুনলে আরবি দরুদ পড়ে–ইন্নাল্লিাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। **বান্দা** – দাস। **দাফন-কাফন** – মৃত মানুষকে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে কবর দেয়া, মৃতদেহের সৎকার। **যোগাড়যন্ত্র** – ব্যবস্থা। **জানাজা** – কবর দেয়ার আগে মৃতের জন্য নামাজ পড়া। **খেলাল** – দাঁত পরিস্কার করার চিকন কাঠি। **কেরায়া** – ভাড়া। **কেরায়া নায়ের মাঝি** – ভাড়া খাটা নৌকার মাঝি। **কপালে রেখা টোটা** – চিন্তার ভাব জাগা। **আজাব** – শাস্তি। **নিস্পন্দভাবে** – প্রাণহীনভাবে। **হাহাকার** – দুঃখ, শোক। **অন্তরালে** – আড়ালে। **নীল হয়ে ওঠা** – যন্ত্রণার প্রকাশ। **বেহেস্ত-নছিব** – বেহেশ্‌তে যাওয়ার ভাগ্য। **খাড়া হয়ে দাঁড়ানো** – নিজের মত কাজ করা, নিজের শক্তিতে দাঁড়ানো। **দিগন্ত** – আকাশ ও মাটির মিলন রেখা। **ক্বাজা** – নামাজ যথাসময়ে না পড়া।

আঞ্চলিক

হইছে – হয়েছে।

বিটি – বেটি, কন্যা।

মা মরছে – মা মরেছে।

এ্যামনে – এমনি।

ছ্যামরারা কই – ছেলেরা কোথায়।

ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে – ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে আছে অর্থাৎ কাজ না করে আরাম আয়েশে আছে।

করতাছে নি – করছে কি?

জানাজা পড়বো – জানাজা পড়বে।

মওত – মৃত্যু।

চাইছিল – চেয়েছিল।

পাঠসংক্ষেপ

খালেক ব্যাপরীর বাড়ি থেকে ফেরার পথে হাসুনির মার সঙ্গে মজিদের দেখা হয়। হাসুনির মা তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ জানায়। মজিদ শোকাহত হয়েছে এমন ভাব দেখায়। মজিদ হাসুনির মাকে জিজ্ঞেস করে মরার আগে তার মা আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিল কিনা। এ ব্যাপারে হাসুনির মা নিশ্চিত নয়। মায়ের কবর আজাব হবে ভেবে তার মনোকষ্ট হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাড়ি ফেরার পথে মজিদের সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল? সে কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল কেন?

২. "আর তার মুখ ..... করে আসছে।" – কথাটার অর্থ কী?

৩. মজিদ হাসুনির মাকে কেন জিজ্ঞাসা করল যে তার মা মরার আগে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিল কিনা?

৪. হাসুনির মায়ের মন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে কেন?

৫. নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলোর অর্থ লিখুন :

ভান করা, কপালে রেখা ফোটা, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে থাকা, নীল হয়ে ওঠা, খাড়া হয়ে দাঁড়ানো।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : বাড়ি ফেরার পথে ..... কেন?

উত্তর : বাড়ি ফেরার পথে হাসুনির মায়ের সঙ্গে মজিদের দেখা হয়েছিল। সে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। সে জেনেছে যে মজিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে গেছে এবং এটিই হচ্ছে ফেরার পথ। তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। শোকগ্রস্ত হাসুনির মা মজিদকে এ সংবাদটি জানানোর জন্য গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

প্রশ্ন : "আর তার মুখ ..... করে আসছে।" কথাটার অর্থ কি?

উত্তর : মানুষ মরণশীল। মানুষের মৃত্যু হবেই। কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে বলবে- ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।" ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানেরা এ কথা বলে আসছে। মুসলমানদের এটিই ধর্মীয় রীতি। শত শত বৎসর ধরে এ রীতি চালু রয়েছে।

প্রশ্ন : মজিদ হাসুনির মাকে ..... মাফ চেয়েছিল কিনা ?

উত্তর : মৃত্যুর আগে মানুষ আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেয়। দুনিয়াদারিতে মানুষ অনেক পাপ করে। মাফ চাইলে আল্লাহ সদয় হন। হাসুনির মায়ের মা মরার আগে মাফ চেয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন মজিদ করেছে এ জন্য যে, ঐ বুড়ি স্বামীর সঙ্গে নিত্য ঝগড়া করত এবং এমন সব কথা বলত যা ছিল সম্পূর্ণ অনুচিত। হাসুনির মায়ের বাপ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ঐ বুড়ির কুৎসিত কথার কারণে। ধর্মীয় মতে, এসব কথায় আল্লাহ নারাজ হন। মাফ চাওয়ার কথাটা এসেছে এ কারণে।

প্রশ্ন : হাসুনির মায়ের মন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে কেন?

উত্তর : হাসুনির মায়ের মা বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছে। বুড়ো বয়সে মারা গেল শোক তেমন বেশি হয় না। মায়ের জন্য হাসুনির মারও শোক বেশি হয় নি। কিন্তু যখন সে মজিদের কথায় বোঝে যে তার মায়ের কবর আযাব হবে তখনই তার মনে হাহাকার জাগে। কবরে মায়ের একাকী যন্ত্রণাভোগ তার দুঃখের কারণ। সেই জন্যই তার মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। হাসুনির মাকে দেখে মজিদের যে এখন কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না তা এখানে বলা হয়েছে।

মজিদ মোল্লা-মৌলবী গোছের মানুষ, সে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে। কিন্তু আর সকলের মতো তারও কামনা বাসনা আছে। যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে সেও আকর্ষণ বোধ করে। মাস খানেক আগে এক রাতে ধান সিদ্ধ করার সময় বেগুনি শাড়ি পরা হাসুনির মায়ের খোলা বাহু কাঁধ ও পিঠ দেখে মজিদ তার প্রতি কামাসক্ত হয়েছিল। কিন্তু আজকে মা-মরা হাসুনির মাকে দেখে তার সেই মনোভাব জাগে না।

বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। মৃত্যু শোকের মধ্যেও যে তারতম্য আছে সেটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

অল্প বয়সে কারো মৃত্যু হলে নিকট জন ও আত্মীয় স্বজনেরা খুব বেশি শোক করে। কেননা এ ব্যক্তি আরো বহুদিন বেঁচে থাকতে পারত। তার তো মরার বয়স হয়নি। এ-মৃত্যুকে ঠিক মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু বুড়া-বুড়ির মৃত্যু হলে নিকট জনেরাও অধিক শোকাহত হয় না। কারণ তারা ধরে নিয়েছে এর মরার সময় হয়েছে। তার মৃত্যু সবাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়। হাসুনির মাও তার বুড়ি মায়ের মৃত্যুকে সেভাবে নিয়েছে।

ইউনিট ৬

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মাজারে যাওয়ার জন্য আমেনা বিবির প্রস্তুতি ও তার মনোভাবের কথা জানতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানি পড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিলো; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আস্তে-আস্তে একটা ভয়ও এলো মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চৌদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউ-এর তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিলো আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শীরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবি সঙ্গে নীচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহীমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়– পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহীমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

–বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

–আমি দেই নাই।

–দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। –তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চৌদ্দ প্যাঁচ?

রহীমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

–তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহীমা মুশ্‌কিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়। তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহীমা আস্তে বলে,

—তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহীমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

—পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

—না। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্তসীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দুজন বেহারা পাল্কি এনে লাগালো অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে, —কই, তৈয়ার হইছেন নি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুষ ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

—ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামীর মত আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরীফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মত আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি-গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে—ক-ঘণ্টায় যে ভয় দীর্ঘ রোগভোগ করা মানুষের মত তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারলো সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ-প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানে নি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে-শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো-বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমতা করে না। এ-সমাজে কোন মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

রোজা – ইসলাম ধর্ম মতে দিনের বেলায় উপবাস। **বিহিত করা** – সমাধান করা। **সঞ্চার** – আবির্ভাব। **আবছায়া** – আলো আঁধার। **মাদুর** – পাটি। **অবিশ্রান্ত** – বিশ্রাম না নিয়ে। **মেহমান** – অতিথি। **ঘষা-মাজা** – পরিষ্কার। **দোয়া-দরুদ** – আল্লাহর মহিমা বিষয়ে পাঠ। **তফাৎ** – পার্থক্য। **বিস্তর** – অনেক। **দেমাকি** – দেমাক বা গর্ব আছে যার। **নাপাক** – অপবিত্র। **তালাব** – পুকুর। **দিগন্ত সীমারেখা** – আকাশ আর মাটি যেখানে মিশেছে মনে হয়। **বেহারা** – পাল্কি বাহক। **অন্দর ঘর** – ভিতর বাড়ি। **জৌলুষ** – উজ্জ্বলতা। **বেলা শেষের ম্লান আলো** – বিকেল বেলার নিস্তেজ আলো। **ফ্যাকাশে** – ম্লান, মলিন। **আবছা** – অস্পষ্ট। **থেকে থেকে** – একটু পর পর। **ভীত বিহ্বেল** – ভয়ে কাতর। **ছুরা** – পবিত্র কোরানের এক একটি পাঠ। **গেলাফ** – কাপড়ের আবরণ। **পালক স্পর্শ** – অতি হালকা স্পর্শ। **রেহেল** – কোরান শরীফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো। **টাল খেয়ে** – ঘুরে। **কাহিল** – দুর্বল। **উপক্রম** – অবস্থা। **মগরেবের নামাজ** – সান্ধ্যকালীন নামাজ। **বুটিদার** – বুটিওয়ালা/যে কাপড়ে সূচের তৈরি ফুল তোলা হয়। **গুটি গুটি পায়ে হাঁটা** – খুব আস্তে আস্তে সাবধানে হাঁটা। **মুষড়ে যাওয়া** – ভয় পাওয়া। **ধাপে ধাপে** – বিভিন্ন সময়ে। **প্রতি বৎসরের শূন্যতা** – প্রতি বৎসর সন্তান না হওয়ার অভাব। **হ্রাস** – কমা। **তাগিদ** – প্রেরণা, আশা। **ফুরিয়ে যাওয়া** – শেষ হওয়া। **দু'কদমের পথ** – অল্প দূরত্বের পথ। **মাল মশলা** – উপকরণ। **সর্বতোভাবে** – সব দিক থেকে। **বেহুদাপনা** – অকাজ। **নিয়ত** – মনের ইচ্ছা। **হাসিল** – অর্জন।

বিশিষ্টার্থক ব্যবহার

বাতাসে কথা শুরু করে – গোপন কথা অতি দ্রুত প্রকাশিত হয়।

মুখ শুকিয়ে ওঠা – মুখের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়া।

সুখ দুঃখের কথা – সংসারের কথা।

এক ঢিলের পথ – অতি কাছে।

ফাঁসীর আসামী – কঠোর শাস্তি যার জন্য বরাদ্দ।

চোখ অন্ধকার হওয়া – চোখে কিছু না দেখা।

ভেঙে যাওয়া – শক্তিহীন হওয়া।

পা চলে না – হাঁটার শক্তি নেই।

অক্ষরে অক্ষরে – পুরোপুরি।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

বইন – বোন

আপনেও – আপনিও

দিছেন – দিয়েছেন

তানি – তিনি

যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে – যা পড়েছে পুকুরের মধ্যেই পড়েছে

তৈয়ার হইছেন নি – তৈরি হয়েছেন কী?

সময় হইছে – সময় হয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

শুক্রবার দিন আমেনা বিবি মজিদের নির্দেশ মতো রোজা রাখে। সারাক্ষণ কোরান শরীফ পড়ে। আমেনা বিবির ব্যাপারটি গোপন থাকে না। দুপুরে মজিদের স্ত্রী রহীমা এসে আমেনা বিবিকে পেটে মাখার জন্য পানি পড়া দিয়ে যায়। সন্ধ্যার একটু আগে আমেনা বিবির জন্য পালকি আসে। মগরেবের নামাজ সেরে আমেনা বিবি পাল্কিতে চড়ে বসে। আমেনা বিবির মনে বেজায় ভয়

ঢোকে। মাজারে যেতে তার অনিচ্ছা। তার ভয়, মাজারের চারধারে ঘুরেও যদি তার সন্তান না হয়। এ মাজারে না গিয়ে তার উপায় নেই। সমাজের ভয়েই তাকে মাজারে যেতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যে পাঠটি পড়লেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২. যে আঞ্চলিক শব্দ ও বাগার্থ আপনি জানলেন সেগুলো সাজিয়ে লিখুন।

৩. আমেনা বিবির মনে আশার সঞ্চার হল কেন?

৪. পরে মাজারে যেতে তার ভয় হল কেন?

৫. বুঝিয়ে লিখুন –

ক. কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

খ. দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়!

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : আমেনা বিবির মনে আশার সঞ্চার হল কেন?

উত্তর : আমেনা বিবি প্রথমে নিরাশ হয়েছিল। কারণ আওয়ালপুরের পীর সাহেবের পানি পড়া সে পায়নি। সুতরাং সে ধরেই নিয়েছিল তার আর সন্তান হবে না। কিন্তু মজিদ যখন পেটের বেড়ির কথা বলল এবং সাতের বেশি বেড়ি না থাকলে তা খোলার ব্যবস্থার কথা জানাল, তখন তার মনে আশার আলো দেখা দিল। সন্তান হওয়ার যে কোন সম্ভাবনার কথা আমেনা বিবিকে ভরসা দেয়।

প্রশ্ন : পরে মাজারে যেতে তার ভয় হল কেন?

উত্তর : আমেনা বিবিকে মাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পালকি আসে। সন্ধ্যার পর পাল্কিতে ওঠার সময় হয়। ছোট্ট একটি উঠোন পার হতে হবে। উঠোন পার হতে গিয়ে আমেনা বিবি যেন আর হাঁটতে পারে না। তার মনের মধ্যে ভয় ঢোকে। যদি মাজারে গিয়েও তার সন্তান না হয়। তাহলে মুহূর্তেই তার আশা চুরমার হয়ে যাবে। এরকম একটা আশঙ্কায় তার মনে ভয় ঢোকে।

প্রশ্ন : 'কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতেই দাঁড়িয়েই যেন মাখে'। - কথাটি বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : মজিদ রহীমাকে দিয়ে আমেনা বিবির জন্য পানিপড়া পাঠায়। বলে পাঠায়, এ পানি যেন মাখবার সময় পুকুরের পানিতেই দাঁড়িয়ে যেন মাখে। এ পানি দোয়া দরুদ পড়া পবিত্র পানি। এ পানি বাইরে পড়া অনুচিত। পুকুরে পড়লে তা পুকুরের পানির সঙ্গে মিশে যাবে। পুকুরের পানিতে সবাই গোসল করে, সেজন্য পুকুরের পানি নাপাক নয়। এ পানিতে দোয়া দরুদ পড়া পানি পড়লে ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন : 'দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়?' - কথাটি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : দুই তানির মধ্যে একজন মজিদ অন্যজন খালেক ব্যাপারী। রহীমার পেটে চৌদ্দ প্যাঁচ আছে এ কথা মজিদ কি করে জানে এ হল খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী তানু বিবির জিজ্ঞাসা। রহীমা উত্তর দেয়, স্বামী হওয়ার কারণে মজিদ বুঝতে পারে। তাহলে খালেক ব্যাপারী আমেনা বিবির স্বামী হয়েও কেন তার পেটের প্যাঁচের কথা জানে না। তানু বিবিকে এ কথা বোঝানো মুশকিল।

মজিদ আর ব্যাপারী যে এক মানুষ নয় তা বুঝতে হবে। মজিদ খোদার পথের মানুষ। সুতরাং সে খালেক ব্যাপারীর মত সাধারণ মানুষ নয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

২. তবে কথা হচ্ছে কী তেরো বছরের কথা একদিনে জানে নি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে।

মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ।

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে আমেনা বিবির কথা বলতে গিয়ে সমাজে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে।

সন্তানের আশায় আমেনা বিবি মাজারের চারধারে পাক দিতে রাজি হয়। কিন্তু মাজারে যাওয়ার সময় হলে আমেনা বিবির মনে ভয় ঢোকে। ভবিষ্যতে কী আছে কে জানে। যদি আমেনা বিবির প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সেই আশঙ্কায় আমেনা বিবি মাজারে যেতে আর আগ্রহ বোধ করে না। কিন্তু তবু তাকে যেতে হয়। কেননা সমাজে পুরুষেরই দাপট। নিঃসন্তান হওয়ার কারণে খালেক ব্যাপারীও আমেনা বিবিকে আগের মতো দেখে না। তা ছাড়া ব্যাপারী আরেকটা বিয়েও করেছে। সন্তানবতী হলেই কেবল আমেনা সমাজে টিকে থাকতে পারবে। সেজন্য আমেনা বিবির উৎসাহহীনতাকে সমাজ কোনোদিন মেনে নেবে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আমেনা বিবির পা দেখে মজিদের প্রতিক্রিয়ার কথা লিখতে পারবেন।
- মাজারে পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা বিবৃত করতেপারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ অপেক্ষা করছিলো। বেহারারা পাল্কিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখলো।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, —নামবো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

—তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছে নি।

ব্যাপারী ছুটে যায় পাল্কির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,

—আছে নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

—তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্মতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। পাল্কির পর্দা ফাঁক করে

নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সুচের তীক্ষ্নতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপের টান করে ধরে রেখেছে। তবু পাল্কি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়-চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নোতুন বউ এর মত চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মান নোতুন বউ এর আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোয় সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মত শত ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহা-আকাশের মতই সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহা-আকাশের মতই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কন

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিলো। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়া হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন আদিম সাপের গতির মত জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পাল্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিলো, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে। ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা—দেখে সস্নেহ-মমতা উঠে না এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেতো। এবং যেতো সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবানু ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে— যেখানে কাদামাটি লাগে নি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীতউদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধ্বসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরের ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মত স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মত। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মত চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মত সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে, —তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চম্‌কে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মত মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা—বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মত অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মত কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিলো। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করলো, হয়তো-বা তাকে আলিঝালি দেখলেও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখলো না, জানলো না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানলো না-মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠতো।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে, —কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্চ্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহীমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসতো যদি না সঙ্গে থাকতো ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিলো। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিলো। রহীমা মনে-মনে স্থির করেছিলো, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফির্‌নিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্প ভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যাই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহীমা যে-দৃশ্য দেখলো তারপর গল্প গুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পাঁজাকোল করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফির্‌নির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলো।

শব্দার্থ ও টীকা

লম্বা কোর্তা – আল খাল্লা জাতীয় পোশাক। **ওজু** – নামাজ ও ধর্মীয় কাজ করার জন্য বিশেষ রীতিতে হাত পা ধোওয়া। **ঈষৎ** – সামান্য। **চিকন** – সূক্ষ্ম, মিহি। **কারুকার্য** – সূক্ষ্ম কাজ। **সূচের তীক্ষ্নতায়** – সূচের মতো তীক্ষ্ন রূপে। **মসৃণ** – তেলতেলে। **বোজা** – বন্ধ। **ম্রিয়মান** – মরে যাচ্ছে এমন। **রক্তাভা** – লালচে রঙ। **দুনিয়ার ছায়া নেই** –মৃতের মতো। **ঝালর** – চাদর জাতীয় কাপড়ের ঝুলে থাকা অংশ এবং এটি কাজ করা থাকে। **সালু কাপড়** – লাল কাপড়। **ফলা** – অস্ত্রের তীক্ষ্ন মুখ। **বিচ্ছুরিত** – ছড়িয়ে পড়া। **ধমনি** – শিরা। **অন্তহীন** – শেষ নাই যার। **আড়চোখে** – চোরা দৃষ্টিতে। **বিড়বিড়** – অস্পষ্ট কথা। **লহরি** – ঢেউ। **কোটরাগত** – গর্তে ঢোকানো। **বাসনা** – ইচ্ছা। **অবসান** – শেষ। **ছোবল** – সাপের কামড়। **আদিম** – অতি পুরাতন। **আদিম** – অতি পুরাতন। **লালাসিক্ত** – পোকার শরীর থেকে নির্গত আঠাযুক্ত। **জালি** – পোকায় কাটা ছিদ্র। **লিকলিক করা** – চিকন ও লম্বা জিনিসের নড়ন। **নিঃসৃত** - বের হওয়া। **চক্কর খায়** – চারদিকে ঘোরে। **নিবদ্ধ হয়** – পড়ে। **মেদবহুল** – চর্বিওয়ালা। **স্ফীত উদর সম্বলিত** – মোটা পেট যুক্ত। **ঘূর্ণমান** – যা ঘুরছে। **ধ্বসে আছে** – ভেঙে পড়ে গেছে। **ঠক্কর** – বাধা। **পাপড়ি** – ফুলের পাতা। **ঝঙ্কার** – বাদ্যযন্ত্রের কিংবা চুড়ি জাতীয় অলঙ্কারের আওয়াজ। **চুকচুক** – দুধ বা পানি খাওয়ার মৃদু আওয়াজ। **কোমল** – নরম। **পাড়** – শাড়ির প্রান্ত। **মিহি** – চিকন, সূক্ষ্ম। **স্তব্ধতা** – শব্দহীনতার অবস্থা। **প্রখর অতুজ্জ্বল** – তীক্ষ্ণ ও অতি উজ্জ্বল। **আবির্ভাব** – আগমন। **আলিঝালি** – অস্পষ্ট, এলোমেলো। **দয়া উথলে ওঠা** – বেশি করে দয়া হওয়া। **ফুটো** – ছিদ্র। **চুকে গেলে** – শেষ হলে। **দু-দণ্ড** – সামান্য সময়। **স্বল্পভাষী** – অল্প কথা বলে যে। **সমতা** – মিল। **পাঁজা কোল** – দুহাত বাড়িয়ে টেনে কোলে নেয়া। **মুখের কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে** – জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জগৎ। **খিলি** – ভাঁজ করা সাজানো পান।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

নামাইয়া – নামিয়ে

তয় নামেন – তাহলে নামুন

তানারে বইবার কন – তাঁকে বসতে বলুন

বহেন – বসুন

তানারে উঠবার কন – তাঁকে উঠতে বলুন।

এহন – এখন

এহন পাক দেওন লাগব – এখন ঘুরতে হবে

পড়তাছি – পড়ছি

পাঠ সংক্ষেপ

আমেনা বিবিকে পালকি থেকে নামানো হয়। পালকি থেকে নামার সময় আমেনা বিবির সুন্দর মসৃণ পা দেখে মজিদের মনে কামভাব জাগে। মজিদের কাম চেতনাকে সাপের দংশনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে মজিদ বাইরে স্বাভাবিক থাকে। তার পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি মাজারের চারদিকে পাক দিতে শুরু করে। মাজারের প্রতি তার গভীর বিস্ময়। তৃতীয় বার পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবি চোখে অন্ধকার দেখে এবং মূর্ছা যায়। রহীমা হাসুনির মার সাহায্যে আমেনা বিবিকে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যে সব শব্দ নতুন ভাবে জানলেন সেগুলো বারবার পড়ুন এবং অর্থ জেনে নিন।
২. আমেনা বিবি যখন পালকি থেকে নামে তখন তাকে কেমন দেখায়?
৩. আমেনা বিবি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন?
৪. মজিদের কামবাসনাকে সাপের দংশনের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়েছে?
৫. মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় আমেনা বিবির মনোভাব কেমন হয়?
৬. প্রদক্ষিণ শেষ হলে আমেনা বিবিকে নিয়ে রহীমা কি করবে ভেবেছিল?
৭. এ পাঠের কাহিনী সংক্ষেপে লিখুন।

প্রশ্ন : আমেনা বিবি বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন?

উত্তর : আমেনা বিবি সন্তান পাওয়ার আশায় মাজারে এসেছে। মোমবাতির আলোয় মাজারকে বড় রহস্যময় মনে হয়। মাজারটি সালু কাপড়ে আবৃত এবং চির নীরব। আমেনা বিবির মনে হয় এই মাজারে মহাশক্তিমান কেউ রয়েছেন যিনি আমেনা বিবির ইচ্ছা পূরণ করবেন। সেই মহা শক্তির উপলব্ধিতে আমেনা বিবি অবাক চোখে মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন : মজিদের কাম বাসনাকে সাপের দংশনের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : পালকি থেকে নামার সময় আমেনা বিবির সুন্দর ফর্সা পা দেকে মজিদ আকৃষ্ট হয় এবং আমেনা বিবির প্রতি তার কামভাব জাগে। কামভাব মানুষের মনের বিবেচনা শক্তি নষ্ট করে এবং তা জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। সাপে কামড়ালে সাপের বিষে মানুষের শরীরে যেমন জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, তেমনি কামভাব জাগলে মানুষের দেহে ও মনে যন্ত্রণা হয়। সেজন্য সাপের বিষ আর কামের ভাবের তুলনা ঠিকই হয়েছে।

প্রশ্ন : মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় আমেনা বিবির মনোভাব কেমন হয়?

উত্তর : মাজারের চারদিকে ঘুরতে গিয়ে আমেনা বিবি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। স্তব্ধ নীরব মাজারটিকে তার খুব কঠিন মনে হয়। আমেনা বিবির মনে হয় তার কোনো অনুভূতি নেই, কোনো কামনা বাসনা নেই, কোনো অভাব অভিযোগ নেই। মহাশক্তির কাছে এসে সে বিহ্বল হয়ে গেছে। মনে হয় সে যেন স্বপ্নের ঘোরে হাঁটছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।
২. সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে।
৩. সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লক লক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ।
৪. একটা প্রখর অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে।

মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। মাজারের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা এখানে বলা হয়েছে।

মাজারে এসেছে আমেনা বিবি সন্তান কামনায়। মাজারের নীরবতা তার মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে। একজন শক্তিমান লোক এখানে শুয়ে আছেন। ভক্তিমান লোক সেই শক্তিতে বিশ্বাস রাখে। সে মনে করে ইনিই সব কিছু করে দিতে পারবেন। মানুষের বাসনা কামনা তিনিই পূরণ করবেন। পীরের কবরের প্রতি ভক্তি মরা মানুষের রক্তকেও যেন সজীব করে তোলে। আসলে পীরের প্রতি মানুষের ভক্তিপ্রীতি বেশি। আমেনা বিবি সেইটি উপলব্ধি করেছে এবং মাজারের শক্তিতে বিহ্বল হয়েছে।

সে কেমন ধ্বসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারে নি তার স্থূল দেহটা।

ব্যাখ্যার জন্য চয়ন করা বাক্যটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'লালসালু' উপন্যাসের। এখানে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান পাওয়ার আশায় মাজারের চারদিকে পাক দিতে এসেছে। খালেক ব্যাপারী ও স্ত্রীর জন্য মাজারে এসেছে এবং স্ত্রীকে মজিদের নির্দেশ জানিয়ে দিচ্ছে। খালেক ব্যাপারী মোটা মানুষ, তাছাড়া সে গ্রামের মাতব্বর। অথচ আজকে তাকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। তার ভিতরেও যেন শক্তি নেই। স্ত্রীর সন্তান হবে কিনা সে জন্য তার দুশ্চিন্তা। তার এত বিষয় আশয় ও টাকা পয়সা থাকলে কি হবে, কোনো কিছুতেই যেন তার শান্তি নেই।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আমেনা বিবিকে তালাক দেয়ার জন্য খালেক ব্যাপারীর প্রতি মজিদের বক্তব্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইলো, দুজনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দরঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেলো। দু-জনেই এক এক করে হুকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানি পড়া খাবার সখ হয়েছিলো সে-আমেনা বিবির ওপর –আকার ইঙ্গিতে বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও–মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিলো। তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিলো। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্চ্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেলো, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখালো, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

–দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, –রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানিপড়াডা দিলাম–তা কিসের জন্য? শরীলে তা'কত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

—তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

—আপনে তানার স্বামী—ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত—টাট্‌কা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হত প্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচ্‌মকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

—কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোন কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

—না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তের বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মত বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জোৎস্নার পানে বেদনাভারি চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

—কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছে নি?

ব্যাপারী ভারি গলায় আস্তে বলে,

—আছে?

— হে তহুর বাপের কথা মাইন্‌ষেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মত ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—ক্যান?

—কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মত মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইলো এ : পাক-দিল আর গুণাগার দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপীও ভাল মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মত ভয় করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোন কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোন কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মত সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।

এ সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়ালো। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি?

—তানার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

—মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পাল্কিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোন কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেলো। তার মনের কথা জানা গেলো না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য—আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখলো না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোন দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

সখ — ইচ্ছা। **শাস্তি বিধান** — শাস্তির ব্যবস্থা। **বিন্দুমাত্র** — সামান্য। **প্রশমিত** — থেমে যাওয়া, বন্ধ। **বরঞ্চ** — বরং। **শানিত** — তীক্ষ্ণ। **অপ্রত্যাশিতভাবে** — আকস্মিকভাবে। **ফস্কে গেল** — হাতছাড়া হল। **অবজ্ঞা** — অসম্মান, ঘৃণা। **আস্ফালন** — বাহাদুরি। **দিনভর** — সারাদিন। **তাকত** — শক্তি। **মুখে চুন দেয়া** — গর্ব খর্ব করা। **তাছির** — প্রভাব। **ভুখা** — ক্ষুধার্ত। **কানিয়ে চেয়ে** — আড়াচোখে দেখে। **অনলকণা** — আগুনের স্ফুলিঙ্গ। **কুয়াশাচ্ছন্ন** — কুয়াশায় ঘেরা। **কুপি** — বাতি। **শিখা** — আগুনের শিষ। **টাট্‌কা** — তাজা। **বিদ্বেষ** — ঘৃণা। **টকটকে** — উজ্জ্বল। **পতিত** — পাপী, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত। **হত প্রশ্নের নিশ্চুপতা** — প্রশ্ন করে লাভ নেই, সেজন্য চুপ হয়ে থাকা। **রসনা** — জিহ্বা। **সংযত** — দমন। **তালাক** — বিবাহ বিচ্ছেদ। **ফুটফুটে** — সুশ্রী, সুন্দর। **ঘরকন্না** — সংসার, ঘরের কাজ। **মায়া-মহব্বত** — প্রেম, ভালোবাসা। **আড়ালে-আবড়ালে** — অজান্তে, গোপনে। **হকচকিয়ে ওঠা** — হতভম্ব হওয়া, বিস্মিত হওয়া। **বেদনাভারি** — অতি ব্যথিত। **যন্ত্রচালিত** — যন্ত্রের মত চলা। **পাক দিল** — পবিত্র হৃদয়। **গুণাগার দিল** — অপবিত্র হৃদয়। **গুণাগার** — পাপী। **বিক্ষিপ্ত** — অস্থির। **দুষ্ট আত্মা** — ভূত প্রেত। **রোশনাই** — আলো, আলোর উজ্জ্বলতা। **তেরছাভাবে** — বাঁকাভাবে। **হুস** — জ্ঞান। **গাছগাছলা** — গাছ ও ঝোপঝাপ। **অন্যমনস্কভাবে** — আনমনাভঙ্গিতে। **অনিশ্চয়তা** — সংশয়, সন্দেহ। **চক্রান্ত** — দুষ্ট বুদ্ধি, ষড়যন্ত্র। **আচম্বিতে** — হঠাৎ, আচমকা। **সদা** — সবসময়। **হুঁশিয়ার** — সাবধান।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

রাখলে — রাখার জন্য।

দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি — সারাদিন রোজা রাখায় তিনি বড় দুর্বল হয়েছিলেন।

শরীল — শরীর।

শরীলে তাকত হইবার জন্য না? — শরীরে শক্তি হওয়ার জন্য নয়?

এমন তাছির হেই পানি পড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে — সেই পানিপড়ার এমন প্রভাব যে, পেটে গেলে এক মাসের ক্ষুধার্ত মানুষও সঙ্গে সঙ্গে সতেজ হয়ে ওঠে।

তয় কেন তানি অজ্ঞান হইছেন – তাহলে কেন তিনি অজ্ঞান হয়েছেন?
কওন – বলা।
তহুর বাপ – তাহেরের বাপ, হাসুনির মায়ের বাপ।
মাইন্ষেরা – মানুষেরা।
হে তহুর বাপের কথা ভুইলা গেছে – সেই তাহেরের বাপের কথা মানুষেরা ভুলে গেছে।
ভুলবার পারি নাই – ভুলতে পারিনি।
দিবার চায় – দিতে চায়।
শাস্তি পাইল হেই – শাস্তি পেল সেই।
কিছু কমু না – কিছু বলব না।
তানার হুস হইছে – তাঁর জ্ঞান ফিরেছে।
বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন – বাড়িতে যেতে চাইছেন।

পাঠ সংক্ষেপ

পীরের পানিপড়া খেতে চেয়েছিল বলে আমেনা বিবির ওপর বেজায় রাগ হয়েছিল, তাকে একটি শক্ত শাস্তি দিতে চেয়েছিল সে। কিন্তু আমেনা বিবি মূর্ছা যাওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল। মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বোঝাতে চায় যে, রোজা রাখার জন্য দুর্বল হয়ে আমেনা বিবি মূর্ছা যায়নি; অন্য কারণ আছে। এভাবে মজিদ ব্যাপারীর মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়। পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি যখন সাত পাক দিতে পারল না তখন আর সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবি অপবিত্র। মজিদ ব্যাপারীকে সরাসরি বলে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। ব্যাপারী হতভম্ব হয়ে পড়ে। মজিদ বড় নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধকামী; আমেনা বিবির জন্য তার মনের মধ্যে সামান্যতম কোমল ভাব নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এ পাঠের মূল কথা সংক্ষেপে লিখুন।
২. এ পাঠে ব্যবহৃত আঞ্চলিক বাক্যগুলোর শিষ্টরূপ দিন।
৩. মজিদ আমেনা বিবির প্রতি ক্রুদ্ধ কেন?
৪. স্ত্রীর সঙ্গে খালেক ব্যাপারীর সম্পর্ক কেমন?
৫. মজিদ কোন কথা বলে ব্যাপারীর মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়?
৬. তাহেরের বাপের ঘটনা থেকে মজিদ কোন্ কথাটি শিখেছে?
৭. মজিদ এত নিষ্ঠুর কেন?

প্রশ্ন : মজিদ আমেনা বিবির প্রতি ক্রুদ্ধ কেন?

উত্তর : আমেনা বিবি সন্তানের আশায় আওয়ালপুরের পীর সাহেবের পানিপড়া খেতে চেয়েছিল। মজিদ যখন ব্যাপারটি জেনে গেল, তখন তার রাগ গিয়ে পড়ল আমেনা বিবির ওপর। মজিদ মহব্বতনগরের ধর্মগুরু। তাকে বাদ দিয়ে অন্য গ্রামের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানিপড়া আনা তার জন্য অবজ্ঞাসূচক। এজন্য মজিদ আমেনা বিবির ওপর এত ক্রুদ্ধ।

প্রশ্ন : মজিদ কোন্ কথা বলে ব্যাপারীর মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়?

উত্তর : মাজারের চার ধারে ঘুরতে গিয়ে আমেনা বিবি মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মজিদের মতে ও মূর্চ্ছা কারণ শরীরের দুর্বলতা নয়। আল্লাহর কালাম পড়া পানি মিথ্যা হতে পারে না। আমেনা বিবি যখন সাত পাক দিতে পারল না তখন কোন সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবির মধ্যে পাপ রয়েছে। সূর্যের আলোর মতো তা স্পষ্ট। এ রকম কথা বলে মজিদ ব্যাপারীর মনে সন্দেহ জাগাতে চায়।

প্রশ্ন : তাহেরের বাপের ঘটনা থেকে মজিদ কোন্ কথাটি শিখেছে?

উত্তর : মজিদ বলতে চায়, তাহেরের বাপের ঘটনা থেকে মজিদ সোনার মত একটি মূল্যবান কথা শিখেছে। তা হল, অপবিত্র মন ও পবিত্র মন যদি এক সূতায় বাঁধা থাকে, তাহলে অপবিত্র মনকে কেউ শাস্তি দিতে চাইলে পবিত্র মনই শাস্তি পায়, অপবিত্র মন নয়। তাহেরের মা অপবিত্র ছিল, কিন্তু শাস্তি পেল পবিত্র-মন তাহেরের বাপ।

প্রশ্ন : মজিদ এত নিষ্ঠুর কেন?

উত্তর : মজিদ শক্ত হৃদয়ের মানুষ। তার মনে কোন কোমলতা নেই। কোমলতা দেখাতে সে মহব্বতনগরে টিকে থাকতে পারত না। যে তাকে আবজ্ঞা করেছে কিংবা উপেক্ষা করেছে তাকে সে সরাবেই। যে তার বিরুদ্ধে গেছে তাকে সে শাস্তি দেবেই। আমেনা বিবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, সুতরাং তার প্রতি সে কোমল হতে পারত। কিন্তু আমেনা বিবি তাকে অবজ্ঞা করেছে, সেজন্য আমেনা বিবির জন্য তার হৃদয়ে কোন জায়গা নেই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত - টাককা, লাল টকটকে।

২. খোদার কালামের সাহায্যে যে কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মত সাফ।

৩. দুনিয়াটা বড় বিচিত্র।

যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে আমেনা বিবির প্রতি মজিদের মনোভাবের কথা জানা যায়।

মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বলেছে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। কারণ আমেনা বিবি শুদ্ধ বা পবিত্র নয়। দোয়া দরুদ পড়া পানি খেয়েও আমেনা বিবি মাজারে সাত পাক দিতে পারেনি। এতে সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবি নিশ্চয়ই কোন পাপ করেছে। আসলে এটি মজিদের চক্রান্তের ফল। আমেনা বিবির প্রতি তার ক্রোধ রয়েছে। অথচ এই আমেনা বিবির প্রতিই সে আকৃষ্ট হয়। তার সাদা কোমল পা দেখে কামনা জাগে। কিন্তু মজিদ জানে এ কোমলতার প্রশ্রয় দেয়া চলে না। দুনিয়াটা অদ্ভুত। নিষ্ঠুরতা ও প্রেম একই সঙ্গে চলে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আমেনা বিবিকে খালেক ব্যাপারীর তালাক দেয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোন গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেতো, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুকার নীলাভ ধোঁয়া অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হু-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। এক বার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয় একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আরেকবার মনে হয়, সে শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনদিন তার রূপের ঠাট ছিলো না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিলো না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিলো না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমনকাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোন ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রঙ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোন গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মত লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পাল্কিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাল্কির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসতো। সেটা হলো থোতামুখো তালগাছটা। বহু দিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পাল্কির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝতো যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিলো নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

শব্দার্থ ও টীকা

দাউ-দাউ – বেশি জোরে আগুন জ্বলার ভাব। **গোলযোগ** – গন্ডগোল, ঝামেলা। **বিবেচনা** – খুঁটিয়ে দেখা। **নীলাভ** – নীল রঙের । **চোখে ধোঁয়া ভাসে** – চোখ ঝাপসা দেখে। **গলিয়ে ঢোকা** – কোন একটি পথে ঢুকে যাওয়া। **অন্তর দৃষ্টি** – মনের চোখ। **হেস্ত-নেস্ত** – মীমাংসা, নিস্পত্তি। **খসে আসবে** – আলাদা হয়ে আসবে। **দুরূহ** – কঠিন। **জীবনের অলি-গলি** – জীবনের নানা পথ। **আপত্তিকর** – দোষের **ঠাট** – গর্ব, আড়ম্বর। **বেহায়াপনা** – লজ্জাহীনতা **চলনে-বলনে** – আচার আচরণে। **হুঙ্কার** – সাবধান বাণী। **কান দুটোতে রঙ ধরে** – লজ্জা হয়। **গর্হিত** – অন্যায়। **মনস্থির** – সংকল্প। **বিবর্জিত** – সম্পূর্ণরূপে বাদ। **সংকীর্ণতায়** – অপরিসর জায়গায়। **নাক বরাবর** – সোজা, সম্মুখ। **থোতামুখো** – ডালপালাহীন। **ঝড়ে-পানিতে** – সকল আঘাতে। **লোহা** – শক্ত। **নাইয়র** – বাড়ি। **নিশানা** – চিহ্ন।

পাঠ সংক্ষেপ

খালেক ব্যাপারী জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যায় পড়েছে। বিনা দোষে আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে কি করে! তাদের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ দিনের। রূপবতী স্বামীভীরু আমেনা বিবি কোনদিন কোন অন্যায় করেনি। ভেবে ভেবে খালেক ব্যাপারী অস্থির হয়। কিন্তু মজিদের কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। মজিদ যা কিছু জেনেছে খোদার কালামের সাহায্যে জেনেছে। মানুষের ভিতরের কথা কিছুই বোঝা যায় না। খোদাই সব কিছু দেখেন এবং জানেন। মজিদের কথাই ঠিক। এর পর ব্যাপারী আমেনা বিবিকে তালাক দেয়। বজ্রাহত মন নিয়ে আমেনা বিবি বাপের বাড়িতে চলে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খালেক ব্যাপারীর জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা কোনটি? কেন এটি বড় সমস্যা?
২. খালেক ব্যাপারীর চোখে আমেনা বিবি কি রকম?
৩. খালেক ব্যাপারী মজিদের কথা ঠিক মনে করল কেন?
৪. কোন জিনিসটি দেখলে আমেনা বিবির কান্না আসত? কেন?
৫. আপনি ভেবে চিন্তে লিখুন কেন আমেনা বিবিকে তালাক দিতে মজিদ ব্যাপারীকে পরামর্শ দিল?

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারীর জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা কোনটি? কেন এটি বড় সমস্যা?

উত্তর : খালেক ব্যাপারীর জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা হল আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া। মজিদ আমেনা বিবিকে তালাক দিতে বলেছে। কিন্তু ব্যাপারী আমেনা বিবির মধ্যে কোন অন্যায় দেখেনি। সেজন্য নির্দোষ আমেনাকে তালাক দেয়া তার জন্য বড় সমস্যা।

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারীর চোখে আমেনা বিবি কি রকম?

উত্তর : খালেক ব্যাপারী ও আমেনা বিবির দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ দিনের। আমেনা বিবির ব্যবহারে ব্যাপারী কোনদিন কোন আপত্তিকর কিছু দেখেনি। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি পরায়না।

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারী মজিদের কথা ঠিক মনে করল কেন?

উত্তর : খালেক ব্যাপারী বিশ্বাস করে মজিদ কোরান কেতাব পড়া আলেম মানুষ, সে একজন পীর। মজিদ আমেনা বিবি সম্পর্কে যা জেনেছে খোদার কালাম পড়েই জেনেছে। সে জন্য সে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে বলেছে। আমেনা বিবি বাইরের দিক থেকে নির্দোষ, তার আচারে ব্যবহারে আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু তার ভিতরে নিশ্চয় কোন গলদ আছে, তা না হলে মজিদ তালাকের কথা বলত না।

প্রশ্ন : কোন জিনিসটি দেখলে আমেনা বিবির কান্না আসত? কেন?

উত্তর : পথের মধ্যে থোতামুখ তালগাছটি দেখলে আমেনা বিবির কান্না আসত। বহু প্রাচীন গাছ এটি। প্রথম যৌবনে বাপের বাড়ি থেকে ফিরবার সময় পাল্‌কির ফাঁক দিয়ে গাছটি দেখলে সে বুঝত স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। বিবাহিত নারীর আসল ঠিকানা তার স্বামীর বাড়ি। এখানেই তার আনন্দ আর সুখ। সেই সুখের জায়গা ছেড়ে সে চিরকালের জন্য বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। সুতরাং স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় ঐ গাছটি যদি দেখত তাহলে তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। আমেনা বিবিকে তালাক দেয়ার প্রস্তাবে স্ত্রী সম্পর্কে খালেক ব্যাপারীর মনোভাব এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমেনা বিবির প্রতি আক্রোশবশত মজিদ খালেক ব্যাপারীকে মন্ত্রণা দিয়েছে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। কিন্তু আমেনা বিবির কি দোষ তা ব্যাপারী বুঝে উঠতে পারে না। ব্যাপারী চিন্তায় পড়ে যায়। হুঁকো খেতে খেতে চিন্তা করে। আমেনা বিবির সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন বহু দিনের। তের বছর বয়সে আমেনা বিবি বউ হয়ে তার ঘরে এসেছিল। আমেনা বিবির চলা ফেরায় ও আচার-আচরণ অতি চমৎকার। কোথাও তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায় নি। গভীর ভাবে চিন্তা করেও ব্যাপারী আমেনা বিবির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পায়নি। এখন তার অন্যায়টা কী সেটাই প্রশ্ন।

ওটা ছিলো নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

এ বাক্যটি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। স্বামীর বাড়ি যে আমেনা বিবির জন্য সুখের স্থান ছিল তা এই বাক্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

মজিদের কথায় খালেক ব্যাপারী বিনা দোষে আমেনা বিবিকে তালাক দিল। তালাকনামা পেয়ে আমেনা বিবি স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। সন্তান না হওয়ার জন্য স্বামী তাকে এতদিন পরে তালাক দেবে এটা ভাবাই যায় না। এরপর বাপের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আমেনা বিবির অন্য গতি নেই। বাপের বাড়ি যেতে পারলে আনন্দ। কিন্তু আজ আনন্দ নেই, চোখের পানিও শুকিয়ে গিয়েছে। তবে একটি জিনিস দেখলে আমেনা বিবি নিশ্চয়ই কান্নায় বুক ভাসাত। সেটা হল একটি থোতামুখো তালগাছ। বহু দিনের গাছ; শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক ঠায়। বিয়ের পর আমেনা বিবি যখন বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসত, তখন পালকির ফাঁক দিয়ে ঐ গাছটি দেখলেই বুঝত, সে স্বামীর বাড়িতে এসে গেছে। মনটা তখন আনন্দে ভরে যেত। কারণ সে বিবাহিত নারী, স্বামীর বাড়িতেই সে সকল সুখ পেয়েছে। সে জন্য ঐ তালগাছটি হল সুখ আর আনন্দের প্রতীক।

ইউনিট ৭

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মাজারের লালসালু সম্পর্কিত আরও কাহিনীর বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- আক্কাসের একটি স্কুল করার প্রচেষ্টা ও তা ভন্ডুল হওয়ার কাহিনী লিখতে পারবেন।
- গ্রামে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে ওঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ঐখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এ কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারে গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তা আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরানো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনখানে যদি রঙ চটে যায়, বা সালু কাপড়ের কোন স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া—তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারি হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহীমা বিড়বিড় করে বলে, —তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারি। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিলো বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিলো। ভেবেছিলো, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এ জন্য আরো বেশি বোধ করলো যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিলো না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোন কারণ দেখলো না। ভাবলো, বিদেশী হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা'দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কী দু-দুটো মক্তব বসানো হয়নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগলো চরকির মত। ইস্কুলের জন্য দস্তরমত চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগলো, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কথা এ যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কোনপ্রকার ভনিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করলো,

—কী হুনি ব্যাপারী মিঞা?

ব্যাপারী বলে, কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এলো।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলো। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে —এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এলো। তারপর মুর্হূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রগ। ঠাস্ করে চড় মারা ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,

—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলো, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। ইস্কুল হবে কী হবে না —সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাটা, কারো স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারো-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মত একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেতো। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে—দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছিলো এ ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

—আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ—তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এ বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুফির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার—এ রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইলো তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে—।

সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকতো আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচতো; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, —মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইতো, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরতো—আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিলো, কিন্তু মজিদের এক'শ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, —ভাইসকল! পোলা মাইন্ষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে—তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরী ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে—এ আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নোতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেলো। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বলে,

—বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন!

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন—আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

—তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে ওঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

—চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মত কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এ ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে ওঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মত খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারো না কারো যেন যৎকিঞ্চিত হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এ ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশখোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটলো। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোন অন্যায়ের বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

—ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে—এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক—একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে ওঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাদদেশে – নিচে। **রোশনাই** – আলোকিত। **নজরে** – দৃষ্টিতে। **পাত** – লোহা বা তামার পাতলা করা অংশ। **বিবর্ণ** – রং ওঠা। **সৌখিনতা** – সখ। **চাকচিক্য** – উজ্জ্বলতা। **অন্তর** – পর। **গাত্রাবরণ** – গিলাফ। **আফসোস** – অনুতাপ। **বরঞ্চ** – বরং। **প্রার্থী** – ইচ্ছুক ব্যক্তি। **উপযুক্ততা** – যোগ্যতা। **গর্হিত** – খারাপ। **ভারি** – দুঃখিত। **আড়ত** – ব্যবসা-কেন্দ্র, কেনা-বেচার জায়গা। **লাট-বেলাট** – ক্ষমতাশালী। **প্রত্যাবর্তন** – ফিরে আসা। **রকম-সকম** – ভাবভঙ্গি। **উচ্চা** – অবাধ্য। **মুরুব্বি** – গুরুজন। **ওক্ত** – নামাজের সময়। **পরিত্রাণ** – উদ্ধার। **মক্তব** – মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। **বৈঠক** – সভা। **অপ্রত্যাশিত** – যা আশা করা হয়নি, অভাবনীয়। **বৃষ্টি পানি সিঞ্চিত** – বৃষ্টির পানিতে ভেজা। **ছাটা** – কেটে ছোট করা। **ক্ষীণ** – অল্প, মৃদু। **বেআদবি** – অভদ্রতা। **রুদ্ধ** – বন্ধ। **বেয়াড়া** – অবাধ্য। **সূত্র** – সম্পর্ক। **বদ মতলব** – দুষ্ট বুদ্ধি। **দিনকাল** – সময়। **এধার-ওধার** – এদিক ওদিক। **বেকুফি** – বোকামি। **মতিগতি** – মনের ভাব। **চাষাভুষা** – চাষী জাতীয়

সাধারণ লোক। **শিলাবৃষ্টি** – ঝড়ো বৃষ্টির সঙ্গে বরফ খণ্ড পড়া। **শিরালি** – শিলাবৃষ্টির ভয় কাটানোর জন্য যারা মন্ত্র পড়ে। **যপতপ** – মন্ত্রপাঠ। **নগ্ন** – নেংটা। **শিরনি** – পুণ্য লাভের জন্য মসজিদে বা পীরের বাড়িতে দেয়া পায়েস জাতীয় খাদ্য। **খতম পড়ানো** – মৃতের সৎকার, বালাই বা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোল্লা মৌলবীদের দিয়ে কোরান পাঠ। **সমস্বরে** – এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে। **দররা** – চাবুকের আঘাত। **ঘরে ঢোকা** – অবাধ যৌনমিলন। **নিত্যকার** – প্রতি দিনের। **বদ খেয়াল** – দুষ্ট ইচ্ছা। **হেদয়ায়ত** – সংশোধন। **মর্জি** – ইচ্ছা। **শাস্তিবিধান** – শাস্তির ব্যবস্থা। **চমৎকৃত** – অবাক। **উচ্ছ্বসিত** – বেশি আবেগপূর্ণ। **গদগদ** – অতিরিক্ত খুশি। **মুসল্লি** – যারা নামাজ পড়ে, নামাজী। **বাঞ্ছনীয়** – যে রকম ইচ্ছা করা হয়েছে, কাম্য। **বেত্তমিজ** – অভদ্র। **আকৃতি** – আকার। **গুরুতর** – বেশি গুরুত্বপূর্ণ। **খামখেয়ালী** – খেয়াল খুশি মতো যে চলে। **বড়গা** – বরগা, ছাদের ভার, রক্ষার জন্য ব্যবহৃত কাঠ অথবা লোহা। **হুড়কা** – দরজার খিল। **যৎকিঞ্চিত** – সামান্য। **গতর** – শরীর। **নির্মাণ** – তৈরি। **সকাতর** – কাতরতাসহ। **আর্জি** – নিবেদন, প্রার্থনা। **খায়েশ-খোয়াব** – ইচ্ছা ও স্বপ্ন। **পাট** – কাজকর্ম। **দিল** – হৃদয়, মন। **কানাঘুষা** – কানে কানে কথা চালাচালি। **বাজা** – বন্ধ্যা, যে নারীর সন্তান হয় না। **হিড়িক** – হুজুগ। **কষ্টি পাথর** – সোনা ইত্যাদি যাচাই করার বিশেষ পাথর। **পরমাত্মীয়** – অতি নিকটজন। **মঞ্জুর** – গৃহীত। **আস্ত** – পুরো। **ক্ষান্ত** – শেষ। **জোশ** – উত্তেজনা। **ফের** – আবার। **দরিয়া** – নদী।

বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ

উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাড়ের মধ্যে – সব উজ্জ্বলতার মধ্যে।

মন অন্ধকার হওয়া – মনে দুঃখ আসা।

অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে – অনেকেই কিনতে চায়।

কয়েকজন রুপালি চাকচিক্য – উচ্চ গিলাফে ঢাকা মাজার

বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে – বুকের ভিতরে দুঃখ জাগে।

কালো করে রেখেছে কেমন – মনটা বিষাদে ভরে গেছে।

হাওয়ায় কদিন ধরে একটা কথা ভাসে – প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ইস্কুল বসানো – বিদ্যালয় তৈরি করা।

কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব – কাউকে তোয়াক্কা করছে না এমন ভাব।

তসবি টিপতে পারবে – ধর্মকর্ম করতে পারবে।

মাথাটা একটু গরম ধরেছে – মাথা বিগড়ে গেছে।

অন্যের মাথা গরম করা – অন্যকে রাগিয়ে দেয়া।

ওঠে পড়ে লেগে গেলো – তৎপর হল।

যুক্তি তর্কের ধার ধারে না – যুক্তি মানে না।

যে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো – চারদিকে অনবরত যেতে লাগল।

বাড়াবাড়ির সীমা – অতিরিক্ত কিছু করার সীমা।

আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা – নিজের ভাবনায় ডুবে থাকার কারণে উদাসীন ভাব।

মুখ খুলেছে – কথা বলতে শুরু করেছে।

খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রগ – রেগে বা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

গা ঢিলা করে – স্বস্তি পায়।

কথাটা ঢাকা পড়ে গেছে – কথাটি নিয়ে আর কেউ আলোচনা করছে না।

গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে – শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

জীবন আর কদিন – জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

দুনিয়ার পাট গুটানো – পৃথিবীর কাজ কর্ম শেষ করে আনা।

ডাল পালা শাখা প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে – কথাটা সব দিকে ছড়াচ্ছে।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

আমাগো মনের কথাডাই কইছেন – আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন।

কথাডা ঠিকই – কথাটা ঠিকই।

আমি কত কই ছ্যামড়া দাড়ি রাখ তা হের কান দিয়া যায় না কথাটা – আমি কত বলি, ছেলে দাড়ি রাখ তা ওর কান দিয়ে যায় না কথাটা।

আপনি যা হুনছেন – আপনি যা শুনেছেন।

আইজকাইল ইংরাজি না পড়েল চলব ক্যামনে – আজ কাল ইংরেজি না পড়েল চলবে কীভাবে।

পোলা মাইনষের – ছেলে মানুষের।

গিরাম – গ্রাম।

আমাগো ভালে ধান হইছে – আমাদের ভালো ধান হয়েছে।

ফেলাইয়া রাখা ঠিক না – ফেলে রাখা ঠিক নয়।

চুপ কর ছ্যামড়া – চুপ কর ছেলে।

বেত্তমিজের মত কথা কইস না – অভদ্রের মতো কথা বলিস না।

পাঠসংক্ষেপ

এক রাতে মোমবাতি আলোয় মজিদ দেখে মাজারের ঝালরের এক পাশের কিছু অংশের রং নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য দুবছর তিন বছর অন্তর মাজারের গিলাফ পরিবর্তন করা হয়। তবু মাজারের কিছু হলে মজিদের খারাপ লাগে। রহীমা কিন্তু আমেনা বিবির কথা ভুলতে পারে না। খোদা দয়ালু হয়েও এত কঠিন কেন? রহীমার কথায় মজিদ চমকে ওঠে।

এদিকে মোদাব্বের মিঞার ইংরেজি পড়া ছেলে আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলতে লাগল এবং সরকারের কাছে আবেদনপত্রও দিল। গ্রামের মুরুব্বিরা এটি পছন্দ করেনি, মজিদ তো নয়ই। মজিদ আক্কাসকে কাবু করার পথ খুঁজতে লাগল। স্কুলের ব্যাপারে যে বৈঠক বসল তাতে মজিদ হঠাৎ আক্কাসকে জিজ্ঞেস করে বসল তার দাড়ি কই। আক্কাস স্কুল সম্পর্কে কথা বলতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু এ রকম উদ্ভট আক্রমণে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মজিদের প্রভাবে মহব্বতনগরের সবাই দাড়ি রাখতে শুরু করেছে, শুধু ব্যতিক্রম আক্কাস। মজিদ সকলকে বুঝিয়ে দিল যে, স্কুল গড়ার চিন্তা আক্কাসের মনের একটি বদ খেয়াল মাত্র। এরপর মজিদ একটি নতুন প্রস্তাব দেয়। তাহল মহব্বত নগর গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হলেও এখানে পাকা মসজিদ নেই। পাকা মসজিদ করার প্রস্তাবে সবাই প্রবল উৎসাহ বোধ করে। খালেক ব্যাপারী খরচের বারো আনা বহন করার আগ্রহ দেখায়। তবে মসজিদ নির্মাণে গ্রামের সকলেরই কিছু না কিছু অংশ থাকতেই হবে। এটি মজিদের ইচ্ছা। এভাবে আব্বাসের স্কুল গড়ার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। মোদাব্বের মিঞাই জানায় ছেলে যদি আর অগ্রসর হয় তাকে দু টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে কেন?

২. মজিদ কীভাবে লাভবান হয়?

৩. রহীমা মজিদের সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেন?

৪. আব্বাস কে? সে কি করতে চায়? কেন করতে চায়?

৫. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা? - এটি কার উক্তি? এ কথা বলার কোন কারণ আছে?

৬. 'মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি!' এখানে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দিন।

৭. আক্কাস কেন বৈঠক থেকে ওঠে চলে যায়?

৮. মসজিদ তৈরির খরচের ব্যাপারে মজিদের কী প্রস্তাব থাকে?

৯. খালেক ব্যাপারী কেন বারো আনা খরচ বহন করতে চায়।

১০. আপনি এ পাঠের বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলো অর্থসহ সাজিয়ে লিখুন।

১১. এ পাঠের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যগুলোর অর্থ লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে কেন?

উত্তর : এক রাতে মোমবাতির উজ্জ্বল আলোয় মজিদ দেখে মাজারের গিলাপের ঝালরের একটি অংশ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঐ জায়গাতে সুতোও একটু খসে গেছে। এ কারণে মজিদের মনে দুঃখ জাগে। মজিদ মাজারের রক্ষক ও পীর। তার মান মর্যাদা মাজারকে ঘিরে। মাজারের প্রতি তার টানও রয়েছে বেজায়। মাজারের সামান্য ক্ষতি হলেও তার মন খারাপ হবে। সে সবসময় চায় মাজারের সবকিছু ঝকঝকে থাকুক।

প্রশ্ন : মজিদ কীভাবে লাভবান হয়?

উত্তর : মাজারের গিলাফ বদলানো হয় দু-বছর তিন বছর পর পর। পুরোনো গিলাফ কেনার জন্য গ্রামের অনেক লোক খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সব প্রার্থীর মধ্যে সেই উপযুক্ত যে বেশি টাকা দিতে পারে। এ গিলাফ বেচার টাকা পায় মজিদ নিজেই। সুতরাং যত বেশি টাকায় সে গিলাফ বিক্রি করতে পারে ততই তার লাভ।

প্রশ্ন : রহীমা মজিদের সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেন?

উত্তর : আমেনা বিবির জন্য রহীমার মনটা সারাদিন খারাপ থাকে। তার মনে কেবল একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে। আমেনা বিবির এত বড় শাস্তি হল কেন? সে যে অন্যায় কিছু করেছে এমন তো দেখা যায়নি। আবার করেনি যে তাও বলা যায় কি করে। মজিদ যখন বলেছে তখন তা অবিশ্বাস করা যায় না। ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে যায় রহীমা। তবু আমেনা বিবির জন্য তার খারাপ লাগে। দয়ালু খোদা এত কঠিন কেন? আমেনার জন্য রহীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মজিদের সামনে।

প্রশ্ন : আক্কাস কে? সে কি করতে চায়? কেন করতে চায়?

উত্তর : আক্কাস মোদাব্বের মিঞার ছেলে। সে ইংরেজি স্কুলে পড়েছে। তারপর বিদেশে গিয়ে বহুদিন থেকেছে। সেখানে চাকরি করে পয়সা জমিয়ে সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে।

আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আক্কাসের এ ধারণা হয়েছে যে স্কুলে না পড়লে মুসলমানের ছেলের উন্নতি হবে না। গ্রামে মক্তব আছে বটে, কিন্তু মক্তব্যে পড়ে পড়ুয়ারা আধুনিক চেতনা থেকে পিছিয়ে থাকে। সে জন্য আক্কাস মনে করে গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত।

প্রশ্ন : 'তোমার দাড়ি কই মিঞা? - এটি কার উক্তি? এ কথা বলার কোন কারণ আছে?

উত্তর : উক্তিটি মজিদের।

মজিদ এ কথাটি বলেছে মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাসকে। আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আধুনিক শিক্ষা গ্রামে চালু হলে মক্তবের লেখাপড়ায় পড়ুয়াদের আগ্রহ কমে যাবে। তখন মজিদের মতো ধর্মের কারবারীদেরও

অসুবিধা হবে। সে জন্য মজিদ গ্রামে স্কুল হতে দিতে চায় না। মজিদের সুবিধা হল এ যে, গ্রামের অজ্ঞ লোকেরা তাকে ভয় করে এবং তার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু আক্কাস তো সে রকম ছেলে নয়। আক্কাসকে থামিয়ে দিতে মজিদ তৎপর হয়। মুসলমানের ছেলে দাড়ি রাখে না এ কথাটি বললে গ্রামের লোকেরা আক্কাসের বিরুদ্ধে যাবে। বাস্তবে হয়েছে তাই। মজিদ লোকজনের সামনে এটি প্রমাণ করল যে আক্কাস ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মানে না।

প্রশ্ন : 'মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি!' এখানে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দিন।

উত্তর : এখানে চেতনা বলতে ইসলাম ধর্মের চেতনার কথা বলা হয়েছে। মজিদ যখন এ গ্রামে প্রথম এসেছিল তখন সে দেখেছিল এ গ্রামের মানুষেরা ধর্মকর্মের ধার ধারে না। সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এখন। এখন সাধারণ লোকও কলমা জানে। তাঁরা পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে এবং রোজার দিনে রোজা রাখে। অনেক কুসংস্কার ও সামাজিক প্রথা বন্ধ হয়েছে। শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা শিরালির মন্ত্রে বিশ্বাস করত। এখন তারা দোয়া দরুদ পড়ে, মসজিদে শিরনি দেয় এবং খতম পড়ায়। আগে মেয়েরা ধান ভানতে গান গাইত, এখন তা বন্ধ হয়েছে। এখন মজিদের একশ দোররার ভয়ে অবাধ যৌনাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। সুতরাং নতুন চেতনা তো হয়েছে।

প্রশ্ন : আক্কাস কেন বৈঠক থেকে ওঠে চলে যায়?

উত্তর : আক্কাস বৈঠকে এসেছিল স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলতে। কিন্তু মজিদ আচমকা এমন এক প্রশ্ন করে বসল যে আক্কাস একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বৈঠকে আক্কাস ছাড়া অন্য সকলের দাড়ি ছিল। দাড়ি থাকা না থাকার সঙ্গে স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ সে কথা বোঝে না। দাড়ি নাই কেন এ প্রশ্নটি করে মজিদ আক্কাসকে একেবারে চুপসে দিল। তারপর মজিদ গ্রামে একটি পাকা মসজিদ স্থাপনের প্রস্তাব দিলে উপস্থিত সবাই একবাক্যে সায় দিল। আক্কাস স্কুলের কথাটা আবার তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু পিতার ধমকে সে আর কিছু বলতে পারল না। সবাইকে মসজিদ করা নিয়ে আলোচনা করতে দেখে আক্কাস আসর থেকে ওঠে চলে গেল। সে বুঝল যে এ সভায় সে অবাঞ্ছিত।

প্রশ্ন : মসজিদ তৈরির খরচের ব্যাপারে মজিদের কী প্রস্তাব থাকে?

উত্তর : মসজিদ তৈরি করতে হলে খরচ হবে। সে খরচ কে বহন করবে? মজিদ প্রস্তাব দেয় মসজিদ তৈরিতে গ্রামের সকলের তৌফিক অনুযায়ী কম বেশি দান যেন থাকে। কিন্তু গ্রামে অনেক মানুষ আছে যাদের একটি পয়সাও নেই। সেক্ষেত্রে তারা শারীরিক পরিশ্রম করে মসজিদ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারী কেন বারো আনা খরচ বহন করতে চায়।

উত্তর : খালেক ব্যাপারী গ্রামের মাতব্বর এবং সবচাইতে পয়সাওয়ালা লোক। আগেও সে মাজারের জন্য অনেক পয়সা খরচ করেছে, গিলাফ বদলে দিয়েছে। এখন সে মসজিদের জন্যও টাকা দেবে। কিন্তু বেশির ভাগ খরচ সে একাই বহন করতে চায়। তার মনটা বড় অশান্তিতে আছে সংসারেও তার বিরাগ এসেছে। আগের মতো দুনিয়ার কাজে সে শান্তি পায় না। সে জন্য সে পরকালের চিন্তা করে এবং সওয়াব অর্জন করতে চায়। মসজিদের বারো আনা খরচ বহন করার আর্জির কারণ একটি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এ কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য।

২. রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে মন।

৩. শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই।

৫. দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়।

তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এ কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য।

ব্যাখ্যোয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে মাজারের প্রতি মজিদের মমতার কথা বলা হয়েছে।

মজিদ বাইরে থেকে এসে মহব্বতনগর গ্রামে স্থায়ীভাবে আস্তানা তৈরি করেছে। ধর্মকে পুঁজি করে সে এটি সম্ভব করেছে। কোন এক অখ্যাত কবরকে সালু দিয়ে ঘিরে সুন্দর গিলাফ দিয়ে ঢেকে সে গ্রামের পীর সেজে বসেছে এবং সকলের সম্মান ও ভক্তি পাচ্ছে। সুতরাং মাজার হচ্ছে তার অস্তিত্বের ভিত্তি। এ মাজারের কোন রকম অনাদর বা অবহেলা তার কাম্য হতে পারে না। এজন্য যখন এক রাতে মোমবাতির আলোয় যখন সে দেখল যে গিলাফের রূপালি ঝালরের এক প্রান্তের সূতা খসে গেছে তখন সে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং মনে দুঃখ অনুভব করে। মাজারের উজ্জ্বলতাই যদি কমে যায় তাহলে মজিদও ম্লান হয়ে পড়ে। মজিদকে টিকে থাকতে হলে মাজারের সৌন্দর্যও বজায় রাখতে হবে। মজিদ সে জন্য মাজারের সৌন্দর্য ঠিক রাখতে তৎপর। এটাই তার সৌখিনতা।

যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই।

আলোচ্য লাইনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে বন্ধ্যা মেয়েদের প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে।

মজিদের চক্রান্তে বন্ধ্যা স্ত্রী আমেনা বিবিকে খালেক ব্যাপারী তালাক দিয়েছে। তালাক দেয়ার পর ব্যাপারীর মনের শান্তিও নষ্ট হয়েছে। মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে সে চায়। সেজন্য মসজিদ তৈরির বারো আনা খরচ সে নিজে করতে চায়। দুনিয়াদারিতে তার আর মন নেই। কিন্তু সন্তান না হওয়ার জন্য আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া কি সমীচীন হয়েছে। এ ব্যাপারে সমাজ বড় নিষ্ঠুর। সন্তান না হলে স্বামীর ঘরে মেয়েদের আদর কমে যায়। এ মেয়েকে সমাজ ভাবে অপয়া। আমেনা বিবি বন্ধ্যা হওয়ায় ব্যাপারী তার প্রতি যে খুশি ছিল তা নয়। সে দ্বিতীয় বিবাহ করতেও বিলম্ব করেনি এবং প্রথম সুযোগে আমেনাকে তালাক দিয়েছে। বন্ধ্যা মেয়েরা যে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয় আমেনা বিবির ঘটনাই তার প্রমাণ। সে জন্য বাজা মেয়ে যে ঘরে রয়েছে সে ঘরে স্বস্তি থাকার কথা নয়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মজিদের বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- মজিদের আরেক সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিলো ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গুম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এ দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোন এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা।

কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিলো। এ মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিলো ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে, এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিলো তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দরুদ পড়ছিলো মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নাবিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মত মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালু কাপড়টা এক কোণে উল্‌টে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মত ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় কবরের সে অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মত দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এ কবরই, কিন্তু সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে ওঠেছিলো, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার একে। কবরের কাপড় উল্‌টানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গবোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মত আদিঅন্তহীন—যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহীমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহীমা কোন প্রশ্ন করে না।, কিন্তু মনে-মনে ভাবে।

এক সময়ে মজিদই বলে,

—বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকতো!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহীমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে, —আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

—নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া-দেয়। মহড়া-দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে ওঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মত তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহীমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

—আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিতো!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মত দেখাচ্ছিলো। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিলো যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরীফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মত অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান-পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে– তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহীমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিলো। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহীমাকে বলে,

–বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্যে রহীমা পা-টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

–বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম? সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহীমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোন উত্তর আসে না মুখে।

রহীমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

–কী কও?

–আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহীমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তসারশূন্যতা এ মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্তবড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

সুদৃশ্য – দেখতে সুন্দর। **দুস্থ** – দীন, দুঃখী। **গুম্বুজ** – গম্বুজ, মসজিদ ইত্যাদির ওপরে গোল চূড়া। **তদারক** – দেখাশোনা। **পাগলা হাওয়া** – এলোমেলো হাওয়া। **ঝকঝকে রোদভাসা** – রোদে উজ্জ্বল। **জমজমাট** – সরগরম। **মথিত** – আন্দোলিত। **দমকা** – হঠাৎ জোরে সঙ্গে আসা। **অতিক্রান্ত** – ফেলে আসা। **নিরাকপড়া** – একটুও হাওয়া নেই এমন। **জোতজমি** – সম্পত্তি। **সম্মান-প্রতিপত্তি** – মর্যাদা ও ক্ষমতা। **সচ্ছলতা** – প্রাচুর্য। **শিকড়গাড়া** – শিকড় মাটিতে অনেকটা ঢুকে যাওয়াতে গাছের শক্ত অবস্থান। **বিসদৃশ** – অন্য রকম। **ঠক্কর** – ধাক্কা, আঘাত। **সমৃদ্ধি** – টাকা পয়সা ও সম্পত্তির উন্নতি। **যশমান** – সুনাম ও সম্মান। **চিরশায়িত** – চিরকাল শুয়ে থাকা। **নিঃসঙ্গ** – একাকী। **আদি অন্তহীন** – যার শুরু নাই শেষও নাই, বিশাল, সীমাহীন। **অপলাপ** – মিথ্যে কথা। **স্বল্পভাষিনী** – যে স্ত্রীলোক কম কথা বলে। **চড়িয়ে** – উপড়ে তুলে। **মোটা তাজা** – স্বাস্থ্যবান। **নিজের রক্ত** – নিজের ছেলেমেয়ে। **মহড়া** – প্রস্তুতি। **জন্মের ঠিক** – জন্ম অবৈধ। **ব্যথাবিদীর্ণ** – ব্যথায় ছিড়ে গিয়েছে এমন। **নিছক** – খাঁটি। **অনাবৃত** – আঢাকা, খোলা। **পুষ্যি** – পোষ্য, দত্তক। **উপভোগ** – তৃপ্তির সঙ্গে যাপন। **ঢাকা** – বিস্তৃত। **পিচ্ছিল** – পিছলা। **রেশ** – অনুরণ; তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর শেষে কিছুক্ষণ যে শব্দ থাকে। **আওয়া ঘর** – বসার ঘর। **কদু** – লাউ। **পলক** – নিমেষ। **নিষ্ফলতা** – ব্যর্থতা। **অন্তসারশূন্যতা** – ভিতরটা শূন্য এমন ভাব।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত – আমাদের যদি ছেলে-পিলে থাকত।

পোলা – ছেলে।

তোমার একটা সাথী আনুম – তোমার একটি সঙ্গী আনব।

কী কও – কি বল।

আপনে যেমুন বোঝেন – আপনি যেমন বোঝেন।

পাঠসংক্ষেপ

মসজিদ তৈরি হতে থাকে। ফাল্গুনের এলোমেলো হাওয়াতে তার মনে ভাবান্তর আসে। অনেক বছর ধরে সে এখানে আছে। এখানে জায়গাজমি ও মানমর্যাদাসহ সে পাকাপোক্ত হয়ে আছে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে মাজারটি। সালু কাপড়ের এক অংশ বাতাসে উল্টে আছে। কার কবর এটি? মজিদ জানে না।

রাতে ঘুমাবার সময় মজিদ রহীমাকে বলে, যদি তাদের ছেলেপিলে থাকতো। হাসুনিকে দত্তক নেয়ার প্রস্তাব মজিদ উড়িয়ে দেয়। মজিদের মনে হয় জীবনটাকে সে উপভোগ করেনি। পরদিন মজিদ রহীমাকে জানায়, সে রহীমার সাথী আনবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ফাল্গুনের দমকা হাওয়া মজিদের মনে কোন্ ভাব জাগায়?

২. কবরটি মজিদকে ভীত করে তোলে কেন?

৩. রাতে মজিদ রহীমাকে কি বলে? রহীমার উত্তর কী ছিল?

৪. 'মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি'। কথাটার অর্থ কী?

৫. মাজারের অনাবৃত কোন দেখে মজিদের কী মনে হয়?

৬. মজিদ দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চায় কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ফাল্গুনের দমকা হাওয়া মজিদের মনে কোন্ ভাব জাগায়?

উত্তর : ফাল্গুনের দমকা হাওয়া মনকে বেদনাময় করে তোলে। হাওয়াতে ধুলি উড়াতে দেখে মজিদের মনে হয় ফেলে আসা দিনগুলির কথা। এ দেশে সে বহুদিন ধরে বসবাস করেছে। দশ বারো বছর তো হবেই। একসময় সে টাকা পয়সাহীন গরীব মানুষ হিসেবে সে এ গ্রামে এসেছিল, কিন্তু আজ তার অনেক জায়গা জমি এবং মান মর্যাদা ও ক্ষমতা। ভবিষ্যতে এগুলো ঠিকই থাকবে। এখন সে বাতাসে উড়ে যাওয়া পাতা নয়, মাটিতে শিকড় গাড়া গাছ। সে এখন সচ্ছল মানুষ।

প্রশ্ন : কবরটি মজিদকে ভীত করে তোলে কেন?

উত্তর : বাতাসে কবরের সালু কাপড়ের এক অংশ উল্টে যায়। সেই অনাবৃত অংশ যেন মরা মানুষের খোলা চোখের মতো ঠেকে। এ কবরই মজিদের মান সম্মান ও অর্থবিত্তের মূলে। কিন্তু এ কবরের ভিতরে যে শায়িত আছে মজিদ তাকে চেনে না। অথচ এ কবরের সঙ্গেই সে গত দশ বারো বছর বসবাস করে আসছে। এ কথা ভাবতে ভাবতে মজিদ শিউরে ওঠে।

প্রশ্ন : রাতে মজিদ রহীমাকে কি বলে? রহীমার উত্তর কি ছিল?

উত্তর : রাতে ঘুমাতে গিয়ে রহীমা মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। মজিদ রহীমাকে বলে যদি তাদের ছেলে থাকত। সন্তানের বড় অভাব অনুভব করে মজিদ। রহীমা উত্তর দিতে গিয়ে জানায় তার ইচ্ছে হাসুনিকে পুষ্যি রাখা। হাসুনির উপর তার মায়া পড়েছে। হাসুনি স্বাস্থ্যবান ছেলে।

প্রশ্ন : 'মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি'। কথাটার অর্থ কী?

উত্তর : মজিদ ছেলেপিলে চায়। কিন্তু রহীমা বাজা মেয়ে। তার সন্তান হবে না। সে রাতে এ নিয়ে কথাবার্তা বলার পর যখন দুজনে চুপ হয়ে যায় তখন রহীমা ভাবতে বসে। মজিদ আর কথা বলে না নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু মজিদের নীরবতা রহীমার কাছে পাথরের মতো ভারি মনে হয়। সে নীরবতার মধ্যে যেন বঞ্চনা রয়েছে সন্তান না পাওয়ার হাহাকার আছে। সে জন্য ঐ নীরবতা অসহনীয়।

প্রশ্ন : মাজারের অনাবৃত কোন দেখে মজিদের কি মনে হয়?

উত্তর : মাজারের অনাবৃত কোণ দেখে মজিদের মনে হয় ওটি যেন মৃত মানুষের চোখ। তখন সম্ভবত মৃত্যুর কথা তার মনে পড়ে। এ মৃত্যুর প্রসঙ্গে মজিদ ভাবে জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ করতে না পারলে টাকা পয়সা, সম্পত্তি ও সম্মান অর্থহীন। এত পরিশ্রম করে আরাম আয়েশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখারও কোন মানে হয় না।

প্রশ্ন : মজিদ দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চায় কেন?

উত্তর : মজিদ রহীমাকে বলে তার জন্য সে সাথী আনবে। অর্থাৎ সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। সম্ভবত সে সন্তান চায়। কেননা রহীমা তাকে সন্তান দিতে পারেনি, সে বন্ধ্যা মেয়ে। একটি সন্তানের জন্য আকুল তাই মজিদকে দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী করে। তাছাড়া রহীমাও একা। আরেকটা মেয়ে আসলে ঘর ভরে উঠবে। এগুলো মজিদ বলে। আমলে তার দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছাকে এভাবে যুক্তিসঙ্গত করতে চায় সে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতার শিকড় গাড়া বৃক্ষ।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের পাকাপোক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বহুদিন আগে ভাগ্য অন্বেষণে মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে এসেছিল। তখন সে ছিল একেবারে নিঃস্ব। কিন্তু এটি মাজারকে কেন্দ্র করে সে এ গ্রামে অর্থবিত্ত করেছে এবং খোদার মানুষ হিসেবে সে সকলের শ্রদ্ধাও পেয়েছে। অর্থাৎ এ গ্রামে তার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা একটি উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ঝড়ে পাতা ওড়ে যায়, কিন্তু শক্ত শিকড়ওয়ালা গাছকে ঝড় উপড়ে ফেলতে পারে না। মজিদও গাছের মতো এ গ্রামের মাটিতে শক্তভাবে শিকড় গেড়েছে। কেউ তাকে সরাতে পারবে না।

ইউনিট ৮

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথি-এর হৈহুলস্থূল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিলো যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—হে নামাজ জানে নি?

রহীমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

—জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহীমা সরাসরি উত্তর দেয়,

—পড়বো আর কি ধীরে-সুস্থে,

—তোমার হে মানসম্মান করে নি?

—করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে—এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিলো।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনে নি। রহীমা জোরে হাসে না। সালু আবৃত মাজারের আশে-পাশে যারা আসে তারাও কোনদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মত হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো। এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-বা কবে মজিদ এমন হাসি শুনেছে। জীর্ণ গোয়ালঘরের মত মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্ন-সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মত মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

—কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহীমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহীমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহীমা বলে,

—জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মত ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

—একটা মজার কথা মনে পড়লো বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহীমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—কী কথা বইন?

—কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

—কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

—তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

—কারে দেখাইছিল?

—আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর—হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে—আর, এখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না। রহীমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোন কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারি হয়ে থাকে। রহীমার অলক্ষে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তার পর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহীমা যেমন চমকে ওঠেছিলো তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝেঁকে চোখ নাক মোছে।

রহীমা আস্তে বলে,

—কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহীমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহীমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিলো এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহীমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে—পূর্বাহ্নে তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহীমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মত চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিলো। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মত ভেঙে খান-খান হয়ে গেলো। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, —সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে। —ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রুহ-এর জন্য দোয়া করা, সে যেন বেহেস্তে স্থান পায়, তার গুণাহ যেন মাফ হয়ে যায়—তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মত মুখ চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুস নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরে আগে মজিদকে নিকটে কোন একস্থানে যেতে হয়েছিলো, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মত বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশ নাই।

রহীমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিড়িতে এসে বসে। রহীমার হাত থেকে হুকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

—ওইটার হইছে কী?

রহীমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

—মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—কিন্তু .... ক্যান খারাপ করছে?

রহীমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ায় হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোন লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী—তবে না হয় বুঝতো মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢঙ? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মত হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বলা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহীমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

দানা-দানা – ছোট ছোট গোল আকারের। **অনাড়ম্বর** – জাঁকজমকহীন। **মেহমান** –অতিথি। **হৈহুলুস্থুল** – হট্টগোল, চীৎকার, ব্যস্ততা। **সংগোপনে** – অতি গোপনে। **সারা** – শেষ। **ভুরভুর** – ভরপুর, সবদিকে ভরে যাওয়া। **ধীরে-সুস্থে** – আস্তে ধীরে। **আড়াল** – গোপন। **মিহিসুন্দর** – অতি সূক্ষ্ম, চমৎকার। **চমকিত** – বিস্মিত। **রোল** – আওয়াজ, শব্দ। **জীর্ণ** – পুরাতন। **গোয়াল ঘর** – গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর থাকার জায়গা। **খিটখিটে** – বদমেজাজী। **তারস্বরে** – উঁচুস্বরে। **আম সিপারা** – আমপারা, ত্রিশ খন্ড কোরানের শেষ খন্ড। **অন্ন-সংস্থান** – খাবার জোটানো। **তিক্ততম** – সবচাইতে দুঃখজনক। **সংগ্রাম** – যুদ্ধ। **আভাস** – পরিচয়, চিহ্ন। **টান** – শক্ত। **রুষ্টতা** – রাগের ভাব। **আড়ষ্ট** – জড়োসড়ো। অবিশ্রান্ত। **মরণাপন্ন** – মুমূর্ষ। **ঝাড়তে** – দোয়া পড়ে গা ফুঁ দিতে। **অনাবিল** – স্বচ্ছ, পরিষ্কার। **সমাপ্তিহীন** – শেষ নেই এমন। **ধারা** – প্রবাহ, গতি। **বুবু** – বড় বোন বা বোনের মত জ্যেষ্ঠদের সম্বোধনবাচক শব্দ। **মস্করা** – ঠাট্টা। **কৌতুক** – রঙ্গ রসিকতা, ঠাট্টা। **দুলা** – বর। **দুলার বাপ** – শ্বশুর। **সংযত** – নিয়ন্ত্রিত। **ছলছল** – চোখের জল আসার ভাব। **নিদারুণ** – খুব বেশি। **অভিমান** – নিকট জনের বিরুদ্ধে রাগ। **অলক্ষ্যে** – গোপনে, কেউ দেখে না এমন। **পশলা** – বর্ষণ, এখানে চোখের পানি পড়া। **নুলা** – হাত বিকল হয়েছে এমন। **হদিশ** – ঠিকানা। পূর্বাহ্নে – আগে ভাগে। **ইঙ্গিত** – আভাস। **দুষ্কর** – কষ্টসাধ্য। **খ্যাংটা** – মেজাজ গরম, খিটখিটে। **আর্তনাদ** – কাতর চীৎকার। **বিলাপ** – টানা সুরে কান্না। **অভিযোগ** – নালিশ। **যাদু** – ছোট বাচ্চা। **কোমল** – নরম। **খান খান** – টুকরো টুকরো। **পেয়ারের** – আদরের। **জলদি** – তাড়াতাড়ি। **প্রস্থান** – ফিরে যাওয়া। **রুহ** – আত্মা। **গুণাহ** – পাপ। **মাফ** – ক্ষমা। **নছিহত** – ধর্মীয় উপদেশ। **হুস** – জ্ঞান। **চৌকাঠ** – দরজার কাঠের ফ্রেম। **ঝুরে আসা চোখ** – কান্নায় কাতর চোখ। **বদনা** – সং বর্ধনী। পানি রাখার এক ধরনের নলযুক্ত পাত্র। **খড়ম** – কাঠের পাদুকা। নড়চড় – নড়াচড়া। **পিড়ি** – কাঠের আসন। **লক্ষণ** – চিহ্ন, আভাস। **দায়িত্ব** – কর্তব্যের ভার। **চিনচিনে** – সূক্ষ্ম। **মস্ত** – বিরাট। **একরত্তি** – এতটুকু। **ঢঙ** – ভঙ্গি। **ঠাটাপড়া** – বাজপড়া, বজ্রাহত। **গর্জন** – রাগ প্রকাশের উচ্চ চীৎকার। **মড়ক** – মহামারি। **বলা** – বিপদ আপদ, রোগ। **অবসন্ন** – শ্রান্ত, ক্লান্ত।

বিশিষ্টার্থক ব্যবহার

চুকে যায় – শেষ হয়।

যেন ঠিক বেড়াল ছানা – বিড়ালের বাচ্চার মতো অতি নিরীহ।

ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে – ভয়েই মরে যাবে।

তার মুখে কথা ফুটতে থাকে – কথা বলতে শুরু করে।
ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল – নিজের মধ্যে রেখেছিল।
বরফ গলা নদীর মত – জমাট দুঃখের প্রকাশ।
মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে – রাগে মুখ কঠিন হয়।
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানো – গুরুতর কিছু ভাবনার ভঙ্গি।
গলা পর্যন্ত ওঠে ভারি হয়ে থাকে – রাগ বা অভিমান প্রকাশ করতে না পারার জন্য গলায় যন্ত্রণা।
পশলাটি কেটে গেলে – কান্না শেষ হলে।
সাতকুলে কেউ নেই – বংশধর নেই।
চোখের মনি – অতি আদরের ছেলে।
সকালটা যেন কাঁচের মত ভেঙে খান খান হয়ে গেল – সকালের সুন্দর সময়টা নষ্ট হয়ে গেল।
নছিহতে কান নেই – উপদেশ শোনে না।
শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে – অতিমাত্রায় শোকাকুল হয়েছে।
আশ-পাশের দিশ নাই – আশপাশ সম্পর্কে সচেতনতা নাই।
পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতা – পার্থিব জীবন নিয়ে বোধশূন্যতা।
সংসার উচ্ছন্নে যাক – সংসার নষ্ট হোক।
বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে – অতিরিক্ত ভয় পায়।
ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে – অত্যন্ত ভয় পাবে।
মনে শাশুড়ির ভাব জাগে – শাশুড়ি যেমন বালিকা বউকে আদর করে, রহীমার মনেও জমিলা সম্পর্কে সে ধারণা হয়।
চোখ পর্যন্ত তোলে না – খুবই শান্তশিষ্ট ও লজ্জাশীলা হয়ে থাকে।
আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে – প্রকৃত স্বভাব বেরিয়ে আসতে থাকে।
ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল – গোপন করে রেখেছিল।
দুঃখ বেদনা বরফ গলা নদীর মত – বরফ গললে যেমন নদী হয়, মানুষের দুঃখ বেদনাও যেন গলে গিয়ে পানি হয়।
মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে – খুব রেগে যায়।
হাসিতে ফেটে পড়লো – অতিরিক্ত হাসলো।
ভারি হয়ে থাকে – আটকে থাকে।
মনের হদিশ পাওয়া যায় না – মন বোঝা যায় না।
সাত কুলে কেউ নেই – বংশের কেউ নেই।
চোখের মনি – অতি আদরের
শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে – বেশি রকম শোক হয়েছে।
ঠাটা পড়া মানুষের মত হয়ে গেছে – বাজ পড়া মানুষ যেমন প্রাণহীন তেমনি।
বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে – বেশ ভয় পায়।
দাউ দাউ করা শিখার মত সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে – খুব বেশি উত্তেজিত হয়।

আঞ্চলিক শব্দ ও ব্যাক্যাংশ

পড়বো – পড়বে, **ভালা** – ভালো, **কইরা** – করে, **মাইয়া** – মেয়ে, **হুনে না** – শোনে না

হুনলা নি – শুনেছ কি?, **আওয়াজ কইরা হাসন নাই** – আওয়াজ করে হাসতে নেই, **জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো** – জোরে হেসো না বোন, মানুষ শুনবে, **বইলাই** – বলেই, **তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায়** – তিনি যখন আমাকে বিয়ে করতে আসেন, **তানারে দেখাইছিল** – তাঁকে দেখিয়েছিল, **তয় দেইখা আমি কই** – তখন দেখে

আমি বলি, **দ্যুত** – ধ্যুৎ- অবিশ্বাস প্রকাশের শব্দ, **কাঁদো ক্যান বইন** – কাঁদো কেন বোন, **ওইটার হইছে কি** – ওটার হয়েছে কি?, **ছেমড়ি** – মেয়ে, **থিকা** – থেকে, **আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে** – আমর দরজা থেকে উঠতে বল তাকে, **আনবার** – আনতে।

পাঠসংক্ষেপ

জ্যৈষ্ঠ মাসে মসজিদের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই মজিদ কোন বড় আয়োজন না করে দ্বিতীয় বিয়ে সেরে ফেলে। নতুন বউ অল্প বয়সী, দেখতে অতি নিরীহ গোছের, নাম জমিলা। জমিলাকে খুব পছন্দ হয় রহীমার। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে জমিলার স্বাভাব বোঝা যায়। সে বেরিয়ে আসে ঘোমটা থেকে, কথা বলে অনবরত এবং হাসতে থাকে। মজিদ বিচলিত হয়। এ রকম হাসি সে কখনো শোনে নি। মাজারে কেউ কখনো হাসে না। মজিদের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও জমিলার হাসি বন্ধ হয় না। একদিন হেসে হেসে জমিলা রহীমাকে বুঝিয়ে দেয় যে মজিদ তার শ্বশুরের মতো, আর রহীমা তার শাশুড়ির মতো। জমিলা শুধু হাসে না, কাঁদেও। জমিলার রকম-সকম মজিদকে ভাবিয়ে তোলে। জমিলার মনের হদিস পাওয়া মুশকিল। একদিন এক খিটখিটে বুড়ি মজিদের কাছে বিপুল আর্তনাদ করে তার মৃত ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার চীৎকার জুড়ে দেয়। সেটি দেখে জমিলা কেমন পাথরের মত হয়ে যায়। সে মন খারাপ করে চৌকাঠে বসে থাকে। মজিদ এসব একেবারে পছন্দ করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদের নতুন বউয়ের নাম কী? তাকে পেয়ে রহীমার কী ভাব জাগে? মজিদ ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায় কেন?

২. জমিলার ব্যাপারে রহীমা ও মজিদের ভুল ভাঙে কখন?

৩. মজিদ কি জন্য চমকিত হয়?

৪. 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' – কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।

৫. জমিলা কাঁদে কেন?

৬. খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে কী ফরিয়াদ জানাল? মজিদ তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দিল?

৭. 'জমিলা যেন ঠাটা পড়া মানুষের মত হয়ে গেছে'। এ বাক্যটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৮. কয়েকটি নতুন শেখা শব্দ অর্থসহ সাজিয়ে লিখুন।

প্রশ্ন : মজিদের নতুন বউয়ের নাম কী? তাকে পেয়ে রহীমার কী ভাব জাগে? মজিদ ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায় কেন?

উত্তর : মজিদের নতুন বউয়ের নাম জমিলা।

জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। জমিলার প্রতি তার স্নেহ জাগে, মেয়ের মতো মনে হয় তার। এভাবে যতই সে দেখে ততই জমিলাকে তার ভালো লাগে।

ওদিকে জমিলার মতো একটি তরুণী মেয়েকে বিয়ে করতে পেরে মজিদ খুব খুশি হয়। এ বয়সেও তার মনে বরের ভাব জাগে। সেজন্য সে দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলায়।

প্রশ্ন : জমিলার ব্যাপারে রহীমা ও মজিদের ভুল ভাঙে কখন?

উত্তর : জমিলার ব্যাপারে মজিদ ও রহীমার ভুল ভাঙল অল্প দিনের মধ্যে। প্রথমে জমিলাকে খুব নিরীহ বিড়াল ছানার মতো মনে হয়েছিল। চুপচাপ শান্ত শিষ্ট হয়ে রয়েছিল সে প্রথমে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে ঘোমটার আড়াল থেকে

বেরিয়ে আসে। হাসতে ও কথা বলতে শুরু করে। তার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল সে অনেক কিছু জানে, এতদিন প্রকাশ করেনি। তখনই মজিদ ও রহীমা জমিলাকে বুঝতে পারল।

প্রশ্ন : মজিদ কি জন্য চমকিত হয়?

উত্তর : একদিন মজিদ বাইরের ঘর থেকে জমিলার হাসির ঝঙ্কার শোনে। এতেই মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘদিন সে এখানে বাস করছে। কিন্তু কোনদিন সে এমন হাসি শোনে নি। মাজারে যারা আসে তারা কেউ হাসে না। তারা দুঃখের ফরিয়াদ নিয়ে আসে, প্রবলভাবে কাঁদে। এখানে বুকফাটা বেদনা জাগে। কে হাসবে এখানে? তাছাড়া শৈশব থেকে মজিদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কোনদিন এমন করে কেউ হাসে নি।

প্রশ্ন : 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' - কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : উক্তিটি জমিলার। রহীমাকে সে একথা জানিয়েছে। বিয়ের আগে জমিলার খোদেজা বুবু মজিদকে দেখিয়েছিল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। মজিদ দাড়িওয়ালা বয়সী মানুষ। তাকে দেখে জমিলা ভেবেছিল এ লোক নিশ্চয়ই বরের বাপ। কিন্তু এর সঙ্গেই তো তার বিয়ে হল। আসলে এরকম পিতৃতুল্য অসমবয়সী মানুষকে জমিলা স্বামী হিসেবে ভাবতে পারিনি। তার দুঃখের কথা, অপছন্দের কথা হাসতে হাসতে সে রহীমাকে জানিয়েছে।

প্রশ্ন : জমিলা কাঁদে কেন?

উত্তর : জমিলা শুধু হাসে না, জমিলা কাঁদেও। পাটি বোনার সময় জমিলা কাঁদে, চোখ-নাক মোছে। জমিলা কি জন্য কাঁদে তা সে বলতে চায় না। একটা মিথ্যা কথা বলে রহীমাকে। তার এক নুলো ভাইকে ফেলে আসার জন্য তার মন খারাপ হয়েছে, সে জন্য সে কাঁদে। আসলে সে কাঁদে তার ভাগ্যের জন্য। এ রকম বুড়ো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হল কেন? সে জন্য এখানকার পরিবেশের সঙ্গ সে খাপ খাওয়াতেও পারে না। সে কারণে কাঁদে।

প্রশ্ন : খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে কি ফরিয়াদ জানাল? মজিদ তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দিল?

উত্তর : কানের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীব্র চীৎকার জুড়ে দিল। সে বিলাপ করতে লাগল ভয়ানক ভাবে। তার একমাত্র ছেলে মারা গেছে। বংশে বাতি জ্বালানোর কেউ নেই তার। সে কেঁদে কেটে মজিদের কাছে ফরিয়াদ করে, আল্লাহ যেন তার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেয়।

মজিদ তাকে শোক না করতে বলে। সে বুড়িকে এ বলে সান্ত্বনা দেয় যে, যারা খোদার খুব পেয়ারের, খোদা তাদের তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে তুলে নেয়। এখন বুড়ির উচিত ছেলের রুহের জন্য দোয়া করা।

প্রশ্ন : 'জমিলা যেন ঠাটা পড়া মানুষের মত হয়ে গেছে'। এ বাক্যটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : জমিলা অল্পবয়সী একটি বালিকা। তার জীবনে বাসনা কামনা আছে। কিন্তু সে জীবনকে যেভাবে ভেবেছিল তার জীবন সেভাবে হল না। তাকে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হল পিতার বয়সী এক বুড়ো লোকের সঙ্গে। যার এক বউ আগে থেকেই আছে। সব মিলিয়ে তার জীবন তার কাছেই কৌতুককর মনে হয়। কিন্তু সে প্রাণ খুলে হাসতেও পারে না। মজিদের শাসন চলে সর্বক্ষণ। খ্যাংটা বুড়ির ছেলের জন্য জমিলারও মন খারাপ হয়। মজিদ ওসব বোঝে না। মন খারাপ হলে দুনিয়াদারির কাজ কি চলবে না। কিন্তু জমিলা পাথরের মতো হয়ে গেছে যেন। কোনদিকে তার হুঁশ নেই। বজ্রাহতের মতো হয়ে গেছে সে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

বিবিত্রভাবে জীবন্ত হাসি, ঝরণার অনাবিল গতির মত ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

এ অংশটি নেওয়া হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে। জমিলার হাসির রূপ এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

জমিলা মজিদের দ্বিতীয় বউ হিসেবে এ বাড়িতে এসেছে। মজিদের সঙ্গে তার বয়সের বিরাট ব্যবধান। মজিদ তার পিতার বয়সী। কিন্তু এর সঙ্গে তার বিয়ে হওয়াই হাসির বিষয়। সে কথা রহীমাকে বলতে গিয়ে জমিলা দারুনভাবে হেসে ওঠেছে। হাসতে হাসতে সে লুটিয়ে পড়েছে। হাসি আর থামে না। তার হাসি জীবন্ত। ঝরণা যেমন স্বচ্ছ গতিতে ছন্দময় ভঙ্গিতে এড়িয়ে চলে এবং কোথায় তা থামবে জানে না, জমিলার হাসিও তেমনি, বাধাহীন, অন্তহীন। আসলে জমিলার এ হাসি তার জীবনেরই প্রতি একটি প্রচণ্ড কৌতুক।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- জমিলাকে নির্যাতন করার একটি ভাষাচিত্র অঙ্গন করতে পারবেন।
- চিদ্রোহী জমিলার চরিত্রের একটি দিক বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কুল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে—এ ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এ দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মত চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মত ধারোলো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে-মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এ মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খা-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকি-ধিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনলো? যার কচি-কোমল লতার মত হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মত ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো—তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারি হয়ে এলো তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেলো। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝলো না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসলো। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

পাশের বারান্দার মত ঘরটায় রহীমা শোয়। সেখানেই রহীমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁট একটু নড়ে উঠলো—যেন মাই খেতে-খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিলো, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হলো সে-কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহীমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহীমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহীমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

—জমিলা কই?

—ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এ নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দুরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

—ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মত খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছে নি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিলো, তবু টান হয়ে বসেছিলো আধ ঘণ্টার মত। তারপর কোন প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহীমা পেছনে ছাপড়া দেয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিলো বলে সে-কথা সে জানে না।

—কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

—বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ঐসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহীমা নিরুত্তরে ভুষি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহীমা যখন ধীরে-ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মত। সে-ঘুম ভাঙে না। রহীমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এ সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহীমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে ওঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোন কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোন দিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ—যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিলো বলে—সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মত ঘুরতে থাকে, ফুসঁতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহীমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে

তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহীমা বলে

—ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কী রাগ করা যায়?

—রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এ বাড়িতে আলহাদের জায়গা নেই। এ বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এর পর কী করবে। হঠাৎ এমন এ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

—ওর দিলে খোদার ভয় নেই। এটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান-পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে—দাঁতের আশে-পাশে ওপরে-নীচে। ঘষতে ঘষতে ঠোঁটের পাশের ফেনার মত থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই—মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক-থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে তারপর বলে,

—রূপ দিয়া কী হইব? মাইন্ষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনের বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

—তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছো, তা কী শক্ত গুণার কাম জানো নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কী ডরাও না, দোজখের আঁগরে ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

—তাছাড়া, এ কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি। এ ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এখানে তাঁনার রূহ-এর দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোন দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মত। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মত সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

ডোম – হিন্দু সমাজের একটি সম্প্রদায়। **ডোমপাড়া** – ডোমদের থাকার এলাকা। **ভোতা উত্তেজনা** – তীব্র নয় এমন উত্তেজনা। **আলগোছে** – মৃদুভাবে। **ঢোলক** – ঢোল। **অথই** – অতল, গভীর। **নিমজ্জিত** – ডোবা। **অতলতা** – গভীরতা। **নির্মম** – নিষ্ঠুর। **ভাতার** – স্বামী। **তলানি** – বিস্তৃতি। **খানিক** – অল্প। **সান্ত্বনা** – আশ্বাস দিয়ে শান্ত হওয়ার জন্য বোঝানো। **নিরন্তর** – একটানা। **স্ফুলিঙ্গ** – আগুনের কণা। **ছটা** – আলো, আভা। **ফালি** – টুকরো। **নিরবচ্ছিন্ন** – একটানা, অবিরাম। **ভারিত** – ওজনদার, গভীর। **অপেক্ষাকৃত** – তুলনামূলকভাবে। **অকল্পিত** – স্থির। **দেশলাই** – দিয়াশলাই। **কুপি** – বাতি। **প্রশস্ত** – চওড়া। **অঘোরে** – বেহুঁশের মতো। **মাই** – বুকের দুধ। **গোলায়** – মেশায়। **বলা-কওয়াতে** – বলে দেয়ার কারণে। **অভুক্ত** – উপোস। **টান** – সোজা। **ছাপড়া** – বাঁশ ছন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চাল। **নিরুত্তরে** – উত্তর না দিয়ে। **নাসারন্ধ্র** – নাকের ছিদ্র। **অধীরতা** – অস্থিরতা। **পেষনে** – চাপে। **কবজা** – ভয়ে দিশেহারা। **শ্রবণ শক্তি** – শোনার শক্তি। **রুষ্ট** – রাগান্বিত। **ল্যাট মেরে** – হাত পা ছড়িয়ে। ক্ষণকাল – অল্পসময়। **রাজত্বকাল** – রাজ্যশাসনের সময়। মহব্বতনগরে মজিদ রাজার মতোই। **ঝোঁক** – প্রবণতা। **নির্বিকারভাবে** – কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে। **হতবুদ্ধি** – বুদ্ধিহীন। **ফুঁসতে থাকে** – ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সচরাচর – সাধারণ। **রাগান্বিত** – ক্রুদ্ধ। **সমবেদনা** – অন্যের বেদনায় অংশী হওয়া। **সংস্কার** – পরিবর্তন, মেরামত। **সদিচ্ছা** – ভালো ইচ্ছা। **নির্ভেজাল** – খাঁটি। **আহলাদ** – আবদার। **ঠায়** – নড়াচড়া না করে। **আগ্নেয়গিরি** – যে পাহাড় থেকে আগুন ও গলিত পদার্থ বের হয়। **ছিপি** – যা দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করা হয়। **প্রতিদ্বন্দ্বী** – বিরুদ্ধ লোক, শত্রু। **অবলম্বন** – নির্ভর। **আদ্যোপান্ত** – আগাগোড়া। **সতর্কতা** – সাবধানতা। **পর্বতপ্রমাণ** – পাহাড়ের মতো উঁচু, বিরাট, বিশাল। **অন্দরে বাইরে** – ঘরের ভিতরে ও বাইরে। **ঘোলাটে** – ভালো দেখা যায় না এমন। **মনোযোগ সহকারে** – মন দিয়ে। **পাট করা** – বিন্যস্ত। **কড়া** – তীক্ষ্ণ। ঝলক – প্রখর আলোর তাপ। **মেছোয়াক করে** – মাজে। **ঘরময়** – সারা ঘরে। **গাছ-গাছলা** – বড় ছোট সব গাছ। **রগড়ে** – ডলে। **প্রতিচ্ছবি** – অনুরূপ ছবি। **থাক** – সিঁড়ির অংশ, ধাপ। **গুঁড়ি** – গাছের দেহ, কাণ্ড। **ক্ষীপ্রগতিতে** – অতি দ্রুত। **জাহেল** – মূর্খ, জ্ঞানহীন। **কিছিম** – রকম। **হাশর** – ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। **জবাবদিহি** – কৈফিয়ৎ, উত্তরদান। **গুণা** – পাপ, **দোজখ** – নরক। **মাজার পাক** – পবিত্র কবর। **গোস্বা** – রাগ। **সশঙ্কিত** – ভীত। **বিস্ফারিত** – বড় হওয়া, ফুলে ওঠা। **পূর্ববৎ** – আগের মতো।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের অর্থ

ছুরির মত ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ – ছুরির যেমন ধার থাকে, তীক্ষ্ণ বিলাপ ও যেন তেমনি ধার বিশিষ্ট।

কেমন হয়ে গেছে – অন্য রকম হয়ে গেছে।

অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয় – রাত বাড়তে থাকে।

আদর শুকিয়ে আছে – স্নেহ-প্রেম নেই।

মুখের অন্ধকারটা কেটে যায় – মুখটা খুশি খুশি হয়।

টান হয়ে বসেছিলো – ঘুম যেন না আসে সে জন্য সতর্ক থেকেছিল।

জমিলার ঘুম কাঠের মত – কাঠ যেমন অসাড় থাকে, জমিলাও অসাড় হয়ে ঘুমায়।

ওঠার নামটি করে না – উঠতেই চায় না।

দীর্ঘ রাজত্বকালে – মজিদ এতই শক্তিশালী যে মহব্বতনগরে সে-ই রাজা। দীর্ঘদিন সে এ গ্রামে রয়েছে।

আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায় – জমিলার ওপর মজিদের ভয়ঙ্কর রাগ হয়। কিন্তু জমিলার কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে মজিদ নিজের রাগ দমন করে।

কাঠের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা – মুখটা কঠিন রূপ ধারণ করে।

কান খাড়া করে রাখা – সতর্ক হওয়া।

দাউ দাউ করা শিখার মত সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে – সে খুব বেশি উত্তেজিত হয়।

পাঠসংক্ষেপ

সে রাতে কি একটা উৎসব উপলক্ষে ডোম পাড়ায় ঢোলক বাজে। মজিদ ও জমিলা শয্যা থেকে সে বাদ্য শোনে। জমিলার মনটা খারাপ হয়ে আছে ঐ শন চুল বুড়ির তীক্ষ্ণ বিলাপ শুনে। মজিদের সহজে ঘুম আসে না। মজিদের চিন্তা, হালকা কচি দেহ জমিলা এতখানি অবাধ্য কেন। মজিদ জমিলাকে আদর করে না। মধ্যরাতে ঢোলের আওয়াজে মজিদের ঘুম ভেঙে গেলে মজিদ দেখে জমিলা বিছানায় নেই। জমিলা তখন পাশের ঘরে রহীমার বুক লেপ্টে শুয়ে আছে। জমিলার ওপর মজিদের রাগ বেড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হলেই জমিলা ঘুমে ঢলে পড়ে। সে ঠিকভাবে নামাজও পড়তে পারে না। এতে মজিদ আরো ক্রুদ্ধ হয়। ঘুমন্ত জমিলাকে সে হ্যাঁচকা টান মেরে ওঠায়। জমিলা আবার ল্যাট মেরে বসে থাকে। মনে তার প্রবল বিদ্রোহ। মজিদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এত বড় অবাধ্যতা সে কল্পনাই করতে পারেনি। জমিলা কিন্তু মজিদকে তোয়াক্কাই করে না। মজিদ যখন জমিলাকে মাজার পাকের থেকে ঠিকভাবে আচরণ করার জন্য শাসায় তখন জমিলা বুঝতে পারে সে খাঁচায় ধরা পড়েছে। ভয়ানক উত্তেজিত হয় জমিলা কিন্তু পরে শান্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন : ১। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে, সে ঘরে আনল? –কে কাকে ঘরে আনার প্রসঙ্গ বলছে? নেশার লোভে' কথাটি বুঝিয়ে দাও।

উত্তর: মজিদ জমিলাকে বউ করে এনেছে, সে বিষয়ে বলা হচ্ছে।

জমিলা মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। অল্প বয়সী আকর্ষণীয়া তরুণী। মজিদ তার চেয়ে অনেক বড়। মজিদকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে জমিলার বেজায় আপত্তি। মজিদ যখন জমিলার বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পেল তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মহব্বত নগরে কেউ মজিদের অবাধ্য হয়নি। অথচ তার ঘরের মানুষ তাকে মানছে না। মজিদ জমিলাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। মজিদ জমিলাকে বিয়ে করার সময় ভেবেছিল এ হালকা দেহ কচি কোমল মেয়েটি তার কথামতো চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গেল উল্টো। এতে মজিদের মনে অনুতাপ জাগে। কাকে সে বিয়ে করল সে প্রশ্ন মনকে বিদ্ধ করে।

প্রশ্ন-২: জমিলা কোথায় ঘুমাচ্ছিল? মজিদ জমিলাকে কীভাবে ঘুমাতে দেখল?

উত্তর: জমিলা মজিদের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু মধ্যরাতে ঘুম থেকে ওঠে মজিদ দেখে জমিলা বিছানায় নেই। জমিলা পাশের ঘরে রহীমার সঙ্গে ঘুমাচ্ছিল। সে রহীমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে আছে। এমনভাবে গুঁজে আছে যে, মনে হয় সন্তান যেন মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার জন্য মুখ খুলেছে। কুপির আলোয় মজিদ জমিলাকে এভাবে ঘুমাতে দেখেছিল।

প্রশ্ন-৩: জমিলা এশার নামাজ পড়তে পারে না কেন এবং রাতে খাবার খেতে পারে না কেন? জমিলার ওপর রেগে গিয়ে মজিদ কি করল?

উত্তর: জমিলা একটু ঘুম কাতুরে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়। মগরবের নামাজ কোন রকমে পড়তে পারলেও এশার নামাজ সে পড়তে পারে না। খাবার খেতে পারে না এ কারণে। জমিলার ঘুম কাঠের মত অর্থাৎ জমিলা একবার ঘুমালে আর উঠবার নাম করে না।

জমিলা মজিদের কথা শোনে না। তদুপরি সন্ধ্যা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। এতে জমিলার ওপর মজিদ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। এক সন্ধ্যায় জমিলার এ রকম ঘুমানোর সময় মজিদ এক কাণ্ড করে বসে। হঠাৎ সে ঘুমন্ত জমিলাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওঠায়। জমিলার হাতকে সে এমন চাপ দেয় যে মনে হয় তা মড়মড় করে ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ৪। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।" – এটি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর: এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হল জমিলা। জমিলা মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। মজিদ খুব পছন্দ করে এ অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মজিদের ধারণা ছিল এ মেয়েটি তার অনুগত থাকবে। কিন্তু মজিদের হিসেবে ভুল হল। জমিলা পিতার বয়সী মজিদকে স্বামী হিসেবে মানতে পারেনি। নিজের জীবন সম্বন্ধে তার খুব দুঃখ হয়। জমিলা আনমনা হয়ে পড়ে। মজিদের নিত্য শাসনে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে বিদ্রোহ করে। মজিদের কোন কথাই সে শোনে না। গালমন্দ করেও কোন লাভ হচ্ছে না। মজিদের ব্যাপারে জমিলার কোন ভয় নেই। সব কিছু দেখে মজিদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। মহব্বত নগরের রাজা সে, কেউ কোনদিন তার বিরুদ্ধে যায় নি। কিন্তু জমিলা তাকে মানছে না। জমিলাকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে মজিদ দেখে। এ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন কীভাবে করবে তা সে ভাবে। তবে মজিদ খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন ৫। "রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক দিনের? কদিনেরই বা জীবন তার"? – এ কথাগুলো কার? এ কথাগুলো কেন বলা হয়েছে?

উত্তর: এ কথাগুলো মজিদের। দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলাকে শুনিয়ে মজিদ কথাগুলো বলেছে।

জমিলাকে কিভাবে শাসন করবে মজিদ ভেবে পায় না। তাকে পীড়ন করেও কোন লাভ হয় না। এতে জমিলা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মজিদ আশ পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, কিন্তু জমিলা তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। মজিদ অনুভব করে অল্পবয়সী তরুণী মেয়েটির মনে খোদার ভয় নেই, তার মনে এ ভয় ঢোকাতে হবে। এ জন্য মজিদ জমিলাকে রূপ যৌবনের অনিত্যতার কথা শোনায়। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষের রূপ যৌবনও চিরকাল থাকে না। মানুষকে পরকালে যেতে হবে। সেজন্য মানুষের মনে খোদাভীতি থাকা উচিত এবং সেইভাবে জীবনে আচরণ করা উচিত।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

সে চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই– মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এ অংশে জমিলার কথা বলা হয়েছে। মজিদের কথা মতো চলার জন্য জমিলার ওপর পীড়ন করেছে, কিন্তু জমিলা বশে আসে নি। মজিদের কোন নিষেধই শোনে না। এখন তার সঙ্গে কথাও বলে না। পাশ দিয়ে চলে যায়, কিন্তু জমিলা তার দিকে তাকায় না। ভাবলেশহীনভাবে এক জায়গায় বসে থাকে। মজিদ আড়চোখে বউয়ের দিকে তাকায়। মজিদ দেখে জমিলার চোখে মানুষের ভয় তো নেই, খোদার ভয়ও নেই। সে ঠিকভাবে নামাজ পড়ে না, সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার মনে খোদার ভয় থাকলে জমিলা ঠিকভাবে আচরণ করত। মজিদের মনে হয়েছে, সে তাকে তো ভয় করেই না, খোদাকেও ভয় করে না।

কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। মজিদের ঘর করতে এসে জমিলার মনের যে অবস্থা হয়েছে তার বর্ণনা এখানে আছে।

পিতার বয়সী মজিদকে তরুণী জমিলা স্বামী হিসেবে পছন্দ করেনি। তা ছাড়া মজিদের নানা রকম শাসন ও উপদেশ জমিলাকে বিদ্রোহী করে তোলে। এতে মজিদ বিচলিত হয়ে পড়ে। সে তার তরুণী স্ত্রীর মনে খোদার ভয় জাগাতে চায়। জমিলা যে বাপ মায়ের কাছে শিক্ষা পায় নি সে কথাটি বলে। মজিদ জমিলাকে এ বলে শাসায় যে সে যার তার ঘরে বউ হয়ে আসেনি। মজিদ একজন পীর কামেল মানুষ। তার বউ হয়ে জমিলার এমন কাজ করা উচিত যাতে খোদা রাগ না করেন। এ সব কথায় জমিলা স্পষ্টভাবে বোঝে যে মজিদের ফাঁদে সে সম্পূর্ণরূপে আটকা পড়েছে। ফাঁদের কাঁচা

গোস্তে মুখ দেয়ার সঙ্গে খট করে আওয়াজ হয় এবং এতেই ইঁদুর বোঝে যে সে আঁটকা পড়েছে। জমিলাও হঠাৎ করে বুঝতে পারে সে ফাঁদে আটকা পড়েছে।

নিম্নলিখিত অংশের ব্যাখ্যা করুন

শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

ঘুমাইছে – ঘুমিয়েছে।

তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মত খ্যাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? – তুমি কাজ করবে, সে লালবিবির মত খাটে চড়ে ঘুমাবে বুঝি?, **লালবিবি** – লাল চেলি পরা নতুন বউ। **ফাইজলামি** – ফাজলামি। **ঘুম থিকা** – ঘুম থেকে। **পড়বার কও** – পড়তে বল। **বহুত হইছে** – অনেক হয়েছে। **কাইল** – কাল, গতকাল। **করছো** – করেছ। **ক্যামনে করলা** – কেমন করে করলে।

আঁগ – আগুন। দোজখের আঁগরে কী ডরাও না – দোজখের আগুনকে কি ভয় পাও না? **তাঁনার রূহ** – তাঁর আত্মা। **তাঁনার দিলে** – তাঁর হৃদয়ে।

দ্বিরুক্ত শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার

'লালসালু' উপন্যাসের এ অংশে আমরা বেশ কয়েকটি দ্বিরুক্ত বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার দেখেছি। একটি শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে তা হয় দ্বিরুক্ত শব্দ আর সে শব্দ যদি কোন আওয়াজ অর্থাৎ ধ্বনি বোঝায় তাহলে তা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ। এ শব্দগুলো অব্যয় জাতীয়। এ শব্দগুলো ব্যবহার করে আমরা অনেক অব্যক্ত ভাবকে বোঝাতে পারি। এ শব্দগুলো বাংলা ভাষার সম্পদ।

আপনি এ পাঠের ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো জেনে নিন। লক্ষ্য করুন এগুলো ভাষায় কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টি বুঝলে আপনি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং অন্য পাঠের ধ্বন্যাত্মক শব্দও বর্ণনা করতে পারবেন।

খাঁ খাঁ – শূন্যতা, শূন্যতার কারণে অভাববোধ। **ধিকিধিকি** – অল্প অল্প আগুন জ্বলার ভাব। **চকচক** – উজ্জ্বলতার ভাব। **ভনভন** – মশা মাছি ইত্যাদির আওয়াজ। **গবগব** – বড় বড় গ্রাসে দ্রুত খাওয়ার আওয়াজ। **সোঁ সোঁ** – পানি বা পানি মেশানো খাদ্য খাওয়ার আওয়াজ, প্রবল বাতাসের শব্দ। **মড়মড়** – কাঠ, হাড় ইত্যাদি শক্ত জিনিস ভাঙার আওয়াজ। **দাউ দাউ** – উঁচু শিখায় জোরে আগুন জ্বলার শব্দ। **জবজব** – বেশি করে ভিজে যাওয়ার ভাব। **জ্বলজ্বল** – উজ্জ্বলতার রূপ। **থাক থাক** – একটার পর একটা থাক বা খাঁজ।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মাজারে জিকির অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখতে পারবেন।
- এ পাঠে জমিলার আচরণ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহীমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল মশলা এলো ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকের এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগলো। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘৎ খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে-ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মত। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এ যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে নাবতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মত তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে দুনে চড়ে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট, বিচিত্র আওযাজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু-হু-হু। আবার : হু হু হু। আবার—

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহীমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মত নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন এক সময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে। বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহীমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মত ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মত মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহীমাকে ডাকে,

—বুবু!

রহীমা শোনে কী শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চীৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লন্ড-ভন্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারেনা। এবার ভেসে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদুৎগতিতে জমিলা ওঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে রুদ্ধ বৃক্ষের মত কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,

—বুবু!

এবার রহীমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মত বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে কেউ-বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মত রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে-ধীরে ওঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়। এক সময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

—পাগলী ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এ বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষীপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মত তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে-একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

—ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোন কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, —আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহীমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহীমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোন কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

—হে কই?

রহীমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ ওঠে চলে গেলো তারপর আর সে এদিকে আসে নি। আস্তে রহীমা বলে,

—বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

—ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহীমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিলো? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

—হে বাইরে গেছিলো?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

—হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহীমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মত জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবন্ত হুকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিলো মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহীমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মত মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বলা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে ওঠেছে সে-সংসার ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহীমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে—বিবি, শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহীমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলা নি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহীমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয়,

—তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহীমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখদুটো ভেজা মাটির মত নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহীমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,

—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জীগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট্ করে রহীমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে ওঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এ মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহীমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে-পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহীমা বলে,

—কী কমু? মাইয়াডা যানি কেমুন। পাগলী। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

শব্দার্থ ও টীকা

বাদ মগরেব — সন্ধ্যার পর। **শিরনি** — আল্লাহর দোয়া পাওয়ার জন্য মসজিদ, মাজার ইত্যাদিতে বিতরণের জন্য তৈরি খিচুড়ি, পায়েস কিংবা এ জাতীয় খাবার। **চড়ানো** — রান্নার জন্য ডেকচি চুলোর উপরে দেয়া। **ছুঁয়ে দিলে** — দোয়া পড়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে। **খিচুড়ি** — চাল-চাল মশলার মিশ্রণে রান্না করা অন্ন। **কাটা চুলা** — ওঠোনে কিংবা খালি জায়গায় কেটে গর্ত করে যে চুলা তৈরি হয়; অস্থায়ী চুলা। **ডেকচি** — হাঁড়ি। **জিকির** — সমবেতভাবে উচ্চস্বরে বারবার আল্লাহর নাম নেওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান। **অপরাহ্ন** — বিকেল। **গনগন** — আগুন জ্বলার শব্দ। **আগারবাতি** — ধুপকাঠি। **বিছানো... বসানো** — মিলাদে, জিকির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। যিনি মিলাদ পড়াবেন কিংবা জিকির পরিচালনা করবেন তিনি বিশেষ জায়গায় বসেন। তাঁর দুপাশে কখনো কখনো মোমবাতি জ্বালানো হয়। সামনে থাকে চালভর্তি একটি পাত্র। তাতে গুঁজে দেয়া হয় অনেকগুলো ধুপকাঠি। ধুপকাঠিগুলো পুড়তে থাকে, তাতে একটি সুরভিত ধমীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। **আলখাল্লা** — পা পর্যন্ত লম্বা ঢিলে পোশাক, জুব্বা। **আধা পাগড়ি** — ছোট করে বানানো পাগড়ি, মাথা সম্পূর্ণ ঢাকে না এতে। **বিঘৎ খানেক লেজ** — পাগড়ির ছোট ঝোলানো অংশ। **পরস্পর** — একে অন্যে। **যোগশূন্য** — আলাদা, বিচ্ছিন্ন। **ঢিলে তেতালা** — আস্তে আস্তে। **সন্নিকট** — কাছে। **ধীরগতিশীল** — অল্পগতির, আস্তে আস্তে। **চাঞ্চল্য** — চঞ্চলতার ভাব। **আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব** — পাবে কি পাবে না এ নিয়ে মানসিক সংকট। **অস্তিত্ব** — সত্তা। **নিরুদ্বিগ্ন** — উদ্বেগশূন্য। নিষ্কম্প র কাঁপছে না এমন। **প্রতীক** — চিহ্ন। **অটুট** — যা ভাঙে না, শক্ত। **নিশ্চল** — যা চলে না, স্থির। **দুনে** — দ্বিগুণ হয়ে। **সংঘর্ষণে** — আঘাতে। অন্তর খনন — হৃদয়কে খোঁড়া। **বলকে বলকে** — উথলে উথলে। **দাহ্য-চেতনা** — পুড়বার ভাব। **হবে হচ্ছে** — হওয়ার উপক্রম। **ঘরবসতি** — ঘরসংসার। **ছারখার** — ধ্বংস। **নিশ্চিহ্ন** — চিহ্নহীন, বিলুপ্ত। **তদারক** —দেখা শোনা। **ভার** — দায়িত্ব। **কালো হাওয়া** — অন্ধকারের হাওয়া। **ভুরভুর** — পরিপূর্ণ। **বলক-ওঠা** — উথলান। **অশরীরী** — ভুতপ্রেত। **ধোয়া-পাকলা** — ধোয়ার কাজ। **লাকড়ি** — জ্বালানী কাঠ। **কাড়ে** — চিড়ে। **অবক্তব্য** — অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। **উত্তাল** — ভয়ঙ্কর। **অচম্বিতে** — হঠাৎ। **বালুতীরে** — সমুদ্রের বালুকাপূর্ণ তীরে। **বিভ্রান্ত** — দিশেহারা। **থই** — তল। **উত্তুঙ্গ** — অতি উঁচু। **পর্বতপ্রমাণ** — পর্বতের মতো উঁচু। **অজস্র** — অনেক। **ছত্রখান** — টুকরো টুকরো। লন্ডভন্ড ধ্বংস। **মারাত্মক** — ভয়াবহ। **রুখতে** — বাধা দিতে। **বিস্মৃত** — ছড়ানো। **নিস্তরঙ্গ** — ঢেউহীন। **ঝলমল** — উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। **হট্টগোল** — গোলমাল। **অবশ পদযুগল** — অসাড় দুই পা। **সিক্ত** — ভেজা। **আলিঝালি** — অস্পষ্ট, আবছা। **অবসাদ** — ক্লান্তি। **বিমূঢ়** — হতভম্ব। **ভাগ** — চলে যাও। **দপদপ** — আগুন জ্বলার ভাব। **হল্কা** — তাপ। **বিদ্যুৎ ক্ষীপ্রতায়** — বিদ্যুতের গতিতে। **ক্ষয়িষ্ণু** — ক্ষয়ে যাচ্ছে যা। **মালুম** — ধারণা, অনুমান। **বেচইন** — অস্থির, চিন্তাগ্রস্ত। **চাওয়া-চাওয়ি** — দেখাদেখির কাজ। গোগ্রাসে — বড় বড় গ্রাসে। **বিসদৃশভাবে** — অসুন্দররূপে। **নিবন্ত** — যা নিভে যাচ্ছে। **বর্তন** — বড় থালা। **কর্কশ** — কঠিন, অমিষ্ট। **সিধা** — সোজা। **কিড়মিড়** — উত্তেজনায় দাঁত কামড়ানোর ভাব। **হনহনিয়ে** — তাড়াতাড়ি, দ্রুত গমন। **গুম** — গম্ভীরভাবে চুপ। **অক্ষুণ্ন** — যা এখন ক্ষুণ্ন হয়নি বা ভাঙেনি। **ঝিমঝিম** — মাথা ধরার ভাব। **বলা** — বিপদ, অসুখ বিসুখ। **ধুলিসাৎ** — ধুলিতে মেশা, ধ্বংস। **দাওয়া** — বারান্দা। **বদদোয়া** — অভিশাপ। **তড়িৎবেগে** — বিদ্যুৎগতিতে। **তওবা** — প্রশস্ত, বিরাট। **আনুগত্য** — অধীনতা। **ধ্রুবতারা** — ভোর বেলায়। **অনড়** — যা নড়ে না, শক্তি। **খুঁটি** — বাঁশ বা কাঠের লম্বা থাম যার ওপর ঘর দাঁড়িয়ে থাকে, অবলম্বন। **সত্তা** — অস্তিত্ব। **শীর্ণ** — রোগা, শুকনো। **পেশি** — দেহের মাংসপিণ্ড। **সহবাস** — একসঙ্গে বসবাস। **নির্ভেজাল** — খাঁটি। **পুলক** — আনন্দ। **শিহরণ** — কাঁপন। **ঝাপটা** — ধাক্কা, জোর। **এলেমদার** — জ্ঞানী, বিদ্বান।

বাক্যাংশের বিশিষ্টার্থক অর্থ

প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মত – সাগর যখন শান্ত থাকে, তখন ঢেউগুলো আস্তে গড়ায়, জিনিষের আওয়াজও যেন সেরকম।

পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে নাবতে শুরু করেছে – তারা এক সঙ্গে জিকির করবে।

দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে – এক এক জায়গায় এক একজন বসে আছে।

মহাসত্যের প্রতীক স্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল – বাঁধানো কবরটি মহাসত্যের চিহ্ন।

যে মহা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে – সবাই মিলে জিকির করার সময় মত্ততার সৃষ্টি হয়। এ মত্ততাকে বলা হচ্ছে মহা অগ্নিকুন্ড। একটু পরেই সে মত্ততা শুরু হবে।

অন্তর যখন গভীরতর হতে থাকে – অন্তরে গভীর ভাবের সৃষ্টি হয়।

পরস্পরের দাহ্য চেতনা এবার মিলিত হবে হচ্ছে করছে – জিকির করতে গিয়ে সবাই এক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়ামমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে – পার্থিব আকর্ষণ আর থাকবে না।

সে ঢেউয়ের গর্জন – জিকিরের আওয়াজ।

সে ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় – জিকির যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে।

এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ – জিকিরের বিরাট হল্লা বারবার শোনা যায়।

তারপর একটু পরে চীৎকার ওঠে – এটি জিকিরের চূড়ান্ত অবস্থা।

অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায় – জিকির শেষ হয়।

মুহূর্তে কী যেন লন্ডভন্ড হয়ে যায় – সাংঘাতিক একটা কিছু যেন ঘটে যায়।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ – ক্রুদ্ধ হয়।

মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে – জিকির থেকে মন অন্য দিকে চলে গেছে।

ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে – ভেঙে দিতে বা ছিন্ন করতে এসেছে।

অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তানিয়ে আছে – অসহায় মজিদ যেন রহীমার মধ্যে নির্ভরতা খুঁজছে।

আঞ্চলিক শব্দ

আসছে – এসেছে।

বিটি – বেটি, মেয়েলোক।

ভাগ – চলে যা।

হে কই – সে কোথায়।

চইলা – চলে।

দেখলা – দেখলে।

হ – হ্যাঁ।

লগে – সঙ্গে।

বিয়া – বিয়ে।

দিছিলা – দিয়েছিলে।

কী যে কন – কী যে বলেন।

যানি – যেন।

জীগাই – জিজ্ঞাসা করি।

কী কমু – কি বলব?

মাইয়াডা – মেয়েটা।

মাইয়াডা যানি কেমুন – মেয়েটা যেন কেমন।

ঠিক হইয়া যাইবনি সব – ঠিক হয়ে যাবে সব।

পাঠসংক্ষেপ

সেদিন বাদ মগরেব মাজারে জিকির হয়। এ উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না হয়। বরাবরের মতো রান্নার দায়িত্ব পড়ে রহীমার ওপর। মজিদ আজ বিশেষ সাজে সেজেছে। এক এক করে লোক আসতে থাকে। দোয়া দরুদ দিয়ে জিকির শুরু হয়, তারপর তা আস্তে আস্তে প্রচণ্ড গতি লাভ করে। জিকিরের আওয়াজে জমিলা ভয় পায়। জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকজন তার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে গাছের তলায় জমিলাকে ঘোমটাশূন্য অবস্থায় দেখা যায়। জ্ঞান ফিরে এলে মজিদও তাই দেখে। সে লোকজনের কাছে জমিলাকে কাজের বেটি রূপে পরিচয় দেয়। জিকির শেষে বাড়ির ভিতরে এসে জমিলার বাইরে যাওয়ার জন্য মজিদ রহীমার কাছে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে এ রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য মজিদ অনুতপ্ত হয়। মজিদ অনুভব করে রহীমাই তার ঘরের খুঁটি বা অবলম্বন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন-১: জিকির অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর: একদিন বাদ মগরেব মাজারে জিকির হয়। জিকির উপলক্ষে শিরনি চড়ানো হয়। আগে থেকেই লোকজন চাল-ডাল মশলা ইত্যাদি পাঠিয়েছে। মজিদ সেগুলো ছুঁয়ে দিলে রহীমা রান্না বসায়। অন্দরের উঠানে চুলা কাটা হয়েছে। সেখানে রান্না হয়। মগরেবের পর বাইরের ঘরে লোক আসতে থাকে। সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বিছানার এক পাশে মজিদ বসে। মজিদ আজ আলখাল্লা ও পাগড়ি পরেছে। মজিদের বসার জায়গার দুপাশে দুই মোমবাতি, আর সামনে জ্বলন্ত আগরবাতি। অনেক দোয়া দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে জিকিরের গতি থাকে কম, পরে সকলের ঘনঘন উচ্চ চিৎকারে জিকির প্রচণ্ড রূপ লাভ করে। এ অবস্থাকে মহা অগ্নিকুণ্ড কিংবা সমুদ্রের ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২: জিকিরের আওয়াজ শুনে জমিলার কী প্রতিক্রিয়া হয়?

উত্তর: খিচুড়ি রান্নার সময় জমিলা ডেকচির ভিতরে দেখে বারবার। এদিকে বাইরে থেকে জিকিরের আওয়াজ আসে। আওয়াজ ঘন ঘন হয়, জোরে জোরে হয়। এতে জমিলা অস্থির হয়ে পড়ে। তার মনে ভয় আসে। জমিলা রহীমাকে ডাকে। রহীমা উত্তর দেয় না এবং ফিরে তাকায় না। এদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো জিকিরের আওয়াজ আসতে থাকে। এতই তীব্র তার গতি যে জমিলা এক সময় হঠাৎ ওঠে দাঁড়ায়। রহীমা কোন কথা না বলাতে অস্থিরচিত্ত জমিলা উঠান পেরিয়ে বাইরে গিয়ে ঘোমটাশূন্য অবস্থায় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন মুসুল্লিরা তাকে দেখে ফেলে। জিকির করতে গিয়ে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান ফিরলে সেও জমিলাকে দেখে। মজিদ জমিলাকে লোকজনের সামনে কাজের বেটি বলতে চায়। মজিদের তাড়া খেয়ে জমিলা ভিতর বাড়িতে চলে যায়।

প্রশ্ন-৩ : জমিলার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রহীমার মনোভাব কী?

উত্তর : জিকিরের কালে ভিতর বাড়ি থেকে বাইরে আসাতে জমিলার ওপর মজিদ বেশ রাগ করে। তবে সে জমিলাকে কিছু বলে না, কিন্তু রহীমাকে অনুযোগ করে। রহীমা স্বামীর চাপা ক্রোধ অনুভব করে। জমিলার বাইর যাওয়ার কথা ভাবতেই তারও মাথা ঝিমঝিম করে। একরকম ভয়ও পায় সে। অল্পবয়সী ক্ষীণকায়া এ মেয়েটি সংসারে ফাটল ধরাবে মনে হয়। জমিলা বিপদ ডেকে আনছে, ফলে মাজারের ছায়ায় যে সংসার গড়ে ওঠেছে তা অচিরে ধ্বংস হবে।

প্রশ্ন ৪ : 'বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলা নি?" উক্তিটিকে কার উদ্দেশ্যে করেছে এবং কেন করেছে?

উত্তর : মজিদ তার প্রথমা স্ত্রী রহীমাকে কথাটি বলেছে। তার ধারণা ছিল জমিলাকে বিয়ে করলে সংসারে আনন্দ ও বৈচিত্র্য বাড়বে। কিন্তু মজিদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। অল্পবয়সী উচ্ছল স্ত্রী জমিলাকে সে একেবারেই বশ করতে পারেনি। মজিদের বয়স এ মাজারের পরিবেশের সঙ্গে জমিলা মোটেও খাপ খাওয়াতে পারেনি। এটি বোঝা গেল জিকিরের সময় ভিতর বাড়ি তেকে জমিলার বাইরে বেরিয়ে আসাতে। মজিদ জমিলার ব্যবহারে খুব ক্রুদ্ধ হয় ও দুঃখ পায়। সে বোঝে জমিলা তার কথামতো চলবে না। এ রকম একটা মেয়েকে সে কেন বিয়ে করল এ অনুতাপে তার মন ভরে যায় এবং এ কথা সে রহীমাকে বলে। রহীমা তার প্রথম স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী থাকতে আরেকটা বিয়ে করাতে রহীমা তাকে বদদোয়া দিয়েছে নিশ্চয়ই। তা না হলে জমিলা এখন অবাধ্য কেন? মজিদের উক্তিতে এটি বোঝা যায় জমিলার ব্যাপারে সে খুব অসহায়।

প্রশ্ন-৫ : 'তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে।' –কে দেখে? নোতুন মজিদ কী রকম?

উত্তর :নতুন এক মজিদকে দেখে তার স্ত্রী রহীমা।

মজিদ হাড়সর্বস্ব ছোট খাট মানুষ হলে কি হবে, সে কিন্তু খুব প্রতাপশালী। মহব্বতনগরে সে হল সবচেয়ে শক্তিমান লোক। তার স্ত্রী রহীমা বিশালদেহী, কিন্তু সে স্বামীকে খুব ভয় করে। স্বামীর প্রতি সে তার আনুগত্য অটুট রেখেছে। এদিকে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা মজিদকে মানতে চায় না। সে ঘোমটা খুলে সকলের সামনে বেরিয়ে আসে, জিকিরের সময় তাই হয়েছে। জমিলাকে বিয়ে করে মজিদ ভুল করেছে কিনা এটিই রহীমার কাছে মজিদের জিজ্ঞাসা। মজিদকে বড় অসহায় মনে হয়। রহীমার ওপর মজিদ নির্ভরতা খুঁজে পায় যেন। খুব কোমল কণ্ঠে পরমাত্মীয়ের মতো সে রহীমার কাছে তার দুঃখ প্রকাশ করে। মজিদের এ নতুন রূপ। কখনও মজিদকে সে এমন রূপে পায়নি, এমনভাবে কথা বলতে দেখেনি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কাঙালের মত তাদের দৃষ্টি যেন হাতড়ায়। মহা সমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

২. লতার মত মেয়েটি যেন এ সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে।

৩. এতদিনের সহবাসের ফলেও যে চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে চোখ এ মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে।

বালুতীরে যুগ যুগ আঘাত পাওয়া শক্ত- কঠিন পাথর তো সে নয়।

আলোচ্য লাইনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে জিকিরের সময় জমিলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মাজারে এক সন্ধ্যায় জিকির হয়। এ উপলক্ষে খিচুড়িও রান্না করা হয়। রান্নার দায়িত্বে থাকে মজিদের প্রথম স্ত্রী রহীমা। দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা রহীমার রান্না বান্নার কাজ দেখে। বাইরে থেকে জিকিরের আওয়াজ আসতে থাকে। প্রথমে জিকির চলে আস্তে আস্তে, পরে তা বহু মানুষের সম্মিলিত আওয়াজে প্রচণ্ড গতি পায়। এতে জমিলার মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় জাগে। সে সচকিত হয়ে ওঠে। ঝড়ের সময় সমুদ্রের এক একটা ঢেউ যেমন তীরে আঘাত হানে, ঠিক তেমনি জিকিরের ঘন ঘন ধ্বনি জমিলার হৃদয়কে আঘাত হানে, জমিলার হৃদয় সমুদ্রের তীরের মতো শক্ত নয়। রহীমার মধ্যে বরং কোন

প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। জিকির বহুবার সে দেখেছে। কিন্তু জমিলা কখনও জিকির শোনে নি। সে জন্য প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন জিকির জমিলাকে দিশেহারা করে তোলে, সে বিভ্রান্ত হয়ে রহীমার দিকে তাকায়।

প্রশ্ন-২ : তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

উত্তর : আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে মজিদের প্রথম স্ত্রী রহীমার স্বামীভক্তি সম্পর্কে সুন্দর একটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মহববতনগর গ্রামে এসে মজিদ স্থায়ীবাস গড়েছে এবং রহীমাকে বিয়ে করেছে। চওড়াদেহী রহীমা তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু সে শান্তশিষ্ট কর্মনিপুণা এক মহিলা। তাছাড়া স্বামীর মুখের ওপর সে যখন ও কথা বলেনি। রহীমা সেবা যত্ন ও পরিশ্রম দিয়ে সংসারকে আগলে রেখেছে। মজিদের মেজাজ-মর্জি সবই সে ভালো করে বোঝে এবং সেই ভাবে চলে। মজিদ পরে অল্পবয়সী তরুণী জমিলাকে বিয়ে করে। জমিলার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। মজিদ আশা করেছিল জমিলাকে বিয়ে করে সে আরো বেশি আনন্দ পাবে। কিন্তু মজিদ অচিরেই ভুল বুঝতে পারে। জমিলা তার চরম অবাধ্য হয়। এমনকি জিকিরের সময় সে রীতিনীতি উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে চলে আসে। এ রকম মেয়েকে সে কেন বিয়ে করল এ প্রশ্ন জাগে। তখন রহীমার সঙ্গে জমিলার পার্থক্য বোঝা যায়। মজিদ অনুভব করে, রহীমা এমন একটি মেয়ে যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। স্বামীর প্রতি রহীমার ভক্তি বিশ্বাস কখনও টলেনি এবং সব সময় সে স্বামীর প্রতি অনুগত থেকেছে। সে জন্য রহীমাকে মজিদের সবচেয়ে আপন মনে হয়।

ইউনিট ৯

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- জমিলার ওপর ক্রুদ্ধ মজিদের নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে ওঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছো। খালি তা না, তুমি তানারে নারাজ করছো। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার ওপর তানার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, –আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়ে বাপের বাড়িৎ পাঠাইয়া দিতো। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

–হুনছো নি কী কইলাম?

কোন উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে সে বলে,

–দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছো তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এ কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোন উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

–তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষের কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিলো খেয়াল করেনি। মাজার ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এলো তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওযাজ থেমে গেলো। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করলো মাজার ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেলো ভয়ে। আবার বাইরে গেলো, আবার এলো ভেতরে।

প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এলো। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এলো তখন আর কোন আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করলো মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজারপাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কোন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছু খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথার কোন উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহীমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে, ওঘরে মজিদ হুকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে ওঠেছে। রহীমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহীমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মত শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহীমা, ঘুনধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে-থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে-ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। এক সময়ে রহীমা আস্তে ওঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মত ভাব নাবে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে ওঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীর-ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে—এ অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মত আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু, করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে-পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মত এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে ওঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারি যে, গলা ছেড়ে চীৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

—তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয় ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহীমা পাশের বিছানা থেকে ওঠে এসেছিলো, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদা-তা'য়ালার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহীমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মত কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে ওঠে বসেছিলো, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকালো। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখলো। তাতে হাত বুলালো না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেলো না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললো বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয় নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিলো, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও ওঠেছিলো জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিলো, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাচ্ছিলো, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারলো না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো।

পেছনে-পেছনে রহীমা আসছিলো কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলো না; এও বুঝলো না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মত প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয়, দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহীমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বললো,

—হে আমার মুখে থুথু দিলো!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো রহীমা,

—কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠেছে।

মজিদ রহীমার চীৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোন কথাও বললো না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই। তার হাতের লইট্টা মাছের মত হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোন কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরো কঠিনতর করে তুললো। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো বাইরের দিকে। ভেবেছিলো, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এমন নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মত এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটু আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মত নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মত মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

গোগ্রাসে – বড় বড় গ্রাসে। **বে-ইজ্জত** – অসম্মান। **এৎবার** – প্রসন্নতা, দয়া। **নাজুক** – অপরিণত। **রুক্ষ** – কর্কশ, কঠিন। **নির্বাক** – চুপ। **সংযত** – নিয়ন্ত্রিত। **তারাবি নামাজ** – রোজার বিশেষ নামাজ। এশার নামাজের পর পড়তে হয়। **কণ্ঠস্বর** – গলার আওয়াজ। **এশার নামাজ** – রাতের নামাজ। **অজু** – নামাজ কিংবা ধর্মীয় কাজ করার আগে হাত মুখ ধুয়ে পবিত্র হওয়া। **ভয়াবহ** – ভীতিকর, ভয়ানক। **গর্জন** – প্রবল চীৎকার। **রক্ত পানি হওয়া** – অতিরিক্ত ভয় পাওয়া। **পাক** – পবিত্র। **নাপাক** – অপবিত্র। **দরবার** – দরবেশ বা পীরের মাজার। **জায়নামাজ** – নামাজ পড়ার জন্য ছোট সতরঞ্চি বা গালিচা। জায়নামাজে ওঠাবসা করে – নামাজ পড়ে। **হুকায় দম দেয়** – হুকা টানে। **পিটপিট** – বারবার পলক পড়া। **আত্মসচেনতায়** – নিজের উপলব্ধিতে। **স্বতঃপ্রবৃত্ত** – নিজেই উদ্যোগী। **টনটন** – ব্যথা বেদনার অনুভূতির ভাব। **ঘুনধরা হাড়** – বুড়ো হাড়। **সুখ ভোগ** – সুখের উপলব্ধি। তন্দ্রা – হালকা ঘুম। **সেজদা** – আল্লার উদ্দেশ্যে মাথা মেঝেতে ঠেকান। **আচমকা** – হঠাৎ। **কাবু** – বশীভূত। **চিনচিনে** – অল্প অল্প। **উত্তপ্ত** – গরম। **হ্যাঁচকা** – আচমকা। **গোঁগোঁ** – গর্জনের শব্দ। **নিঃসৃত** – বের। **থরথর** – ভয়ে, ক্রোধে বা অন্য কারণে বেশি রকম কাঁপার। দুরন্ত অতিমাত্রায়। **নাখোশ** – অসন্তুষ্ট। **বিদ্যুৎছটা** – বিদ্যুতের চমক। **বেগ পেতে হয় না** – কষ্ট হয় না। **অবসর** – সুযোগ, সময়। **ত্রিসীমানায়** – ধারে কাছে। **তৃণখণ্ড** – খড়কুটো। **ঘনীভূত** – বেশি ঘন হওয়া, বেড়ে খাওয়া। **বেঁকে বসলো** – অসম্মত হল। **শক্তি সংযোগ করে** – শক্তি দিয়ে। **বজ্রমুষ্টি** – হাত দিয়ে ভীষণ শক্তভাবে ধরা। **পিচ** – থুথু বা লালা জাতীয় পদার্থ মুখ থেকে ফেলার আওয়াজ। **নিক্ষেপ** – ছুঁড়ে ফেলা। **ঠাঁয়** – একই জায়গায়। **প্রতিপত্তিশালী** – ক্ষমতাবান। **খোদাভাবমত্ত** – খোদার জন্য পাগল হয়েছে যে মানুষ। **সিক্ত** – ভেজা। **আর্তনাদ** – কাতর চিৎকার। **আরশ** – আল্লাহর আসন। **ফতুয়া** – ছোট গলাকাটা জামা। **লইট্টা মাছ** – সাদা রঙের ছোট আকারের নরম সামুদ্রিক মাছ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুপরিচিত। **পাঁজাকোলা** – দুহাত দিয়ে ধরে কোলে নেয়া। **অপরিণত** – যা পরিণত হয়নি। **অর্ধচক্রাকারে** – অর্ধ বৃত্তের মতো। **ঝলকানি** – হঠাৎ প্রখর আলোর চমক। **নিষ্পেষিত** – পিষ্ট। **দুর্দান্ত** – প্রবল।

বাক্যের বিশিষ্ট অর্থ

রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে – অতিমাত্রায় ভয় পেল।

জায়নামাজে ওঠাবসা করে – নামাজ পড়ে।

মজিদ ঘন-ঘন হুকায় টান মারে আর চোখটা পিট পিট করে আত্মসচেতনতায় – মজিদের মনে আনন্দ জাগে।

ঘুন ধরা হাড়ের মধ্যে যে ব্যথার রস টন টন করে তার আরাম করে – বুড়ো হাড় টিপে আরাম দেয়।

রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশ ঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে ঘাটে – রাত বাড়লে প্রকৃতিও ঘুমিয়ে পড়ে।

সে নীরবতার আর চূড়ির চিকন আওয়াজ নেই – জমিলার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

দস্যুর মত আচমকা এসেছে সে ঘুম – হঠাৎ ঘুম এসে গেছে।

সে চোখ কালো হয়ে আসে – অসন্তুষ্টির ভাব।

রাতের নীরবতা এত ভারি – গভীর নিস্তব্ধ রাত।

গর্জন করছে খোদাতালার ন্যায়বাণী, তার নাখোশ দিল – মজিদের ভর্ৎসনা যেন মজিদের নয়, আল্লাই যেন তার মুখ দিয়ে উচিত কথাগুলো বলাছে।

বাক্যবাণ নিষ্ফল – কথায় কাজ না হওয়া।

মজিদের টানে স্রোতে ভাসা তৃণখন্ডের মত ভেসে যাচ্ছিল – জমিলা মজিদকে কোন বাধাই দেয়নি।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল – হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

তার বুকের মধ্যে ফুলের মত নিষ্পেষিত করে ফেলবার – মজিদ জমিলাকে নিবিড়ভাবে পেতে চায়।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

তাঁনারে নারাজ করছো – তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছ। মোদাচ্ছের পীরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেওন – দেয়া।
হুনছো নি কী কইলাম – শুনেছ কি বললাম?
পড়বা – পড়বে।
কাইল যে কামটা করছো – গতকাল যে কাজটা করেছ
তানি ঘুমাইয়া নাই – তিনি ঘুমিয়ে নেই। মোদাচ্ছের পীরের কথা বলা হয়েছে।
আইজ রাইতে – আজ রাতে।
ঘুমাইছ – ঘুমিয়েছে।
কী করলা বইন – কি করলে বোন।

পাঠসংক্ষেপ

পরদিন থেকে জমিলার শিক্ষা শুরু হয়। জমিলার ওপর যে সে অসন্তুষ্ট সে কথা সে জানায়। মাজারে যে পীর শুয়ে আছেন তাঁর শান্তির কথা বলে। একবার বিনা অজুতে মাজারে গিয়ে তার কি হাল হয়েছিল এ রকম একটা বানানো গল্পও সে জমিলাকে শোনায়। মজিদ জমিলাকে তারাবির নামাজ পড়তে ও পীরের কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। সে রাতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে জমিলা জায়নামাজের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে হ্যাঁচকা টানে ঘুম থেকে তুলে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। উপায়ন্তর না দেখে জমিলা মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। মজিদ একেবারে থ মেরে যায়। তারমতো একজন শক্তিশালী মানুষের বিরুদ্ধে কেউ এমন প্রতিবাদ করতে পারে তা মজিদ কোনদিন ভাবেনি। রহীমা আর্তনাদ করে। থুথু মুছে মজিদ জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজারে নিয়ে আসে। এবার জমিলা আর প্রতিবাদ করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন-১ :জমিলার শিক্ষা শুরু হওয়ার সময় মজিদ জমিলাকে কী বলে?

উত্তর : জমিলার প্রতিবাদী আচরণে মজিদ অসন্তুষ্ট হয়। সে মনে করে জমিলার যথোচিত শিক্ষা লাভ ঘটে নি। সে জন্য সে জমিলার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। জমিলাকে সে গম্ভীর কণ্ঠে জানায় যে, গতকাল জমিলা তাকে অসম্মান করেছে। শুধু অসম্মান করেনি, মাজারের বিদেহী পীরকেও সে অসন্তুষ্ট করেছে। এতে মজিদ মনে করছে তার ক্ষতি হবে। জমিলার আচরণের জন্য মজিদ তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু মজিদের দয়ার শরীর। সে ভেবে দেখেছে, জমিলার শিক্ষা হয়নি, তাকে এখন শিক্ষা দিতে হবে। জমিলা তার স্ত্রী হলে কি হবে, সে এখনো অবুঝ।

প্রশ্ন-২ :'তিনি সব জানেন, সব দেখেন।' –এ কথা কে কার উদ্দেশ্যে বলেছে কেন বলেছে?

উত্তর : এ কথাটি মজিদের। মজিদ জমিলার উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলেছে। মজিদের অবাধ্য স্ত্রী জমিলার মনে ডর-ভয় সৃষ্টি করার জন্য মজিদ এ কথাটি বলেছে। পীর ফকির সম্বন্ধে গ্রামের মুসলমান সমাজে ভয় মেশানো ভক্তি রয়েছে। এদের কাছে পীর যেন আল্লাহর প্রতিনিধি। পীরের দোয়া না থাকলে যেন মানুষের মুক্তি নেই। সে জন্য পীরের কবরও মানুষের কাছে বিশেষ মর্যাদা পায়। মজিদ জমিলার কাছে মোদাচ্ছের পীরের শক্তির কথা বলে। এ পীর মরে গেছে বটে, কিন্তু এ হল জিন্দাপীর। কবরে শুয়েও এ পীর সবকিছু দেখেন। এখন জমিলা যদি নামাজ না পড়ে এবং স্বামীকে ভক্তি না করে তাহলে পীরের রাগ তার ওপর পড়বে। সে জন্য জমিলার উচিত নামাজ পড়া এবং পীরের কাছে মাফ চাওয়া।

প্রশ্ন-৩ : মজিদ জমিলার কাছে মাজার সম্পর্কে যে মিথ্যে গল্পটি বলে তা আপনি বর্ণনা করুন।

উত্তর : মজিদ একদিন রাতে এশার নামাজের পরে মাজার ঘরে যায়। তার যে অজু ভেঙে গিয়েছিল তা সে খেয়াল করে নি। মাজারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে শোনে শত সহস্র সিংহের ভয়ানক গর্জন। ভয় পেয়ে সে মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়; তখন আর ঐ গর্জন নেই। আবার সে মাজার ঘরে প্রবেশ করে। তখন আবারও সে রক্ত পানি করা গর্জন।

বাইরে এলে দেখা যায় গর্জন থাকে না। হঠাৎ মজিদের খেয়াল হল যে তার অজু নেই। অপবিত্র শরীরে মাজারে ঢুকেছে বলেই ঐ সিংহ-গর্জন। সত্যি সত্যি তাই, অজু করে পাক সাফ হয়ে আসার পর দেখা গেল ঐ রকম কোন আওয়াজ নেই। অজান্তে কোন গুণাহ করে থাকলে আল্লাহ যেন মাফ করেন এ কারণে মজিদ অনেক কান্নাকাটি করে।

প্রশ্ন-৪ : মজিদের মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে কেন?

উত্তর : মজিদ দেখে তার মিথ্যে গল্পের একটা ফল হয়েছে। জমিলার চোখে ভীতির ছায়া দেখা যায়। মজিদ তখন ধারণা করে তার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। মজিদ আরো তৃপ্ত হয় যখন সে দেখে জমিলা অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়ে। রহীমা ঘরের কাজ শেষ করে আসার পরও দেখা যায় জমিলা নামাজ পড়ছে। এতে মজিদ বেজায় খুশি হয়।

প্রশ্ন-৫ : মজিদ জমিলাকে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় কেন? তারপর সে কি করে?

উত্তর : রাত গভীর হলে মজিদ দেখে জমিলা জায়নামাজে সেজদা দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এতে মজিদের ধারণা হয় জমিলার মনে খোদার ভয় নেই, থাকলে এভাবে সে ঘুমাত না। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে এক হ্যাঁচকা টানে জায়নামাজ থেকে ওঠে বসায়। তারপর সে জমিলাকে ভৎর্সনা করে। এতেও জমিলার কোন অনুতাপ না দেখে আরেক হ্যাঁচকা টান দিয়ে সে জমিলাকে দাঁড় করায়। তারপর শক্তভাবে তার হাত ধরে সে জমিলাকে মাজারের দিকে নিতে থাকে।

প্রশ্ন-৬ : জমিলা বেঁকে বসে কেন? সে কি করে?

উত্তর : জমিলা প্রথমে বোঝে নি যে তাকে মাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে যখন বুঝল তখন সে বেঁকে বসে। এর কারণ মাজার সম্পর্কে তার ভীতি। প্রথমত সে, মাজারের ত্রিসীমানায় কখনো ঘেঁষেনি; দ্বিতীয়ত, মজিদ আজ যে গল্প বলেছে তাতে ভয় আরও বেড়ে গেছে। সে জন্য সে মজিদের শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চায়।

কিন্তু ছাড়াতে যখন সে ব্যর্থ হয় তখন সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। হঠাৎ সে পিচ করে মজিদের মুখে থুথু ফেলে।

প্রশ্ন-৭ : মুখে থুথু ফেলার পর মজিদ কি করে?

উত্তর : মজিদ প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়। মহব্বত নগরের সবাই তাকে মান্যগণ্য করে। সেখানে তার নিজের স্ত্রীর হাতে মজিদের এ দশা! মজিদ ভারি অপমান বোধ করে। সে ফতুয়ার নিচের অংশ দিয়ে থুথু মোছে। ততক্ষণে মজিদের হাতের মধ্যে জমিলার হাত ঢিলে হয়ে গেছে। অর্থাৎ জমিলার মধ্যে আর বিরোধিতা নেই। কিন্তু মজিদ সব সময় সতর্ক থাকে। কারণ জমিলাকে তার বিশ্বাস নেই। তারপর সে জমিলাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে মাজারের দিকে আসে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কিন্তু সে ক্ষুদ্র লতার মত মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল।

২. এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। মজিদের মুখে থুথু ফেলার পর মজিদ যখন জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনকার জমিলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে।

জমিলা মজিদের কথামতো এক সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে শুরু করে। কিন্তু নামাজ পড়তে গিয়ে জমিলা জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ভীষণ রাগ করে মজিদ জমিলাকে টেনে হিঁচড়ে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মাজারে যেতে জমিলার

দারুণ ভয়। মজিদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে সে মজিদের মুখের ওপর থুথু নিক্ষেপ করে। মজিদ হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরে থুথু মুছে সে জমিলাকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে মাজারের দিকে যেতে থাকে। এবার দেখা যায় জমিলা কোন প্রতিবাদ করছে না কিংবা হাত ছাড়াতেও চাইছে না। সে নিস্তেজ হয়ে থাকে। মজিদের ইচ্ছে হয় তার লইট্টা মাছের মতো নরম দেহকে সম্পূর্ণ পিষে ফেলতে। কিন্তু মজিদ খুব সতর্ক থাকে। এ প্রতিবাদী মেয়েটিকে তার বড় ভয়। কখন সে কী করে বসবে তা ঠাহর করার উপায় নেই। মজিদ জমিলাকে বিষাক্ত সাপের সঙ্গে তুলনা করে। এখন চুপচাপ থাকলেও যে কোন মুহূর্তে জমিলা ফণা তুলতে পারে। সুতরাং তার নিস্তেজ ভাব দেখে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- জমিলাকে একাকী মাজার ঘরে আটকে রাখার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটু ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারেই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষীপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মত বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মত একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে এমনি সময়ে বুক ফাটা কণ্ঠে মজিদ হা-হা করে উঠলো। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিলো। সভয়ে চমকে ওঠে জমিলা, তাকালো স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মত ঘূর্ণমান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠলো। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নাবা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা ওঠে দাঁড়ালো। কিন্তু মজিদও ক্ষীপ্রভাবে ওঠে দাঁড়ালো। জমিলা দেখলো পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এ সময় সে বলে,

–দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূতপ্রেতও রক্ষা পায় নাই। এ দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে

হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশেমানির ভাব জাগলো না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মত অসহ্য লাগতাছে?

এ বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধলো। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখলো, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

—তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এ সব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিলো, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলোও না, কিছু বললোও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মত বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বললো,

—ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেলো।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—হে কই?

—মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব সে-জিন।

—ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

—কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠলো মজিদের। দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বললে,

—তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

শব্দার্থ ও টীকা

ধপাস — কোন ভারী জিনিস মেঝেতে রাখার কিংবা ফেলার আওয়াজ। **পাদপ্রান্তে** — পায়ের কাছে, কবরের এক পাশে। **ম্লান** — ফিলে। **রেখায়িত** — চিহ্নিত। **কুপি-লণ্ঠন** — বাতি। **চকমকির পাথর** — এক ধরনের পাথর যা ঘষলে আগুন বের হয়। **আর্তনাদ** — কাতর চিৎকার। **ব্যাকুলতা** — আগ্রহ। **ক্ষীপ্রতায়** — দ্রুততায়। **দুরন্ত** — প্রবল। **মরণভীতি** — মৃত্যুর ভয়। **সর্বনাশা** — ধ্বংসকারী। **স্তব্ধ** — চুপ, নীরব। **ঘনবর্ণ** — কালো রঙের। **স্তূপ** — ঢিবি। ধার — তীক্ষ্ণতা। **চিড়চিড়** — কোন বস্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু কেটে যাওয়ার ভাব। **ক্ষুদ্র পল্লব** — ছোট পাতা। **ঘূর্ণমান** — যা ঘুরছে। **উদ্‌ভ্রান্ত** — পাগলাটে, এলোমেলো। **ভরসা** — নিশ্চয়তা। **ধাঁ** — দ্রুত যাওয়া বা ওঠার ভাব। **উদ্দামতা** — প্রবলতা। **যো** — উপায়। **তারাময়** — তারায় তারায় পূর্ণ। **দুষ্ট আত্মা** — ভুত প্রেত ইত্যাদি। **জিন-পরী** — কল্পিত অশরীরী প্রাণী। **আছর** — প্রভাব। **পাশেমানি** — দুঃখ বা অনুতাপ। ঢিলা — শিথিল। **চাবকাইতে** — চাবুক দিয়ে মারতে। **নাছোড়বান্দা** — একগুঁয়ে। **শয়তানি** — বদমায়েসি। **তারস্বরে** — উচ্চস্বরে। **পানে** — দিকে। **সন্ধানী** — কৌতুহলী। **ঝাপটা, ঝাপ** — বাঁশের বা বেতের তৈরি দরজা। **অস্ফুট** — অস্পষ্ট। **কড়মড়** — দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণের ভাব। **দম খিচে** — নিঃশ্বাস বন্ধ করে। **ক্রোধ সংবরণ** — রাগ দমন। **জিন** — মুসলমানদের মতে আগুনে তৈরি অশরীরী জীব।

বিশিষ্টার্থক বাব্যাংশ

অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন – অন্ধকারের জন্য কিছুই দেখতে পারছে না।

হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে – মজিদ এমন সুরে দোয়া দরুদ পাঠ করে যে মনে হয় ঝড় ওঠেছে।

মাছের পিঠের মত একটা ঘনবর্ণ স্তূপ – এখানে মাজার সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

হো হো করে উঠল – আর্তনাদ করে উঠল।

দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার – বেশি রকম দুঃখ।

অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দুফাঁক করে দিল – কাপড়কে তেমন চিড়াচিড় করে দুই ফাঁক করা যায়, তেমনি দুঃখের আঘাতে অন্ধকারেও দুফাঁক হয়ে গেল। এটি অনুভূতিজ্ঞাপক বাক্য।

ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্র পল্লবের মত ঘুর্ণমান তার অশান্ত উদভ্রান্ত চোখ – ছোট পাতা যেমন ঝড়ে ঘুরতে থাকে, তেমনি চোখটা দিশেহারা।

একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে – ভয়ের জন্য তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

ঝড়ের শেষ নেই – দোয়া দরুদের শেষ নেই।

যে ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার জো নেই, সে ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে – মজিদ দোয়া দরুদ রেখে জমিলার সামনে দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করেছে।

দাঁত কড়মড় করে উঠলো – ক্রোধ প্রকাশ করল।

আঞ্চলিক শব্দ

বইসাও – বসেও, **আইল না** – এলো না, **লাগতাছে** – লাগছে, **করুম না** – করব না, **পহর** – প্রহর, **ছাড়ি** – ছেড়ে, **পলাইব** – পালাবে, **দেখবা** – দেখবে, **আইছে** – এসেছে, **কইরা** – করে, **থাইক না** – থেক না, **দিছে** – দিয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ

মজিদ জোর করে অন্ধকার মাজার ঘরে জমিলাকে নিয়ে আসে। জমিলাও চোখে অন্ধকার দেখে। মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে থাকে তীব্র কণ্ঠে। সামনে মাছের পিঠের মতো কবর। মজিদের কণ্ঠের হাহুতাশে জমিলা ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। সে একবার মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজিদ পথ বন্ধ করে রাখে। তারপর দোয়াদরুদ শেষে মজিদ জমিলাকে বলে, সে যেভাবে বলবে জমিলা যেন সেভাবে কাজ করে। তারপর সে জমিলাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তাকে বলে এক রাত মাজারপাকের কাছে থাকলে দুষ্ট আত্মা বাপ বাপ করে পালাবে এবং এভাবে জমিলার মনে খোদাভীতি ও স্বামীভক্তি আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন-১ : মজিদ জমিলাকে কোথায় নিয়ে আসে? সেখানকার পরিবেশ কেমন? জমিলার তখন কী অবস্থা হয়?

উত্তর : মজিদ জমিলাকে পাঁজাকোলা করে সোজা মাজার ঘরে নিয়ে আসে। মাজার ঘর অন্ধকার। এখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। মৃত্যুর ভীতিতে আঁধার করা এক পরিবেশ এ মাজারের।

জমিলা ভয় পেয়ে যায়। ভয়ে অসাড় হয়। সে যেন চোখে কিছু দেখে না। চারদিকে চোখ হাতড়ায়। আলো দেখবার একটা তীব্র ব্যাকুলতা তার মধ্যে জাগে। কিন্তু অন্ধকারের পর্দা আরো গাঢ় হয়।

প্রশ্ন-২ : মজিদ জমিলাকে কি বলে?

উত্তর : দোয়া দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ জমিলাকে বলে, সে যেভাবে বলবে জমিলাও যেন সেভাবে কাজ করে। দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মজিদকে মানে, এমন কি জীন পরীরাও তাকে ভয় করে, কিন্তু জমিলা তার অবাধ্য। মনে হয় তার ওপর কিছুর আছর হয়েছে। মজিদ জমিলাকে এও জানায় যে, তার জন্য মায়া হয়। জমিলাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তারও মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মজিদ নিরুপায়। তবে মজিদ জিনের আছর ছাড়ানোর জন্য জমিলাকে বিশেষ কষ্ট দিতে চায় না। শুধু এক রাতের জন্য তাকে মাজারে বেঁধে রাখবে। তাহলে জমিলা দুষ্ট আত্মা থেকে মুক্ত হবে এবং আগামী কালই দেখা যাবে জমিলার মনে খোদার ভয় ও স্বামীভক্তি এসে গেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এটুকুন পথ পেরোবার উপায় নেই।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এ অংশে মাজার ঘরে আটকে পড়া জমিলার মনের অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপের কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে জোর করে মাজার ঘরে নিয়ে আসে। মাজারে গভীর অন্ধকার। এ পরিবেশে জমিলা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। এর মধ্যে মজিদ এমন এক দুঃখের ভঙ্গিতে দোয়া দরুদ পড়তে থাকে যে জমিলার ভয় আরো বেড়ে যায়। তখন জমিলা আর্তনাদ করে ওঠে। পরে মাজার থেকে সে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মজিদ তাড়াতাড়ি ওঠে পথ আগলে রাখে। সামনেই উন্মুক্ত দরজা, তারপর অন্ধকারে তারাময় আকাশ। অবাধ মুক্ত এলাকা পড়ে আছে সম্মুখে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার উপায়। মজিদের সতর্ক পাহারার কারণে জমিলার পক্ষে মাজার ঘরের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মাজার ঘরে বন্দী দশায় রাত কাটানো জমিলার পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রহীমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইলো তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করলো না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইলো। যে-কোন মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে—এ আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুললো। কিন্তু ওধারে কোন আওয়াজ নেই। থেকে-থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীর্ঘগাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মত অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে-থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোন আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মত তারও নড়চড় নাই।

আরো সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে ওঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝির-ঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মত সে শিরশিরে

শীতল হাওয়া বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে-সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহীমা একবার ছায়ার মত এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোন তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোন প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে-অপেক্ষা যুগযুগব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোন উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে-বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎচমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মত মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে অন্ধকারের তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়তো-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মত সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন কারণ, ভ্রুর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মত গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মত সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মত প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে ওঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদ সঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎ বেগে মজিদ ওঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহীমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো। সে কোন উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

—বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে।

রহীমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সে-দিনকার চোখের মত হয়ে ওঠেছে—যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিলো।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মত খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটতো, এক আধটা হয়তো আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়তো, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসতো বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটতো বাইরে, লুফে-লুফে খেতো খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে—তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মত আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহীমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মত উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহীমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

—কী হইল তোমার? দেখ না শিলাবৃষ্টি পড়ে।

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহীমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহীমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

—কী হইলো তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

—ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটু ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মত সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমন কী তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহীমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এ রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোন উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

—না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এ রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহীমা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে ওঠে হঠাৎ বন্যার মত দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্প্রমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে ওঠে বলে—সব তো গেলো। এবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মত শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

—নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

শব্দার্থ ও টীকা

সন্ধান – খোঁজ, **স্তব্ধতা** – নীরবতা। **দাওয়া** – ঘরের মেঝের বাড়তি অংশ, বারান্দা। **শ্বসন** – নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। **নিঃশব্দপ্রায়** – নীরব। **পাক খেয়ে যাচ্ছে** – ঘুরে ঘুরে উড়ছে। **গুমোট** – হাওয়া-বাতাসহীন অবস্থা, ভ্যাপসা গরম। **মুমূর্ষু** – মরণাপন্ন। **সুহৃদ** – বন্ধু। **নিশ্চল** – স্থির। **ঘনীভূত** – যা ঘন হয়েছে। **মেঘস্তূপ** – মেঘের পুঞ্জ। আড়মোড়া ভেঙে – আলস্য ত্যাগ করে। **পালক স্পর্শ** – আলতো নরম স্পর্শ। **সারা** – শেষ, অবসান। **নিরলস দৃষ্টি** – সচেতন দৃষ্টি। **তাগিদ** – প্রেরণা। **উদ্বেগ** – চিন্তা। **ঝলসে ওঠা** – প্রখর আলোসহ প্রকাশ পাওয়া। **উদ্ভাসিত** – আলোকিত। **উলঙ্গ** – নাঙ্গা। **গোমড়া** – ব্যাজার। **অবসর** – বিশ্রাম। **উপভোগী** – যে ভোগ করে। **কুদরত** – মহিমা। **লীলা** – গূঢ় কাজ। **আসন্ন** – আগত প্রায়। **এবাদত** – উপাসনা। **থমথম** – বিপদ সূচক ভাব। **থিয়েটার** – নাট্যশালা। **যবনিকা** – পর্দা। **কাটি-কাটি** – শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে এ রকম ভাব। **আভা** – আলোর ছটা। **প্রকৃতি অবলোকন** – প্রকৃতিকে দেখা। **ঝাপটায়** – আঘাতে, ধাক্কায়। গোঙায় – কাঁদে। **সুবেহ সাদেক** – সূর্য ওঠার আগে প্রভাতের রূপ, প্রথম ভোর। **নির্মল** – পরিষ্কার। **পাচ পদের ছুরা আল কালাম** – পবিত্র কোরানের বিশেষ ছুরা। এ ছুরাতে পাঁচটি পদ বা লাইন আছে। **মায়াজাল** – ছলনা। **বাহ্যিক** – বাইরের। **ফলা** – তীরের তীক্ষ্ণ মুখ। **পথ ভ্রষ্ট** – পথ হারিয়েছে যা। **উল্কা** – হাউই। **বিপদ সঙ্কেত** – বিপদের আভাস। **অজস্র** – অনেক। **তড়িৎবেগে** – বিদ্যুতের গতিতে। **উৎকণ্ঠিত** – চিন্তিত। **আবছা** – অস্পষ্ট। **হয়রান** – ক্লান্ত। **লুফে লুফে** – ধরে নিয়ে। **নধর-কচি** – অতি কচি। **শিষ** – ধান গাছের আগা। **পায়চারি** – হাঁটা। **পোষা জীবজন্তু**– গরু ছাগল ইত্যাদি। **আফসোস** – দুঃখ। জান – জীবন, প্রাণ। **গুঁড়িগুঁড়ি** – ক্ষুদ্র বিন্দু। **মেঘাবৃত** – মেঘে ছাওয়া। **ভেদ** – ছেদ। **ধুসর** – ছাই রংয়ের। **বোজা** – বন্ধ। **স্থানান্তরিত** – পরিবর্তন। হুঙ্কার – গর্জন। **ঘোর** – আচ্ছন্নতা। **দুর্বার** – যা বারণ করা কষ্টকর। **কম্প্রমান** – যা কাঁপছে। **বিমূঢ়** – হতবুদ্ধি। **কেয়ামত** – প্রলয়, মুসলমান মতে যেদিন সৃষ্টি ধ্বংস হবে। **উচ্ছ্বাস** – ভাবাবেগ। **মুহূর্ত** – ক্ষণ, সামান্য সময়। **ওলট-পালট** – এলোমেলো। **উপক্রম** – আয়োজন। **আদিগন্ত** – দিগন্ত পর্যন্ত। **টান খেয়ে** – ঘুরে। **পরীক্ষাক্ষেত্র** – পরীক্ষার জায়গা। **আঁধা** – অন্ধ। **বিনিদ্র** – ঘুমহীন। **প্রান্তে** – একদিকে। **হাহাকার** – আর্তনাদ। **পোলাপান** – ছেলেপিলে। **নাফরমানি** – অবাধ্যতা। **তোয়াক্কল** – বিশ্বাস, নির্ভরতা। **ব্যাপ্ত** – ছড়ানো। **খোদাই** – ক্ষোদিত, পাথরে কেটে অঙ্কিত।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

কান খাড়া হয়ে ওঠা – কিছু শোনার অপেক্ষা

ছায়ার মত এসে ঘুরে যায় – নিঃশব্দে এসে দেখে যায়

সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায় – বিদ্যুতের আলোতে সব আলোকিত হয়ে যায়

চিরে দুফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ – অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে মনে হয় তা আকাশকে চিরে দুফাঁক করছে।

আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে – বিপজ্জনক কিছু ঘটবে এমন একটা ভাব।

রাতও কাটি কাটি করে কাটে না, রাত্রির যবনিকা ওঠে না – রাত শেষ হয় না।

ভ্রূর কাছটা একটু কুঁচকে যায় – বিরক্তির প্রকাশ।

দিনাদির অধিকারী – আল্লাহ।

তীক্ষ্ণ ফলার মত সে বৃষ্টি – গতিবেগ সম্পন্ন ঝড়ো বৃষ্টি।

কান তার খাড়া হয়ে ওঠে – সে সতর্ক হয়ে যায়।

মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে – ভয়ের বা বিপদের ছায়া পড়েছে মুখে, নিরানন্দ মুখ।

খোদার ঢিল – শিলাবৃষ্টি, শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিরূপী শিলা।

পাথর হয়ে বসে থাকে – বিপদে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

আফসোস করে বাঁচে না – অতিরিক্ত দুঃখ প্রকাশ করে।

মজিদের আড়ালে চলে যায় – মজিদের কথা শুনতে চায় না।

গা ঝাড়া দিয়ে – নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করে।

আকাশ এ মাথা থেকে সে মাথা – সবটা আকাশ।

সে বুকটা বালকের বুকের মত সমান – মসৃণ সমান বুক।

মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না – রাগের কোন প্রকাশ ঘটে না।

সে কথার কান না দিয়ে – সে কথা না শুনে।

ঘন ঘন হাত বুলাতে শুরু করে – আদর করতে থাকে।

বন্যার মত দুর্বার হয়ে ওঠে – অতিরিক্ত মায়া জাগে।

ওলট পালট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় – পরিবর্তন জাগে।

জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে – সত্যকে তীব্রভাবে অনুভব করে।

সব তো গেলো – সর্বনাশ হল।

বিবর্ণ কাঠের মত শক্ত দেখায় – অসুন্দর কঠিন মুখ।

বিশ্বাসের পাথরে খোদাই সে চোখ – চোখে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের রূপ।

পাঠসংক্ষেপ

জমিলাকে মাজার ঘরে আটকে রেখে মজিদ ঘরের ভিতরের দাওয়ায় বসে থাকে। তার ধারণা ছিল জমিলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ একটু পরে শোনা যাবে। কিন্তু সে রকম কোন আওয়াজ আসে না। আরো পরে আকাশে মেঘ জমে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, শীতল হাওয়া বয়ে যায়, ঝড় আসে তীব্র গতিতে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। ঝড়ের পরে নামে জোরালো শিলাবৃষ্টি। রহীমা আর মজিদের কথা শোনে না, জমিলাকে নিয়ে আসতে বলে। শিলাবৃষ্টি থামলে মজিদ মাজারের ঝাপটা খোলে। জমিলা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে সালুতে ঢাকা কবরের পাশে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। দড়ি খুলে মজিদ তাকে ভিতরে নিয়ে আসে। রহীমা পরম আবেগে জমিলার গায়ে হাত বুলাতে থাকে। মজিদের মধ্যেও ভাবাবেগ জাগে। কিন্তু মজিদ নিজেকে সামলে নেয়। বলে, দুনিয়াটা একটা পরীক্ষা মাত্র। এরপর মজিদ মাঠের দিকে যায়। সে হাহাকাররত লোকজনদের নাফরমানি না করে খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে বলে। তার নিজের চোখেরও রয়েছে অটল স্থায়ী বিশ্বাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন-১ :জমিলাকে মাজারে আটকে রাখার রাতে প্রকৃতির পরিবশে যে রকম ছিল তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : রাতটি ছিল ভয়াবহ। থেকে থেকে প্যাঁচা ডেকে উঠছিল, শকুনের বাচ্চার অবিশ্রান্ত কান্না শোনা যাচ্ছিল, একটা বাদুড় এদিক ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর শোনা গেল মেঘের গম্ভীর গর্জন। আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত। থেকে থেকে বিজলি চমকাচ্ছিল, দক্ষিণ পশ্চিম কোন থেকে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসছিল। তারপর নামল প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ে বিদ্যুতে, বৃষ্টিতে তখন প্রকৃতির ভয়ঙ্কর অবস্থা। শেষে নামল তুমুল শিলাবৃষ্টি। জমিলাকে মাজারে আটকে রাখার প্রকৃতির পরিবেশ এ রকম অশুভ ছিল।

প্রশ্ন-২ :ছুরা আল ফালাকের মুল কথা কি?

উত্তর : দিনের আলোকে যে কুৎসিত অন্ধকার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সেই অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। হে দিনের প্রভু, আমি বাঁচতে চাই অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে, আর যত দুর্বলতা থেকে।

প্রশ্ন-৩ :'ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?" এটি কার উক্তি? এটি কেন করা হয়েছে? এ উক্তির তাৎপর্য কী?

উত্তর : এটি রহীমার উক্তি।

জমিলাকে একটি ভয়াবহ ঝড়ের রাতে মাজারে একলা আটকে রাখার কারণে জমিলার জীবনাশঙ্কায় এ কথা বলা হয়েছে।

মানুষের জীবন সব চাইতে মূল্যবান। জীবন না থাকলে মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ কথাটি সবার আগে বুঝতে হবে। মুখে থু থু নিক্ষেপ করেছে বলে অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে রাতের বেলায় মাজার ঘরে দড়ি বেঁধে সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় রাখে। এমনিতে কবরে একাকী থাকা অতি ভয়ের, তদুপরি ঐ রাতটি ছিল ঝড় বিদ্যুৎ শিলাবৃষ্টিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর। শিলাবৃষ্টিতে ধান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম শিলাবৃষ্টি হলে রহীমা বড় আফসোস করতো। কিন্তু এবার রহীমার উদ্বেগ জমিলার জন্য। মজিদ যেভাবে জমিলাকে বেঁধে রেখেছে তা অত্যন্ত অমানবিক। জমিলা মরেও যেতে পারে। এ প্রথম রহীমা মজিদের অবাধ্য হয়। রহীমা মজিদকে বুঝিয়ে দেয় যে, ধানের চেয়ে মানুষের জানের দাম অনেক অনেক বেশি।

প্রশ্ন-৪ : মাজারে ঝাপটা খুলে মজিদ জমিলাকে কোন অবস্থায় পায়?

উত্তর : সারা রাত ধরে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি থামলে রহীমার কথা মতো জমিলাকে আনতে যায় মজিদ। মাজারের ঝাপটা খুলে মজিদ দেখে জমিলা সালু কাপড়ে ঢাকা কবরের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। আর মেহেদি দেয়া একটি পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। জমিলা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন।

প্রশ্ন-৫ : 'দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া মায়া সকলের আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।" –কথাটি কার? কার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে এবং কেন?

উত্তর : উপরের কথাটি মজিদের। মজিদ তার স্ত্রী রহীমাকে কথাটি বলেছে। মজিদ জমিলার ওপর জীন-পরীর আছর ছাড়ানোর জন্য জমিলাকে রাতের বেলায় মাজারে বেঁধে রেখেছে। ঝড়জলের ভয়ঙ্কর রাত শেষ হলে দেখা যায় জমিলা

অজ্ঞান অবস্থায় চিৎ হয়ে কবরের পাশে। তাকে ভিতর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রহীমা পরম আবেগে তার সেবা করে। এ সব দেখে মজিদেরও ভাবান্তর হয়। কিন্তু মজিদ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। রহীমাকে সে বোঝায়, দুনিয়াটা হল কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। মানুষের দয়ামায়া অবশ্যই আছে। কিন্তু মানুষ কর্তব্য করবে। সত্য যা তা মানবে। দয়া-মায়া করতে গেলে এ সব হয় না। কর্তব্যে মানুষকে কঠোর হতে হয়। সে জন্য মজিদ রহীমাকে দয়ামায়া দ্বারা আচ্ছন্ন না হতে বলছে।

প্রশ্ন-৬ : 'নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।" - এ কথা কে কাকে বলেছে এবং কেন বলেছে?

উত্তর : এ কথাটি মজিদ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছে।

আগের রাতে তুমুল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে, ধান গাছের কচি শিষগুলো ঝরে ঝরে পড়েছে। ঝড়ের শেষে মজিদ সকালবেলায় মাঠ দেখতে গেছে। তখন অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। কারো মুখে কথা ছিল না। মজিদকে দেখে সবাই মিলে হাহাকার করে ওঠে। তাদের একটিই কথা; সব তো গেল এখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে খাবে কি! এ অবস্থায় মজিদ সবাইকে আশ্বাস দেয়। আল্লাহর ওপর স্থির বিশ্বাস রাখতে বলে। কেননা আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাদের খাদ্যেরও জোগান দেন। আল্লাহ ছাড়া মানুষের গতি নেই। সে জন্য মানুষের উচিত আল্লাহকে স্মরণ করা। মজিদ আল্লাহ বিশ্বাসের কথা বলে মানুষকে উদ্দীপ্ত ও ধর্মভাবাপন্ন করে রাখতে চায়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. প্রকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও এক রকম এবাদত।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের অন্তর্গত। এখানে প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখে আল্লাহর মহিমা উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে।

যে রাতে অবাধ্য জমিলাকে মজিদ জোর করে মাজারে বেঁধে রাখে, সে রাত ছিল অতি ভয়াবহ। মাজার ঘরে ছিল ভৌতিক পরিবেশ, আর বাইরের প্রকৃতিতে আসন্ন বিপদের অবস্থা। মেঘের গর্জন বিদ্যুতের চমকানি, ঝড়, বৃষ্টি সব মিলিয়ে এক ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মজিদ ঘুমায় না। জমিলার আর্তনাদ শুনবে এ রকম ধারণা সে করেছিল। কিন্তু ওখান থেকে কোন শব্দ আসে না। এদিকে বিদ্যুতের চমকানিতে সমস্ত আকাশ যেন দুফাঁক হয়ে যায়। মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে এবং আল্লাহর মহিমা উপলব্ধি করে। আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতির বৈচিত্র্যের শেষ নেই। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি বদলায়। কখনো কখনো ভয়াবহ রূপও ধারণ করে। প্রকৃতির এ রকম অবস্থাও আল্লাহর কুদরতের অংশ। প্রকৃতিকে যারা এভাবে দেখে তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর এবাদত করে। শুধু নামাজ পড়া এবাদত নয়। এবাদতেরও নানা রকমফের আছে। মানুষকে বুঝতে হবে যে আল্লাহর মহিমা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সে জন্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুধাবন করাও আল্লাহর এবাদত।

২। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।

এটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের সর্বশেষ লাইন। এ অংশে গভীর আল্লাহ বিশ্বাসী মজিদের কথা বলা হয়েছে।

রাতের বেলায় প্রচণ্ড ঝড়ে ও শিলাবৃষ্টিতে ধানের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কচি ধানের শিষগুলো শিলার আঘাতে খসে পড়েছে। সকাল বেলায় গ্রামের কৃষকেরা এসব দেখে ভয়ানক মুষড়ে পড়ে। মজিদ মাঠ দেখতে এলে সবাই হাহুতাশ করে। মজিদ তাদের সান্ত্বনা দেয় এ বলে যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহর উপরে অবিশ্বাস করা চলবে না। কারণ আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের খাওয়া পরার জোগান দিবেন তিনি। মানুষের দিন একরকম যায় না। আজকের ধ্বংস দেখে ভেঙে পড়লে চলবে না। আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে তাহলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। মজিদ ধর্মপথের মানুষ। সে মহব্বত নগরের মানুষদের ধর্মের পথে এসেছে। তার

চোখে অন্য কোন ভাব নেই। আল্লাহর বিশ্বাসে সে চোখ খোদাই হয়ে আছে। আজকেও সে ধর্মের কথা, আল্লাহ বিশ্বাসের কথা বলছে।

নিজে করুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. না ঘুমিয়ে মজিদ দাওয়ার ওপর বসে থাকে কেন?
২. আগে শিলাবৃষ্টি হলে লোকজন কী কী করতো?
৩. রহীমা মজিদের কথায় কোন সাড়া দেয় না কেন?

ব্যাখ্যা

১. মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।
২. আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. উপন্যাস বলতে কী বোঝায়? উপন্যাসে কী কী উপাদান থাকা প্রয়োজন, উল্লেখ করুন।
২. 'লালসালু' কোন শ্রেণীর উপন্যাস? আলোচনা করুন।
৩. 'লালসালু' উপন্যাসের সমাজচিত্রের বর্ণনা দিন।
৪. 'লালসালু' উপন্যাসে একটি দ্বন্দ্ব আছে। সে দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি কী? কোন কোন চরিত্র সেই দ্বন্দ্বের যুক্ত বিশ্লেষণ করে দেখান। দ্বন্দ্বের পরিণাম কী তাও উল্লেখ করুন।
৫. 'লালসালু' উপন্যাস কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।
৬. 'লালসালু' উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কতখানি সার্থক, বিশ্লেষণ করুন।
৭. 'লালসালু' উপন্যাসের নায়ক কে? তার চরিত্রের একটি পরিচয় দিন।
৮. 'লালসালু' উপন্যাসের নায়িকা কে? তার চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।
৯. রহীমা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
১০. 'লালসালু' উপন্যাসের নামকরণ কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।
১১. 'লালসালু' উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।
১২. উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্প ও নাটকের পার্থক্য কী ও কোথায়?

☞	এখানে চূড়ান্ত মূল্যায়নের কিছু নমুনা প্রশ্নের উত্তর দেয়া হল। যেগুলো লিখে দেয়া হয়নি সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন-১ : উপন্যাস কাকে বলে? উপন্যাসে কি কি উপাদান প্রয়োজন, উল্লেখ করুন।

উত্তর : শব্দটির আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে– উপন্যাস হচ্ছে বিশেষ ধরনের কল্পিত উপাখ্যান। আবার এও বলা হয়েছে যে উপন্যাসের অর্থ কথারম্ভ – শ্রোতা বা পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য কল্পিত গল্প বা কাহিনী। ইংরাজি ভাষায় উপন্যাসের প্রতিশব্দ Novel এর আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে- 'a fictitious prose narrative or tale presenting a picture of real life of the men and women portrayed' অর্থাৎ Novel বা উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে রচিত কল্পিত কাহিনী যার মধ্যে বর্ণিত মানব মানবীর বাস্তবজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। Novel কে এ কারণে (Fiction) বা বানানো কাহিনীও বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত বিশেষভাবে উপস্থাপিত এমন এক ধরনের কাহিনী যার মধ্যে বর্ণিত মানব-মানবীর বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

আভিধানিক অর্থ এবং উপরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই আমরা উপন্যাসের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। উপন্যাসে প্রয়োজন :

(১) মানুষের বাস্তব জীবনের সুবিন্যস্ত একটি কাহিনী, (২) নরনারী বা চরিত্র, (৩) গদ্যভাষা (৪) লেখকের একটি উপলব্ধিজাত বক্তব্য।

১. কাহিনী

দেখা যায়, কাহিনীই উপন্যাসের প্রধান উপাদান, কাহিনী ছাড়া উপন্যাস হয় না। কিন্তু যে কোন কাহিনী দিয়ে উপন্যাস হয় না। (ক) কাহিনীটিকে হতে হবে মানবিক। অর্থাৎ ঈশ্বর দেবতার প্রাধান্য নিয়ে যেমন উপন্যাসের কাহিনী তৈরি হবে না, তেমনি তা ভূত প্রেত দৈত্য দানবের কাহিনীও হবে না। উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠবে মানব-মানবী এবং তারা যে জীবন যাপন করে সেই বাস্তব জীবনকে নিয়ে। আবার এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মানব-মানবীর কাহিনী হলেও তা উপন্যাস হবে না। (খ) কাহিনীটিকে হতে হবে আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক করার জন্য কাহিনীর ঘটনাবলীকে সুবিন্যস্ত করে কাহিনীটি নির্মাণ করা হয়। কাহিনীর আরম্ভ বিস্তার এবং পরিণতি এমনভাবে বিন্যস্ত

করা হয় যাতে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত পাঠ করার আগ্রহ পাঠকের মনে জেগে থাকে। কাহিনীতে ঘটনার এ বিন্যাসকে ইংরাজিতে বলা হয় প্লট।

২. চরিত্র

কাহিনী তৈরি হয় ঘটনা দিয়ে। একটি ঘটনা একাধিক ঘটনার জন্ম দেয় বলে কাহিনী অগ্রসর হয়ে একটি পরিণতিতে পৌছায়। আমরা জানি ঘটনা আপনা আপনি ঘটে না। ঘটনা ঘটায় মানুষ। তার চিন্তা, কল্পনা আশা, তার প্রবৃত্তি, যেমন ঘৃণা, ক্রোধ, লোভ প্রেম হিংসা দয়া ইত্যাদি এবং তার নানা আচরণ, যেমন যে ধীর কিংবা অসাধু বা কলহ পরায়ণ, অথবা ক্ষমাশীল এসবই তাকে দিয়ে নানান ঘটনা ঘটায়। এমতাবস্থায় ঘটনা ঘটক মানব-মানবীরা না থাকলে কাহিনী নির্মাণই অসম্ভব। সুতরাং উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান এর কাহিনীর মানব-মানবী বা চরিত্র ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Character।

৩. উপন্যাসের ভাষা

উপন্যাস গদ্যে লিখিত হয়ে থাকে। কারণ বাস্তব জীবন যেহেতু উপন্যাসের অবলম্বন, যেহেতু সেই বাস্তব জীবনের বর্ণনা সেই ভাষাতেই হওয়া উচিত যা বাস্তব জীবন সংলগ্ন। অর্থাৎ যে ভাষা দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাতেই উপন্যাস লেখা হয়। ছন্দোময়, অলঙ্কৃত ভাষা দিয়ে বাস্তবজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলেই গদ্যকে উপন্যাস রচনার মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. উপন্যাসের বক্তব্য

সর্বোপরি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখকের উপলব্ধিজাত একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কালজয়ী ও মহৎ সকল উপন্যাসেই মানবজীবন সম্পর্কিত গভীর কোন সত্যকে তুলে ধরা হয়। যেমন মহান রুশ লেখক দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে এ জীবন সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে যে, পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে নয়। আমাদের পাঠ্য 'লালসালু' উপন্যাসেও একটি বক্তব্য আছে, আর তা হল- কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, শোষণ এবং প্রথার বিরুদ্ধে মুক্ত চিন্তা, স্বাভাবিক প্রাণধর্ম এবং শোষণ থেকে মুক্তির জন্য মানুষের সংগ্রাম কখনোই থেমে যায় না। সেই কারণে কুসংস্কার ও ভণ্ডামির প্রতীক মজিদের সঙ্গে তার তরুণী স্ত্রী জমিলার যে দ্বন্দ্ব, তার ফয়সালা লালসালু উপন্যাসে দেখানো হয়নি।

প্রশ্ন ২। লালসালু কোন শ্রেণীর উপন্যাস? এবং কতখানি সার্থক তা বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : 'লালসালু'তে যেহেতু রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গ নেই, এবং ঐতিহাসিক কোন বিষয়ও নেই, সেহেতু এ উপন্যাস রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এ উপন্যাসের মধ্যে একটি গ্রামীণ সমাজের কাহিনী আছে, যে সব ঘটনা ও চরিত্রকে আমরা দেখি সেগুলি সবই সামাজিক। সুতরাং বিষয়ের দিক থেকে বিচার করে দেখলে 'লালসালু'কে সামাজিক উপন্যাস হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়।

এর কাহিনী এমনই এক গ্রামীণ সমাজের, যার পরতে পরতে কেবলই দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস আর প্রতারণা। মানুষের মনে ভয় ঐশী শক্তি সম্পর্কে এবং যখন তাকে ভয় দেখানো হয় যে, তুমি যা করছ তা গুণাহ'র কাজ কিংবা তুমি ধর্মীয় বিধানকে অমান্য করছ, অথবা তুমি এ কাজ করলে তোমার মঙ্গল হবে, তখন সে ভয় পেয়ে কোনো কাজ থেকে নিবৃত্ত হয় অথবা কোনো কাজ সম্পাদন করে। নিজের যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে যে কোন কিছু বিবেচনা করে না, তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, একটি সামগ্রিক ভীতি, মান্যতা, পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতার সঙ্গে সে আজীবন বাঁধা।

মহব্বত নগর গ্রামটিতে এ ধরনের মানুষদের নিয়ে সমাজ। এ সমাজে এসে ঠাঁই নেয় ভণ্ড, প্রতারক ও ধূর্ত মজিদ। গ্রাম প্রান্তের একটি পুরাতন কবরকে সে একজন মোদাচ্ছের পীরের কবর বলে ঘোষণা দেয় এবং সেটিকে মাজারে রূপান্তরিত করে। মাজারের সেবক হয়ে সে গ্রামবাসীর ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং নানান সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে সে ক্রমে জমিজমার ও মালিক হয়ে বসে। সে গ্রামের মানুষকে ধর্ম-কর্মে মতি না থাকায় শাসন তো করেই, এমনকি গ্রামবাসীর পারিবারিক সমস্যা নিয়েও সালিশ বসায় এবং সুকৌশলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তিও দিয়ে দেয়। গ্রামের মাতব্বর ও সচ্ছল লোক খালেক ব্যাপারীকেও সে নিজের কব্জায় এনে ফেলে। তার বন্ধ্যা প্রথমা স্ত্রীকে মাজারের চারদিকে সাত পাকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করে। কারণ সে ইতিমধ্যে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে ওই কাজটি করা হলে

মেয়ে লোকটির দোষ কেটে যাবে এবং সে সন্তান সম্ভবা হবে। সাতপাক ঘোরার অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় না, কারণ তার আগেই বেপারীর স্ত্রী শারীরিক দুর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু তাতে মজিদের আধিপত্যের হানি ঘটে না। এমনই কাণ্ড ঘটে আক্কাস আলীর ক্ষেত্রে। স্কুলে পড়ার কারণে ছেলেটি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতো সে জন্যে সে গ্রামে একটি স্কুল বসাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজিদের কুচক্রে সে সফল হতে পারে না। এ ভাবেই লালসালু উপন্যাসে মজিদের জীবন যাপন ও তার আত্মপ্রতিষ্ঠার বর্ণনা দেয়া হয়েছে নানান সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করে। সারা উপন্যাসেই সমাজের ভিতর ও বাহিরকে লেখক খুলে খুলে দেখিয়েছেন। তবে সেজন্যেই আমরা 'লালসালু'কে সামাজিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

তবে এও লক্ষ্য করার বিষয় এ যে কাহিনীর মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি রয়েছে তা কিন্তু সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে নয়। কুসংস্কার, অল্পবিশ্বাস, প্রথাবদ্ধতা, এসবের বিরুদ্ধে কোনো সাংগঠনিক প্রতিরোধের ঘটনা আমরা দেখি না। সুতরাং দ্বন্দ্বটি প্রকাশ্য নয়। এটি রয়েছে ব্যক্তিক ভাবে এবং মানবিক স্তরে। দ্বন্দ্বটি কী? নানা কুসংস্কার প্রথা ও ধর্মান্ধতা একদিকে, আর অন্যদিকে সহজ প্রাণধর্মের মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। একদিকে মজিদ তার সকল শক্তি, কূটচাল, ও ভয়াবহ ক্ষমতা নিয়ে শাসন করে দুমড়ে মুচড়ে দিতে চায় প্রাণধর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জমিলাকে, আর অন্যদিকে জমিলা সকল রকম শাসন ও শাস্তির পরও থাকে অনমনীয়। দুই প্রতিপক্ষের এ দ্বন্দ্বটি ফুরিয়ে যায় না কিংবা হারিয়েও যায় না। অনমনীয়া জমিলা মাথা নোয়ায় না, আত্মসমর্পণ করে না আর তাতেই মজিদ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বন্দ্বের পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে। সেই জন্য সামাজিক উপন্যাস হলেও লালসালু মনস্তত্ত্ব নির্ভর – তাই এ উপন্যাসকে আমরা মনস্তত্ত্বনির্ভর সামাজিক উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

প্রশ্ন ৩। লালসালু উপন্যাসে একটি দ্বন্দ্ব আছে, সেই দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি কী এবং কোন কোন চরিত্র সেই দ্বন্দ্বে যুক্ত বিশ্লেষণ করে দেখান, দ্বন্দ্বের পরিণাম কী তাও উল্লেখ করুন।

উত্তর : মানুষ ও তার বাস্তব জীবনের বিষয় অবলম্বন করেই উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়। মানুষের জীবন যেহেতু দ্বন্দ্ব সংঘাতময়, উপন্যাসের কাহিনীতেও সেই কারণে এক বা একাধিক দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। 'লালসালু' উপন্যাসকে আমরা দেখি এর বিষয় দরিদ্র কৃষিজীবী অধ্যুষিত মহব্বত নগর গ্রামের মানুষদের জীবন যাপনের নানান ঘটনাবলী এবং চরিত্র ঐ গ্রামের মানুষেরা। ঐ গ্রামের মানুষ চাষাবাদ করে যা উৎপাদন করে তাতে তাদের দারিদ্র্যদশা কখনোই ঘোচে না, তাদের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নেই, বৃহত্তর জগৎ এবং জীবন সম্পর্কেও তাদের কোন রকম ধারণা নেই এবং সে সম্পর্কে ধারণা লাভের কোন আগ্রহও কখনও হয় না। তাদের মনের ভেতরে একটার পর একটা প্রাচীন কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের দেয়াল। তাদের অবিচল বিশ্বাস ভাগ্যে এবং অলৌকিতত্বে। নিজেদের সকল অসহায়তাকে তারা ভাগ্য বলে মেনে নেয়। যদি কেউ সুকৌশলে কোন বিষয়, জ্ঞান, বা ব্যক্তির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করতে পারে, তাহলে তারা তা অকাতরে মেনে নেয় এবং ঐসব বিষয় জ্ঞান এবং ব্যক্তির মধ্যে ঐশী শক্তির মহিমা দেখতে পায়।

একশ্রেণীর ধূর্ত মানুষ সরলচিত্ত দরিদ্র গ্রামবাসী মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে যথেচ্ছ শোষণ করে এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। 'লালসালু' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক আচরণ দেখিয়ে প্রথমত গ্রামের লোকদের বিস্মিত করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে নিজেকে সৎ, ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সে গ্রাম-প্রান্তে একটি ভাঙ্গা কবরকে এক মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে শনাক্ত করে এবং কবরটি সংস্কার করে তার ওপর লাল সালু দিয়ে ঢেকে দেয়। একই সঙ্গে সে নিজেকে ঐ মাজারটির রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে ঘোষণা করে। লোকের বিশ্বাস অর্জনের জন্য সে এ রকম একটি গল্প ফাঁদে যে গারোদের দেশে সে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল, এ মাজারে যে পূণ্যাত্মা শায়িত তাঁর স্বপ্নাদেশেই সে এ গ্রামে এসেছে এবং মাজারটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। এ ধূর্ত কৌশলের ফলেই সরল, ধর্মভীরু ও দরিদ্র গ্রামবাসী এবং গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খালেক ব্যাপারী পর্যন্ত মজিদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও অনুগত হয়ে পড়ে এবং তাকে ভয়ও পেতে শুরু করে। জমিজমার মালিক হতে তার বেশি সময় লাগে না এবং সে শক্ত-সমর্থ একজন মহিলাকে বিয়েও করে ফেলে। দেখতে দেখতে সে গ্রামের মধ্যে অশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। তাহেরের বাপের পারিবারিক কোন্দলের মধ্যে সে নাক গলায়। স্বল্প শিক্ষিত যুবক আক্কাস আলী গ্রামের একটি স্কুল খোলার আয়োজন করলে মজিদ তার এমন

হেনস্থা করে যে তার বাবা মাপ চাইতে দিশা পায় না। মজিদ হয়ে ওঠে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, শাসন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক। সে নিজেকে ঘিরে এমন এক জগৎ তৈরি করে যেখানে বিরোধিতা নেই, প্রতিবাদ নেই, উল্লাস নেই, আনন্দ নেই, গান নেই, সেখানে কেবল শাসন আর আনুগত্য। মজিদের জগৎ একটি বিশাল অচলায়তন হয়ে উঠে।

কিন্তু ঐ জগৎ সত্য নয়, কারণ আমরা জানি জগতের মূলে থাকে প্রাণ-প্রাণ না থাকলে জগৎই তৈরি হয় না। আর প্রাণের ধর্ম তা অগ্রসরমান, বিকাশমান চঞ্চল এবং স্ফূর্ত। প্রাণময় মানুষ হাসে, কাঁদে, গান গায় উল্লসিত হয় এবং এ প্রক্রিয়ার প্রাচীন নিয়মের বেড়া ভাঙ্গে। কুসংস্কার গুঁড়িয়ে দেয়, অন্ধবিশ্বাসের ভূতকে তাড়ায়, সে কৌতূহলী হয় জগৎও জীবনকে জানতে চায়। পুরনো জগতের ওপর নতুন জগৎ নির্মাণ করে। নবীন প্রাণময়তার এ শক্তিই হচ্ছে কুসংস্কার শাসন এবং অন্ধবিশ্বাস এবং প্রশ্নহীন আনুগত্যের বিপরীত শক্তি। এ দুই শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে লালসালু উপন্যসে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে মারামারি লাঠালাঠির মাধ্যমে নয়। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে প্রায়শই দৃষ্টিগ্রাহ্যতার বাইরে– যা ফুটে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের আবরণে এবং কথাবার্তায়।

নবীন প্রাণময়তার প্রতীক হচ্ছে জমিলা। সে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী, বয়সে তরুণী, স্বভাবে চঞ্চল এবং হাসিখুশি। প্রথমা স্ত্রী রহীমা তরুণী সতীনটিকে নিজের মেয়ের মতোই আপন করে নেয়। জমিলা উচ্চ স্বরে কথা বলে, হাসে মজিদ ধমক দিলেও তাতে কান দেয় না। সে স্বামীর বিছানায় শুতে চায় না। নামাজ পড়েছে কিনা সে কথাটাও বলে না। বাড়িতে জিকিরের আসর বসানো হলে সে বাইরে বেরিয়ে যায়- পর্দাপুশিদার কথা বিবেচনা না করেই। এ ভাবে মজিদের চোখে জমিলা ক্রমেই হয়ে ওঠে দুর্বিনীত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছাচারী। এমন অবস্থায় মজিদ জানায় যে জমিলার ওপর কোন দুষ্ট আত্মা ভর করেছে এবং সেজন্যে তাকে রাতের বেলা মাজারে বেঁধে রাখা হবে। ঐ নিষ্ঠুর কাজটা মজিদ সত্যিই করে। পেছনে অন্ধবিশ্বাস এবং ধূর্ততা কাজ করলেও সে নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। তার কেবলই সংশয় জাগে তার সংসার আর অন্ধবিশ্বাসে ও কুসংস্কার দিয়ে গড়া জগৎটি বোধ হয় আর অটুট থাকে না। সেখানে যে ফাটল ধরেছে তা সে টের পায়। কিন্তু সে পরাজিত হতে চায় না। সে হয়ে ওঠে আরও একরোখা এবং জেদী। জমিলার মাজারে সংলগ্ন একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এ সময় বাইরে শুরু হয় তুমুল শিলাবৃষ্টি। তাতে ফসল হানির আশঙ্কায় গ্রামবাসীদের মধ্যে হায় হায় শুরু হয়ে যায়। জমিলাকে মাজারে বেঁধে রাখার ঘটনায় রহীমার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। স্বামীর হুকুমের দাসী ছিল সে এতোকাল। কিন্তু ঐ ঘটনার পর সে আর অমন অনুগত থাকতে পারে না। ঝড়বৃষ্টি থামানোর জন্য দোয়া দরুদ পড়ার কথা। সেই দোয়া দরুদ পড়ার জন্য তাগিদ দেয় মজিদ কিন্তু রহিমা তা শুনেও শোনে না। এভাবে জমিলার ভেতর দিয়ে যে প্রাণময়তার প্রকাশ, সেই প্রাণময় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি রহীমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রাণময় তারণ্যের যে উত্থান দেখতে পাই জমিলার মধ্য দিয়ে তার পরিণাম কী হয় শেষ পর্যন্ত তা লালসালু উপন্যাসে দেখানো হয় নি– কিন্তু দ্বন্দ্বটি যে আছে, এবং থেকে যাবে আরও বহুকাল এ আভাসের মধ্যদিয়ে লালসালু উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪। লালসালু উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কতখানি সার্থক, বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসাধারণ কুশলী ছিলেন তা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'র চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারি। মজিদ চরিত্র তাঁর উপন্যাসের স্তম্ভ বিশেষ। তবে সে ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। লালসালু উপন্যাসের প্রথম দিকেই একটি বৃদ্ধ পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই আমরা, তাকে তাহেরের বাবা বলে পরিচিত করানো হয়েছে। নামবিহীন এ বৃদ্ধটিকে অল্প সময়ের জন্য আমরা পাই কিন্তু তার ঐ অল্পক্ষণের অবস্থিতিই পাঠকের মনে গভীরভাগে দাগ কেটে যায়। বুড়ো লোকটি বদরাগী এবং জেদী এককালে সে স্বাভাবিক এবং বুদ্ধিমান মানুষই ছিল। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে জোতজমি নিয়ে মারামারি ও মামলা মোকদ্দমা করে শেষ বয়সে সে সব দিক দিয়ে নিঃস্ব। তার তিন ছেলে সংসারের আয় বাড়াতে পারে না। ফলে দারিদ্র্যের পীড়ন সর্বক্ষণের সঙ্গী। বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে তার অষ্টপ্রহর কলহ কখনও কখনও সে স্ত্রীকে প্রহারও করে। তার সংসার একটি দোজখ বিশেষ। স্বামীর অত্যাচার অসহ্য হলে বৃদ্ধা স্ত্রী স্বামীকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করে। এক পর্যায়ে সে স্বামীর পুরুষত্ব নিয়েও কটাক্ষ করে জানায় যে তার সন্তানেরা বৃদ্ধের ঔরসজাত নয়। ঘটনাটি এমনই কুৎসিত যে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা একটা বিহিত প্রার্থনা করে মজিদের কাছে। যথাসময়ে সামাজিক বিচার বসে এবং তাহেরের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। জানতে চাওয়া হয় যে তার বৃদ্ধ স্ত্রী তাকে কী বলে থাকে। তাহেরের বাপ মুখ খুলতে চায় না। তার

পারিবারিক কথা বাইরে কেন বলতে যাবে। কিন্তু যখন জানতে পারে যে বাইরের লোকদের কাছে ঐসব কথা জানাজানি হয়ে গেছে এবং তাতে তার নিজের মেয়ের ভূমিকা প্রধান, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেয়েকে ধরে পিটায়। তাতে পুনরায় বিচার বসে এবং মজিদ বুড়োর মনের ভেতরে যেখানে ক্ষত সেইখানে খুঁচিয়ে তার পৌরুষের অহমিকা ধূলিসাৎ করে দেয়।

বুড়ির কথা সত্য কি না এ প্রশ্ন বার বার করা হলে সে ক্রুদ্ধ জবাব দিয়ে বলে– 'বুড়ি মাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়– তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল মোহরত দিমু' আর মেয়েকে ঠেঙানোর কথা তোলা হলে সে সোজাসুজি জবাব দেয় যে তার মেয়েকে সে ঠেঙিয়েছে তাতে অন্যের কী? বলা বাহুল্য বৃদ্ধ লোকটির ব্যক্তিত্ব পৌরষ দীপ্তই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। মজিদ দোয়া দরুদ পড়ে, সুরা আবৃত্তি করে। চাপ প্রয়োগ করে বুড়োকে দিয়ে মেয়ের কাছে মাফ চাওয়ায়। কিন্তু তারপর গৃহত্যাগ করে যে কোথায় যায় তার হদিশ আর কেউ পায় না। বোঝা যায়, লেখক এ বৃদ্ধটিকে দিয়ে ভূমিলগ্ন তৃণমূলের মানুষের চরিত্রগত দৃঢ়তাটি কেমন তা দেখাতে চেয়েছেন। তাহেরের বাপ অবশ্যই একটি প্রতিনিধি চরিত্র।

প্রতিনিধিত্বশীল আর এক চরিত্র খালেক ব্যাপারী। সে ভূস্বামী এবং এ সুবাদে গ্রামের সামাজিক নেতৃত্বও তারই কাছে। উৎসব পার্বন, ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা গ্রামের সকল ক্রিয়াকাণ্ডই চলে মাতব্বরের নির্দেশে। মহব্বতনগর গ্রামে এসে মজিদ প্রথমে খালেক ব্যাপারীর বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। ক্রমে মজিদ মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত করে। কিন্তু এ ব্যাপারে খালেক ব্যাপারী কখনোই বিরোধিতা করে নি।

এই-ই নিয়ম। সামন্তবাদী ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেই সমাজে ভূমির মালিকদের সঙ্গে ধর্মীয় পুরোহিতদের পরস্পর নিবিড় সম্পর্ক থাকবার কথা। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খালেক ব্যাপারী জানে, "অশান্ত অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটা পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমিজোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক। "ভূমি মালিকদের শোষণ ও অপকর্মের দোসর ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীরা। তারা মানুষের মনের ভেতরকার কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস জিইয়ে রাখে মানুষের চেতনাকে বিকশিত হতে দেয় না, অধিকার বোধ জাগ্রত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে আর তা করে বলেই জমির মালিকরা জমিহীন কৃষকদের যথেচ্ছ শোষণ করতে পারে। সুতরাং খালেক ব্যাপারী এবং মজিদের সম্পর্ক খাপে খাপে মিলে থাকবার, বিচ্ছিন্ন হবার নয়। তাই মজিদের কোন কাজেই সে বাধা দেয়নি, বরং মজিদ যা করেছে তার সবই সে সমর্থন করেছে। এক পর্যায়ে দেখা যায় সে মজিদকে ভয় পেতে শুরু করেছে। তার পরামর্শে সে প্রথমা স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিয়েছে।

এদিক দিয়ে দেখলে খালেক ব্যাপারীকে দুর্বল চিত্তের লোকই বলতে হবে। কারণ নিয়ম হল এই যে, সামন্ত প্রভুর অনুগত হবে পুরোহিত। খালেক ব্যাপারীর চরিত্রে আমরা দৃঢ়তা কখনোই লক্ষ্য করি না। বরঞ্চ দেখি, প্রায় সব ক্ষেত্রেই মজিদের কথার সুরে তাকে সুর মিলাতে। খালেক ব্যাপারীর চরিত্রের অবস্থান উপন্যাসের প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত থাকলেও তার ভূমিকা কখনোই সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে নি। লেখক এ চরিত্রটির যথাযোগ্য বিকাশ ঘটাতে পেরেছেন এমন কথা আমরা বলতে পারি না।

লালসালুর দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে, দুটিরই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমা– স্বামীর চিন্তা ও কর্মের নিঃসন্দিগ্ধ সমর্থক। স্বামী যা করে এবং বলে সবই অবশ্য করণীয় বলে সে মনে করে। মজিদ বিয়ের পর থেকেই তার হাঁটা-চলা, কথাবলাসহ সকল ব্যাপারে তাকে শাসন করে এবং সেই শাসন নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। তার সন্তান না হওয়ার ব্যাপারেও স্বামী যা বলে তাই সে বিশ্বাস করে। তার বৌ-এর নাকি চৌদ্দটি বেড়ি আছে যার কারণে সে মা হতে পারবে না। সাতটি পর্যন্ত বেড়ি থাকলে তা সরানো যায়, তার বেশি পারা যায় না। এ কথাটি যেহেতু স্বামী মজিদ জানায়, সেহেতু এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, কারণ তার স্বামী খোদার লোক এবং সে-ই জানতে পেরেছে যে খোদার ইচ্ছায় ঐ চৌদ্দ বেড়ির বন্ধন তার পেটে যার অন্য কোনো প্রতিবিধান নেই। তার হৃদয় স্নেহ মমতায়পূর্ণ দুঃস্থ-দরিদ্র প্রতিবেশী গ্রামবাসীর বিপদ ও ক্লেশ মুক্তির জন্য সে নামাজ শেষে প্রতিদিন মোনাজাত করে। স্বামী মেয়ের বয়সী একটি মেয়েকে বিবাহ করে ঘরে আনলে তাকে সে পরম স্নেহে বুকে টেনে নেয় এবং তাকে মেয়ের মতোই ভালবাসে। হাসুনীর মায়ের দুঃখের সমব্যথী শুধু সেই। অন্য কেউ নয়। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী সন্তান কামনায় রোজা রেখে মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাকেই ছুটে যেতে দেখা যায়। পরিশেষে দেখা যায় তার মাতৃত্বের অনুভূতি তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব দান করে। যখন প্রাণধর্মে উচ্ছল জমিলাকে অন্যায়ভাবে শাসন করতে আরম্ভ করে মজিদ, তখন থেকেই তার মন জমিলার দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করে। জমিলাকে মজিদের ক্রোধ থেকে আড়াল করে

রাখে সে। স্বামীর দিকে কখনো সে মনের ভেতরে প্রশ্ন নিয়ে তাকায় নি। কিন্তু যখন দেখে মজিদ তরুণী স্ত্রীর প্রাণধর্মের সহজ উচ্ছ্বলতা মেনে নিতে চায় না, তখনই মজিদের প্রতি সর্বাঙ্গীন আনুগত্য সে আর অটুট রাখতে পারে না। জমিলাকে চূড়ান্ত শাস্তি দেয়ার জন্য যখন অন্ধকার মাজার ঘরে একাকী বেঁধে রাখে, তখন আর নিজেকে সে সংযত রাখতে পারে না। একই সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হলে তাকে নামাজ পড়তে বলা হয়। কিন্তু স্বামীর সেই নির্দেশ সে উপেক্ষা করে। শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে একথা মজিদ স্মরণ করিয়ে দিলে সে স্বামীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে পরিস্কার গলায় বলে, 'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভেতরে।'

"যে রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়" সেই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না। রহীমা বরং স্বামীকেই হুকুম করে।

এভাবে শাসন আর শৃঙ্খলার কঠিন নিগড়ে বাঁধা যান্ত্রিক আচরণে অভ্যস্ত একজন নারী অনুভূতি ও প্রকাশ ক্ষমতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবী হয়ে ওঠে।

জমিলা বয়সে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণী, তাকেই প্রায় বৃদ্ধ মজিদ বিয়ে করে আনে। কেন এ কাজ করে মজিদ সেটা পরে নিজেও খুঁজে পায় নি। হতে পারে তার পিতা হবার সাধ হয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে উচ্ছ্বল, প্রাণময় তারুণ্যকে বন্দী এবং পীড়ন করার কোন বাসনা তার অবচেতনায় কাজ করেছিল। যেভাবেই হোক সে জমিলার উচ্ছ্বাস, হাসি, চাঞ্চল্য, ঘরের বাইরের দিকে তাকানো এসব ব্যাপারে শাসন করতে শুরু করে। একদিন জিকিরের আসর বসানো হয় এবং ঐ জিকিরের আসর চলা সময়ে জমিলা সম্মিলিত আওয়াজে ঘোরগ্রস্ত হয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। এ ঘটনায় মজিদ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে শাসন করে তাকে অন্ধকার মাজার ঘরে এক খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে।

জমিলা প্রথমে নীরব প্রতিবাদ জানাত। যখন নির্যাতন বেড়ে গেল তখন সে সরব হল এবং নির্যাতন অসহ্য হলে সে ঘৃণা প্রকাশ করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে সে মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং শোষণের স্তম্ভ বিশেষ যে মজিদ যে আওয়ালপুরের পীর সাহেবকে গ্রামছাড়া করেছে, স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী তরুণ আক্কাসকে যে গ্রাম থেকে তাড়িয়েছে, অশেষ ক্ষমতাবান খালেক ব্যাপারী যার হাতের পুতুলের মতো, সেই মজিদের সকল প্রতাপ, দম্ভ, অহমিকা সবই অর্থহীন হয়ে যায় তরুণী জমিলার বিদ্রোহের ফলে। জমিলা চরিত্র যে বাংলা সাহিত্যে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি সৃষ্টি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস হলেও এ উপন্যাসেই তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৫ : রহীমা চরিত্র বিশ্লেষণ করুন, এবং লালসালু উপন্যাসে এ চরিত্রের গুরুত্ব কতখানি উল্লেখ করুন।

উত্তর : রহীমা 'লালসালু' উপন্যাসে অন্যতম প্রধান চরিত্র। কারণ নায়ক মজিদের সে প্রথম স্ত্রী এবং উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি। তবে শক্তিময়ী লম্বা-চওড়া এ রমণীকে তার সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে দেখা যায় না। লেখক নিজেই বলেছেন– "তার শক্তি তার চওড়া দেহ–তা বাইরের খোলসমাত্র, আসলে সে ঠাণ্ডা ভীতু মানুষ" তার এ ঠাণ্ডা ও ভীতু স্বভাবেরও আবার কারণ আছে, আর তা হলো, "মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়"– কেন না "শীর্ণ মানুষটির (মজিদ) পেছনে সে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।"

ফলে প্রথম থেকেই সে স্বামীর একান্ত অনুগত। স্বামী তাকে ধীর পায়ে নিঃশব্দে হাটতে বললে, সে তা-ই করে, আস্তে কথা বলতে বললে সে প্রতিবাদ করে না এবং মাজার সম্পর্কে ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা যা যা বলে সবই সে যেন নির্বিকারে বিশ্বাস করে। রহস্যময় মাজারটির অলৌকিক একটি শক্তি আছে বলে তার অন্ধবিশ্বাস। আর এ সুবাদেই তার ধারণা, যে তার স্বামী মজিদ একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ–পৃথিবীর কোনো সমস্যার সমাধান তার অসাধ্য নয়। এ রকম ধারণা ও বিশ্বাসের কারণেই তার দৈনিক সাধনা ছিলো কী ভাবে সে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই সে মহব্বতনগর গ্রামের অন্তঃপুরগুলিতে মজিদের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত করে নেয়।

রহীমার দৈহিক শক্তি বিপুল, সাংসারিক কাজে-কর্মেও সে অসাধারণ পারদর্শী। কিন্তু এ বিপুল শক্তি ও পারদর্শিতা তার মনে স্বাতন্ত্র্যের কোনো চেতনা জাগায় না। স্বামীর আদেশ পালন এবং তার মনকে তুষ্ট রাখা ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ আছে বলে সে মনে করে না।

কিন্তু সে-ও মানুষ এবং মেয়েমানুষ। নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে, কিন্তু তার কোলে সন্তান নেই, এ মর্মবেদনার ভার তাকে বহন করতে হয় সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মাতৃস্নেহ, স্বাভাবিক প্রতিবেশী সুলভ সৌজন্য, দরিদ্র ও ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি মায়া-দয়া– এসব মানবিক গুণাবলী ও তার মধ্যে যথেষ্টই দেখা যায়। হাসুনীর মায়ের দুঃখের সমব্যথী একমাত্র সে-ই, আর কেউ নয়। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী সন্তান কামনায় রোজা রেখে মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য রহীমাকেই আমরা ছুটে আসতে দেখি, নারীর জীবনে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা ও ঈর্ষার পাত্রী তার সতীন, কিন্তু সেই সতীনকে সে গভীর স্নেহ-মমতায় জড়িয়ে ধরে। কিশোরী বধূ জমিলাকে কাছে পেয়ে তার তৃষাতুর মাতৃহৃদয় তৃপ্তির সন্ধান পেয়ে যায়। জমিলার নানান দোষত্রুটি, নানান ছেলেমানুষী, মজিদের সংসারে বেমানান নানান আচরণ—সবই সে ঢেকে রাখে।

তবু আমরা জানি তার অস্তিত্বের সমস্তটাই ছিলো এক রকমের নিঃশর্ত আনুগত্য। তার ব্যক্তিগত সুঃখদুঃখ, সংসারের চিন্তা জীবন-যাপন সবার ঊর্ধ্বে ভেবে নিয়েছিলো স্বামীর শাসন এবং নির্দেশকে। বলা যায় নিজের সত্য পরিচয়টাও তার অজানা ছিলো। কিন্তু তার মাতৃত্বের অনুভূতি তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে দেয়। যখন দুর্বিনীত জমিলাকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করে মজিদ তখনই তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে। তখনো স্বামীর দুর্বলতা তার চোখে ধরা পড়েনি। প্রাণধর্মের সহজ উচ্ছলতা দেখে মজিদকে চিন্তিত হতে দেখে সে বুঝে যায় কোথায় মজিদের দুর্বলতা। কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রকাণ্ড দেয়ালটা তার মনের ভেতরে আর অটুট থাকে না, মজিদ সম্পর্কে যে রহস্যময়তা ছিলো, ভয় ছিলো তাও যেন তার কতকাংশে কেটে যায়। এ অবস্থায় বরং মজিদের প্রতি তার মায়া হয়। ঐ মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হলে তাকে নামায পড়তে বলা হয়, কিন্তু স্বামীর সেই নির্দেশ সে উপেক্ষা করে। ঐ মুহূর্তটিতে মাজার ঘরের অন্ধকারে বেঁধে রাখা জমিলার জন্যেই তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে একথা মজিদ স্মরণ করিয়ে দিলে, রহীমা যেন গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে–

'ধান দিয়ে কি হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভেতরে।'

আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি, "যে রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়" সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।" রহীমা বরং স্বামীকেই হুকুম করে। রহীমার এ শক্তি আসে কোন উৎস থেকে? আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উৎস একটাই– আর সেটা হলো মানবিক প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মের প্রেরণাতেই তার মনে মাতৃত্বের জাগরণ এবং সেই মাতৃত্ববোধই তার ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়েছে। তার এ অনুভূতি বেরিয়ে এসেছে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং ভয়ের প্রাচীর চুরমার করে। এদিক থেকে রহীমা জমিলা চরিত্রের পরিপূরক বলে মনে করা যেতে পারে। মজিদ, জমিলা, তাহেরের বাবা এসব চরিত্র আসলেই টাইপ চরিত্র। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় মানসিক উত্তরণের যে একটি ব্যাপার থাকে উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বাদে 'লালসালু' উপন্যাসের প্রায় সকল চরিত্রেই সেটি অনুপস্থিত। এ উজ্জ্বল ব্যতিক্রমটি হচ্ছে রহীমা। মানব জীবনে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চালু থাকবে এ সত্যটিকে সে ধারণা করে আছে। সে-ই প্রমাণ করে যে, জমিলারা নিঃশেষিত হয়ে যায় না, তারা রহীমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে এবং সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৬ : লালসালু উপন্যাসে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

উত্তর : শহর ও নগরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনের ঘাতসংঘাতময় এবং প্রেম প্রীতিপূর্ণ বিষয়গুলির সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের একটি সহজ যোগাযোগ আছে। এ যোগাযোগ বাংলা উপন্যাসের উভয় কাল থেকেই। তাই বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন নানাভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, শহর বা নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমগ্র বাংলার জনসংখ্যার অতিক্ষুদ্র একটি অংশ। তাই ঐ ক্ষুদ্র শ্রেণীর জীবনযাপনের চিত্র সমগ্র বাংলার মানুষের জীবন যাপনের প্রতিফলন থাকা সম্ভব নয় এবং তা কখনও থাকেও নি। শতকরা আশি জনেরও বেশি লোক থাকে গ্রামে সেখানেই তাদের বাঁচা-মরা এবং জীবন যাপন। সেই সমাজে এমন সব রীতিনীতি ও ধারণা বিশ্বাস জন্মলাভ করে কায়েমী স্বার্থের দ্বারা লালিত হয়, যুগ যুগ ধরে চালু থাকে যা শহরবাসী শিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তা চেতনার অধিকারী মানুষের কাছে একেবারেই

অকল্পনীয় ব্যাপার বলে মনে হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর লালসালু উপন্যাসের পটভূমি চরিত্র, বিষয় সবই নিয়েছেন গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা থেকে। 'লালসালু'র পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজ, তার চরিত্র, একদিকে দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসী ধর্মভীরু শোষিত সাধারণ মানুষ আর অন্যদিকে শঠ, প্রতারক ধর্মব্যবসায়ী এবং শোষক ভূস্বামী। আর তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগ-যুগ ব্যাপী শিকড় গাড়া কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।

'লালসালুতে' প্রত্যক্ষ বাস্তবই প্রধান উপাদান। লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান, যেখানে যুগ-যুগ ধরে মানুষের মনের চারিদিক ঘিরে আছে অসম্ভব শক্ত এবং অদৃশ্য একটি বেষ্টনী, মানুষের চিন্তা এবং কল্পনা যার বাইরে যেতে পারে না এবং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেতেও চায় না। মানুষ সেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য এবং ঈশ্বর প্রদত্ত বলে মেনে নেয়। অলৌকিকে তাদের অগাধ বিশ্বাস। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা দৈবশক্তির লীলা দেখতে পায়। আর তাতে, হয় ভয় পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখে নইলে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে একেবারে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে এলাকা নিয়ে লালসালুর পটভূমি সেখানে শস্যের চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি আর ন্যাংটা থাকতেই বাচ্চাদের আমসিপারা শেখানো হয়। শস্য যা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। মানুষের মধ্যে কেবলই কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস সেই সঙ্গে আছে তার অনিবার্য পরিমাণ ভীতি এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ, গেলে তার বিবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। লেখক যেখানে সেটি এমনই এক সমাজ, যেখানে কেবলই শাসন আর শোষণ দেশের দশের এবং সামগ্রিক জীবনের। শঠতা ভণ্ডামী আর কূটকৌশলের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শিকড় সমাজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিছানো। আর ঐসব শিকড় দিয়ে জীবনের সকল প্রাণরস, অর্থাৎ তার বিকাশের সম্ভাবনা, তার হাসি-আনন্দ, তার জীবন সংগ্রামের উদ্যম সব কিছুই প্রতি নিয়ত শুষে দেয়া হয়। এবং এ কাজে ভূস্বামী জোতদার এবং ধর্মব্যবসায়ী একজন আর এক জনের সহযোগী। কারণ স্বার্থের ব্যাপারে তারা একাট্টা– পথ তাদের এক। একজনের আছে মাজার, একজনের আছে জমিজোত প্রভাব প্রতিপত্তি।

মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের দৃশ্যটিই ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচায়ক। মাছ শিকারের সময় তাহের ও কাদের দেখে যে মতিগঞ্জ সড়কের উপর মোনাজাতের ভঙ্গিতে একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখা যায়, ঐ লোকটিই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষদের তিরস্কার করছে কারণ তারা একজন বুজর্গ মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে অবহেলা করে ফেলে রেখেছে। সে অলৌকিকতার অবতারণা করে জানায় যে মোদাচ্ছের পীরের স্বপ্নাদেশে এ গ্রামে এসেছে এবং এখন থেকে সে উক্ত পীরের মাজার দেখা-শোনার দায়িত্ব নেবে। তার ঐ তিরস্কার ও স্বপ্নাদেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধা তার হুকুম পালন করে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড় সংলগ্ন কবরটি পরিস্কার ও মেরামত করে ঝালরঅলা লালসালুতে ঢেকে দেয়া হয়। তারপর আর দেখতে হয় না– কবরটি অচিরেই মাজার হয়ে ওঠে এবং যথারীতি সেখানে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বলে, ভক্ত আর কৃপাপ্রার্থীরা টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন।

ধর্ম ব্যবসায়ীদের এ প্রক্রিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা গ্রামাঞ্চলে বহুকাল ধরে বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ্রামীণ সমাজের এ দিকটি যথার্থভাবেই তুলে ধরেছেন।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মজিদ ঘরবাড়ি ও জমিজমার মালিক হয়ে বসে এবং শক্ত সমর্থ দেখে একটি বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে এবং স্ত্রী রহীমাকে সর্বাংশে অনুগত করে রাখতে তার দেরি হয় না। স্বামী যা বলে, রহিমা তাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। তার স্বামী অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং খোদার লোক একথা সেতো নিজে বিশ্বাস করে-ই অন্যের মনেও সে একই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে।

গ্রামের মধ্যে ধর্মকার্যের ব্যাপারেই মজিদ নিজের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারও তাকে উপদেশ- নির্দেশ দিতে দেখা যায় এবং গ্রাম্য বিচার সালিশীতে তার ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে। এমন কি গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে সে বাকি রাখে না। তাহেরের বাপের পারিবারিক কর্তৃত্ব নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে। রাগ হওয়াতে নিজের মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিল বলে তাকে মেয়ের কাছে মাপ চাওয়ার জন্য হুকুম দেয় এবং সেই সঙ্গে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি দিতে বলে। খালেক ব্যাপারীর প্রথমা স্ত্রী আমেনা সন্তান কামনায় মজিদের শরণাপন্ন হলে ব্যাপারীকে বোঝায় তার স্ত্রীর পেটে বেড়ি পড়েছে এবং সেই বেড়ি খোলার জন্য তাকে সেহরী না খেয়ে

রোজা রেখে মাজারের চারদিকে পাক দিতে হবে সাতবার। কিন্তু নিয়ম পালন করতে গিয়ে আমেনা জ্ঞান হারায়। কিন্তু তবু মাজার এবং মাজারের চালক ব্যক্তিটির প্রতি আমেনা বা তার স্বামী কারুরই কোন অভিযোগ ওঠে না।

আক্কাস নামে এক যুবক ঐ গ্রামে ইস্কুল বসানোর আয়োজন করলে মজিদ এমনই কূট-কৌশল প্রয়োগ করে তাকে নিরস্ত করে যে তারপর আক্কাস গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে একের পর এক ঘটনা এবং মানুষের আচরণের মধ্য দিয়ে গ্রামের সমাজ ও মানুষের জীবন যাপনের বাস্তব চিত্র লালসালু উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর সেই কারণে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন- এ রচনাটিকে বাংলাদেশের একটি সামাজিক দলিল নামেও আখ্যায়িত করা যায়।

প্রশ্ন-৭ : লালসালু উপন্যাসে নায়ক কে? তার চরিত্রের একটি পরিচয় দিন।

উত্তর : লালসালু উপন্যাসের নায়ক মজিদ। শীর্ণ দেহ এ ধূর্ত মানুষটির মহব্বতনগর গ্রামে আগমনের ঘটনাটি নাটকীয়। নিজেকে মানুষের চোখে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজের ঈশ্বরপরায়ণতা দেখাবার জন্য সে প্রথম থেকেই তৎপর। তাকে প্রথম দেখে তাহেরও কাদের নামে দুই মাছ শিকারী ভাই। তখন সে "মতিগঞ্জ সড়কের উপরেই আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।" ঐ একই লোককে তারা পরে দেখতে পার মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে, সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে সমবেত গ্রামবাসীকে ভর্ৎসনা করছে। কারণ তারা এক বুজর্গ পীরের মাজার অনাদর এবং অবহেলায় ফেলে রেখেছে। তার গালাগালের প্রতিবাদ কেউ করে না, বরং সবাই লজ্জায় মুখ নিচুকরে রাখে। ঐ সময় মজিদ জানায় যে মোদাচ্ছের পীরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে সে এ গ্রামে এসেছে। মাজারটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন থেকে তার। গ্রাম প্রান্তে বাঁশ ঝাড়ের পাশে ভগ্নাবস্থার কবরটি সে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সংস্কার করে, জায়গাটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলে এবং কবরটিকে রূপালি ঝালরঅলা লালসালু দিয়ে ঢেকে দেয়। ফলে জায়গাটি সুন্দর মাজারের মতো হয়ে ওঠে। এ ভাবেই মজিদ গ্রামবাসীর মনে শ্রদ্ধা ও ভীতি সঞ্চার করে নিজের স্থান করে নেয়।

জমিজমা বাড়িঘরের মালিক হতে তার দেরি লাগে না। লম্বা চওড়া একটি বিধবা যুবতীকে সে বিয়েও করে ফেলে। স্ত্রী রহীমা শক্তিমতী হলেও শীর্ণ দেহ প্রৌঢ় স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির অন্ত নেই। কারণ লোকটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারের ছায়াটিকে সর্বক্ষণ দেখতে পায়।

শুধু রহীমা নয়, ছায়াটিকে গ্রামবাসী সকলেই দেখতে পায়। ফলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য ভয় ও শ্রদ্ধার ইচ্ছা ও বাসনা সবই চলে যায় ঐ মাজারটির প্রতিনিধি মজিদের নিয়ন্ত্রণে। সে প্রথমেই বৃদ্ধ তাহেরের বাবাকে এমন এক বিপাকে ফেলে যে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার দ্বিতীয় কাজ, আওয়ালপুরের পীর সাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা। ব্যাপারটি রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায় এবং পীর সাহেবকে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরন করতে হয়। তার তৃতীয় কাজ খালেক ব্যাপারীর সন্তানকামী প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ানো। আর তার চতুর্থকাজ, আক্কাস নামক একটি নবীন যুবক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলে তাকে এমনভাবে বিদ্রূপ করে ধমক দিয়ে শাসন করে যে সে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। এ ভাবেই মজিদ তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা নিরঙ্কুশ করে।

বলা বাহুল্য এসব ঘটনা বাইরের সমাজের। কিন্তু তার পারিবারিক জীবনে একটি সংকট তৈরি করে সে অল্প বয়সী মেয়ে জমিলাকে বিবাহ করে। জমিলা চঞ্চল সহজ ও হাসি খুশি স্বভাবের সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে এমন একটি মেয়ে। বন্ধ্যা সতীন রহীমার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায় স্নেহ-মমতার। মজিদ তার চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বলতা শাসন করতে চায়, কিন্তু পারে না। জমিলার উপর বল প্রয়োগ করতে গেলে সে বিদ্রোহ করে এবং চরম ঘৃণায় স্বামীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। এ ঘটনাটি মজিদকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সে প্রচার করে যে জমিলার ওপর জ্বীনের আসর হয়েছে। জমিলাকে এজন্য সে মাজারের ঘরের অন্ধকারে একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখে। ইতিমধ্যে শুরু হয় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। রহীমা জমিলার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দোয়া দরুদ পড়ার কথা বললে সে মজিদের সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে। বোঝা যায়, মজিদের প্রতিষ্ঠার ভিতে এতো দিনে ফাটল ধরেছে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে ঘটনা বিন্যাসের ভূমিকা। যতোখানি না-তার চাইতে চরিত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা অনেক বেশি। 'লালসালু' এদিক দিয়ে চরিত্র নির্ভর উপন্যাস। আর একটিই এ উপন্যাসের চরিত্র যাকে লেখক বরাবর অনুসরণ করেছেন। দেখা যায়, যতো কিছু ঘটে এবং তাতে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সমস্ত কিছুর পশ্চাতে প্রত্যক্ষে হোক, পরোক্ষে হোক মজিদের নিয়ন্ত্রণ। মানুষের ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে

শুধু নয়– তার সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রেও মজিদের প্রবল উপস্থিতি। তাহের-কাদেরের বাবাকে সে প্রায় পাগল বানিয়ে ফেলে। খালেক মাতব্বরের সঙ্গে তার স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধা। খালেক ব্যাপারীর সাধ্য নেই যে সে সন্তান কামনায় অস্থির স্ত্রীর বন্ধাত্ব ঘোচাবার জন্য আউয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পড়া পানি এনে খাওয়ায়। বরং সে নিজেই এমন অনুগত হয়ে পড়ে যে মজিদের কথামতো দীর্ঘকালের দাম্পত্য জীবনকে অস্বীকার করে নিজের স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে মজিদ। প্রথাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়, প্রভু, হতে চায়, চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে। এজন্য সে হেন কাজ নেই যা করে না। নিজেরই ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সে একেকবার ভাবে, মাজার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কুটিল কৌশল অবলম্বন করেছে– সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু এসব চিন্তা তার ক্ষণিকের। সজ্ঞানে সে প্রতারণা করে– কিন্তু তার মানে এ নয় যে সে ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস তার দৃঢ় – এবং সে মনে করে, প্রতারণা ভণ্ডামি যে ভাবেই হোক, মাজার এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে তার টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠার উপর আঘাত কোনদিক থেকে আসতে পারে সে বিষয়ে সে সজাগ। সে জানে, স্বাভাবিক প্রাণধর্মই তার শাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসীরা আনন্দে গান গেয়ে ওঠে তখন সেই গান তাকে বিচলিত করে দেয়। সে ঐ গান বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রহীমার স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় সে বাধা দেয়। আক্কাস আলী স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত অপমানিত করে তাকে গ্রাম থেকে বিদায় করে দেয়। কেন করে সে এসব? করে নিজের প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে মজবুত করার জন্যে। এ সবই তার হিসেবী বুদ্ধির কাজ। অর্থাৎ তার আগমন অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠা প্রতি পর্যায়েই হিসেব মতো চলে সে।

প্রশ্ন উঠতে পারে মজিদের মধ্যে কি স্বাভাবিক মানবিক আবেগ অনুভূতি নেই? সে শুধু কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, স্বার্থপরতা আর শোষণের প্রতিভূ? আমরা দেখি, মজিদ পুরোপুরি প্রতীক চরিত্র নয়। তার কামনা বাসনা আছে। অল্পবয়সী মেয়েকে বিবাহ করে সে– খালেক ব্যাপারীর বউয়ের নরম সুন্দর পা দেখে তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে– দুর্বিনীতা তরুণী স্ত্রী তার মুখের ওপর থুথু দিলে সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়। এসব কারণেই মজিদ চরিত্রটি হয়ে উঠেছে মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তীব্র হয়ে উঠতে দেখি। মৃত প্রায় জমিলাকে মাজার ঘর থেকে নিয়ে আসার পর রহীমা তার শুশ্রূষা আরম্ভ করে– পরম স্নেহে জমিলার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। ঐ দৃশ্যটি মজিদের মনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। মজিদের মনে হয় 'মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে। একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্যে প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্ম-বেদনার তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে সে মনে মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে। অর্থাৎ মজিদ সংস্কার ও স্বার্থের বন্ধনমুক্ত প্রাণময় জীবনের কাছাকাছি পৌঁছে জন্মবেদনার তীব্র যন্ত্রণাটি পর্যন্ত অনুভব করে– কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবজন্ম হয় না তার। কুসংস্কার ভীতি আর মিথ্যার অদৃশ্য দেয়ালের ভেতরেই থেকে যেতে হয় তাকে। মানবিক মমত্ববোধের দৃশ্য তার মনের উপরকার মিথ্যা পাথরটিকে টলিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত উৎখাত করতে পারে না। মজিদ থেকে যায় তার জীবন বিরোধী শোষক এবং প্রতারকের ভূমিকায়।

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মজিদ আসলে ভয়ানক নিঃসঙ্গ । তার কোন আপনজন নেই। কারণ যার যার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়, তারা সবাই তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার শিকার অথবা সহায়ক। সম্পর্কটা সর্বদাই বাইরের প্রয়োজনের, কখনোই অন্তরের নয়। সে কখনোই সৎ এবং আন্তরিক হতে পারে না– কারণ সে জানে, আন্তরিক হলেই তার সত্য স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়লেই তার দুর্বলতা, তার ভণ্ডামি, তার মিথ্যাচার সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে আর তাতে তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিতটি ধসে যাবে। যার অর্থ তার নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। তাই কোন কোন দুর্বল মুর্হূর্তে মনের আবেগ প্রকাশ হওয়ার উপক্রম হলেই সে তা দমন করে। তার এ বিচিত্র আচরণের কারণেই সবাই তাকে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অলৌকিক পুরুষ বলে মনে করে। সে নিজেও সুকৌশলে কথাবার্তা এবং আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের অলৌকিক ব্যক্তির ইঙ্গিত দিয়ে এসেছে বরাবর। ফলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আন্তরিক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না কখনোই। এএকি নিজের স্ত্রী সঙ্গে কথা বলার সময়ও তাকে গাম্ভীর্যের মুখোস এঁটে থাকতে হয়। তার এই তৈরি আবরণটি এতোই শক্ত যে তা ভেদ করা কারো পক্ষেই কখনো সম্ভব হয় নি।

তবু সে যে আসলেই দুর্বল এবং নিঃসঙ্গ, এ সত্যটি একেবারে গোপন থাকে না। তার আভাস ধরা পড়ে রহীমার কাছে। জমিলাকে শাসনে রাখার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কী ভাবে প্রাণধর্মে উচ্ছল ও দুর্বিনীতা তরুনী বধূটিকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখবে সেই চিন্তায় সে দিশেহারা বোধ করে এবং জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,

'—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জানাই, তুমি কও?'

ঐ ঘটনাতেই রহীমা যেন বুঝতে পারে তার স্বামীর দুর্বলতা কোথায় এবং তখন ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্রটি হয়ে যায় তার কাছে করুণার পাত্র। এরপর যদিও সে জমিলার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে— কিন্তু তখন আর তার সেই প্রতিষ্ঠিত সংকল্পবদ্ধ নির্বিকার আচরণ নেই। জমিলা তার মুখে থুথু দিলে সে ক্ষেপে ওঠে। এ ক্ষিপ্ততা যতোখানি না তার পৌরুষের প্রতি অপমানের কারণে, তার চাইতে বেশি তার মনের ভেতরকার ভয়ের কারণে। সে জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজার ঘরে এনে ধপাস করে বসিয়ে দেয়। "তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দূরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরের আকাশ নীরব কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যতো অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বস থেকে বাঁচার তীব্র ব্যাকুলতা।"

মজিদ চরিত্রের এ দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়ায় একটি বিষয় আলোকিত হয়ে ওঠে যে মজিদ শেষ পর্যন্ত মানুষই, যদিও শেষ পর্যন্ত সে মানবতার পক্ষে আসতে পারে না, দয়ামায়া ও স্নেহমমতায় প্রাণধর্মের বিপক্ষেই থেকে যায়, তবু সে মানুষই। তবে কেমন মানুষ? না মানবতা বিরোধী মানুষ। যে পক্ষ মানুষের বিকাশের অন্তরায়, সেই পক্ষের মানুষ। রহীমার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়লেও রহীমা তার নির্দেশ অমান্য করলেও ভণ্ডামি ও কুসংস্কার দিয়ে বাঁধানো নিজের প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে সে শেষ পর্যন্ত অটুট রাখার চেষ্টা করে। ফলে মজিদ চরিত্র মানবিক হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো প্রকার উত্তরণ ঘটে না। উপন্যাসের প্রথমে যে মজিদের আবির্ভাব হয়েছিল, মধ্যবর্তী অবকাশে, নানাবিধ ঘটনা ঘটাবার পরও উপন্যাসের সমাপ্তিতে সে সেই মজিদই থেকে যায়। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বলা যায় 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্র মানবতাবিরোধী শক্তির যথার্থ প্রতিভূ। তার দয়া নেই, মায়া নেই, ভালবাসা নেই— এক কথায় কল্যাণকর ও মঙ্গলময় কোনো প্রাসঙ্গিকতাকেই তার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। সে কুসংস্কারের অকল্যাণ এবং শোষণের যুগযুগান্তর ব্যাপী চালু প্রক্রিয়াটির ধারক বাহক এবং রক্ষক — সে একাকী, মানবিক দায়বিহীন, নিঃসঙ্গ একটি অস্তিত্ব।

প্রশ্ন-৮ : লালসালু উপন্যাসে নায়িকা কে? তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান।

উত্তর : লালসালু উপন্যাসের নায়ক চরিত্র নিঃসন্দেহে মজিদ। কিন্তু নায়িকা চরিত্র কে? এ প্রশ্নের জবাব আমাদের বিবেচনা করে দিতে হয়। কারণ যেহেতু উপন্যাসের প্রায় সমগ্র বিস্তৃতি জুড়ে মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমার অবস্থান এবং মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তার একটি সহায়ক ভূমিকা আছে সেইহেতু তাকেই উপন্যাসের নায়িকা বলে আমাদের মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরতর বিবেচনায় দেখা যাবে জমিলার গুরুত্ব অনেক বেশি। যদিও তার আবির্ভাব উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বয়সে সে নিতান্তই কিশোরী, তবু সে-ই পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করে বেশি। মজিদের জীবনবৃত্তে কোনো প্রতিপক্ষ আমরা লক্ষ্য করিনা। মজিদকে কেউ বিচলিত করতে পারে নি কখনো। কিন্তু আমরা দেখি এ কিশোরী বধূটিই মজিদকে ভীত, উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার এবং তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিত ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়। কাহিনী বিন্যাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবতারণার জন্যে এমন একটি চরিত্র অপরিহার্য ছিলো একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। সর্বোপরি বলা যায় জমিলা চরিত্রের আবির্ভাব না ঘটলে মজিদ চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটিই অনুদঘাটিত থেকে যেতো। এসব বিবেচনা করেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলাই, নায়িকা।

লেখক জমিলার পিতৃপরিচয় আমাদের জানাননি। এমনকি বিবাহ পূর্বকালে তার জীবন-যাপন পিতৃগৃহে কী রকম ছিলো লেখক আমাদের তাও জানান নি। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে সে দরিদ্র ঘরের সন্তান আর সে কারণেই তার দারিদ্র্য পীড়িত পিতা একজন প্রৌঢ় এবং বিবাহিত মানুষের সঙ্গে কিশোরী কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। সে যখন মজিদের সংসারে আসে তখন তাকে দেখে শান্ত দুর্বল বেড়াল ছানাটির মতো মনে হতো। মজিদ

এমন একটি বউ ঘরে আনতে চেয়েছিলো যে খোদাকে ভয় করবে। জমিলাকে দেখে মনে হয়েছিলো খোদাকে শুধু নয়, সমস্ত কিছুকেই সে ভয় করবে। "যদি কেউ তাকে হেসে আদর করতে চায় তাহলেও সে ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।" কিন্তু দেখা গেলো ধারণা ভুল। জমিলা উচ্ছল হাসি হাসে। কৌতুককর কথা বলে স্বামীর বয়স নিয়ে কটাক্ষ করে এবং স্বামীর রক্তচক্ষু শাসন মানতে চায় না। তার হাসি মাজারের শীতল স্তব্ধ ও শ্রদ্ধা-ভীতির জগতে একটি চিড় ধরিয়ে দেয়। তাকে শাসন করা হয়। কিন্তু তবু-তার হাসি থামে না। তাকে চৌকাঠে বসে থাকতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু সে নিষেধ উপেক্ষা করে। ক্রুদ্ধ অধৈর্য স্বামী বিকট স্বরে ধমক দিলে সে পরম হেলা ভরে ওঠে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়। স্পষ্টতঃই দেখা যায় জমিলা স্বামীকে উপেক্ষা করেছে। স্বামীর বিছানা পরিহার করে রহীমার বিছানায় গিয়ে শোয়। নামাজ না পড়েই একদিন সে ঘুমিয়ে পড়ে। জোর করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে নামাজ পড়ছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে সে কোনো জবাব দেয় না। নামাজ পড়েছে, এ কথাটি সে মুখ দিয়ে বের করে না। বোঝা যায় 'তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে।"

হাস্যমুখরা চপলা জমিলা যেমন, তেমনি এ নীরব বিদ্রোহী জমিলা স্বামী-মজিদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ যে তার আচরণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক প্রাণধর্মের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। খুশিতে কৌতুকে জমিলা উচ্ছল হাসি হাসে এ যেমন স্বাভাবিক প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশ, তেমনি শাসন পীড়ন হলে সে যে সেটা উপেক্ষা করে ও নীরব প্রতিবাদ জানায় এও সেই স্বাভাবিক প্রাণধর্মেরই সহজ প্রকাশ। আর এ খানেই মজিদের আতঙ্ক। ভীতি আত্মবিশ্বাস আর কুসংস্কার দিয়ে গড়ে তোলা মজিদের প্রতারণা আর শোষণের শীতল সাম্রাজ্যে যদি এ রকম প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশ ঘটতে থাকে, যদি এভাবে তার প্রতাপ আর প্রতিষ্ঠার প্রতি অবহেলা আর উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়, তাহলে তার নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বাইরের আক্রমণ সে প্রতিহত করতে পারে। কূটকৌশল প্রয়োগ করে সে প্রবল প্রতাপান্বিত পীরসাহেবকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছে, খালেক ব্যাপারীর মতো মাতব্বরের আনুগত্য এখন তার হাতের মুঠোয় শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী আধুনিক তরুণ আক্কাস আলীকে গ্রাম থেকে সহজেই সে বিতাড়িত করেছে– কিন্তু জমিলার বিরুদ্ধে কী করবে? সে ভেবে পায় না। জমিলা বুদ্ধি কিংবা কৌশল দিয়ে বাইরে থেকে তাকে আঘাত করে না, করে তার সহজ প্রাণধর্মের প্রকাশ দেখিয়ে তার নিজেরই অন্তঃপুরের ভেতর থেকে। এমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে কখনো সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে নি– এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৌশলও সে জানে না। মোট কথা জমিলা তার ক্ষুদ্র দেহ, অপরিণত মন এবং একাকী অস্তিত্ব নিয়ে তার স্বামীর প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তার শক্তি শুধু একটিই– সেটি হলো তার সহজ প্রাণধর্ম। ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেটি বলা যায় প্রায় আবহমানকালের। এর শুরু মানব সভ্যতার সুচনাকাল থেকে। হৃদয় ধর্ম বড়, না প্রথামুলক ধর্ম বড়? মানুষের সহজ সৃজনশীল প্রাণময় জীবন বড়, না প্রথাবদ্ধ অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের ভারে ন্যুব্জ ও বন্ধ্যা জীবন বড়? এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় পাঠককে। আর তাতে জমিলা সহজ প্রাণধর্মের উচ্ছল উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। তবে মাজারের স্তূপটি ভেঙ্গে, সকল ভণ্ডামি, শোষণ এবং অন্ধবিশ্বাস তুচ্ছ করে জমিলা কিংবা প্রকাশ্যেও সহজ ও সৃজনশীল প্রাণধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেনি। বরঞ্চ দেখি, প্রতিপক্ষেরও অত্যাচারে সংজ্ঞাহীন জমিলা সংজ্ঞাহীনই থেকে গেছে। তবে তার অর্থ এ নয় যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে, জমিলা আত্মসমর্পণ করেছে। বরং দেখি, জমিলার বিদ্রোহ রহীমার মনেও সহজ প্রাণধর্মের প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছে। ফলে জমিলা হয়ে উঠেছে অন্যায়, শোষণ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের প্রতিপক্ষের বিদ্রোহের প্রতীক। এ রকম একটি বিদ্রোহী বালিকাবধূকে সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে পাওয়া ভার। সেদিক থেকে জমিলা এক অনন্য চরিত্র।

প্রশ্ন-৯ : 'লালসালু' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখুন।

উত্তর : উপন্যাসে ভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়বস্তু, চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ ও আবহ উপন্যাসের ভাষা তৈরি করে। এ জন্য উপন্যাসের ভাষার ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে খুব সচেতন হতে হয়। উপন্যাস বাস্তব জীবনের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ, সে কারণে উপন্যাসের ভাষারীতি ও সংলাপেও জীবন-ঘনিষ্ঠতা থাকে। জীবনকে বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়। একটি জনপদের শিক্ষিত শ্রেণী সাধারণত শিষ্ট ভাষায় কথা বলে। এদের অধিকাংশই শহরাঞ্চলে থাকে। এদের জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে শিষ্ট ভাষার সংলাপই ব্যবহার সম্মত। কিন্তু গাঁয়ের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মুখে শিষ্ট ভাষার প্রয়োগ হলে তা বেমানান ঠেকবে। এটি তখন অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হবে। এবং এটিও ধারণা হবে যে, এ ভাষা জীবনের কাছে যায়নি। একটি দেশের অঞ্চল

বিশেষের জীবনাবহে ভাষার বিশেষ আদল আছে। ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি এবং ভাষা অবিচ্ছিন্ন। এখন এ অঞ্চলের মানুষেরা যদি উপন্যাসে আসে, তাহলে তাদের ভাষাও উপন্যাসে স্থান পাবে। উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কিন্তু সহজ কাজ নয়। দক্ষ উপন্যাস শিল্পীই পারেন আঞ্চলিক ভাষার সুন্দর রূপ দিতে। বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্ট পরিচর্যা হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন নিপুণ শিল্পী। 'লালসালু' উপন্যাসই এর প্রমাণ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। 'লালসালু' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে মুসলিম-অধ্যুষিত পূর্ববাংলার তথা বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এ চিত্র সুপরিচিত। কবরের উপর লালসালু বিছিয়ে পীরের মাজারে রূপ দেয়া অভিনব কিন্তু নয়। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ধর্মের অতশত তারা বোঝে না, কিন্তু ধর্মীয় পুরুষ ও মোল্লামৌলবী শ্রেণীর মানুষদের তারা বেজায় ভক্তি করে। আর এদের ভক্তি, বিশ্বাস, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীর দল মেতে ওঠে। 'লালসালুতে আমরা এ চিত্রই পাই। এ চিত্রের উন্মোচনে আঞ্চলিক ভাষা খুব সহায়ক হয়েছে। লালসালু উপন্যাসের পুরো পটভূমিই গ্রাম। তাও আজ কালকার গ্রাম নয় বহু বছর আগের অজপাড়াগাঁ। নাগরিক জীবন থেকে দূরে বহুদূরে, বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগবিহীন, দুর্গম। এ গ্রামে ভালো সড়ক নেই, বিজলি বাতি নেই, ইস্কুল নেই, অর্থাৎ কোন আধুনিক জীবন ব্যবস্থা নেই। এ গ্রাম নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামের মানুষগুলোর প্রধান কাজ ফসল উৎপাদন। এ রকম একটি গ্রামের একটি ভাঙা কবরকে পীরের মাজারে রূপান্তরিত করে মজিদ নামক জনৈক ধর্ম ব্যবসায়ীর জীবন প্রতিষ্ঠার কাহিনী লালসালু উপন্যাসের মূল বিষয়। এ উপন্যাসে নাগরিক মানুষ নেই, সকল পাত্রপাত্রীই গ্রামের। সঙ্গত কারণে তারা আঞ্চলিক ভাষাতে কথা বলেছে। মজিদ বলেছে, রহীমা বলেছে, জমিলা বলেছে, খালেক ব্যাপারী, হাসুনির মা, ধলা মিঞা সবাই নিজেদের ভাষায় কথা বলেছে। উপন্যাসের বর্ণনাত্মক অংশগুলোতে আছে শিষ্ট চলতি বাংলা, আর সংলাপে আছে আঞ্চলিক ভাষা। তবে একটি সংশয় থেকে যায়, 'লালসালু' ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা বাংলা দেশের কোন অঞ্চলের ভাষা। উপন্যাসটির প্রথম দিকে যে বর্ণনা পাই, তাতে মনে হয় নোয়াখালি অঞ্চলের চিত্র এটি। পরে উপন্যাসটির পটভূমি সরে আসে ওখান থেকে, স্থিত হয় গারো পাহাড়ের কাছাকাছি কোন গন্ডগ্রামে, সম্ভবত এটি ময়মনসিংহের কোন একটি গ্রাম হবে। সে যাই হোক, এ উপন্যাসে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা নোয়াখালির নয়, ময়মনসিংহেরও নয়। তাহলে কোন অঞ্চলের উপভাষা এটি? সে প্রশ্নের উত্তরও নিরঙ্কুশ নয়। তবে এটি অনুমান করা যায় যে, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে 'লালসালু'র আঞ্চলিক ভাষার মিল রয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আশ্চর্য সংযম ও কুশলতায় এ ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে মজিদের সংলাপের ভাষায় তিনি দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েচেন। মজিদ আর সকলের মতো গ্রামের ভাষাতে কথা বলেছে। তবে তার কথাবার্তার ও সংলাপের বিশিষ্ট পরিচয় আছে। মজিদ মোল্লা-মৌলবী শ্রেণীর লোক এবং মাজারের খাদেম। গ্রামের মানুষের উপর তার অসাধারণ প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব বজায় রাখতে তার মুখের বুলিকেও সে কাজে লাগিয়েছে। লোকে বিশ্বাস করে, মজিদ কোরান হাদিস পড়া রুহানি তাকতের লোক। আঞ্চলিক বুলির মধ্যে যথেষ্ট আরবি ফার্সি শব্দ মিশিয়ে কথা বলার বিশেষ ঢঙ মজিদ রপ্ত করেছে। এ বুলির তার বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে মানিয়েছেও চমৎকারভাবে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মজিদের সংলাপকে খুব সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করেছেন এবং সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মজিদের বুলি হয়তো বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা নয়, এটা বাংলাদেশের মোল্লা শ্রেণীর মানুষের সাধারণ বুলি। কিন্তু আঞ্চরিক পরিবেশের সঙ্গে এ ভাষা মানিয়ে যায় চমৎকার ভাবে। তখন মজিদের ভাষা আর রহীমার ভাষার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় না; কিংবা হাসুনির মা আর খালেক ব্যাপারীর ভাষাকে একরকম মনে হয়। অর্থাৎ এসব পাত্রপাত্রীর ভাষা একই বৃত্তের ভাষা, একই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে শৈল্পিক নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন-১০ : উপন্যাসের 'লালসালু' নামকরণের প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

উত্তর : উপন্যাসের নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য থাকে। সাধারণত বিষয়বস্তু, আখ্যান, ভাবের গূঢ়ার্থ, চরিত্রের উপন্যাসের নামকরণে ভূমিকা রাখে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসে নামকরণে আখ্যান ও চরিত্রের চেয়ে বিষয়বস্তু ও ভাবচিন্তার ব্যঞ্জনাই বেশি।

লালসালু হল লাল রঙের বলাত। এমনিতে লাল কাপড়ের বিশেষ কোন মহিমা নেই। কিন্তু লাল রঙ খুব উজ্জ্বল এবং এ রঙটি চোখে পড়ে বেশি। সুতরাং এ রঙটিকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ধর্ম

ব্যবসায়ী যুগ যুগ ধরে এ রঙটিকে খুব সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগিয়েছে। কবরের উপর লাল কাপড় বিছিয়ে দিলে কবরের গুরুত্ব হঠাৎ বেড়ে যায়। তখন তা আর সাধারণ কবরে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা তখন মাজারে পরিণত হয়। এ কবরের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়ে সহসা। কবরটি তখন মানুষের ভক্তিপ্রীতির আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে। তখন মানুষ প্রতিনিয়ত কবরে যায়; জেয়ারত করে, দোয়া দরুদ পড়ে এবং শিরনি দেয়। টাকা পয়সা ও দিতে থকে। এভাবে মাজারটি পরলোক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। এ মাজার বাংলাদেশের লোক জীবনে অসামান্য প্রভাব ফেলে। সুতরাং লালসালুর তাৎপর্য বুঝতে হবে।

একসময় বাংলাদেশে পীর ফকিরদের আধিপত্য ছিল। এখন তেমন আধিপত্য না থাকলেও পীরভক্তি উবে গেছে তা বলা যাবে না। খানকা, দরগা, মাজার বাংলাদেশের সব জায়গাতেই আছে। লালসালুর ব্যবসায় গ্রামে শহরে সর্বত্রই চলে। বাংলাদেশের বিশাল লোকজীবনে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বেশি। পীর ফকিরদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের জন্য অশিক্ষার আর কুসংস্কারই দায়ী। মানুষ মনে করে পীর ফকিরেরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, আল্লাহর নৈকট্যে তারা আছে, সুতরাং তাদের মুরিদ হয়ে তাদের সেবাযত্ন করতে পারলে পাপতাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ কারণে ফকির দরবেশ বা মোল্লা মৌলবী শ্রেণীর লোকের প্রতি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের দুর্বলতা। এ দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে মোল্লা মৌলবী শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। তাদের বিশেষ কর্ম তৎপরতার মধ্যে রয়েছে কবরকে কারুকার্যমণ্ডিত ঝালরওয়ালা লাল বলাতে আবৃত করে মাজারে পরিণত করা এবং তার মাধ্যমে দুনিয়াদারি হাসিল করা। এ ব্যবসায় বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র পরিলক্ষিত।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে লালসালু ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতীক। বাংলাদেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত, বিজ্ঞান বুদ্ধিহীন মানুষের জীবনে লালসালুর প্রভাব খুবই গভীর। এ ব্যাপারটিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। মনে রাখতে হবে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাস লিখেছেন। লালসালুর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিবৃতিদান করতে যাননি তিনি। লালসালুকে কেন্দ্র করে যে জীবন গড়ে উঠেছে তা তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মের বিষয় হয়েছে। এ জীবনের রূপ সৌন্দর্য ও প্রকৃতি এবং সামাজিক তাৎপর্য উপাখ্যানে রূপায়িত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এ দিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যে একজন সফল শিল্পী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার ও ধর্মীয় রীতিনীতির আলোকে মানবজীবনকে অবলোকন করতে চেয়েছেন। লালসালুর প্রতীক এ ক্ষেত্রে তাঁকে চমৎকারভাবে সাহায্য করেছেন।

লালসালু উপন্যাসে আমরা পাই মজিদ নামক এক ভাগ্যান্বেষী মোল্লার জীবনচিত্র। মজিদ অনেক ঘাটের পানি খেয়ে অবশেষে মহব্বতনগরে এসে আস্তানা গেড়েছে। একটি টাল খাওয়া কবরকে জনৈক মোদাচ্ছের পীরের মাজারে রূপদান করা মজিদের কীর্তি। অজ্ঞ অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষীদের প্রতারিত করতে মজিদের মোটেও বাধেনি। মজিদ সালু কাপড়ে ঢাকা মাছের পিঠের মতো উঁচু কবরটি তার সকল শক্তির মূল। সুতরাং এঁকে আঁকড়ে থেকে সে নিজের জীবন রচনা করে। সে সংসারী হয়, জমিজমা ও অর্থবিত্তের মালিক হয়। সবচাইতে বড় কথা, সে গ্রামের শক্তিধর পুরুষ হয়ে ওঠে, তার অঙ্গুলি হেলনেই সমাজ চলে। তাকে ছাড়া সমাজ অচল। খালেক ব্যাপারীর মতো গ্রাম্য মাতব্বরেরাও তার সম্পূর্ণ বশ। কেউ যদি তাকে অমান্য করতে চায় কিংবা তার অবাধ্য হয় অথবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে তখন তাকে শক্তহাতে শাস্তি দিতে কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মজিদ মোটেও বিলম্ব করে না। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কিংবা অবাধ্যতাকারীদের সে জব্দ করেছে; উদাহরণ আওয়ালপুরের বৃদ্ধ পীর সাহেব, আক্কাস, আমেনা বিবি এবং সর্বোপরি তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জমিলা। সবাইকে অতিক্রম করে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সে সক্ষম হয়েছে। জীবনের ক্ষেত্রে মজিদের এত বড় প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে সেই লালসালুতে আবৃত মাজার। সুতরাং উপন্যাসের লালসালু নাম অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এ নামটি যথাযথ এবং অসামান্য তাৎপর্যমণ্ডিত, সামাজিক দিক থেকেও মজিদের দিক থেকেও।

প্রশ্ন-১১ : লালসালু উপন্যাসের বাক্য প্রকরণ শব্দ প্রয়োগ কৌশল ও উপমা ব্যবহারের সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটি আলোচনা লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে 'লালসালু' নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবীদার। এ উপন্যাসের বিষয় গৌরব অনস্বীকার্য। বিষয়কে উপযুক্ত ভাষায় অর্থাৎ সুন্দর বাক্যে, শব্দে ও রূপকল্পে ফুটিয়ে তুলতে পারলে উপন্যাস-শিল্পী খ্যাতিমান হন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বেশি উপন্যাস লেখেন নি, তাঁর মাত্র তিনটি উপন্যাস এবং 'লালসালু' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাস ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু ক্ষুদ্র হলে কি হবে, বিষয়ে ও ভাষায় এ উপন্যাস একটি স্মরণীয় রচনা। বিশেষ

করে ভাষারীতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কথা কম, কিন্তু কথাগুলো গভীর অর্থবহ। বাক্য গঠনে ওয়ালীউল্লাহ দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাক্যে বাহুল্য নেই, মনে হয় সব বাক্যই সুনির্বাচিত। অর্থাৎ বাক্যের গাঁথুনি ও ভাষার সৌন্দর্যের কথা বিবেচনা করি, তাহলে বলতে হবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন নিপুণ কথাশিল্পী। উপন্যাসের বর্ণনাত্মক অংশে ওয়ালীউল্লাহ শিষ্ট মান বাংলা ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে ভাষা আধুনিক ও সংকেতময় হয়ে উঠেছে। এ কথার প্রমাণ হিসেবে 'লালসালু' উপন্যাস থেকে প্রচুর উদাহরণ দেয়া যায়। আপাতত দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝানো যেতে পারে। উপন্যাসের শুরুতে ভাগ্যান্বেষী মানুষদের বেরিয়ে পড়বার একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। মানুষগুলি রেল গাড়িতে চলাফেরা করে। সে রেলগাড়ি হয়তো রাতের বেলা কোন এক স্টেশনে পৌঁছায়। তখন চারদিকে কোলাহল পড়ে যায়। এ ঘটনাটিকে বর্ণনা করছেন লেখক, এভাবে- 'রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে।' এ বাক্য ঠিক সহজ বাক্য নয়। ঘটনা ও চিত্রকে আধুনিক প্রতীকী ভাষায় তুলে ধরেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তাঁর বর্ণনা পর্যবেক্ষকের মতো, খুব স্পষ্ট ও যথাযথ। মুসল্লিরা নামায পড়ার আগে ওজু করে নেয়। পুকুরধারে সান বাঁধানো ঘাট নেই, আছে হয়তো এক টুকরো প্রস্তরখণ্ড। ওজু বানানোর দৃশ্যটি ওয়ালীউল্লাহর বর্ণনায় এভাবে এসেছে- 'মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার উপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে।' কখনো কখনো সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেন যে তাঁর ভাষার শক্তিমত্তাই শুধু প্রকাশ পায়। যেমন, 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' আশ্চর্য সুন্দর সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগম্ভীর বাক্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ রকম করে সৃষ্টি করেন। ওয়ালীউল্লাহ শব্দ প্রয়োগ কৌশলও এভাবে সার্থক হয়। 'লালসালু'র ভাষায় তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক ও দেশজ শব্দের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। বর্ণনায় ও মুখের সংলাপে যথাযথ ভাবে শব্দগুলো বসেছে। মজিদ পীর মোল্লা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তার মুখের বুলির বিশিষ্টতা আছে। আঞ্চলিক বাকরীতির মধ্যে আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ তার কথাতে থাকবে। মজিদের সংলাপের তিনটি নমুনা এখানে দেয়া হল ঃ

১. আপনারা জাহেল, বে এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?
২. খোদার কালামের সাহায্যে যে কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।
৩. নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।

উপমা

লালসালুর ভাষারীতির বিশিষ্ট পরিচয় উপমার মধ্যেও পাওয়া যায়। উপমা হলো দুই বস্তুর তুলনা। এ তুলনা দেয়া হয় একটা ভাব বা চিত্রকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। উপমার সাহায্যে অনেক বিষয় স্বচ্ছ বা স্পষ্ট করাও যায়। সে জন্য শিল্পীর ভাষারীতিতে উপমা ব্যবহারের গুরুত্বও থাকে। লালসালু উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সুন্দর সুন্দর উপমার প্রয়োগ করেছেন। মাজারকে তিনি উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর।' মাছের পিঠের মতো কবর' এ উপমা অনেক বার ব্যবহার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। কিছু গভীর ভাবাত্মক উপমাও ব্যবহার করেছেন তিনি, আবার সহজ সরল উপমাও। যেমন-

'গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে, রহীমার সারা দেহে'— কিংবা

'নিস্পন্দ ধান ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল।'

মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা নিয়ে উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এ রকম করে-

'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।'

এসবই আধুনিক প্রকাশভঙ্গি, আধুনিক উপমা। এ জাতীয় উপমা ব্যবহারের লালসালুর ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

আরও যা পড়তে পারেন

'লালসালু' ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আরও দুটি উপন্যাস লিখেছেন। এগুলোর নাম হচ্ছে– চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো। সম্ভব হলে এগুলো পড়বেন। এছাড়া সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত ছোটগল্প, নয়ন চারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, নাটক বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি পড়তে পারেন। এগুলো পাবেন সৈয়দ আকরাম হোসেন সম্পাদিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী' ১ ও ২ গ্রন্থে। বইগুলো প্রকাশ করেছে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করলে সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখা 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দ ব্যবহার-

এগুলো সম্পর্কে আরও জানতে হলে– ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান গ্রন্থটি পড়ুন।

ভাষারীতি

এ ইউনিটটি পড়ে আপনি

১. বাংলা ভাষারীতির একটি পরিচিতি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
২. ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
৩. ভাষারীতি পরিবর্তন করতে পারবেন।

পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই আছে দুটি রূপ। একটি লেখ্য বা লৈখিক রূপ ও অপরটি মৌখিক বা কথ্যরূপ। আমরা যখন বর্ণমালা বা প্রতীক দিয়ে যখন লিখি তখন তা হয় ভাষার লিখিত বা লৈখিক রূপ। কথা বলার সময় আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি সেটিকে বলে ভাষার মৌখিক বা কথ্যরূপ। স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষাতেও আমরা ভাষার লিখিত ও কথ্যরূপ পাই।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা ভাষারীতির বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- সাধু ও চলিত ভাষার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সাধু ও চলিত ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

বাংলা ভাষার লিখিত রূপ আছে দুটি। একটির নাম সাধুভাষা ও অপরটির নাম চলিত ভাষা। বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিষ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য রচনা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে এ দুটো রীতি অনুসরণ করে থাকেন। এদিক দিয়ে সাধু ও চলিত রীতি সার্বজনীন। বাংলা মৌখিক বা কথ্য ভাষাও আমরা পাই দুরকমের। একটি শিষ্ট ও শিক্ষিতজনের মুখের ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষা। আরেকটি হচ্ছে আঞ্চলিক বা উপভাষা। কথ্য চলিত ভাষা শিষ্টজনের সার্বজনীন ভাষা। তবে আঞ্চলিক বা উপভাষা- একান্তভাবেই বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলের ভাষা। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন নয়। বিভিন্ন ভাষারীতির পরিচয় আমরা রৈখিক চিত্রে এভাবে তুলে ধরতে পারি–

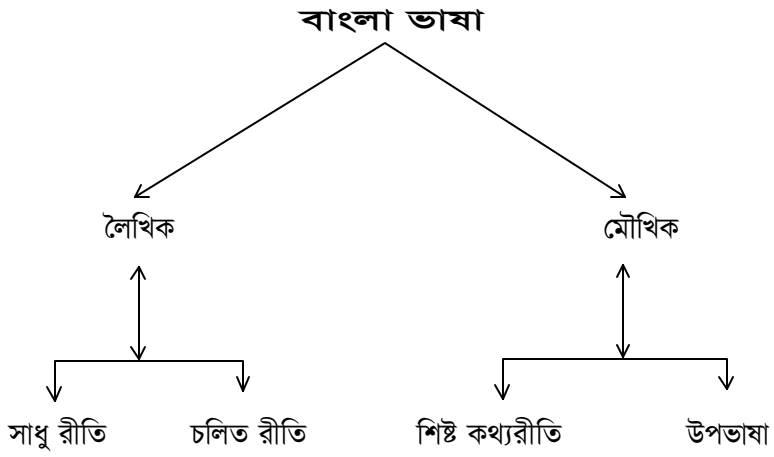

আমাদের আলোচনা বাংলা ভাষার লিখিত রূপ বা লেখ্যরূপ সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে। আমরা জেনেছি যে শিষ্ট ও শিক্ষিত জনের কাছে দুটো ভাষাই গ্রহণীয়। তবে সাধু ভাষা সংস্কৃতের অনুসারী ও চলিত ভাষা কথ্য ভাষার অনুসারী। তাই সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যেয়ে আমরা বলতে পারি।

যে ভাষার শব্দ, বাক্যগঠন ও প্রয়োগ কৌশল সংস্কৃতের অনুসারী এবং সেকালের 'সাধু' অর্থাৎ শিষ্ট, শিক্ষিত ও পণ্ডিতজন যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন তাই সাধুভাষা (Standard literary style)

যে ভাষার শব্দ, বাক্যগঠন ও প্রয়োগ-কৌশল শিষ্ট ও শিক্ষিতজনের কথ্যভাষার ধারা অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় চলিত ভাষা (Standard Colloquial style)।

সাধু ও চলিত রূপের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগে ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন ছিল কবিতা। চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের একটি অস্পষ্ট রূপ এ সময় পাওয়া গেলেও এগুলো ছিল একেবারেই প্রাথমিক ও অবিকশিত। প্রকৃতপক্ষে এ দেশে ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পর বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব অনুভূত হয়। এর ফলেই এখানে বাংলা গদ্য চর্চার একটি সমন্বিত প্রয়াস শুরু হয়। উনিশ শতকে বাংলা সাময়িক পত্রের প্রকাশ বাংলা গদ্য রচনার সুযোগ সম্প্রসারিত করে।

এছাড়া রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক এ সময়ই সমাজ সংস্কারের জন্য গদ্য চর্চা শুরু করেন। তাঁরা এ সময় অন্যান্য লেখকদের প্রচেষ্টায় সকল অঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালির জন্য একটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য লিখিত ভাষা গড়ে তোলেন। এ ভাষার মূল নির্ভরতা ছিল সংস্কৃত ভাষার উপর। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন কৌশল সব কিছুতেই সংস্কৃতের প্রভাব ছিল গভীর। উনিশ শতকে গড়ে উঠা এ ভাষার নাম সাধুভাষা। সাধুভাষা একদিনে তার রূপ-লাবণ্য, শ্রী ও সৌন্দর্য লাভ করেনি। বহুজনের মিলিত প্রয়াসে সাধুভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমযুগে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র এবং পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গদ্যলেখকের হাতে সাধুভাষা প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়। এ সময় সাময়িকপত্রের প্রকাশ ও সমাজ সংস্কারকদের বাংলা গদ্য চর্চার ফলে বাংলা সাধু গদ্য বিকশিত হতে থাকে। বহুজনের মিলিত প্রয়াসে বাংলা সাধুগদ্য পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা চলিত ভাষা (Standard Colloquial Style)

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই চলিত ভাষা বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিতে থাকে। সংস্কৃত নির্ভর সাধুভাষা ক্রমশ পণ্ডিতি ভাষায় পরিণত হয়। ফলে সাধুভাষা নিষ্প্রাণ ও স্থবির হয়ে যেতে থাকে। লেখকদের মধ্যে অচিরে এ বোধ জাগ্রত হতে থাকে যে গদ্যকে প্রাণবাণ ও জীবন্ত রাখতে হলে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা" প্রথম কথ্যভাষায় রচিত দুটি গদ্যগ্রন্থ। পরর্বীতিকালে প্রমথ চৌধুরী তাঁর "সবুজপত্র" পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথও চলিত ভাষায় লিখে একে অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রবীন্দ্রপরবর্তী যুগ থেকে বাংলা গদ্যে চলিতরীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে সাহিত্যের প্রায় সবটুকুই চলিতরীতির আদর্শে রচিত হচ্ছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের ভাষা থেকে আরম্ভ করে ব্যবহারিক সর্বক্ষেত্রেই চলিতভাষাই আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

চলিতরীতি প্রাণবাণ ও জীবন্ত বলে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ভাষা এখন চলিত ভাষা। সাহিত্য ছাড়াও চলিত ভাষা আমাদের ব্যবহারিক সমস্ত প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ধারিত স্থানে লিখুন।

১. আপনি কথা বলার সময় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন কী? (হ্যা অথবা না লিখুন)
২. আপনার আঞ্চলিক ভাষায় বা উপভাষায় একটি বাক্য লিখুন। সে বাক্যটিকে সাধুরীতি ও চলিতরীতিতে রূপান্তরিত করুন।
৩. শিষ্ট চলিত ভাষায় কথা বলতে কী আপনার অসুবিধা হয়?
৪. আপনি পরীক্ষার খাতায় কোন রীতিতে লিখতে পছন্দ করেন? সাধু না চলিতরীতি?

এখানে উত্তর লিখুন

১. --

২. --

৩. --

৪. --

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- সাধু ও চলিত রীতিতে রচিত যে কোন রচনা সনাক্ত করতে পারবেন।
- সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

ভাষারীতি সনাক্ত করা ও সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে ভাষা রূপান্তরিত করতে পারার দক্ষতা আমাদের অর্জন করতে হবে। তাই প্রথমেই আসুন সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আমরা জেনে নিই।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

সাধুভাষা	চলিতভাষা
১. তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	১. তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
২. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার দীর্ঘায়িত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- করিতেছে, যাইতেছে, চলিতেছে (সমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি। খাইয়া, ধরিয়া, যাইয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি।	২. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার। যেমন করছে, চলছে, যাচ্ছে (সমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি। খেয়ে, ধরে, যেয়ে (অসমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি।
৩. সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- তাহারা, যাহার, ইহা, উহা ইত্যাদি।	৩. সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- তারা, যার, এ, ও ইত্যাদি।
৪. অনুসর্গের দীর্ঘায়িত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- হইতে, দিয়া, অপেক্ষা ইত্যাদি।	৪. অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- হতে, দিয়ে, চেয়ে ইত্যাদি।

৫. সকল সমাসের বেশি ব্যবহার।	৫. সমাসের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
৬. সংস্কৃত অব্যয়পদের ব্যবহার। যেমন- অনন্তর, বরঞ্চ, তথাপি, তদ্রূপ ইত্যাদি।	৬. অব্যয় পদের বিবর্তিত রূপের ব্যবহার। যেমন- তারপর, বরং, তবুও, সেরূপ ইত্যাদি।
৭. গুরুগম্ভীর শব্দের প্রয়োগ।	৭. ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার বেশি।
৮. দীর্ঘ ও জটিল বাক্যের ব্যবহার বেশি।	৮. সংক্ষিপ্ত ও যৌগিক বাক্যের ব্যবহার বেশি।

নিচে কিছু লেখকের সাধু চলিত রীতির রচনা সংকলিত হয়েছে। সেগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

সাধুরীতির উদাহরণ

১. "চৈত্রবায়ু তাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে, যথায় কপালকুন্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটর্বোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটবৃত্তিকাখণ্ড কপালকুন্ডলার সহিত ঘোর রবে নদী প্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুন্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২. গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দসকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালার বহুল চর্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নাম কেহ জানিত না।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৩. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল যদি কেহ এমন করিয়া বাঁধিয়া রখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কালো চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্নভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না। আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আমি সুখ যাচঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

—মীর মশাররফ হোসেন

৫. অরণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুঈনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল করিম-মুসোলিনী সানইয়াৎ সেন লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে- যাহারা বৈমানিক রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়।

—কাজী নজরুল ইসলাম

চলিত রীতির উদাহরণ

১. একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশেই পড়ল জড়ের কাঁধে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক।

—প্রমথ চৌধুরী

৩. বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে দীর্ঘ নোনা গাছের তলা থেকে উঠলুম। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে, বাবলা বনের ওপর সূর্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রঙের অজানা বনফুল তুলে নিলুম।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. মাঝি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত, সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে।

—সৈয়দ মুজতবা আলী

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সাধুরীতিতে ব্যবহৃত ৫টি সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ লিখুন। ঐ ক্রিয়াপদগুলির চলিত রীতির রূপও লিখুন।
২. সাধুরীতিতে সর্বনামের ব্যবহার কেমন হয়? ৫টি উদাহরণ দিন। ঐ সর্বনামগুলির চলিতরূপ লিখুন।
৩. তৎসম ও তদ্ভব শব্দ কোন ভাষারীতিতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর

১. **সাধু :** আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না— আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

চলিত : আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাকে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু 'কবিত্ব' সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাকে Poetry বলে এখন তাই কবিত্ব। এখন এ অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এ অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না — আমরা বিচার করতে বাধ্য।

২. **সাধু :** যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুন দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

চলিত : যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরছে, প্রকৃতির অন্তর ফেটে যাচ্ছে, সেই দেহ বিচ্ছিন্ন হোসেন মস্তক দেখে কার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হন, এ নিদারুন দুঃখের কথা শুনলে কে না ব্যথিত হন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হয়ে হোসেন শোকে কাঁদতে লাগলেন।

৩. **সাধু :** জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানা প্রকার আভাস-ইঙ্গিত নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

চলিত : জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করে দিতে হয়। তার জন্য নানা প্রকার আভাস ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাকে কেবল বুঝিয়ে বললেই হয় না, তাকে সৃষ্টি করে তুলতে হয়।

৪. **সাধু :** আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম, বাড়িতে মার কাছে লইয়া খাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না, অথচ ইচ্ছা, আমি একবার যাই। এ দীন বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটিরের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব, এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

চলিত : আমি তার মনের ভাব বুঝতে পারলাম। বাড়িতে মার কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে তার সাহস হচ্ছে না, অথচ, ইচ্ছা, আমি একবার যাই। এ দীন বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হল। দরিদ্রের কুটিরের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটেনি। দেখে আসব, এ দেশে তারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

৫. **সাধু :** কিন্তু, একি করিতেছি! একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম! মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনায় যে মেঘ কাল হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখ সন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব।

চলিত : কিন্তু, এ কি করছি! একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখতে বসলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হবে এ আমি কি জানতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনায় যে মেঘ কাল হয়ে জমে উঠেছে, তাকে বৈশাখ সন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করে দেব।

৬. **সাধু :** কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে। যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়।

চলিত : কুবেরের ধমক খেয়ে গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নিজেই ধরে দিল গান। সে গাইতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়ে গানের কথাগুলি শোনে। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়।

৭. **সাধু :** দৈনন্দিন জীবনে সকলে ভাল-মন্দ অনেক কথা বলিয়া থাকে। যে কথাগুলি মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, তথা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই সাহিত্য। সাহিত্য অর্থে কতকগুলি মূল্যহীন অকেজো কাগজের স্তুপ নহে।

চলিত : দৈনন্দিন জীবনে সকলে ভাল-মন্দ অনেক কথা বলে থাকে। যে কথাগুলো মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, তথা অর্থপূর্ণ, যা শুনলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাই সাহিত্য। সাহিত্য অর্থে কতকগুলো মূল্যহীন অকেজো কাগজের স্তূপ নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. সাধু ও চলিত রীতির সংজ্ঞা দিন।
২. সাধু ও চলিত রীতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
৩. সাধু ও চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।
৪. নিচের বাক্য অনুচ্ছেদগুলো চলিতরীতিতে রূপান্তর করুন।

১. তাহাদের যাইতে হইবে।
২. আমরা যখন বেড়াইতেছিলাম, দেখিলাম একজন রাখাল তাহার গরুর পাল লইয়া ফিরিতেছে।
৩. কেহ কেহ অন্যরকম মনে করিতে পারে।
৪. বাংলাদেশ ছোট হইলে কি হইবে, ইহার অফুরন্ত সম্পদ রহিয়াছে।
৫. হাঁটিতে হাঁটিতে আর কতদূর যাইতে হইবে?
৬. আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলা, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব"।
৭. বাণিজ্য বিষয়ে ইহা যে তখন সপ্তগ্রাম অপেক্ষা বেশি উন্নত ছিল, তাহা ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হইতে পারে। এ দেশের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ইংরেজদিগকে এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল।
৮. আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্য তালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।
৯. কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারন, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যু যদি বা সহে তাঁর মৃত দেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না।
১০. নদীর তীরে নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থামিয়া থামিয়া স্টীমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়। কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।

প্রবাদ-প্রবচন

ভূমিকা

প্রবাদ বা প্রবচন ভাষার একটি সম্পদ। পৃথিবীর সকল উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষাতে প্রবাদ বা প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'প্রবাদ' শব্দটিকে ভাঙলে আমরা দুটি অংশ পাই – 'প্র' ও 'বাদ', 'প্র' শব্দের অর্থ 'প্রকৃষ্ট' এবং 'বাদ' শব্দের অর্থ 'বচন' বা 'কথা'।

'প্রবাদ' বা 'প্রবচন' গুলো কোন না কোন উপদেশ বা নীতিকথার সার-সংক্ষেপ। প্রকৃতি ও সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে নিরীক্ষণ করার অভিজ্ঞতা এসব প্রবাদ প্রবচনে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজিতে প্রবচনকে Sayings of the wise বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের অভিজ্ঞতাই প্রবাদ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় বহু প্রবাদ বা প্রবচন ব্যবহৃত হয়। এগুলো আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই এগুলোর ব্যবহার আমাদের জানা প্রয়োজন।

প্রবাদ বা প্রবচনের নমুনা ও অর্থ

১. অন্ধকারে ঢিল ছোড়া – আন্দাজে কথা বলা

২. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী – সামান্য জ্ঞান বিপজ্জনক

৩. অতি চালাকের গলায় দড়ি – চালাকি করে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে যেয়ে নিজেই ঠকা।

৪. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – বেশি লোভ করতে গিয়ে নিজের যা আছে তাও হারাতে হয়।

৫. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ – স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ি রকমের শ্রদ্ধা জানালে তা সন্দেহের কারণ হয়।

৬. আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর – অনাধিকার চর্চা। যে ব্যক্তির আদার বেচাকেনা করে পণ্যবহনের জন্য তার জাহাজের খবর নেওয়া অপ্রয়োজনীয়।

৭. অনুরোধে ঢেঁকি গেলা – অনুরোধ, উপরোধে সম্ভব নয় এমন কাজ করতে যাওয়া।

৮. উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে – একজনের দোষ অন্যের উপর চাপান।

৯. উলুবনে মুক্তা ছড়ান – অনুপযুক্ত স্থানে মূল্যবান বস্তু দান করা।

১০. কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস – একই কারণে কারও উন্নতি হয় আবার ঐ কারণেই কারও সর্বনাশ হয়।

১১. কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী – কাজ পড়ে থাকলে আদর যত্নে কাজ করান হয়। কিন্তু কাজ শেষ হলেই অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

১২. কয়লা ধুলে ময়লা যায় না – কয়লা যতই ধোয়া হোক, ওটা কালই থাকে। তেমনি অসৎ ব্যক্তিকে যত উপদেশই দেওয়া হোক, তার মন থেকে কলুষতা দূর হয় না।

১৩. আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া – আঙ্গুল যতই ফুলুক কলা গাছের সমান মোটা হয় না। কিন্তু হঠাৎ করে এর চেয়ে অসম্ভব ঘটনা ধনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হতে পারে।

১৪. উড়ে এসে জুড়ে বসা – হঠাৎ এসে কায়েমিভাবে দখল করা।

১৫. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা – কষ্টের মধ্যে আরও কষ্ট বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা।

১৬. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – যে অন্ধ তার চোখ পদ্ম ফুলের মতো বলে উপহাস করা।

১৭. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না – গুণী ব্যক্তি নিজ গ্রামে অথবা নিজ দেশে সম্মান পান না।

১৮. গরু মেরে জুতো দান – গুরুতর অন্যায় করে পরে সামান্য কিছু দান করা।

১৯. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তার ফললাভের জন্য প্রস্তুতি।

২০. ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর – বাস্তব অবস্থার সঙ্গে গালভরা নামের মিল না হওয়া।

২১. চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো – যার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই নেই।

২২. চকচক করলে সোনা হয় না – বাইরের চেহারা দেখে অনেক সময় ভেতর চেনা যায় না।

২৩. চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী – অসৎ ব্যক্তি ধর্মের কথা শোনে না।

২৪. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – বিপদের সময় বুদ্ধিহীন কিন্তু অন্য সময়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নানা পন্থা মনে আসে।

২৫. দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা – আদরযত্ন করে শত্রুর লালন পালন করা।

২৬. দুধের স্বাদ ঘোলে মিটান – সার বস্তু না পেয়ে অসার বস্তুতে তৃপ্ত থাকা।

২৭. দশের লাঠি একের বোঝা – অনেকের পক্ষে যে কাজ সহজ একার পক্ষে তা কঠিন।

২৮. দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ – অনেক ব্যক্তির মিলিত কাজের জন্য ব্যক্তির অপমানিত বোধ করার কারণ নাই।

২৯. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা – নিজের ক্ষতি করে হলেও অন্যকে অসুবিধায় ফেলা।

৩০. পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা– ষোল আনায় এক টাকা। পড়ে পাওয়া বা বিনা শ্রমে পাওয়া চৌদ্দ আনা - ষোল আনারই সমান।

৩১. পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পাওয়া – অন্যকে অবলম্বন করে নিজের কার্যসিদ্ধি।

৩২. পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে – যেটি যার নয়, সেটি তার আয়ত্তে আসলে সর্বনাশের রাস্তা মুক্ত হয়।

৩৩. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা – নিজের ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

৩৪. নাই মামার চেয়ে কানা ভাল – কিছুই না থাকার চেয়ে খারাপ হলেও সামান্য কিছু থাকা ভাল।

৩৫. পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভ পেয়ে থাকলে পীড়ন সহ্য করা যায়।

৩৬. ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাঁড়া – অন্যরা যা দয়া করে দেয় তাতে দোষত্রুটি থাকলেও তা ধরার মত নয়।

৩৭. মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতি – অভিজ্ঞ লোক যে কাজ পারেন না অনভিজ্ঞ লোকের সে কাজ করতে যাওয়া হাস্যকর।

৩৮. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন – যেভাবেই হোক কাজে সফলতা অর্জনের চেষ্টা।

৩৯. মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – যার যতটুকু ক্ষমতা তার বেশি সে যেতে পারে না।

৪০. বরের পিসি কনের মাসি – যিনি দুপক্ষেরই আপনজন।

৪১. বামুন হয়ে চাঁদে হাত – সীমার অতিরিক্ত যে করে।

৪২. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা – যে পছন্দনীয় নয়- তার সব কাজেই খুঁত ধরা।

৪৩. যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই – একজন পরিশ্রম করে আরেকজন পরিশ্রমের ফলভোগ করে।

৪৪. যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেতুল – ভয়ঙ্কর ব্যক্তির জন্য প্রত্যাঘাতের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৪৫. বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি – প্রধান বিষয় অপেক্ষা অপ্রধান বিষয়ের প্রাধান্য।

৪৬. বিষ নাই কুলোপানা চক্কর – আসল ক্ষমতা নেই কিন্তু অহেতুক আস্ফালন করা।

৪৭. ভিটেয় ঘুঘু চরান – ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা।

৪৮. বোঝার উপর শাকের আঁটি – মূল দায়িত্বের সঙ্গে আরও কিছু বাড়তি দায়িত্ব।

৪৯. যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় – বিপদ দুর্বল মুহূর্তেই আসে।

৫০. রথ দেখা কলা বেচা – একই সঙ্গে দুইটি লাভ করা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. প্রবাদ বা প্রবচন বলতে কি বোঝায়?

২. 'প্রবাদ' শব্দের অর্থ কি? প্রবাদ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

৩. পাঠে নেই, এমন প্রবাদ আপনার জানা আছে কি? জানা থাকলে আপনার খাতায় সেগুলো লিখুন।

৪. নীচে প্রবাদগুলোর অর্থ লিখুন–

চক চক করলেই সোনা হয় না, ঘটি ডোবে না নাম তাল পুকুর, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী, কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাকি, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, বোঝার উপর শাকের আঁটি, রথ দেখা কলা বেচা, আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া, চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর, কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, দমের লাঠি একের বোঝা, নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।

মানবন্টন

বাংলা ১ম পত্র

গদ্য - ৪০

১)সাধারণ প্রশ্ন থাকবে ৫টি।	যে কোন ২টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×২ = ২০
২) বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৫টি।	যে কোন ২টির উত্তর দিতে হবে।	৫×২ = ১০
৩) ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫
৪) ব্যাখ্যা থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫

কবিতা - ৩০

১)সাধারণ প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×১ = ১০
২) বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৫টি।	যে কোন ২টির উত্তর দিতে হবে।	৫×২ = ১০
৩) ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫
৪) ব্যাখ্যা থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫

উপন্যাস - ২০

১)সাধারণ প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×১ = ১০
২) বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫
৩) ব্যাখ্যা থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫

ভাষারীতির রূপান্তর - ৫

১) ১টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে	১টির রূপান্তর করতে হবে।	৫×১ = ৫

প্রবাদ-প্রবচন- ৫

৮টি প্রবাদ প্রবচন দেওয়া থাকবে।	যে কোন ৫টির অর্থ লিখতে হবে।	৫×১ = ৫

নমুনা প্রশ্ন

বিষয় : বাংলা প্রথম পত্র

বিষয় কোড : HSC 1801

সময় - ৩ ঘন্টা পূর্ণমান - ১০০

(একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।)

ডান পার্শ্বের সংখ্যা পূর্ণমান জ্ঞাপক

১। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **১০´২ = ২০**

ক) 'আদর্শ মহাপুরুষ' প্রবন্ধ অবলম্বনে হযরত মুহম্মদের (সা.) চরিত্রের পরিচয় দিন।

খ) 'বই কেনা' প্রবন্ধ অবলম্বনে বইপড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

গ) 'বিড়াল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

ঘ) ছোটগল্প হিসাবে "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।

ঙ) 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক কি বলতে চেয়েছেন, বুঝিয়ে লিখুন।

২। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫´২ = ১০**

ক) শৈশবকালে খোকাবাবুর আচরণ কেমন ছিল?

খ) বৃক্ষকে লেখক কেন আদর্শ জীবনের প্রতীক মনে করেছেন?

গ) আনাতোল ফ্রাঁস মনের চোখ বাড়ানর কি উপায় নির্দেশ করেছেন?

ঘ) বেশি মাছ ধরা পড়ার অর্থই সৌভাগ্য নয় কেন?

ঙ) আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে? কে, কেন বলেছেন?

৩। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫´১ = ৫**

ক) বিশেষ্য পদগুলোকে বিশেষণে রূপান্তরিত করুন। –মন, প্রহার, ধর্ম, সমাজ, আহার।

খ) সাধু ও চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহারের পার্থক্য নিজের ভাষায় লিখুন।

গ) বিপরীত শব্দ লিখুন - বন্ধু, উত্তম, বিষ, খাঁটি, কনিষ্ঠ।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন (যে কোন ১টির) **৫´১ = ৫**

ক) ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

খ) আমার কি জীবন আছে? আমি তো মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।

গ) বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

৫। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **১০´১ = ১০**

ক) সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ যে আক্ষেপ করেছেন তার বর্ণনা দিন।

খ) "ওরা কাজ করে" কবিতার মূল বক্তব্য লিখুন।

গ) তোমাতে অমর আমি কবিতার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৬। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫´২ = ১০**

ক) আদি যুগে মানুষ কার আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং কেন?

খ) যাত্রীরা যখন খেয়াপার হতে এসেছিল তখন সমুদ্রের অবস্থা কেমন ছিল?

গ) ডালিম গাছের তলায় কার কবরের কথা বলেছেন দাদু? কেমন ছিলেন তিনি? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

ঘ) "রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী" - ছত্রটির মর্মার্থ লিখুন।

ঙ) রানার কে? তার কাজ কী? বুঝিয়ে লিখুন।

৭। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫´১ = ৫**

ক) 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা থেকে ৫টি আরবি-ফারসি শব্দ লিখুন।

খ) নিচের অংশটি গদ্যে লিখুন।

অধম ভালুকে/শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে/কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে/বীতং সে?

গ)ধরিত্রী শব্দের ৫টি সমার্থ শব্দ লিখুন।

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যে কোন ১টির ব্যাখ্যা লিখুন। **৫´১ = ৫**

ক) একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে, / আত্মার আত্মীয়।

খ) শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ - পরে/ওরা কাজ করে।

গ) তোমাতেই মূর্ত দেখি, সভ্যতার অমর মিনার।

৯। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখুন। **১০´১ = ১০**

ক) লাল সালু কোন শ্রেণীর উপন্যাস? উপন্যাস হিসেবে এটি কতটুকু সার্থক, আলোচনা করুন।

খ) লাল সালু উপন্যাসের সমাজ চিত্রটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

গ) লাল সালু উপন্যাসের নায়িকা কে? তার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

১০।যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫´১ = ৫**

ক) আক্কাস কে? সে কি করতে চায়? কেন করতে চায়?

খ) মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশের কাহিনীটি বর্ণনা করুন।

গ) "ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে"? এটি কার উক্তি? কাকে কেন বলা হয়েছিল?

১১।প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন। **৫´১ = ৫**

ক) শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।

খ) তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

গ) প্রকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও এক রকম এবাদত।

১২।ভাষারীতির রূপান্তর করুন। **৫´১ = ৫**

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে।

১৩।নিচের ৫টি প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ লিখুন। **৫´১ = ৫**

ক) উলুবনে মুক্তা ছড়ান খ) কয়লা ধুলে ময়লা যায় না গ) চকচক করলেই সোনা হয় না ঘ) অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ঙ) রথ দেখা কলা বেচা। চ) নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা ছ) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা জ) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

ভাষারীতি
প্রবাদ-প্রবচন